পিএইচডি ডিগ্রি'র জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

mvB‡q¨‘ †gvnv¤§‘ ev‡Ki m‘i Gi Av_-mvgvwRK ‘kb

[**Sayyid Mohammad Baqir Sadr : Socio-Economic Thought**]

M‡elK

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস

রেজি. নং : ০৩/২০১৫-১৬

ZËveavqK

অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী

‘kb wefvM

XvKv wekwe‘¨vjq

XvKv - 1000

Dhaka University Institutional Repository

A½xKvibvgv

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত ÒmvB‡q¨‘ †gvnv¤§‘ ev‡Ki m‘i Gi Av_-mvgwRK ‘kbÓ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

(মোঃ আব্দুল কুদ্দুস)
পিএইচডি গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ZËeavq‡Ki cZ¨qb cÎ

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের পিএইচডি গবেষক মোঃ আব্দুল কুদ্দুস “mvB‡q¨‘ †gvnv¤§‘ ev‡Ki m‘i Gi Av_-mvgwRK ‘kbÓ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচনা করেছেন। আমি এর পাণ্ডুলিপির আদ্যপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে উক্ত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য অথবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং, গবেষককে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের বিষয় বিবেচনার্থে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেওয়ার সুপারিশ করছি।

(ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

DrmM...

আমার জ্ঞানতাপস পিতা

†gvt †gveviK Avjx

এবং

পরম মমতাময়ী মাতা

dwRjv Lvbg‡K

Dhaka University Institutional Repository

KZÁZv ¯xKvi

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহামহীম আল্লাহর, যিনি কলমের সাহায্যে মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানতো না। তাঁরই অপার করুণায় অবশেষে আমার পক্ষে ÒmvB‡q¨' †gvnv¤§' ev‡Ki m'i Gi Av_-mvgwRK 'kbÓ শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে। যথাসময়ে বিধি-মোতাবিক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই মহান আল্লাহ্‌র দরবারে।

আজকের এ স্মরণীয় মুহূর্তে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শাহ্‌ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী স্যারের প্রতি। যার নিরন্তর অনুপ্রেরণা আর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্ধারণ, সার-সংক্ষেপ ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সেমিনার পেপার প্রস্তুকরণ, চূড়ান্ত গবেষণাপত্রের অধ্যায় উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং বিষয়বস্তুর সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রতিটি ধাপে স্যারের তত্ত্বাবধনা ছিল সুনিবিড়। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের পিছনে অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গত বিভাগের অন্যান্য সকল শিক্ষকের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে বিভাগের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. সাজাহান মিয়া, অধ্যাপক ড. এ কে এম হারুনার রশীদ, অধ্যাপক ড. এম মতিউর রহমান, অধ্যাপক ড. নাইমা হক, অধ্যাপক জনাব আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার রায়, এবং জনাব আবুল খায়ের মো. ইউনুস স্যারের প্রতি নিবেদন করছি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। আমার পিএইচডি গবেষণার দীর্ঘ অভিযাত্রায় তাঁদের বিভিন্ন নির্দেশনা, পরামর্শ এবং উৎসাহ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখব আজীবন।

দর্শন শাস্ত্রে আমার হাতে খড়ি ইরাকি স্কলার সাইয়্যেদ কামাল হায়দারি'র মাধ্যমে, ইরানের জ্ঞান নগরী কোমের ধর্মীয় সেমিনারিতে অধ্যয়নকালে। উস্তাদ কামাল হায়দারি ছিলেন সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদরের সরাসরি শিষ্য। আজ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদরের চিন্তা ও দর্শন সম্পর্কে বাংলা ভাষায় একটি অভিসন্দর্ভ উপহার দিতে পারার সাহস তিনিই প্রথম আমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। তাই এ মুহূর্তে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি উস্তাদ কামাল হায়দারিকে। বর্তমানে তিনি ইরাকে একজন শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদ ও ফকীহ হিসাবে সকলের বরণীয় ব্যক্তিত্ব।

পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার বাবা মোবারক আলী এবং মা ফজিলা খানমকে। যে বাবা-মা একটি টানাটানির সংসারে চার চারটি পুত্রকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন অকুতোভয় সৈনিকের ন্যায়। তাঁদের অন্তঃকরণের দোয়াই আমার পাথেয়। আজ আমি তাঁদের জন্য হাত তুলে প্রভুসনে দোয়া করি, দীর্ঘজীবী হও তোমরা হে বাবা ও মা। এরপর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহধর্মিনী রেবা'কে। বলতে গেলে প্রায় বিয়ের বছর থেকেই প্রথমে এমফিল এবং পরবর্তীকালে পিএইচডি'র অজুহাতে আজ এক দশক কাল আমার কেটে গেল একধরনের বৈরাগ্যপনায়। সংসারটাই করা হয়নি ভালভাবে। তবুও স্বামীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে একজন পতিব্রতা আদর্শ নারীর ন্যায় সবকিছু দু'হাতে সামলে নিয়েছে সে। কখনও কোন বিরক্তি নয় বরং মুখে সদা হাস্য বজায় রেখে আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে গেছে নিরন্তর। আর নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে দুই শিশুকন্যা খুদে পরি - অরণী আর ইরানিকে নিয়ে। ওরাও বাবার আদরটুকু ভাল করে পায়নি শৈশবের দিনগুলোতে, গবেষণার ব্যস্ততার নামে বাবার স্বার্থপরতার কারণে। তাই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার মা মণিদের কাছ থেকে।

দীর্ঘ গবেষণাকার্যে আমাকে দেশি বিদেশি অনেক শিক্ষক, গবেষক, লেখক ও চিন্তাবিদের পরামর্শ ও রচনাকর্মের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে তাদের নাম ও রচনাকর্মের উল্লেখ করেছি। তদুপরি এখানে আরেকবার তাদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে চাই। এছাড়া আমার দূরের ও কাছের যে সকল শিক্ষকবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুজন, যারা বিভিন্নভাবে যুক্তি-পরামর্শ ও মূল্যবান তথ্য যোগান দিয়ে আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আল্লাহ্ই সর্বোত্তম সহায় এবং তারই কাছে দোয়া চাই সকলের মঙ্গলের জন্য।

kã-ms‡ÿc

µg	cY kã	kã-ms‡ÿc
১	অধ্যায়	অ.
২	সংস্করণ	সং.
৩	সংখ্যা	স.
৪	সম্পাদিত	সম.
৫	পৃষ্ঠা	পৃ.
৬	তারিখ নেই	তা. নে.
৭	নাম নেই	না. নে.
৮	স্থান নেই	স্থা. নে.
৯	অনুবাদ/অনুবাদক/অনুদিত	অনু.
১০	দেখুন/দ্রষ্টব্য	দ্র.
১১	খণ্ড	খ.
১২	ফারসি	ফা.
১৩	বাংলা	বাং.
১৪	আরবি	আ.
১৫	ইংরেজি	ইং.
১৬	হিজরি	হি.
১৭	সৌর সন	সৌ. সন
১৮	সূত্র	সূ.
১৯	উদ্ধৃত	উৎ.
২০	Volume	V.
২১	Page	p.
২২	ibīdem, in the same place,	Ibid
২৩	Translated	Tr.
২৪	Published	Pub.
২৫	Solar Hijri	SH.

mwPcÎ

অঙ্গীকারনামা ০২
তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র ০৩
উৎসর্গ ০৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ০৫
শব্দ-সংক্ষেপ ০৭
ভূমিকা ১১
সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও চিন্তাধারা ১৫

c_g Aa¨vq : mgvRwPšÍvi BwZeË I gmwjg gvbm 24-58

১. মুসলিম সামাজিক চিন্তার উত্থান-পতন ও নিয়ামকসমূহ ২৬
২. সামাজিক চিন্তার উপর প্রভাবশীল বাস্তব কারণসমূহ ৩০
৩. সমাজচিন্তার ধারায় বাকের সদর ৩৩
৪. সমাজবদ্ধ জীবনের উৎপত্তি ৩৪
৪.১. মনীষীদের অভিমত ৩৫
৪.২. ব্যক্তি আসল নাকি সমাজ? ৩৮
৪.৩. সমাজের মৌলিকত্ব প্রসঙ্গে চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ ৩৮
৪.৪. তাৎপর্য বিজ্ঞানের নিরিখে ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিকতা প্রসঙ্গ ৪১
৪.৫. সমাজের জন্য দার্শনিক মৌলিকতা নাকচ ও সামাজিক মৌলিকতা গ্রহণ ৪২
৪.৬. বাকের সদরের অভিমত ৪৩
৪.৭. ব্যক্তির কর্ম ও সমাজের কর্মের পার্থক্য ৪৪
৫. সমাজ এবং ইতিহাসের নিয়মনীতি প্রসঙ্গ ৪৬
৬. সমাজের গঠনশৈলী ৪৯
৭. বাকের সদর-এর Kvibj AwK‘ তত্ত্ব ৫৩
সামাজিক বিষয়াবলি সমাধানে Kvibj AwK‘ তত্ত্বের প্রয়োগ ৫৪
বিশ্লেষণ ৫৫
৮. সমাজের গঠন উপাদান (তথা স্তম্ভ)সমূহ ৫৬

wØZxq Aa¨vq : GKZev‘x mgvRKvVv‡gv Ges HwZnwmK weeZbaviv 59-100

১. বাকের সদরের একত্ববাদী সমাজের রূপকাঠামো ৬১
২. ইস্তিখলাফ (প্রতিনিধিত্ব) হচ্ছে সমাজের চতুর্থ মাত্রা ৬৮
৩. মানব সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনধারা ৭০
৪. আল-কুরআন ও ইতিহাসের নিয়মনীতি ৭৬
৫. বাকের সদরের দৃষ্টিতে ইতিহাসের নিয়ম-নীতিসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি ৮০
৬. ইতিহাসের গতিপথের ভিত্তিই হচ্ছে মানুষ ৮৫
৭. মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও সামাজিক পরিচয় ৮৭
৮. সামাজিক ক্রিয়াকর্মের ভিত্তিতে সামাজিক নিয়ম-প্রথার ব্যাখ্যা ৮৮
৯. সামাজিক আদর্শ ও ন্যায়পরতা ৯১
১০. আদর্শের প্রকারভেদ ৯৩
এক. পুনরাবৃত্তিমূলক আদর্শ ৯৩
দুই. সংকীর্ণ দৃষ্টির আদর্শ ৯৬
তিন. সত্যিকার তথা পরম আদর্শ ৯৯

ZZxq Aa¨vq : mgvRZË Ges ÔBmjwg gvblÕ ZË 101-130

১. পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ব্যাপারে বাকের সদরের মূল্যায়ন ১০৪
২. কমিউনিস্ট ডকট্রিন এবং সমাজতন্ত্রের সাথে এর সম্পর্ক ১০৫
৩. কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে বাকের সদরের অভিমত ১০৭
৪. বাকের সদরের ‘ইসলামি মানুষ’ তত্ত্ব ১০৮
৫. দুইটি বিভ্রান্তির অপনোদন ১১১
৬. ইচ্ছা ও স্বাধীনতার ভূমিকা ১১৫
৭. ন্যায়পরতা ১২৫
বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা (Distributive Justice) ১২৫
সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা (Corrective Justice) ১২৬
বাকের সদর-এর ব্যাখ্যা ১২৬
৮. সামাজিক ন্যায়বিচার কি? ১২৭

PZ_ Aa¨vq : mvgwRK mgm¨vewj Ges a‡g cZ¨veZ‡bi WvK ১৩১-158

১. সামাজিক সমস্যা বলতে কি বুঝায়? ১৩২
২. বাকের সদরের দৃষ্টিতে সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ১৩৩
৩. সামাজিক সম্পর্কের সাথে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের পার্থক্য ১৩৫
৪. সামাজিক সমস্যাবলি সমাধানে পশ্চিমা মতবাদসমূহের ব্যর্থতা ১৪০
৫. সমসাময়িক মানুষের সমস্যাবলি সমাধানে ধর্মে প্রত্যাবর্তনের আবশ্যকতা ১৪১
৬. ডকট্রিন হিসাবে ইসলাম ১৪৪
৭. বাকের সদরের থিওরীর বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৪৫
৮. সভ্যতা বিনির্মাণ ও লালন পদ্ধতি ১৪৭
৯. মূল্যায়ন ১৫৬

cÂg Aa¨vq : mgvR I A_©bwZK ‘kb 159-205

১. অর্থনীতিতে আর্থ-সামাজিক চিন্তার মিথস্ক্রিয়া ১৬৩
২. আধুনিক অর্থনীতিতে ইউরোপের উত্থান : প্রেক্ষিত ১৫ থেকে ১৮ শতক ১৬৪
৩. ইসলামি অর্থনীতির ইতিকথা ১৬৬
৩.১. ইসলামি অর্থনীতির আধুনিক কাল ১৭০
৩.২. বাকের সদর ও তাঁর BKwZmv‘bv ১৭১
৪. ইসলামি অর্থনীতির পরিচয় ১৭৩
৫. বাকের সদরের পর্যালোচনা ১৭৭
৬. বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার সাথে ইসলামি বিশ্ববীক্ষার পার্থক্য ১৭৯
৭. মার্কস্‌বাদের সমালোচনা ১৮৮
মূল্যের শ্রমতত্ত্ব (Labor theory of value)-এর ইতিকথা ১৮৮
মার্কস্‌বাদের সমালোচনার অর্থ পুঁজিবাদের বৈধতা নয় ১৯৩
মার্কস্‌বাদ ও বাকের সদরের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ১৯৫
৮. পুঁজিবাদের সাথে তুলনা ১৯৯

lô Aa¨vq : Bmjwg A_bxwZi i/c‡iLv 206-254

১. অর্থনৈতিক ডকট্রিন ও অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ২০৮
২. ইসলাম ও অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইসলামি অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামো ২১০

এক. মিশ্র মালিকানা ২১০

দুই. বিশেষ কাঠামোর আওতায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ২১২

তিন. সামাজিক ন্যায়বিচার ২১৪

৪. ইসলামি অর্থনীতির বিস্তারিত রূপরেখা ২২৬

৫. ইসলামে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের মালিকানা ২৩২

৬. লেনদেন ২৩৪

৭. অর্থনৈতিক সমস্যাবলি ২৩৬

৮. অর্থের সঞ্চালন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ব্যবস্থা ২৩৯

৯. দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা কি? ২৪১

১০. সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক লেনদেন ২৪২

১০.১. বাকের সদরের প্রস্তাবিত মডেলের রূপরেখা ২৪৪

১০.২. সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যক্রম ২৪৫

১০.৩. মুদারাবা ২৫১

১০.৪. মুনাফা বিহীন ঋণ ২৫৩

১১. মন্তব্য ২৫৪

mßg Aa¨vq : ivó, h‡Mvc‡hvMx A_bxwZ Ges Dbqb 255-274

১. অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য ও কর্তৃত্বসীমা ২৫৭

২. সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্রের কর্তব্য ২৫৮

৩. রাষ্ট্র ও সম্পদের মালিকানা প্রসঙ্গ ২৬৩

৪. ব্যক্তিখাতের উপর নজরদারি ২৬৪

৫. নীতিপন্থা প্রণয়ন ২৬৪

৬. আয়ের পুনঃবণ্টন ২৬৫

৭. Avj-gvšÍvKvZj dvivM তত্ত্ব এবং অর্থনীতির যুগোপযোগিতা ২৬৭

৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন ও বাকের সদরের দৃষ্টিভঙ্গির সাযুজ্য ২৭১

Aóg Aa¨vq : ev‡Ki m‘‡ii KwZcq ‘wófw½i mgv‡jvPbv
275-284

Dcmsnvi 285

MšcÄx 299

fwgKv

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য এই অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ÒmvB‡q¨‘ †gvnv¤§‘ ev‡Ki m‘i Gi Av_-mvgwRK ‘kbÓ। ইরাকের প্রখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর (১৯৩৫-১৯৮০) সমকালীন মুসলিম মনীষার একজন অন্যতম পুরোধা। তাঁর চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ dvjmvdvZbv (1959) ও BKwZmv‘bv (1982) প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলামি দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি সামাজিক দর্শনের উপর একাধারে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন এবং gRZvgvDbv শিরোনামে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও প্রস্তুত করেন। যদিও সেটা প্রকাশের আগেই ইরাকের তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকারের হাতে তিনি নিহত হন। বাকের সদর এসব রচনাবলিতে সমসাময়িক বিশ্বে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার প্রসঙ্গ সামনে এনে সমাজ জীবন ও সামাজিক সমস্যাবলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রয়াস চালান। পাশাপাশি ইসলামি মতাদর্শের আলোকে মানব জাতির মুক্তি ও সমৃদ্ধির সন্ধানে তিনি একটি আদর্শ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরতে সচেষ্ট হন।

বাকের সদরের সৃজনশীল পন্থা ও অভিনব চিন্তাধারা অচিরেই প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। ফলে কেবল মধ্যপ্রাচ্য তথা মুসলিম বিশ্বের মধ্যেই নয়, বরং গোটা বিশ্বের ধর্মীয় সেমিনারি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নৃ-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, অর্থনীতি, মধ্যপ্রাচ্য তথা আরবীয় অধ্যয়ন, ইসলামি শিক্ষা ইত্যাদি অনুষদগুলোতে তাঁর চিন্তা ও দর্শন গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এভাবে সমসাময়িক মুসলিম মনীষীদের মধ্যে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর এক স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। যতদূর জানা যায়, বাংলা ভাষায় বাকের সদরের চিন্তা ও দর্শনের উপর পিএইচডি পর্যায়ে কোন মৌলিক গবেষণা কর্ম এটাই প্রথম। এ অভিসন্দর্ভ রচনার পিছনে উদ্দেশ্য হল, বাকের সদরের আর্থ-সামাজিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম চিন্তা-মানসকে নতুন পরিচয়ে তুলে ধরা এবং বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বাইরে শান্তিময় জীবনযাত্রার তৃতীয় পথ হিসাবে ইসলামি আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থার নাম প্রস্তাব করা।

চিন্তার আদি উন্মেষ থেকেই সমাজ সম্পর্কে মানুষ ভাবতে শুরু করে। সেজন্য সামাজিক চিন্তার ইতিহাস লিখতে গিয়ে Harry Elmer Barnes (১৮৮৯-১৯৬৮) তাঁর লেখা বইয়ের শিরোনাম দিয়েছেন *Social Thought from Lore to Science.* পক্ষান্তরে Rollin Chambliss তাঁর লেখা *Social Thought* -এ হাম্মুরাবী (Hammurabi) থেকে অগস্ট কোঁত (Auguste Comte) পর্যন্ত সামাজিক চিন্তার বিকাশধারা দেখিয়েছেন। হাম্মুরাবী'র সনদ হল সর্বপ্রাচীন মানবরচিত (১৭৯২-১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্ব; অন্য মতে ১৭২৮-১৬৮৬ খ্রিষ্টপূর্ব) শিলালিপি, যাতে প্রাচীন ব্যবিলনীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন পাওয়া গেছে। তাতে উৎপাদক শ্রেণী ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের অধিকার ও কর্তব্যের এক সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। মানুষের সমাজ সম্পর্কে হাম্মুরাবীর সনদই সর্ব প্রাচীন দলিল। এদিকে প্রাচ্যে মানুষের চিন্তাধারা দর্শনের গভীরে গিয়ে বিশ্ব-প্রকৃতির সন্ধান করেছে। বিশ্বজগতের উৎপত্তি, আকৃতি, প্রকৃতি -এসব প্রশ্নের অবতারণা করেছে। অথবা ধর্মীয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছে বা অধ্যাত্মবাদের চরমে পৌঁছেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের রীতিতে সে চিন্তাধারা মানব সমাজের বিশ্লেষণের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ দেশের মুণি, ঋষি, জ্ঞানী, গুণী, সাধু-সন্ন্যাসীরা

সমাজকে ত্যাগ করেই যেন চিন্তায় মগ্ন হতে ভালবাসতেন। তাতে তাদের চিন্তা বিশ্বচরাচরকে কেন্দ্র করে গভীরতা ও ব্যপ্তি লাভ করত। মনের গভীরদেশে তাঁরা বিচরণ করতেন, সমাজের দৈনন্দিন সমস্যাবলি থেকে যেতেন দূরে।

ইউরোপের এক বৈপ্লবিক পরিবেশে ও সামাজিক পরিবর্তনের এক ক্রান্তিলগ্নে সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে জন্মলাভ করে। বস্তুত ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী অগস্ট কোঁত ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম Sociology শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপরই বিজ্ঞান হিসাবে সমাজ বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়। পাশ্চাত্যের শিল্প বিপ্লব এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের যুগে সমাজবিজ্ঞানের জন্ম হয় বলে স্বভাবতঃই ধারণা হতে পারে যে সমাজবিজ্ঞান একটি বৈপ্লবিক বিজ্ঞান। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে প্রকৃতিকে মানুষের সেবায় নিযুক্ত করা হচ্ছে। তেমনি সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার সাহায্যে সমাজের গলদ দূর করে মানুষের দুঃখ মোচন করা সম্ভব হবে। যদিও সমাজ সম্পর্কে গবেষণা বড়ই দুরূহ কাজ। কেননা, মানবসমাজ মাত্রই জটিলতায় পূর্ণ। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা খোদার প্রদত্ত। মানুষে মানুষে প্রভেদ খোদার সৃষ্টি বা প্রকৃতির খেয়াল। অতএব মানুষের করার কিছুই নেই। শিল্প বিপ্লবের ফলে সেদিন মানুষের ভেতর থেকে এ ধারণা দূর হয়ে গেল। ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতি রবার্ট ওয়েন মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে নিজ মালিকানার শিল্পসমূহে শ্রমিকদের দারিদ্র্য দূর করার প্রচেষ্টা চালালেন। ফরাসি দেশে ম্যাবলী, মোরেলী শ্রমিকদের উপর মালিকের শোষণের মাত্রা কমাবার জন্য লেখালেখি আরম্ভ করেন। এ ধরনের শ্রমিক কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে কাল্পনিক সমাজতন্ত্র (Utopian Socialism) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কার্ল মার্কস্ নিজ প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এদিকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন হিসাবে ইসলাম ধর্ম মানব জীবনের সর্ব অঙ্গনে কথা বলেছে। মানুষের আকীদা বিশ্বাস ও বিশ্ববীক্ষা থেকে আরম্ভ করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ প্রত্যেকটি অঙ্গনে ইসলাম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে। একটি কল্যাণরাষ্ট্র গঠন এবং পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণে পৌঁছুনোর ব্যাপারে অপরিহার্য দিক-নির্দেশনা ও রূপরেখা ইসলামে রয়েছে। তাই মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে সমাজ বিষয়ক চিন্তার সূত্রপাত ঘটে প্রাচীন কাল থেকেই। সামাজিক চিন্তায় অনবদ্য অবদান রাখার জন্য ইবনে খালদুন (১৩৩২ - ১৪০৬)-কে অনেক আগেই সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত জনক বলে অভিমত পোষণ করেছেন অনেকেই। মুসলিম সভ্যতার পরিসরে সামাজিক চিন্তা হচ্ছে মানবের সামাজিক চিন্তারই অংশ বিশেষ, যা ভূ-পৃষ্ঠের এ অঞ্চলে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা থেকে গড়ে উঠেছে এবং একটি দীর্ঘ সময়কাল পার করে এসেছে। এটাই আজ মুসলিম সমাজ চিন্তার ইতিহাস নামে পরিচিতি লাভ করেছে এবং বিভিন্ন একাডেমিক কেন্দ্রসমূহে পর্যালোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

অপরদিকে চিরায়তভাবে মানুষের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক। মানুষের অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও মতবাদের ইতিকথা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর এসবের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা। ইউরোপ খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষে এবং ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে (অর্থাৎ মধ্যযুগের সমাপ্তিকালে) ব্যাপক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়। এই পরিবর্তনের পেছনে যে ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষভাবে অনুঘোটকের ভূমিকা পালন করেছিল, সেগুলো হচ্ছে একদিক থেকে ক্রিস্টফার কলম্বাস কর্তৃক ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার এবং ভাস্কো-দা-গামার প্রচেষ্টায় ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতবর্ষে প্রবেশের নতুন পথ আবিষ্কার হওয়া। তাছাড়া ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ যেমন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক ঐক্য ছিল আরেকটি কারণ, যারা নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলার মোহে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলে সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিচয়সত্তায় প্রকাশ লাভ করে এবং যদিও তাদের সাগর-মহাসাগর ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চলার পেছনে

বেশিরভাগ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল, কিন্তু অচিরেই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও প্রকাশিত হয়ে পড়ল। এভাবে বৈশ্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন এক রূপরেখা রচিত হয়। যা পরবর্তী যুগে ইউরোপের পরিবর্তনে অতিশয় প্রভাব ফেলেছিল। আটলান্টিক মহাসাগরের অপর প্রান্ত থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশের পথ খুলে যাওয়ায় বহির্বিশ্ব ব্যবসা-বাণিজ্য নতুন মাত্রা লাভ করে এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে প্রচুর পণ্যসামগ্রী ও মূল্যবান ধাতব আমদানীর কারণ হয়। এই নতুন অবস্থা এবং বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার কারণ হয় এবং নতুন নতুন তত্ত্ব ও বিশ্বাস জন্ম নেয়, যা মার্কেন্টাইলিজম তথা বণিকবাদ নামে আখ্যা লাভ করে। প্রতীয়মান হয় যে অর্থনৈতিক বিষয়াবলি সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং নাগরিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষ জীবনে চলার পথে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেগুলোর প্রত্যেকটিই কোন না কোনভাবে অর্থনৈতিক বিষয়াবলির সাথে সম্পৃক্ত। তাই অর্থনৈতিক বিষয়াবলিকে উপেক্ষা করার অর্থই হচ্ছে মানব অস্তিত্বের অর্ধেকাংশ (অর্থাৎ বস্তুগত দিকটি)কে উপেক্ষা করা, যা অপর অর্ধেকাংশ (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দিক) থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

বাকের সদর তাঁর BKwZmv‘bv গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথমে পাশ্চাত্যে বিরাজমান দুইটি অর্থনৈতিক ধারা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ সম্পর্কে কথা বলেছেন, যারা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক নেতৃত্বের দাবীদারও বটে। এরা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে তাদের অনুসরণ করতে আহ্বান জানায়, তবেই নাকি অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রকৃতই কী বিজাতীয় আর্থ-সামাজিক দর্শন মুসলিম সামাজিক জীবনে মুক্তির আদর্শ হতে পারে? এ ব্যাপারে বাকের সদরের অভিমত হচ্ছে, মুসলিম সমাজসমূহে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক মডেলদ্বয় নিতান্তই অসঙ্গতিপূর্ণ। আরব সোশ্যালিজম নামে কিছু কিছু রাষ্ট্রে গোজামিল ধরনের মডেলের আবির্ভাব ঘটেছে মূলত সমস্যাবলি সমাধানে ধর্মের সার্বিক সামর্থের প্রতি বিশ্বাসের অভাব থেকে। কিন্তু বাকের সদর, যিনি উত্তমভাবেই এ সমস্যার মূল উদঘাটন করেছেন[১], রোগ নির্ণয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্বাস করেন যে, প্রচলিত দুই অর্থব্যবস্থার আদলে পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক মডেল আদতেই মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।[২]

বাকের সদর ইসলামি অর্থনীতির স্বতন্ত্র পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। ইসলামি অর্থনীতির স্বতন্ত্র প্রকৃতি হচ্ছে তা মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সমাধানের সময় একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে থাকে। এ ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রেক্ষিত একসাথে সুসংহত ও সন্নিবেশিত। পাশাপাশি গোটা ব্যবস্থাটিই ইসলামের অপরাপর দৃষ্টিকোণ যথা সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাকের সদর মনে করেন, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় যেসব স্ববিরোধিতা রয়েছে সেগুলোর সমাধানে ইসলামি অর্থব্যবস্থাই সক্ষম এবং একই কারণে মানবিক প্রয়োজন পূরণে অধিকতর কার্যকর। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানবীয় সম্ভাবনার সাথে সাযুজ্য বজায় রেখে উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। তাই গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিচারে বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে ইসলামের শান্তিময় সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই অনুপ্রেরণা থেকেই মূলত সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর এর আর্থ-সামাজিক দর্শনের উপর অভিসন্দর্ভ রচনার পদক্ষেপ।

অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় প্রমিত বানান রীতি অনুসরণ করে মোট আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম চারটি অধ্যায়ে বাকের সদরের সামাজিক দর্শন আর পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে বাকের সদরের অর্থনৈতিক দর্শন

---

১. gIMAvZ Avj-Bgvg mvB‡q¨‘ †gvnv¤§‘ ev‡Ki Avj-m‘i, বৈরুত : দারুল মাআরিফ লিল মাতবুআত, ২০১২, খ. ১৭, পৃ. ২৩।
২. cÖv¸³|

বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোর শিরোনামগুলো হচ্ছে যথাক্রম (১) mgvR wPšÍvi BwZeË I gmwjg gvbm (২) GKZev'x mgvRKvVv‡gv I HwZnvwmK weeZbaviv (৩) mgvRZË I ÔBmjvwg gvblÕ ZË (৪) mvgwRK mgm¨vewj Ges a‡g cZ¨veZ‡bi WvK (৫) mgvR Ges A_%bwZK 'kb (৬) Bmjvwg A_bwZi i/c‡iLv এবং (৭) ivó, A_bwZi h‡Mvc‡hwMZv I Dbqb| আর অষ্টম তথা শেষ অধ্যায়টি একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা। মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাকের সদরের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের মধ্য থেকে বাছাইকৃত কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গির উপর সমালোচনা পেশ করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। সবশেষে অভিসন্দর্ভের থেকে পাওয়া বক্তব্য তথা সিদ্ধান্তগুলো সন্নিবেশিত করে প্রস্তুত করা হয়েছে উপসংহার। অপরদিকে ব্যক্তি সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদরের সাথে অধিকতর পরিচিত হওয়ার সুবিধার্তে অত্র ভূমিকার পরপরই কয়েক পৃষ্ঠায় তাঁর কর্মময় জীবন ও চিন্তাধারার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংযোজন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ রচনার রীতি অনুযায়ী অন্যান্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদের রচনাবলি থেকে কোন বক্তব্য উৎকলন করার সময় যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে সূত্র উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। বাকের সদরের নিজের রচিত গ্রন্থাবলি থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করতে হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। একারণে পাদটীকার মধ্যে অনেক জায়গায় একই সূত্রের পুনরাবৃত্তি হেতু সংশ্লিষ্ট সূত্রের একবার পূর্ণাঙ্গ রূপ উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরবর্তী স্থানগুলোতে ঐ একই সূত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ উল্লেখ করা হয়েছে। [উদাহরণস্বরূপ একটি সূত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ হল (বাকের সদর, Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, তেহরান : মারকাযে নাশরে ফারহাঙ্গি-এ রাজা, ১৩৬৯ সৌ. সন, পৃ. ১৮৬)। আর ঐ একই সূত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে (বাকের সদর, Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬। কখনো বা আরও সংক্ষেপে এভাবে (cv¸ ³, c. 186)। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একই গ্রন্থসূত্র, কিন্তু বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য ঐ ভিন্ন প্রকাশনী ও সংস্করণের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করার দরকার হয়েছে।

বাকের সদরের পূর্বেও অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ ইসলামি আর্থ-সামাজিক দর্শনের অগ্রসর ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তবে সার্বিক বিচারে বলা যায় যে বাকের সদরের উপস্থাপিত তত্ত্ব ও বিশ্লেষণগুলো এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অধিকতর আধুনিক এবং পূর্ণাঙ্গতর। বিশেষ করে ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর তিনি যে রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন, সেটা অভাবনীয় এবং মৌলিক কর্ম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। একে মুসলমানদের স্বকীয় ও স্বাধীন জাতিসত্তার পরিচয় নিয়ে বিশ্বমাঝে পুনর্বার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রয়াস হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি বিপ্লবোত্তর ইরানে এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরও কতিপয় রাষ্ট্রে বাকের সদরের কিছু কিছু অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও সূত্র বাস্তবায়নের প্রয়াস দেখে গেলেও এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন আজও পর্যন্ত কোথাও চোখে পড়েনি। অবশ্য বাকের সদরের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রদর্শন করেই বলতে হয় যে নতুন ধারার বিশ্বায়নের এই জটিল আন্তর্জাতিকতার যুগে ইসলামি অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন আরও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা এবং মুসলিম চিন্তাবিদদের নিরন্তর গবেষণা। এক্ষেত্রে বাকের সদরের আর্থ-সামাজিক দর্শন হতে পারে নতুন প্রজন্মের গবেষকদের জন্য অনুপ্রেরণার বাতিঘর।

mvB‡q¨‘ †gvnv¤§‘ ev‡Ki m‘i

msw¶ß cwiwPwZ

সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর ১৯৩৫ সালের ১লা মার্চ ইরাকের কাযেমাঈন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সদর পরিবারটি ইরাক, লেবানন ও ইরানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য সুপরিচিত ছিল এবং বংশ পরম্পরায় সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছিল। এ বংশেরই প্রখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক ইমাম মূসা সদর লেবাননে, সাইয়্যেদ রেযা সদর ইরানে এবং সাইয়্যেদ মোহাম্মদ সদর ও তদীয় সংগ্রামী পুত্র সাইয়্যেদ মুক্তাদা সদর ইরাকে সুপরিচিত। তারা সকলেই এ ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সদস্য।

সাইয়্যেদ বাকের সদরের পিতা ছিলেন সাইয়্যেদ হায়দার সদর এবং পিতামহ সাইয়্যেদ ইসমাঈল সদর। তাঁরাও প্রত্যেকে পণ্ডিত ও মুজ্‌তাহিদ ছিলেন। বাকের সদর তিন বছর বয়সে পিতাকে হারান। তখন বড় ভাই সাইয়্যেদ ইসমাঈল তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর মেধা ও প্রতিভা সকলের দৃষ্টি কাড়ে। কথিত আছে, ইরাকের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদরকে আধুনিক শিক্ষালয়ে লেখাপড়া করার আহ্বান জানান। কিন্তু বাকের সদর প্রচলিত পদ্ধতির ধর্মীয় সেমিনারিতে পড়াশুনা করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি প্রথমে নিজ শহর কাযেমাঈন-এ এবং তারপর ১৯৪৫ সালে ইরাকের নাজাফ শহরে পড়াশুনা অব্যাহত রাখেন। সেখানে তিনি তাঁর মামা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শেখ মুর্তাজা আলে ইয়াসীন এবং নাজাফের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ ধর্মতাত্ত্বিক আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আবুল কাসেম আল-খুয়ী'র নিকট শিক্ষা লাভ করেন। আর দর্শন শাস্ত্রে তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন শেখ সাদরা বাদকুবে। ব্যক্তিগত জীবনে বাকের সদর আপন চাচাতো বোন সাইয়্যেদা ফাতিমা সদরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং মোট ছয় সন্তানের জনক হন।

শিক্ষা জীবনে বাকের সদর দৈনিক ষোল ঘণ্টারও অধিক সময় পড়াশুনা করতেন এবং মাত্র সতের বছর বয়সে 'ইজতিহাদ'-এর স্বীকৃতি অর্জন করে ফকীহ্ তথা মারজা পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নাজাফের ধর্মীয় সেমিনারিতে উচ্চতর ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের উপর অধ্যাপনা শুরু করেন এবং অচিরেই নাজাফের খ্যাতিমান উস্তাদ হিসাবে পরিচিত লাভ করেন। ব্যক্তি বাকের সদরের অসামান্য জ্ঞান-প্রতিভা সম্পর্কে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শওকি আল-ফাঞ্জারী'র মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি যখন নাজাফে সাইয়্যেদ বাকের সদরের সাক্ষাতে আসেন তখন প্রথমেই জানতে চান, আপনি পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করেছেন? উত্তরে বাকের সদর বলেছিলেন, আমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিনি, দেশেও না, বিদেশেও না। আমার পড়াশুনা কেবল নাজাফের ধর্মীয় সেমিনারিগুলোতে, যেখানে ধর্মতত্ত্বের পাঠদান করা হয়। এ কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে ড. শওকী বলেন, সত্যই নাজাফের ধর্মীয় সেমিনারিগুলো ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেয়েও উত্তম। একইভাবে ড্যুরহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক উইলসন তাঁর 'The contribution of Baqir al Sadr to contemporary Islamic Economic Thought' শীর্ষক প্রবন্ধে বাকের সদরের সম্পর্কে লিখেছেন :

> "সমসাময়িক ইসলামি অর্থনীতির লেখক ও সমালোচকদের সাথে বাকের সদরের খুব কমই যোগাযোগ ছিল। এর একটি কারণ ছিল এটা যে তিনি একজন শিয়া স্কলার ছিলেন এবং নাজাফে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবনযাপন করতেন, যার কর্মকাণ্ড একটি অত্যাচারী সরকার কর্তৃক সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য সংস্কারবাদী লেখকদের বিপরীতে বাকের সদরের মূলধারার নব্য-ধ্রুপদী অর্থনীতির উপর কোন আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছিল না। যদিও

মার্কস্‌বাদী অর্থনীতির উপর তিনি ভালই জ্ঞান রাখতেন। যে মৌলিক অনুমানগুলো তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।”[৩]

ইরাকে তখন বামপন্থী বাথ পার্টির একদলীয় শাসনের কড়াকড়ি। এ শাসনব্যবস্থার সামনে হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল ইরাকের প্রভাবশালী ধর্মতাত্ত্বিকদের নেতৃত্বাধীন gvRwjm-B Awjv কাউন্সিল (Islamic Supreme Council)। এ দলে সক্রিয় ছিলেন বাকের সদরও। সমকালের ক্ষণজন্মা এ মুসলিম মনীষী এমন এক সময়ে ইরাকের জাতীয় অঙ্গনে স্ব-মহীমায় আবির্ভূত হন যখন ১৯৫৮ সনে জেনারেল আব্দুল করিম কাসেম ইরাকের শাহী জান্তাকে হটিয়ে প্রজাতন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা ঘোষণা করেন। এ সময় জেনারেল কাসেম মুসলমান অধ্যুষিত এ দেশটিতে কমিউনিস্টপন্থীদের জন্য স্বাধীন রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ অবারিত করে দেন। ফলে সেখানে বস্তুবাদী চিন্তা ও দর্শন নির্বিঘ্নে প্রসার লাভ করতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে ইরাকের সমাজে আগ্রাসী রূপ ধারণ করে। ১৯৮০ সনে ইরাকের তৎকালীন স্বৈরশাসকের হাতে নির্মমভাবে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত বাকের সদর কলম হাতে লড়ে গেছেন আত্ম-পরিচয় বিস্মৃত ও পাশ্চাত্যের ধ্বজাধারী মুসলিম মননের বিরুদ্ধে। ফলে মাত্র ৪৫ বছরের নাতিদীর্ঘ জীবনে তিনি রেখে যেতে পেরেছেন ১৭ টিরও বেশি মৌলিক গ্রন্থ এবং অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ।

বাকের সদরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা এবং পাশ্চাত্য দর্শন, বিশেষ করে মার্কসীয় দর্শনের চুলচেরা বিশ্লেষণে দক্ষতা ইত্যাদি কারণে তিনি gvRwjm-B Awjv’র দার্শনিক দীক্ষাগুরু হয়ে ওঠেন। এদিকে ১৯৭৯ সালে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ইরানে গণবিপ্লবের মাধ্যমে শাহ সরকারকে উৎখাত করে সেখানে ইসলামি প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন আয়াতুল্লাহ খোমেইনী। বাকের সদর ইরানের ইসলামি বিপ্লব ও ইসলামি প্রজাতন্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেন। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেন। পাছে ইরাকেও গণবিপ্লবের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের কারণ ঘটে- এ আশঙ্কায় সাদ্দাম সরকার বাকের সদরের শীর্ষ সহচরসহ সক্রিয় ব্যক্তিদের নির্বিচারে গ্রেফতার, জুলুম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালান। এসব জুলুম নিপীড়নের প্রতিবাদে বাকের সদরের বজ্রকণ্ঠে সাড়া দিয়ে দেশব্যাপী যখন আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন সাদ্দাম হোসেন বাকের সদরকে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৯ সময়কালের মধ্যে পর পর কয়েক দফা গ্রেফতার ও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সর্বশেষ ১৯৮০ সালে বাকের সদরকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য স্বৈরশাসক তার বাসভবন অবরোধ করে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখে। দীর্ঘ নয় মাস এ অবস্থা চলার পর অবশেষে সাদ্দামের নির্দেশে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং বাগদাদে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে কারান্তরীণ অবস্থায় তাঁর উপর অনেক নির্যাতন চালানোর পর ১৯৮০ সালের ৯ এপ্রিল তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইরাকের নাজাফে অবস্থিত ওয়াদিউস-সালাম নামক গোরস্থানে তাঁর সমাধি অবস্থিত।

---

[৩]. *“Baqir al-Sadr had little contact with other leading contemporary writers and critics of Islamic economics. This was partly because he was a Shi’te scholar living in comparative isolation in Najaf, whose activities were restricted by an oppressive regime. Unlike those other reformist writers, al-Sadr had no formal training in mainstream neo-classical economics, although he had a good knowledge of Marxist economics, the basic assumptions of which he rejected vehemently”*- Rodney Wilson, ‘The contribution of Baqir al Sadr to contemporary Islamic Economic Thought’, *Journal of Islamic Studies*, Published by: Oxford University Press , Volume 9, Issue 1, 1 January 1998, pp. 46–59.

ev‡Ki m`‡ii wPšÍvaviv

একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে ইরাকের জনগণের জন্য সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদরের চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী পশ্চিমা ও কমিউনিস্ট চিন্তাধারার বস্তুবাদী জোয়ারে ভেসে যাওয়া ইরাকের মুসলমান জাতিকে পুনর্বার আত্ম-পরিচয়ে ফিরতে অনুপ্রেরণা যোগায়। বাকের সদর লক্ষ্য করলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চায় মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের দুর্দশার অন্ত নেই। কারণ, পাশ্চাত্যের তাক্ লাগানো উন্নয়ন ও অগ্রগতির সামনে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একদল কেবল অনুকরণের পথকেই মুক্তির পথ বলে মনে করছেন। উঠতে বসতে তারা তাকিয়ে থাকেন পশ্চিমা পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মুখের দিকে। যেন পশ্চিমারা যেটা বলবে সেটাই অমোঘ বাণী। যে মুসলিমরা একসময় জ্ঞানের জন্য ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের অপেক্ষায় থাকতো, আজ তারা অপেক্ষায় থাকে কখন পাশ্চাত্য থেকে কি অবতীর্ণ হয় তার দিকে। এটা বড়ই লজ্জাকর।

অপরদিকে যে সকল মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা কিছুটা স্বকীয়তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তাদের নীতি আবার ভিন্ন। তারা মনে করেন, পাশ্চাত্য থেকে যা কিছু আসে তা হুবহু গ্রহণ করা ঠিক নয়। বরং তাদের ভালটা আর আমাদের ভালটা মিশিয়ে একটা মিশ্র কিছু দাঁড় করানো উচিত। বাকের সদর এ উভয় দলের বুদ্ধিজীবী থেকে আলাদা। তিনি মুসলামানদের জন্য 'আমাদের' পরিচয়টা নতুন করে সামনে এনেছেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত তিনটি গ্রন্থ dvjmvdvZbv, BKwZmv`bv এবং gRZvgvDbv। তিনটি গ্রন্থের শেষেই আরবী 'نا' (-না) সর্বনামটি রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে 'আমাদের'। সুতরাং তাঁর গ্রন্থত্রয়ের নাম দাঁড়ায় যথাক্রমে Avgv‡`i `kb, Avgv‡`i A_bxwZ এবং Avgv‡`i mgvR। এর মাধ্যমে তিনি যে আদর্শিক শিক্ষা মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের জন্য রেখে গেছেন সেটা খুবই স্পষ্ট ও অর্থবহ। অর্থাৎ মুসলিমদের কাছে 'আমাদের' তথা নিজেদের জ্ঞান বিজ্ঞান আর কৃষ্টি সভ্যতা বলে স্বকীয় সবকিছুই রয়েছে। পাশ্চাত্যের অমোঘ বাণীর কোনই প্রয়োজন নেই। সমগ্র অর্থেও নয়, আংশিক অর্থেও নয়। বাকের সদর বর্তমান মুসলমানদের এ দৈন্যদশা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করেছেন সমাজ ব্যবস্থায়। এটাকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন 'সমসাময়িক বিশ্বের সংকট' হিসাবে। এ সংকটকে তিনি তিনটি পরিসরে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। যথা :

১. e¨vcK cwimi : এ স্তরে তিনি ইতিহাসকাল জুড়ে মানব সভ্যতার বৃহত্তর সমস্যাবলির উপর আলোকপাত করেছেন, যা পৃথিবী নামক এ গ্রহে বসবাসরত মানুষদের জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছে।

২. ga¨g cwimi : সমসাময়িক মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা এ পরিসরে গুরুত্ব পেয়েছে, যা মানব জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্যতম সমস্যা।

৩. ew× I cÁvi cwimi : এটা হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা, যা প্রাথমিক দৃষ্টিতে বাকের সদরের নজরে ছিল এবং যা অন্য সব অঙ্গনের চেয়ে অধিকতর সহজে নিরসন যোগ্য।

বাকের সদর ইসলামি আদর্শে পুষ্ট জাতির স্বকীয়তা সংরক্ষণে বিভিন্ন স্তরে সাংগঠনিক পরিকল্পনা সহকারে অগ্রসর হন। তাঁর গৃহীত এসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল :

১. চিন্তার ভিত্তির মধ্যে পরিবর্তন সাধন।

২. সামাজিক পরিবর্তন সাধন।

৩. রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন।

চিন্তার ক্ষেত্রে বাকের সদর যে পরিবর্তন সাধনের পরিকল্পনা করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল নিম্নরূপ -

১. ইসলামি চিন্তার পুনর্গঠন : ইসলামি চিন্তাকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করে উপস্থাপন করার তাগিদ ছিল যেন তা কুরআন ও হাদীস থেকে উৎসারিত মৌলিকতা বজায় রেখেই বর্তমান জীবনধারার উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয় এবং এ যুগের মানুষদের চাহিদাসমূহ পূরণ করতে সক্ষম হয়।

২. ধর্মীয় সেমিনারিসমূহ ও ইসলামি অধ্যয়ন কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষা ও গবেষণার পদ্ধতিতে পরিবর্তন সূচিত করা এবং সমকালীন মানুষদের চাহিদা ও প্রত্যাশা পুরণের লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষা ও গবেষণার বিষয়বস্তু নিরূপণ এবং চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল গবেষণা কর্মসূচিকে আধুনিকায়ন করা।

৩. ইসলামকে বিশ্বজগত ও মানুষের ব্যাপারে শক্তিশালী দার্শনিক বীক্ষাসমৃদ্ধ একটি সুসমন্বিত জীবন ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে, যার প্রত্যেকটি ধারা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও প্রমাণসিদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে ইসলামি চৈন্তিক মতাদর্শের উপর গুরুত্বারোপ এবং প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা পরিহার করতে হবে।

৪. বিরুদ্ধ চিন্তা দর্শনকে মৌলিকভাবে মোকাবিলা করা।

৫. যুবসমাজের মধ্যে থেকে কর্মতৎপর ও সক্রিয় প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে, যারা ইসলামের মৌলিক কৃষ্টি ও নতুন চিন্তাধারার উপর অভিজ্ঞ হবে এবং নিরীশ্বরবাদ ও বস্তুবাদী চিন্তা দর্শনের সাথে মোকাবিলায় সঠিক যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে।[৪]

বাকের সদর উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতির সামাজিক পরিবর্তন কেবল ঐ শিক্ষিত শ্রেণীর নেতৃত্বে বাস্তবায়ন সম্ভব, যারা একদিকে জাতির আস্থাভাজন হবে, অপরদিকে জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হবে। যাতে তারা সামাজিক অবস্থা ও পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করে একটি কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় উন্নীত করনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। এ প্রসঙ্গে তিনি gviRvCq¨vZ তথা ফকীহ্‌র নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তাঁরা হচ্ছে জাতির হৃৎপিণ্ডসম এবং সকল ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল অক্ষ। তাই জাতির মধ্যে আর কোন সংস্থা সমাজ পরিবর্তনে এতটা সামর্থ ও শক্তি রাখে না। অগত্যা এই সংস্থার মাধ্যমেই আরম্ভ করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে এই এক ব্যক্তি নির্ভর সংস্থাকে একটি মৌলিক সংস্থায় পরিণত করতে হবে যা gviRvCq¨v‡Zi জন্য জাতির পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে কৌশলগত ভূমিকা পালন করবে।

আর রাজনৈতিক অঙ্গনে বাকের সদর বিশ্বাস করতেন জীবনের ব্যাপারে ধর্মীয় বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ব্যতীত সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। সেজন্য ইসলামি শাসন ব্যবস্থার আবশ্যকতা রয়েছে। যে শাসনব্যবস্থা মানব সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্বভার বহন করবে। এ লক্ষ্য পূরণে জাতিকে যেমন চিন্তাগতভাবে প্রস্তুত করা দরকার, তদ্রূপ কর্মগতভাবেও রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রস্তুত করা ছাড়া উপায় নেই।

ev‡Ki m‘‡ii wPšÍvavivi wfwËmgn

wekZË

বাকের সদর বিশ্বাস করেন বিশ্বজগত, জীবন ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা তথা বিশ্ববীক্ষা যতটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট থাকবে, আমাদের অগ্রগতিও ঠিক তদানুপাতে উক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রূপ লাভ করবে। তিনি

[৪]. মুহসীন আরাকি, ‘I‡inv Iqv wckMgv‡b we‘wi Bmjvwg, অনু. মুহাম্মদ মুকাদ্দাস, তেহরান : ফারাকেতাব, ২০০২, পৃ. ১০০।

মনে করেন, মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাসমূহের প্রতি যে নির্দেশই প্রদান করা হোক না কেন, সেটা জীবনকে চিত্রায়িত করার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবস্থার দার্শনিক ব্যাখ্যার সাফল্যের মাত্রার উপর নির্ভরশীল।[৫] এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তিনি বিশ্বতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় স্রষ্টা ও তাঁর গুণাবলিকে অধিকতর জানার এবং বিশ্বজগতে মানুষের স্থান ও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়ার আহ্বান জানান। অন্য কথায় বলা যায়, বাকের সদর তাঁর এরূপ বিশ্ববীক্ষার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চসমূহকে মানুষ ও আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্কের নিরিখে পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস চালান।

বিশ্বতত্ত্বে বাকের সদরের আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্ হচ্ছে 'অদৃশ্যলোক' (عالم الغيب) ও 'দৃশ্যমান জগত' (عالم الشهادة)। এখানে 'অদৃশ্যলোক' বলতে তাঁর উদ্দেশ্য বিশ্বজগতের সেই অংশটি, যা মানবের ইন্দ্রিয়ানুভবের বহির্ভূত এবং যা সচরাচর ইন্দ্রিয় মাধ্যম দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজগতের সমুদয় বাস্তবতাসমূহ এবং মানব অস্তিত্বের বহির্ভূত সৃষ্টিকূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। অবশ্য এহেন উপলব্ধির কারণে তিনি ঐ সমস্ত মতবাদসমূহের বিপরীতে অবস্থান নেন, যারা অজড় ও অতিন্দ্রীয় বাস্তবতাসমূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে থাকে। বাকের সদরের দৃষ্টিতে অদৃশ্যলোককে দৃশ্যমান জগত থেকে পৃথক করা হয় এ অর্থে যে, বিশ্বজগত প্রাকৃতিক জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয় না। বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত হল জগতসমূহের মধ্যে একটি জগত মাত্র। অতএব অদৃশ্যলোক ও দৃশ্যমান জগতের মাঝে যদিও মৌলিক সব পার্থক্য রয়েছে, তথাপি এ'দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ও গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান এবং যা কিছুই দৃশ্যমান জগতে রয়েছে, তার মূল নিহিত রয়েছে অদৃশ্যলোকে। এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আল্লাহ্ কেবল জগতের স্রষ্টা ও বিধাতাই নন, বরং এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি হলেন বিশ্বজগতের নিয়ন্তা। দর্শনের ভাষায় বলতে গেলে এভাবে বলা যায় যে, জগত শুধু কেবল নিজের সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী তা নয়, বরং নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ আল্লাহ্ কেবল সবকিছুর সৃজনই করেননি, বরং সেগুলোর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং পরিচালনাও তাঁরই উপর নির্ভরশীল।[৬]

বিশ্বতাত্ত্বিক আলোচনায় বাকের সদরের দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতা প্রকাশ পায় মানবের অন্তর্নিহিত সহজাত প্রবৃত্তির সাথে তাঁর বিশ্ববীক্ষার সঙ্গতিশীলতা ও সামঞ্জস্যতা থেকে। তিনি বিশ্বাস করেন, ইসলাম মানুষের অভ্যন্তরীণ সহজাত প্রবৃত্তি, প্রতিভা, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সকল মানুষের মধ্যকার অভিন্ন মূলনীতিসমূহকে পরিপূরণ করে থাকে।[৭]

সুতরাং 'অস্তিত্ব জগত' (عالم الوجود) -এর ধারণাটি আবর্তিত হয় 'সত্য'কে কেন্দ্র করে। আর গোটা বিশ্বলোকের সত্যকেন্দ্রিকতা এবং সৃষ্টির পেছনে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকার বিষয়টিই এই 'সত্য'র আলোকে অর্থবহ হয়ে ওঠে। এ অর্থ ততটাই গভীর, যতটা গভীর ও ব্যপ্তিময় 'সত্য'র অর্থ। বিভিন্ন রূপে এ অর্থবহতার প্রকাশ ঘটে। সত্যের এরূপ একটি প্রকাশস্থল হচ্ছে- মহাবিশ্ব খোদায়ী নিয়মনীতির[৮] উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সুশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, খোদায়ী তক্‌দীরে এটাই নির্ধারিত হয়েছে যে বিশ্বজগত এক বিশেষ শৃঙ্খলার উপর সুসংবদ্ধ হোক এবং এর প্রপঞ্চসমূহ বিশেষ সীমান্ত রেখাসমূহে ক্রিয়া করুক। সুতরাং জগতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী মানুষরা, যারা সৃষ্টিকে অহেতুক বলে মনে করে না, তারা মানব জীবনে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে। কখনোই অন্তঃসারশূন্য ও নৈরাশ্যকর চিন্তা চেতনা এধরনের মানুষদের

---

৫. বাকের সদর, dvjmvdvZbv, বৈরুত : দারুল মাআরিফ লিল মাতবুয়াত, ২০০৯, পৃ. ২৮।

৬. cÖv¸³, পৃ. ২৯।

৭. দ্র. _______, wimvjvZbv, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-ইসলামি, ২০০৪, পৃ. ৭১-৭৩।

৮. বাকের সদর 'খোদায়ী রীতি-নীতি' কথাটি বুঝাবার জন্য 'সুনানে ইলাহী' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। আরবী শব্দ 'সুনান' বহুবচন। একবচনে হয় 'সুন্নাত', যার বাংলা অর্থ হয় রীতি বা প্রথা।

মস্তিস্কে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। বরং বিশ্বজগত সম্পর্কিত তাদের মধ্যে এমন দার্শনিক উপলব্ধির সৃষ্টি করে, যা ইসলামকে বিশ্বমানবের সঠিক পথে পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হিসাবে দেখতে পায়।[৯]

বাকের সদর লিখেন :

> 'ইসলাম মুসলিম জাতিকে জীবনের উৎকৃষ্টতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করা এবং তাদের সঠিক বিশ্বাসের নেতৃত্ব প্রদানে সবচেয়ে একটি শক্তিশালী মতাদর্শ।'[১০]

বাকের সদরের বিশ্বতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো পাওয়া যায় -

১. সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ্) নিখাঁদ প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরতার অধিকারী।

২. তাঁর গুণাবলি এবং কার্যাবলিও নিখাঁদ ন্যায়পর।

৩. বিশ্বজগত হচ্ছে (সর্বাধিক) সম্পূর্ণতম ও সুন্দরতম ব্যবস্থা। কোনরূপ ক্রটিবা ঘাটতি এতে নেই।

৪. সমাজে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের শাসনকর্তৃত্ব নাকচ।

৫. রাজনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানব সমাজে তা প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক।[১১]

b-ZË

বাকের সদরের দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে এমন এক স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী যার দ্বি-মাত্রিক যোগ্যতা রয়েছে। তবে দর্শনের পরিভাষায় যে 'দ্বিত্বতা'র কথা বলা হত যেখানে দ্বৈত স্বভাব প্রকৃতির মানুষকে বুঝানো হত, এখানে সেটা উদ্দেশ্য নয়। তিনি মানুষের যোগ্যতাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেছেন। তিনি মানুষের বস্তুগত দিকটা বর্ণনা করেছেন কুরআনে ব্যবহৃত mvjmvj (سَلْسَلٌ: শুষ্ক কর্দম), Zxb-B jvhe (طِينٍ لازِبٍ : আঠাঁলো কর্দম), nvgvDb gvmbb (حَمَاءٌ مَسْنُونٌ :রঞ্জনকৃত কর্দম) ইত্যাদি আরবি পরিভাষা ব্যবহার করে। এসব পরিভাষা আসলে মানুষের বস্তুগত পাশব দিকটাই বর্ণনা করে। পক্ষান্তরে মানুষের চিন্তাক্ষমতা, আত্মিকতা তথা আধ্যাত্মিকতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে তার অপার্থিব দিক বলে মনে করেন। তাঁর মতে, মানুষ একাধিক দিক বিশিষ্ট, যে দিকগুলো প্রচণ্ডভাবে পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। এ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি। আর মানুষের চাহিদাসমূহ পূরণে তার 'আত্ম-প্রেম' প্রবৃত্তির ভূমিকাকে ভাগ্যনির্ধারণী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, মানবের ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে মানুষের 'আত্ম-প্রেম' এর স্বভাব হচ্ছে একটি মৌলিক স্বভাব। যদি মানুষের প্রকৃতিতে এই স্বভাবটি না থাকতো, তাহলে তার চাহিদাসমূহ পূরণের কোন অনুপ্রেরণাই বিদ্যমান থাকতো না। বাস্তবতা হল এটা যে, সমাজ গঠিত হওয়ার বহু পূর্বে মানুষের মধ্যে এই চাহিদাসমূহ পূরণের প্রেরণা বিদ্যমান ছিল এবং এ প্রেরণাই সমাজসমূহ গঠনের উৎসকারণে পরিণত হয়েছে। আর এভাবেই মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।[১২]

বাকের সদরের দৃষ্টিতে, মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটার কিছু চাহিদা রয়েছে, যা এই দেহ ও সামাজিক পরিবেশে বিদ্যমান অলিগলির মধ্য দিয়ে চলতে চলতে স্বাধীনতা ও নির্বাচন ক্ষমতার মাধ্যমে নিজের আলোকময় কিম্বা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে পথ পাড়ি দেয়। সুতরাং মানুষ তার আপন প্রকৃতিতে যেমন আলোকময় ভবিষ্যতের

---

[৯]. বাকের সদর, wimvjvZbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২।
[১০]. cv¸³, পৃ. ১৮।
[১১]. দ্র.cv¸³, পৃ. ২০।
[১২]. দ্র.cv¸³, পৃ. ৪।

সম্ভাবনা ধারণ করে, তদ্রুপ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎকেও ধারণ করে। উভয়ই তার আপন হাতে নির্মিত, স্বাধীন নির্বাচনের ফল এবং এ নির্বাচন ক্ষমতার মৌলিকতা রয়েছে। বাকের সদর মানুষ সম্পর্কে তাঁর নিজের বিশ্লেষণে স্বীয় মনোযোগকে নিবদ্ধ করেছেন মানুষের অন্তর্নিহিত সারসত্তার প্রতি। অর্থাৎ মুল নিয়ামক হল মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি। মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছাই হচ্ছে সমাজ ও ইতিহাসের গতি সৃষ্টিকারী এরূপভাবে যে, অভ্যন্তরীণ সারসত্তা একদিক থেকে 'চিন্তা'র দিকটি নির্দেশ করে যেখানে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য'র কল্পনা সঞ্চার হয়। অপরদিকে 'ইচ্ছা'র নির্দেশ করে। আর 'চিন্তা' ও 'ইচ্ছা'- এ দুটি একসাথে মিলে ভবিষ্যৎকে নির্মাণের ক্ষমতা এবং সমাজের দৃশ্যপটে ইতিহাসের কর্মতৎপরতার গতি সৃষ্টি করে থাকে।[১৩]

এই ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায় যে, মানুষের অভ্যন্তরীণ সারসত্তাই (অর্থাৎ চিন্তা ও ইচ্ছা) ইতিহাসের গতির নির্মাণকারী। মানুষ এই বৈশিষ্ট্যগুণে স্বভাবগতভাবেই সামাজিক। আর যেহেতু সামাজিক, কাজেই তার জন্য আইন-কানুন প্রয়োজন। আর নবুওয়্যাতের অর্জনই হচ্ছে আইন-কানুন।[১৪] অবশ্য বাকের সদরের দৃষ্টিতে, এই স্বভাবগতভাবে সামাজিক যে মানুষ, তার জন্য জীবনের বহুমুখী পথের মধ্যে থেকে সঠিক পথটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে যখন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সত্য ও মিথ্যা মিলেমিশে এমন এক জটিল পরিস্থিতি তৈরী হয় যেখানে সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করতে গিয়ে যে কোন প্রজ্ঞাবান বিচক্ষণ মানুষকেও হিমশিম খেতে হয়) সাফল্য ও মুক্তির একমাত্র উপায় হল তার পথনির্দেশক থাকা। আর এ পথনির্দেশক হচ্ছে চিন্তা ও ইচ্ছা সহকারে সুনিদ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট মূলনীতিসমূহের প্রতি বিশ্বাস পোষণ।[১৫]

ÁvbZË

সামগ্রিকভাবে বাকের সদরের জ্ঞানতত্ত্ব দুইটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত-

প্রথমত, যুক্তি-প্রমাণ আশ্রয়ী বুদ্ধি এককভাবে সত্যকে প্রমাণে যথেষ্ট নয়। বরং অন্যান্য শিক্ষার সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে।[১৬]

দ্বিতীয়ত, বাকের সদরের জ্ঞানতত্ত্ব হল যোগাযোগনির্ভর এবং ওয়াহি তথা প্রত্যাদেশভিত্তিক। অর্থাৎ তিনি সাদরায়ী দর্শন[১৭]কে অন্যান্য দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন এবং ইসলামি আকাঈদ তথা বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি বিধান

---

[১৩].দ্র.___________ , Avj-gv'ivmvZj KiAwbq¨v, বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল মাতবুয়াত, ১৯৮৯, পৃ. ১৩৮।

[১৪].দ্র.___________, BKwZmv'bv, কোম : মাকতাব আল-আ'লাম আল ইসলামি, ১৩৭৫ সৌ. সন, পৃ. ৩৩৭।

[১৫] দ্র. __________, Avj gv'ivmvZj KiAwbq¨v, (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭)।

[১৬]. দ্র. cv¸ ³, পৃ. ৪৯।

[১৭]. এখানে মোল্লা সাদরার দর্শনকেই সাদরায়ী দর্শন হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সদর আদ-দীন মুহাম্মদ সিরাজী ওরফে মোল্লা সাদরা (১৫৭১-১৬৪০) ছিলেন ইরানের একজন দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। মোল্লা সাদরা সপ্তদশ শতকে ইরানের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। অলিভার লীম্যানের মতে, মোল্লা সাদরা মুসলিম বিশ্বে গত চারশ বছরের মধ্যে এককভাবে সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক।

মোল্লা সাদরার দার্শনিক মতবাদ আল-হিকমাত আল-মুতাআলিয়া (الحكمة المتعالية তথা উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞা) দর্শন নামে পরিচিতি। এ দর্শনে অস্তিত্ব (existence) কে মূল ধরা হয় এবং নির্যাসকে (essence) গণ্য করা হয় গৌণ হিসাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জগতে সর্বজনবিদিত বিষয়টি হচ্ছে 'অস্তিত্ব'র বিষয়টি। এটা আমরা আমাদের উপস্থিত জ্ঞান তথা স্বজ্ঞা দ্বারা জানতে পারি। কোন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা এটা প্রমাণ করার দরকার হয় না। বিশ্বজগতের সকল প্রপঞ্চই একটি মূলনীতিতে এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে 'অস্তিত্ব'। আর অস্তিত্ব হল একই। কারণ তা অস্তিত্বদাতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর থেকে উৎস লাভ করে। কিন্তু এ সব প্রপঞ্চের প্রত্যেকটির স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য তাদের সত্তা ও নির্যাসের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, প্রত্যেক জিনিসের মূল হচ্ছে তার অস্তিত্ব। আর তার নির্যাস তথা গুণাবলি হচ্ছে অস্তিত্বের ফল। মোল্লা সাদরা স্বীয় গুরু মীর দামাদ এর বিরোধিতা করে দাবী করেন যে 'অস্তিত্ব' হচ্ছে একটি প্রকৃত ব্যাপার। আর 'নির্যাস' (essence) হচ্ছে একটি অপ্রকৃত ব্যাপার।

করেছেন। তিনি বিশ্বতত্ত্বের বিষয়ে ছাড়াও জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়েও গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং তারপর এগুলোকে প্রত্যাদেশের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং ইসলামি আকাঈদ এর সাথে সঙ্গতি বিধান করেছেন।[১৮] প্রকৃতপক্ষে কোন কোন চিন্তাবিদ, যারা নিজেদের সমস্ত চিন্তা সামর্থকে দর্শন ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পিছনে ব্যয় করেছেন, তাদের বিপরীতে বাকের সদর জ্ঞানতত্ত্বকে কেবল এক মাধ্যমের (অর্থাৎ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের) মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেননি। বরং এরূপ এক-মাধ্যম জ্ঞানতত্ত্বের পরিবর্তে তিনি এর পরিসরকে আরও বিস্তৃত করেছেন এবং উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে সত্যকে উদ্‌ঘাটনের মোট চারটি মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। বাকের সদর এই সকল উপাদানগুলোকে মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। এমনভাবে যে এ উপাদানগুলোর কোনটাই অপরের বিরোধিতা করে না। তবে প্রত্যেকের কার্যকারিতা ও পরিধি একে অপর থেকে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ 'অভিজ্ঞতা' একাকীভাবে 'ইয়াকীন তথা নিশ্চিত বিশ্বাস'গত জ্ঞানকে সৃষ্টি করতে পারে না। অবশ্য তিনি অভিজ্ঞতাগত জ্ঞানতত্ত্বকে বুদ্ধিগত জ্ঞানতত্ত্বের পরিপূরক বলে মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে সেক্ষেত্রে জ্ঞানতত্ত্ব দুইটি পর্যায়ের অধিকারী হয়ে থাকে। একটি পর্যায়, যা ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতাকে অর্জন করে থাকে এবং আরেকটি পর্যায় যা উক্ত অর্জনগুলোকে বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে থাকে।[১৯]

বাকের সদরের নিকট সবচেয়ে নিশ্চিত প্রকারের জ্ঞান হলো 'প্রত্যাদেশগত জ্ঞান'। এটা এমন এক প্রকার জ্ঞান, যা বুদ্ধিও সত্যয়ন করে থাকে; যেমনভাবে প্রত্যাদেশগত জ্ঞানও বুদ্ধিগত ও মরমী (আধ্যাত্মিক) জ্ঞানকেও সত্যয়ন করে থাকে। বাকের সদরের জ্ঞানতত্ত্বে মানুষ তার জ্ঞাতির ভিত্তিতে দায়িত্বপরায়ন হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার অস্তিত্বের গভীর হতে তার জীবন-মরনের দায়িত্বগুলোকে জানবে এবং সেগুলো সম্পর্কে অবগত হবে, যাতে সেগুলো যথাযথ সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের চিরকালীন সৌভাগ্যকে সুনিশ্চিত করতে পারে।[২০]

সংক্ষেপে বলা যায়, বাকের সদর বিশ্বতত্ত্বের প্রবেশদ্বার দিয়ে 'ফরমাল লজিক' ভিত্তিক ধ্রুপদী রাজনৈতিক দর্শন কাঠামোর দিকে না এগিয়ে বরং উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞার পন্থায় উপলব্ধিগত ও জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার অন্বেষণ করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে গাণিতিক সমীকরণাদি ও আরোহী পন্থা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। কেননা বাকের সদর মনে করতেন, যদি সাদরায়ী যুক্তিবিদ্যার পন্থা এবং তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক মতাদর্শ মেনে নেওয়া হয়, তাহলে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় এই নতুন পন্থা ইসলামের সামাজিক-রাজনৈতিক দর্শনের অঙ্গনে সমস্যার অবসান করতে পারে।

সুতরাং বাকের সদর প্রায় নতুন এক জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের রূপরেখা প্রণয়ন করেন, যা ভিত্তিগত দিক থেকে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন (উদারনৈতিকতাবাদ এবং মার্কস্‌বাদ) থেকে ভিন্ন। অপরদিকে বাকের সদর তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে প্রয়োগিক ও তুলনাভিত্তিক মূলনীতির উপর নির্ভর করে জ্ঞাতসারেই জ্ঞান ও উপলব্ধিগত কাঠামো তত্ত্বের আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যা আসলে ইসলামের রাজনৈতিক-সামাজিক দর্শনে এক প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। কেননা, ইতোপূর্বে তা কেবল তত্ত্ববিদ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মোল্লা সাদরা গতি (motion) সম্পর্কেও নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যা হারাকাত-ই জওহারি (حرکت جوهری- substantial moton) নামে প্রসিদ্ধ। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি মুসলিম দর্শন চিন্তার চার ধারা (কালাম, ইরফান, প্লেটোনিক দর্শন ধারা এবং অ্যারিস্টটলীয় দর্শন ধারা) কে একটি বিন্দুতে সমবেত করতে সক্ষম হন এবং একটি নতুন স্বাধীন দর্শনের গোড়াপত্তন করেন।

[১৮]. বাকের সদর, BQev‡Z †Lv'v ev iv‡f‡k Bjwg Iqv dvjmwd, (ফা. অনু. মাহমুদ আবেদী), (তেহরান : রুজবেহ, ১৩৬২ সৌ. সন. পৃ. ৬৪-৬৬)।

[১৯]. cv¸ 3, পৃ. ২০।

[২০]. ________, wLjvdvZj Bbmvb Iqv kvnv'vZj Awm¤qv, তেহরান : দারুল মাআরিফ আল-হিকমিয়্যাহ, ২০১৪, পৃ. ১০-১৩।

D‡jøL‡hvM¨ iPbvKgmgn

1. dvjmvdvZbv *(Our Philosophy)*
2. BKwZmv‘bv *(Our Economy)*
3. MqvZ Avj-wdKi *(The Highest Degree of Thought)*
4. ‘iæm wd Bjg Avj-Dmj *(Lessons in the Science of Jurisprudence)*
5. Avj-dvZIqv Avj-Iqw‘nv *(Clear Decrees)*
6. Avj-Dmj Avj-gwšÍwKqv wjj-Bw¯ÍKiv *(Logical Foundations of Induction)*
7. Avj-gRvh wd Dmj Avj-Øxb : Avj-gimvj, Avj-ivmj, Avj-wimvjvn *(The Summarized Principles of Religion: The Sender, The Messenger, The Message)*
8. Avj-e¨vsK Avj jv-ivewweq¨vn wd Avj-Bmjvg *(Usury-free Banking in Islam)*
9. gvKvjvZ Avj-BKwZmw‘q¨v *(Essays in Economy)*
10. Avj-Zvdmxi Avj-gI‘qx wj Avj-KiAwbj Kwig *(The Thematic Exegesis of the Holy Qur'an)*
11. eûQ wd Djg Avj-KiAvb *(Discourses on Qur'anic Sciences)*
12. Avj-Bmjvg BqvK‘ Avj-nvqvZ *(Islam Directive to Life)*
13. Avj-gv‘ivmvZ Avj-Bmjwgq¨v *(Islamic School)*
14. wimvjvZbv *(Our Mission)*
15. gRZvgvDbv *(Our Society)*
16. mivZb Avb BKwZmw‘ Avj-gRZvgv Avj-Bmjwg *(A Perspective on the Economy of Muslim Society)*
17. LZvZ Zvdwmwjq¨wZb Avb BKwZmw‘ Avj gRZvgv Avj-Bmjwg *(General Basis of Economics of Islamic Society)*

c_g Aa¨vq

mgvR wPšÍvi BwZeË I gmwjg gvbm

c_g Aa¨vq

mgvRwPšÍvi BwZeË I gmwj g gvbm

দর্শনের একটি প্রধান শাখা হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্ব। দর্শনের ইতিহাস ও জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাস একসাথে গাঁথা। জ্ঞান কি এবং কোন্ উৎস থেকে ও কীভাবে তা উৎপত্তি লাভ করে, আর প্রকৃত সত্যের প্রকাশ ও প্রতিফলনে এ জ্ঞানের মূল্যই বা কতটুকু ইত্যাদি বিষয়গুলো আদিকাল থেকেই মানুষের চিন্তাকে নিমগ্ন করে রেখেছে। ফলে জন্ম হয়েছে নতুন নতুন তত্ত্ব ও মতবাদের। জ্ঞানতত্ত্ব দর্শনের এ সমস্যাগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীতে সামাজিক আলোচনা আর সমাজতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার সমান্তরালে সমাজচিন্তকরা জ্ঞানতত্ত্বের বিশ্লেষণে নতুন নতুন দরজা উন্মুক্ত করেছেন। ইতোপূর্বে মানুষের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া তথা ইন্দ্রিয় উপলব্ধিতে প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে বাইরের বাস্তবতাসমূহ বিশেষ করে সামাজিক কারণসমূহের জন্য বিশেষ কোন স্থান বিবেচনা করা হত না। কিন্তু নতুন বিশ্লেষণে এ ধারার পরিবর্তন ঘটে এবং সামাজিক বিষয়াদিও মানুষের জ্ঞানতত্ত্বে প্রভাব সৃষ্টিকারী হিসাবে স্থান করে নেয়।

পাশ্চাত্যে এ পরিবর্তন ধারা চোখে পড়ে সতের শতকে। এ শতকের প্রথমদিকে ফ্রান্সিস বেকন-এর রচনাবলিতে প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ যেমন লিঙ্গ, বয়স, সুস্থতা, অসুস্থতা, সৌন্দর্য, কদাকার ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ নিয়ামক হিসাবে এবং শাসনক্রিয়া, অভিজাত বর্গ, কল্যাণ, বিরূপ পরিস্থিতি, সম্পদ ইত্যাদি বাইরের নিয়ামক হিসাবে মানব মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তারকারীরূপে আলোচনায় আসে। এটাই ছিল জ্ঞানতাত্ত্বিক সমাজবিদ্যার (Sociology of Knowledge) যাত্রার সূচনা। যা পরবর্তী দুই শতকে ম্যাক্স শেলার (Max Scheler : ১৮৭৪-১৯২৮), আলফ্রেড বেভার (Alfred Weber : ১৮৬৮-১৯৫৮) এবং কার্ল ম্যানহেইম (Karl Mannheim : ১৮৯৩-১৯৪৭) প্রমুখের মাধ্যমে গোড়াপত্তন ও বিস্তার লাভ করে।

মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যেও সমাজ ও সামাজিক প্রপঞ্চ সম্পর্কে চিন্তা ও তত্ত্ব উপস্থাপনের ইতিহাস অনেক পুরাতন। অবশ্য ইবনে খালদুন ও আল-বিরুণি'র ন্যায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন চিন্তাবিদ ব্যতীত অন্য এমন বিশেষ কাউকে দেখা যায় না, যারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে সমাজতত্ত্ব বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে থাকবেন কিংবা সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের ব্যাপারে তত্ত্ব প্রদান করে থাকবেন। বরং অধিকাংশের বেলায় সমাজ সম্পর্কিত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত জানতে তাঁদের অন্যান্য রচনা সম্ভার যেমন তাফসীর, কালাম, ইরফান, আখলাক ইত্যাদির মধ্যে খুঁজে বেড়াবার প্রয়োজন পড়ে। অতঃপর প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহকে একত্রে পাশাপাশি রেখে সমাজ ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি শনাক্ত করতে হয়।

মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে সমাজ বিষয়ক চিন্তার সূত্রপাত ঘটে প্রাচীন কাল থেকেই। কেননা, সঙ্গত কারণেই মানুষের সামাজিক চিন্তা ততটাই পুরাতন হওয়া উচিত যতটা পুরাতন মানব সভ্যতার ইতিহাস। মুসলিম সভ্যতার পরিসরে সামাজিক চিন্তা হচ্ছে মানবের সামাজিক চিন্তারই অংশ বিশেষ, যা ভূ-পৃষ্ঠের এ অঞ্চলে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে এবং একটি দীর্ঘ সময়কাল পার করে এসেছে। এটাই আজ মুসলিম সমাজচিন্তার ইতিহাস নামে পরিচিতি লাভ করেছে এবং বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে পর্যালোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।[১]

---

[১]. আবুল হাসান তানহায়ী, Zwi‡L Aw›'‡k Iqv bvhwiqv‡Z Rv‡g wkbvLwZ Avh BewZ'v ZvKbb, রাফসানজান : আযাদ ইউনিভার্সিটি, ১৯৮৯, খ. ১, পৃ. ৩।

সামাজিক চিন্তা নামক এ প্রপঞ্চটি উৎপত্তি লাভের পর থেকে এর দুটি মূল পর্যায় নির্ধারণ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে সামাজিক চিন্তাও একটি ধাপে উন্নীত হয় ও বিকাশ লাভ করে। অবশ্য এ পর্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়ক বিভিন্ন 'উপাদান কারণ' যেমন অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা এবং ইতিবাচক রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাও অন্যান্য পর্যায়ের তুলনায় ব্যাপকহারে পরিদৃষ্ট হয়। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধঃগামী হয়। তদ্‌পরিবর্তে মরমী ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা অধিকতর বিস্তার লাভ করে। এরই মধ্যে আবার বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও নিরাপত্তাহীন সমাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এ যুগে বাড়তি প্রভাব ফেলে। ফলে এ যুগে সামাজিক চিন্তা কিছুকালের মন্দা অবস্থার পর অবশেষে পতনমুখী হয়।

সামাজিক চিন্তার ইতিহাসের ক্রমধারা বিচারে বলা যায় যে হিজরি তৃতীয় ও চতুর্থ শতকই মুসলিম সামাজিক চিন্তা বিকাশের স্বর্ণযুগ ছিল, যখন আল-ফারাবি, আল-বিরুণি, ইবনে সিনা প্রমুখের ন্যায় শীর্ষ সমাজচিন্তকবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীকালে হিজরি অষ্টম ও নবম শতকে যদিও ইবনে খালদুন মুসলিম সমাজচিন্তার উচ্চতর স্তরকে উত্থাপন করেন, তদ্‌সত্ত্বেও সামাজিক চিন্তার অধঃমুখী ধারা আরম্ভ হয়। মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে নেহায়েৎ কম ব্যক্তিরই সন্ধান মিলবে যারা সামাজিক বিষয়ে কথা বলে থাকবেন। আর এ ধারা অব্যাহত থাকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের যুগ অবধি। এরপর থেকে মুসলিম সামাজিক চিন্তা গড়ে উঠতে থাকে পাশ্চাত্য সামাজিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। ফলে ক্রমশঃ মুসলিম সামাজিক দর্শন নিজের স্বকীয়তা হারায়।

1. gmwjg mvgwRK wPšÍvi DÌvb-cZb Ges Gi wbqvgKmgn

মুসলিম সমাজচিন্তার উত্থান-পতনে ভূমিকা রাখা নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে বিশেষ কোন সমীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায় না। অধিকাংশ সমীক্ষণই ইসলামি সভ্যতার সামগ্রিকতা সম্পর্কিত, যা সামাজিক চিন্তার বিষয়ে বিস্তৃত দিক ও মাত্রা সম্বলিত। এম এম শরীফ এর মতে, সামাজিক প্রপঞ্চসমূহ সাধারণত একটি জটিল প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে। ফলে কোন নির্দিষ্ট একটি কারণ তথা নিয়ামকের উপর নির্ভর করে এর বিশ্লেষণ করা যায় না। উপরন্তু প্রতীয়মান হয় যে ইসলামি সভ্যতাভিত্তিক সমীক্ষণের ফলাফলকে সামাজিক চিন্তাদর্শনের উপর সাধারণীকরণ করা যায় না। কেননা, অনেকে মনে করেন যে ইসলামি সভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশের দুইটি অধ্যায় ছিল। প্রত্যেক অধ্যায়ের গঠন-উপাদানসমূহ ছিল একে অপর থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে। অথচ দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিল্পকলা ও মরমী জ্ঞানের বিকাশই ঘটে অধিকতর।[২]

অতএব যদি ইসলামি সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাকে সামাজিক চিন্তাধারার সাথে একসমান ধরা হয়, তাহলে সামাজিক চিন্তাধারার বিকাশেরও দুইটি অধ্যায় গণ্য করতে হবে। অথচ অনুসন্ধানে দেখা যায় এরূপ মতামত সঠিক নয়। বরং যেহেতু এ উভয় অধ্যায়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলি বিশেষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচর্যা করেছে, সে কারণে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান সামাজিক চিন্তাধারার উপর নিজস্ব বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। প্রতীয়মান হয় যে সামাজিক চিন্তাধারা প্রথম অধ্যায়ে বিকাশের পর্যায় অতিক্রম করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামাজিক চিন্তার অধঃগামী ধারা পরিলক্ষিত হয়।

---

২. M.M. Sharif. *A History of Muslim Philosophy*, Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1966, p 23.

mgvRwPšÍvi Dci a‡gi cfve

পাশ্চাত্যে মধ্যযুগে চার্চ কর্তৃক বিজ্ঞান বিরোধী আচরণের কারণে রেনেসাঁ পরবর্তী সময়কালে বিজ্ঞানের পথ, ধর্মের পথ থেকে পৃথক হয়ে যায়। আর এ পৃথক হওয়ার সূত্রে অনেক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং এগিয়ে থাকা মানবতাবাদ ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক ও সামাজিক ইত্যাদি আজ যেসব বিজ্ঞান প্রচলিত, সেগুলোর মধ্যে গভীর শিকড় গাড়ে। কিন্তু কুরআন, যা মুসলমানদের অনুসৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস, মানুষকে আদ্যপান্ত জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে রহস্য উদ্‌ঘাটনে আহ্বান জানায়। এর ভিত্তিতে মুসলিম চিন্তাবিদরা চিন্তা ও গবেষণায় তুমুল উৎসাহ লাভ করেছে এতটাই যে সাহসের সাথে দাবি করা যেতে পারে অন্য কোন ধর্মই ইসলামের ন্যায় পার্থিব বিষয়ে জ্ঞান-গবেষণায় এতখানি গুরুত্বারোপ করেনি। একারণে মুসলমানদের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এটা ঠিক পাশ্চাত্যে যা ঘটেছে তার বিপরীত। যার ফলশ্রুতিতে সেখানে বিজ্ঞানের পথ ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে গেছে। মোটকথা পাশ্চাত্যে ও প্রতীচ্যে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্কের ধারা দুটি বিপরীতমুখী পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে।[৩]

মুসলিম চিন্তাবিদরা মূলত প্রথম অধ্যায়ে যখন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জোরালো সম্পর্ক বিরাজমান ছিল, তখন সামাজিক চিন্তা-দর্শনে অধিকহারে উন্নতি ও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে এবং সমাজের বাস্তবতার প্রতি একটা পর্যায় পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পেরেছে। কিন্তু যখন এ দুয়ের মাঝে সম্পর্ক দুর্বল করা হয়েছে, তখন সামাজিক চিন্তা-দর্শনে সামগ্রিকভাবেই ভাটা পড়েছে এবং অধঃমুখী হয়েছে। এই সম্পর্ক দুর্বলীকরণের ফলে আরও যা হয়েছে, তা হল অতীতের চিন্তাবিদদের রচনাবলির প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কমই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ অতীতের মনীষীদের চিন্তা ও দর্শন আন্তরিকতার সাথে এবং নিবিড়ভাবে সমালোচনা কিংবা পর্যালোচনার আওতায় আনা হত না। ফলে নতুন যুগের সাথে পরিচিত চিন্তাবিদরা অতীতের চিন্তা-দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই বাছাই করে শক্তিশালী দিক্‌গুলোকে গ্রহণ আর দুর্বল তথা নেতিবাচক দিক্‌গুলো বর্জন করার প্রয়াস গ্রহণ না করে বরং সেগুলো প্রত্যাখ্যান করার পথেই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরা কেবল নতুন অধ্যায়ের পরিমণ্ডলের চৌহদ্দিতে দাঁড়িয়ে মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। এভাবে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটার কারণে চিন্তাবিদদের চিন্তা-দর্শন একধারায় এগিয়ে চলেনি। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের চিন্তা ও জ্ঞানের বিশাল সম্ভার ক্রমশ বিস্মৃতির কবলে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ইবনে সীনা'র 'মাশশায়ি দর্শন'- যা প্রথম যুগে পরিপক্বতা লাভ করে। অথচ তাঁর উত্তরকালে উক্ত দর্শন নিয়ে মোটেও সমালোচনা ও পর্যালোচনা চালু রাখা হয়নি। শুধু তাঁর রচিত কতেক গ্রন্থ তৎকালীন যুগের কালামশাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিছু কিছু শিক্ষাকেন্দ্রে পঠিত হত বুদ্ধির চর্চা ও বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে। সেটাও আবার চলতো নতুন দর্শনচর্চার খাতিরে নয়; বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল দর্শনের বিরোধিতা বা প্রত্যাখ্যান করা।[৪] কিংবা ইবনে খালদুনের চিন্তাধারার উপরেও পরবর্তীকালে কাউকে কোন গভীর পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ অথবা পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। কারণ ইবনে খালদুন এমন এক যুগের অগ্রপথিক ছিলেন, যখন আজকের এসব বিজ্ঞানের অনেকগুলোর প্রতি মানুষের ধারণা বা বিশ্বাসই ছিল না।

এ বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা যায়, মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার এ সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। অর্থাৎ যে অধ্যায়ে বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্ক এরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে বিদ্যমান বাস্তবতায় পৌঁছুতে মানুষের চিন্তাকেও কাজে লাগানো যায়, তখন থেকে মুক্ত চিন্তা প্রচলন লাভ করে এবং সামাজিক চিন্তাদর্শন এ চিন্তাগত ধারার মধ্যে বিকশিত হয়। কারণ, সামাজিক চিন্তাদর্শন, ভিত্তিগতভাবে একটি

৩. Syyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature,*Tehran: Khawrajm, 1980, p. 20.
৪. M.M. Sharif. *A History of Muslim Philosophy*, Ibid, p. 717.

বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া এবং বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষণ করে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে উপনীত হতে পারে। কিন্তু যখন ধর্মীয় চিন্তা বুদ্ধিবৃত্তিক ও দর্শনগত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথেই নিজের সম্পর্ককে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে, তখন থেকেই সামাজিক চিন্তার ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহ মুসলমানদের মাঝ থেকে বিদায় নিতে থাকলো। অবশ্য এর পশ্চাতে ছিল মূলত রাজনৈতিক ইন্ধনের সক্রিয় হাত ।

mgvRwPšÍvi Dci ‘k©bi cfve

‘ফালসাফা’ কথাটি মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত পরিভাষায় নির্দিষ্ট কোন শাস্ত্র বা জ্ঞানকে বুঝায় না। বরং বিবৃতিমূলক সমুদয় জ্ঞানের বিপরীতে বুদ্ধিবৃত্তিক সমুদয় জ্ঞানকেই ফালসাফা তথা দর্শনের জ্ঞান বলে গণ্য করা হয়।[৫] ইসলামে ফালসাফা'র বিশেষ অর্থ রয়েছে। তা হল, আল্লাহ্‌তত্ত্ব। তাত্ত্বিক দর্শনের তিন প্রকারের মধ্যে এটা অন্যতম।[৬] দর্শনের এ সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সামাজিক চিন্তাকেও প্রথম অর্থে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য করতে হবে। কেননা সামাজিক চিন্তাদর্শনও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত হয়।

সুতরাং সাধারণ অর্থে ‘ফালসাফা’, সামাজিক চিন্তার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। কাজেই বলা যেতে পারে যে ফালসাফা তথা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের যুগে সামাজিক চিন্তারও বিকাশ ও পরিপক্বতা ঘটে। যখন ফালসাফা ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আঙ্গিনা থেকে বাইরে চলে যায় তখন সামাজিক চিন্তারও মন্দাভাব শুরু হয়। মুসলমানদের সমাজচিন্তার পর্যালোচনায় দেখা যায়, সমাজ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি তত্ত্ব সেই আমলে প্রকাশ লাভ করেছে যখন বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল। ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭), আল-ফারাবি (৮২৭-৯৫০), ইবনে মাসকাভেই (৯৩২-১০৩০), ইখ্‌ওয়ানুস সাফা (১০-১২ শতক)[৭], আল-বিরুণি (৯৭৩-১০৪৮), যাকারিয়া রাজি (৮৪১-৯২৬) প্রমুখগণ এ যুগেই সমাজচিন্তার তত্ত্ব প্রদান করেছেন। এ অধ্যায়ে ফালসাফা ‘মাশশায়ি’ ধারা নামেই সমধিক পরিচিতি পায় এবং বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণের উপরেই বেশি ভিত্তিশীল ছিল।[৮]

তৎকালে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশজনিত সামাজিক চিন্তার উপর যে প্রভাব পড়েছিল তার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য যাকারিয়া রাজি'র উদাহরণটি একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হতে পারে। পারসিক পণ্ডিত যাকারিয়া রাজি মূলত একজন চিকিৎসক এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবে প্রসিদ্ধ। যদিও তিনি সুসংবদ্ধ কোন দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতির অধিকারী ছিলেন না, তবুও মুক্তধারার মুসলিম চিন্তাবিদদের সারিতে অন্যতম একজন হিসাবে গণ্য হন। এ কারণেই তাঁর বিবৃতিতে এমন কিছু বিষয় এসেছে যেগুলো আজকের ভাষায় Common Belief (তথা অভিন্ন বিশ্বাস), জাতি কেন্দ্রিকতা, সামষ্টিক আক্রমণাত্মক আচরণ (যুদ্ধ) এবং মনো-সামাজিক অনুভূতি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

যখন থেকে ফালসাফা মন্দায় আক্রান্ত হল এবং দার্শনিকরাও তাঁদের পন্থা পরিবর্তন করলেন, আর BkivK ও ïû‘ পদ্ধতিতে ফালসাফার চর্চায় ঝুঁকে পড়লেন; আবার অপরদিকে ফালসাফাও তার বিশেষ অর্থে ‘ফিলোসোফা প্রিমিয়া’ (বা ‘আল্লাহ্‌তত্ত্ব’)-র মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল এবং এটাকেই তাঁরা তাঁদের তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেন, তারপর থেকে আর তেমন কাউকে সামাজিক চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হতে দেখা যায় না।

---

৫. দ্র. মূর্তাজা মোতাহহারি, Akbwq ev Dj‡g Bmjwg, কোম : দাফতারে ইন্তেশারাতে ইসলামি, ১৯৮৩, পৃ. ৮৯।
৩. দ্র. cv¸ ³, পৃ ৯১।
৭. খ্রিষ্টীয় দশম শতকে ইরাকের বসরায় মুসলিম দার্শনিকদের একটি গোপন সংগঠন|
৮. সূ. ˆÎgwmK wgmevn, তেহরান, ২০০৭।

mgvRwPšÍvi Dci Aa¨vZ¥ev‡`i cfve

ইসলামে অধ্যাত্মবাদ খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে প্রকাশ্যে রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু এর চরম উৎকর্ষ ও বিকাশ ঘটে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে এসে।[৯] ইসলামি জ্ঞানের এই শাখাটি, যা বিশেষ একটি অধ্যায়ে ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর প্রচণ্ড কর্তৃত্ব করতো, তা এমন কিছু বিশেষত্বের অধিকারী যা সামাজিক চিন্তার উপর গুরুত্বপুর্ণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

অধ্যাত্মবাদে তিন ধরনের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। যথা : (ক) মানুষের নিজের সাথে মানুষের সম্পর্ক, (খ) বিশ্বজগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং (গ) আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক। এ তিন প্রকারের সম্পর্কের মধ্যে আবার সবচেয়ে প্রধান সম্পর্কটি হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক।[১০] অপর দুটি সম্পর্ক এই সম্পর্কের প্রশাখা। এসব সম্পর্ক মানুষকে পার্থিব বিষয়াদি হতে মুক্ত ও দূরে সরিয়ে রাখে।[১১] কেউ কেউ এমনকি এতদূর পর্যন্ত বলেন যে †mBi I mjK (سیر و سلوک) তথা আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণ চলমান অবস্থায় বিবাহ করাও সমীচীন নয়। কারণ স্ত্রী-সন্তানরা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা হতে পারে। এ অর্থে বলা যায়, সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি একেবারে নিম্ন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কই সবার আগে গুরুত্ব লাভ করে। অন্যতম প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক সাধক ইয্যুদ্দীন নাসাফি'র আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উপর জনৈক গবেষক এক গবেষণা পরিচালনা করেন। উক্ত গবেণষাপত্রে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন-চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক তথা সামাজিক চিন্তাধারা পরস্পর বিপরীত।

এসব সমস্যাবলির সামষ্টিক পর্যালোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, মূলত যতক্ষণ মানুষের দৃষ্টিসীমা সামাজিক পরিমণ্ডলে ফিরে না আসে, ততক্ষণ সে সামাজিক চিন্তা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় না। আর মানুষের রাজনৈতিক চিন্তা হচ্ছে তার সামাজিক চিন্তারই অংশবিশেষ। ফলে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি তার উভয় চিন্তা-দর্শনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আর মুসলিম চিন্তাবিদদের দীর্ঘ ইতিহাসে সেটাই ঘটেছে, যা তাদের চিন্তার আকাশে ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল এবং জ্ঞানতত্ত্বের অন্যান্য অঙ্গনসমূহকেও প্রভাবান্বিত করেছে।

মোটকথা মরমী অধ্যাত্ম চর্চার মধ্যে মুসলিম সামাজিক চিন্তা ততটা পরিচর্যা লাভ করেনি। ফলে সময়ের পরিক্রমায় তা আশানুরূপ শক্তিশালী ও বিকশিত হয়ে ওঠেনি। বরং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে সামাজিক চিন্তাদর্শনের অধঃগামিতায় প্রভাব রেখেছে। কেননা, আধ্যাত্মিক সাধকগণের সাথে মানব ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া ন্যুনতম পর্যায়ে নেমে আসে এবং তাঁরা কেবল আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ককে শক্তিশালীকরণে সচেষ্ট হন। তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজ ও মানব ব্যক্তিবর্গের প্রতি দৃষ্টি দুর্বল হয়ে যায়। আর নিতান্তই যদি কোন তত্ত্ব বা মতামত থাকেও তাহলে সেটা নৃ-তাত্ত্বিক আলোচনায় উত্থাপন করা চলে।

mgvRwPšÍvi Dci Bmjwg wdKvnÕi cfve

ইসলামি ফিকাহ্শাস্ত্রও সামাজিক চিন্তার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। যে যুগে BRwZnv', ফিকাহ্র প্রধানতম স্তম্ভ হিসাবে নিজের যথাযোগ্য স্থান করে নিতে পেরেছে, সে যুগে সামাজিক চিন্তার উন্নয়ন ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আবার যখন ধী-শক্তির অবাধ চর্চা ও BRwZnv' বিদায় নিয়েছে, তখন

---

[৯]. দ্র. মূর্তাজা মোহাহ্হারি, Lv'vgv‡Z gZvKv‡e‡j Bmjvg I qv Bivb, কোমঃ ইন্তেশারাতে সাদ্‌রা, ১৯৮৩, পৃ. ৬৪২।
[১০]. cv¸³,পৃ. ৬৩১।
[১১].M.M. Sharif. *A History of Muslim Philosophy*, Ibid, p. 443.

সামাজিক চিন্তারও অধঃগতি ঘটেছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে যখনই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ফিকাহ্'র অঙ্গন থেকে BRwZnv'কে বাদ দেওয়া হবে, তখন তা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে সমাজচিন্তার উপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, BRwZnv' বিহীন ফিকাহ্'র চর্চার অর্থই হচ্ছে সময়ের পরিক্রমায় সমাজের পরিবর্তন এবং এর যুগ-জিজ্ঞাসার বিষয়টি উপেক্ষা করা। অর্থাৎ সমাজচিন্তাকে বাদ দেওয়া। এটা এমন এক বাস্তবতা যা মুসলিম সমাজের একটি বিরাট অংশে ঘটে গেছে। একারণে যুগে যুগে আবার এ BRwZnv' প্রক্রিয়া শুরু করার পক্ষেও জোরালো দাবি উঠেছে। সাম্প্রতিক কালে যে সকল মুসলিম চিন্তাবিদ এ দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন তাদের মধ্যে ড. মুহাম্মদ ইকবাল লাহোরি, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. রশিদ রেযা এবং শেখ মুহাম্মদ আব্দুহ্ অন্যতম। আল্লামা ইকবাল বলেন :

> "কুরআনের মতে আল্লাহ-তা'য়ালার চিহ্নসমূহের একটি মহত্তম প্রকাশ রয়েছে বিশ্ব-জগতের পরিবর্তনশীলতায়। একে অস্বীকার করার অর্থ জীবনকে অস্বীকার করা এবং সাথে সাথে যার প্রকৃতি মূলতঃ গতিশীল, তাতে গতিহীনতা আরোপ করা। চিরন্তন নীতিতে দৃঢ়মূল নয় বলে ইউরোপ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানে অকৃতকার্যতা বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। চিরন্তনের সাথে পরিবর্তনের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনি বলে বিগত পাঁচ শত বছর ইসলাম অচলাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন দ্রষ্টব্য, ইসলামি ব্যবস্থায় গতিশীলতার নীতি কি? তা হল 'ইজতিহাদ'।"[১২]

আবার মুসলিমদের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে BRwZnv‡'i দরজা খোলা ছিল বটে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় একটি পর্যায়ে এসে তা ক্রমশঃ মন্থর ও স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে সমাজচিন্তার অধঃগতি ঘটে। অধ্যাপক মূর্তাজা মোতাহ্হারি'র মতে, উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে কতিপয় বিষয়ের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করার কারণে মুসলিম মনীষীরা সমাজতত্ত্বের আলোচনা হতে পিছিয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়েছে যাতে তারা সামাজিক বিষয়াদির বিশ্লেষণ করতে না পারেন।[১৩]

এসব ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইসলামের ফিকাহ্ শাস্ত্রে সামাজিক পর্বগুলো অবহেলার শিকার হয়েছে। যদিও একজন ফিকাহ্বিদের নিকট এটা প্রত্যাশা করা হয় না যে তিনি সমাজতত্ত্বেরও বিশারদ হবেন। কিন্তু ফিক্হি বিধি-বিধানে সামাজিক বিষয়াবলির প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্বারোপের মাধ্যমে ইসলামি সামাজিক চিন্তা-দর্শনের উন্নয়ন ও বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখা সম্ভব। আর এভাবেই ইলমে ফিকাহ্ সামাজিক চিন্তার উপর পরোক্ষ প্রভাব রাখে।

2. mvgwRK wPšÍvi Dci cfvekxj ev¯Íe KviYmgn

ivR‰bwZK KviY : এ কারণটি সামাজিক চিন্তা-প্রক্রিয়ার উপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলেছে। প্রথমত যে বিষয়গুলো মুসলিম চিন্তাবিদদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেগুলো রাজনৈতিক কারণসমূহ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে, এমনভাবে যে সামাজিক চিন্তা রাজনৈতিক চিন্তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। দার্শনিকবৃন্দ, কালামবিদগণ এবং সমাজের ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ কেবল একটি কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থার ছায়াতলেই সমাজের অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভব বলে মনে করতেন এবং একটি সুযোগ্য শাসনের মধ্যেই মানুষের উন্নয়ন ও বিকাশ নিহিত রয়েছে বলে

---

[১২]. ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল, '¨wiKb‡÷Kkb Ad wiwjwRqvm _U Bb Bmjvg, বঙ্গানু. অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ (৩য়) প্রকাশ, পৃ. ১৯১।

[১৩]. দ্র. মূর্তাজা মোতাহ্হারি, 'wn ¸dZvi, তেহরান : সাদরা, ১৯৮৩ (সংক্ষেপিত)।

বিশ্বাস করতেন।[১৪] অপরদিকে অনেক চিন্তাবিদ শাসকদের আচরণ এবং উক্ত আচরণের ধরনকে সমাজের ব্যক্তিদের আচরণের ধরন নির্ধারণে প্রভাবশীল বলে মনে করতেন।

সামাজিক চিন্তার উৎপত্তি, বিকাশ ও মন্দাভাবের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণের আরেকটি প্রধানতম প্রভাব ছিল শাসকদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যের বিষয়টি। ইবনে সিনা, আল-ফারাবি, ইবনে খালদুন, আল-বিরুণি, ইমাম গাজ্জালি, খাজা নাসিরুদ্দীন তুসি প্রমুখ মুসলিম মনীষীগণ, যারা সমাজচিন্তক হিসাবে সমধিক পরিচিত, তাঁদের ব্যক্তি-জীবনের বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমাজচিন্তকগণ তখনই 'সমাজ ও সামাজিক বিষয়াদি'র ব্যাপারে তাঁদের চিন্তা ও দর্শনকে মস্তিষ্ক থেকে নিঃসৃত ও লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন যখন কোন না কোন প্রতাপশালী শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। যেমন আল-ফারাবি হামাদানি শাসকদের, আল-বিরুণি গযনবি শাসকদের, ইবনে সীনা বিভিন্ন রাজদরবারের আর খাজা নাসিরুদ্দীন তুসি মোগলদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। মোটকথা এমন সমাজতাত্ত্বিকের সন্ধান খুব কমই মিলবে যারা কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সমাজ ও সামাজিক বিষয়ে কোন তত্ত্ব বা মতামত প্রকাশ করে থাকবেন। যদি ইসলামের গোড়ার দিকে উমাইয়াদের শাসন-নীতি সম্পর্কে কিছু পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দু'তরফের মধ্যে এই সম্পর্কের যোগসূত্র সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা মিলবে। সামাজিক চিন্তা-দর্শন ব্যক্ত করার জন্য একটি উন্মুক্ত পরিবেশ অথবা সমাজের শক্তিমান রাজনৈতিক সমর্থন থাকার দরকার ছিল, যাতে তা প্রকাশ লাভ করতে পারে। কারণ সামগ্রিকভাবে শাসন পরিচালনার সাথে সহিংসতা, কঠোরতা, ভীতিকর বাড়াবাড়ি, অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, জীবন্ত কবর দেওয়া ইত্যাদি হাজারো প্রকার নিপীড়নের সম্পর্ক ছিল। এমন পরিস্থিতিতে ক্রীতদাস সুলভ তোষামোদী এবং ওযর-আপত্তি বিহীন আনুগত্যই ছিল বেঁচে থাকা ও নিরাপদ থাকার প্রধান শর্ত।[১৫]

এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে মুসলিম চিন্তাবিদদের সমাজচিন্তা কেন এতটা রাজনৈতিক প্রবণতাসম্পন্ন। সমালোচনামূলক সমাজচিন্তার অবকাশ ছিল না বললেই চলে। একজন সমাজচিন্তক বড়জোর যতটুকু পেরেছেন তা হল কোনো ঝক্কি-ঝামেলায় না জড়িয়ে কোন রকমে শুধু নিজের মতামতটা উপস্থাপন করেছেন। আর যদি কখনও শাসকমহলের নিকট এতটুকু চিন্তার চর্চাও পছন্দনীয় না হত, তাহলে তো অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। সেক্ষেত্রে কোন সমাজচিন্তকই তার চিন্তা প্রকাশ বা লিপিবদ্ধ করার সাহস করেননি।

একারণে খ্রিষ্টীয় দশম ও একাদশ শতকের দিকে মুসলিম সমাজচিন্তা যতটা বিকাশ লাভ করেছিল, তদ্পরবর্তী যুগগুলোতে সে ধারায় ছেদ পড়ে। হয়ত কদাচিৎ কোন সমাজচিন্তকের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে সমাজচিন্তার ধারা ঊর্দ্ধগামী ছিল না, বরং ছিল নিম্নগামী। ক্রমান্বয়ে তা স্থবির হয়ে পড়ে এমনভাবে যে শেষের শতকগুলোতে উল্লেখযোগ্য কোনো মুসলিম সমাজচিন্তকের দেখা মেলা ভার।

mvgvwRK KviY : সামাজিক কারণ বলতে বিশেষত উদ্দেশ্য সমাজে বিশৃঙ্খলা ও টেকসই নিরাপত্তার অভাব থাকা। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগে এবং দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে গোটা মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য এবং উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে রাজনৈতিক গোলযোগের সূত্র ধরে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজমান ছিল। ঘন ঘন ক্ষমতার পালাবদল, গোত্র ও বংশীয় শাসকদের আধিপত্য, বিজাতীয়দের শ্যেনদৃষ্টি ইত্যাদি সব মিলিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল। ফলে স্থায়ী সামাজিক সম্পর্ক ও ভিত্তি গড়ে ওঠার

---

১৪. দ্র.আকরাম মুহাম্মাদি, Bj‡j Bb‡nZv‡Z Aw›`‡k-G BRwZgvwq `vi †`Š‡i‡q AveŸvmxqvb, তেহরান : টিচার্স ট্রেনিং ইউনিভার্সিটি (থিসিস), পৃ. ৭।

১৫. দ্র. ইহ্সান তাবারি, R‡¤kn‡q BRwZgvwq `vi Bivb, তা. নে.স্থা, নে, ১৯৬৯. পৃ. ৩৫।

অবকাশ ছিল কম। ইবনে খালদুনের 'আসাবিয়া তত্ত্ব' মূলত এ পরিস্থিতির ব্যাখ্যা। এ ধরনের বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিস্থিতি থেকে স্থির সমাজচিন্তার চর্চা ও বিকাশ কোনটাই আশা করা যেত না।

অথচ যদি ইউরোপের ইতিহাসের দিকে তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে, অষ্টম শতকের পর থেকে সেখানে গোত্র বা বারবারীয়দের আক্রমণের ঘটনা আর ছিল না বললেই চলে। কিছু ছোট ছোট অভ্যন্তরীণ কলহ ব্যতীত এমন কোন ধ্বংসাত্মক ঘটনা সেখানে চোখে পড়ে না, যা তাদের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে দিতে পারে।[১৬] স্বভাবতই এরূপ পরিস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হয় এবং অভ্যন্তর থেকেই সংশোধন ও বিবর্তন ঘটতে থাকে। আবার যখন বিবর্তন কে অবশ্যম্ভাবী মনে করে তখন গোটা সমাজের কাঠামো পরিবর্তন করে ফেলে। তখন নতুন ও পুরাতন সমাজ কাঠামোর মধ্যে সংকটের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ফলে সমাজচিন্তা অধিকতর গতি লাভ করে এবং বিকশিত হয়। কেননা, পুরাতন ও নতুন সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের কারণসমূহ চিহ্নিত করার এবং সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করার সুযোগ ঘটে।

কিন্তু মুসলিম সভ্যতার পরিসরে এরূপ অপেক্ষাকৃত টেকসই স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা কমই দেখা গেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতনের সাথে নতুনের তুলনা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। বরং কখনো কখনো সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসকে চাপিয়ে দিয়ে নিছক 'নসীব' বা নিয়তি হিসাবে তা বরণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। উইল ড্যুরান্ট মোগলদের আক্রমণের ধ্বংসাত্মক ফলাফলের প্রতি ইশারা করে বলেন :

> 'গোটা ইতিহাসকালে মুসলিম সভ্যতার ন্যায় আর কোন সভ্যতা এতটা অবিরাম ও কঠিন বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি।'[১৭]

এখানে কেবল মোঘলদের আক্রমণের কথাই বলা হচ্ছে না। বরং ঐ অনবরত ও অবিরাম সামাজিক পরিবর্তন ও বিশৃঙ্খলাই উদ্দেশ্য। এরূপ অবিরাম সামাজিক পরিবর্তন ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি একদিকে যেমন সমাজচিন্তার বিকাশের পথে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি আরেকটি প্রতিবন্ধক হয়, অপরদিকে তেমনি সমাজের এক শ্রেণির লোকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিমুখ হওয়ারও কারণ হয়েছে। ফলে তারা সমাজবিচ্ছিন্ন বৈরাগ্য জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কেউ বা আবার সামাজিক তত্ত্ব ব্যাখ্যায় ভাগ্য বা নিয়তিবাদের আশ্রয় নিয়ে অবশেষে সামাজিক ঘটনাপ্রবাহকে মরমীতত্ত্বের খোলস প্রদান করেছে যা 'সামাজিক মরমীবাদ' নামে পরিচিত।[১৮] তাই সমাজে বিদ্যমান কিছু চিন্তাধারা এরূপ সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টির নেপথ্যে কারণসমূহের দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে কিম্বা সামগ্রিকভাবে সামাজিক বাস্তবতাসমূহের বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে একচেটিয়াভাবে পার্থিব বিষয়াবলিকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে এবং নিয়তির মাধ্যমে বিরাজমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। ফলে এর মধ্যে সমাজচিন্তা বিকাশের কোন উর্বর ভূমি পায়নি এবং তা চিন্তাবিদদের তত্ত্ব বিশ্লেষণের আওতা থেকে বাইরেই রয়ে গেছে।

উপরোক্ত পর্যালোচনায় মুসলিম সমাজচিন্তার অধঃগামিতার মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তব কারণগুলো বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব কারণ মুসলিম মানস ও চিন্তায় প্রভাব ফেলেছে সেগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং ঐতিহাসিক কারণগুলোই প্রধান ভূমিকা রেখেছে। মুসলিম সমাজচিন্তার ধারায় সেই যুগকেই

---

১৬. দ্র. গোলাম হোসেন,"নাআমনি ওয়া আদামে ছুবাতে সিয়াসি ওয়া তা'সিরে অন দার তৌসেয়ে দার তারিখে ইরান",ÔgvwmK dvinv‡½ †ZŠ‡m‡qÕ, তেহরান : ১৩৭১ ফা. সন. সং ৪, পৃ. ৫৩।

১৭. দ্র. উইল ড্যুরান্ট, '¨ †÷vwi Ad wmwf jvB‡Rkb, (ফা. সংস্করণ), তেহরান : অমুজেশে ইনকিলাবে ইসলামি, ১৩৬৭ ফা.সন, পৃ. ৭৮০।

১৮. ইয়াকুব আঝান্দ, "আওয়ামেলে মুয়াসসির দার ফারহাঙ্গে ইরানে দাওরায়ে ইসলামি",'‰ÎgvwmK b‡g‡q dvinv½Õ,তেহরান : ১৩৬৯ সৌ.সন, সং ২, পৃ. ২৭-২৮।

অধিকতর উপযোগী ও সহায়ক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যে যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক ও (সাধারণ অর্থে) দার্শনিক চিন্তার চর্চা বেশি হয়েছে। যদি ইতিহাসগত বিচারে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করা হয় তাহলে বলতে হবে যে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন কিম্বা অধঃগতি, বাস্তব কারণ তথা রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

মুসলিম ফিকাহ্ এবং ইজ্‌তিহাদ চর্চার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক প্রভাব সক্রিয় ছিল। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব সমাজ চিন্তার উপর এসে পড়ে। কারণ, ফিকাহ্ শাস্ত্র যখন সমাজ ও রাজনীতির বিষয়গুলো পাশ কাটিয়ে কেবল ধর্মীয় ও ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়াবলি নিয়ে ব্যস্ত হল তখন সমাজ চিন্তার স্থবিরতা আরও প্রকট রূপ ধারণ করলো।

মোটকথা, উপরে বর্ণিত মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক কারণদ্বয়ের মধ্যে কোনটাই এককভাবে সামাজিক বিষয়াবলি ও সমাজচিন্তাকে ব্যাখ্যা করতে যথেষ্ট নয়। কমপক্ষে এ কারণদ্বয় যদি পরস্পর একসাথে ক্রিয়াশীল হয় তবেই সমাজ চিন্তার উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। যখন শাসকের পক্ষে 'সুলতান হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ছায়া'- এরূপ বানোয়াট হাদীস চালু করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই শাসকের বৈধতার জন্য রাজনৈতিক ও বিশ্বাসগত কারণ একযোগ হয়েছে। আর তখনই শাসকরা সমাজের ব্যক্তিদের মননে স্থান দখল করে নিয়ে স্বীয় চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তাদের আচরণপদ্ধতি, ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার সুযোগ গ্রহণ করেছে। তবে এ জাতীয় সামাজিক সম্পর্ক সমাজচিন্তার পথে প্রতিবন্ধক হয়। কেননা, তখন মুক্ত-স্বাধীন চিন্তা এবং সমালোচনার সুযোগ অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়।

উপরের বিশ্লেষণে উল্লেখিত বহির্জাগতিক তথা বাস্তব কারণসমূহের পাশাপাশি আরও কিছু বাহ্য কারণ রয়েছে যা গোটা চিন্তার পরিসরে সর্বজনীনভাবে প্রভাব ফেলেছে। যেমন চিন্তা-অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার প্রবণতা। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানগত চিন্তাকে বিশেষ মহলের মধ্যেই কেবল বিকশিত হতে দেওয়া, যেন তা কেবল সমাজে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ ধরনের কারণগুলো সমাজচিন্তকদের মধ্যেও চোখে পড়ে। ইবনে খালদুন যেহেতু স্বীয় চিন্তাধারাকে প্রসার ঘটাতে সক্ষম হননি, একারণে তার চিন্তাধারা সঙ্গী-সহযাত্রী ছাড়া একাই পড়ে থেকেছে। অন্য অনেক সমাজচিন্তকের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

তাই বলা যায়, ইসলাম ও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান স্বয়ং কখনও সমাজচিন্তার পথে অন্তরায় হয় না। বরং ইতিহাসকাল জুড়ে বিভিন্ন অবৈধ ও স্বৈরশাসকদের চাপে পড়ে যেসব ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও উপলব্ধির সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোই মূলত সমাজচিন্তার এ অধঃগতির পেছনে দায়ী। এ বিবেচনায় মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোর ভূমিকা ছিল অপ্রত্যক্ষ। আর বাইরের বাস্তব কারণগুলোই মূলত প্রভাব ফেলেছে বেশি।

3. mgvRwPšÍvi avivq ev‡Ki m'i

সমকালীন মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে যারা সমাজচিন্তায় অগ্রণী ছিলেন, সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর হলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত সতেরটি গ্রন্থের অধিকাংশের[১৯] মধ্যেই আর্থ-সামাজিক বিষয়ে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে সমাজচিন্তা সম্পর্কে দেখা যায় যে, তিনি যতগুলো রচনাকর্ম রেখে গেছেন, সর্বত্র সমাজ বিষয়ে তাঁর এক ধরনের আকুলতা ঢেউ খেলে যায়। এমনকি নিখাঁদ দর্শনের আলোচনার মধ্যেও তিনি ঘোষণা করেন যে, মানব সমাজের সমস্যাবলি দূর করাই এ আলোচনার উদ্দেশ্য। একইভাবে যখন তিনি গণিতের

[১৯]. উদাহরণস্বরূপ dvjmvdvZbv, BKwZmv'bv, Avj-mbvb AvZ-ZwiwLq¨v wdj KiAvb, Avj-gv'ivmvZj Bmjvwgq¨v এবং Avj-gv'ivmvZj KiAwbq¨v, wgnbvZj Dgvg, Avj Bbmvb Avj gAvwmi Iqvj gkwKjvZj BRwZgvCq¨vn, Avj Bmjvg BqvK' Avj-nvqvZ ইত্যাদি।

একটি জটিলতম সমস্যা Bw¯ÍKiv (induction) নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হন, সেখানেও সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পথ বের করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে একটি সামাজিক দুরূহ সমস্যারই সমাধানে ব্রতী হন। পূর্বোক্ত আলোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, শাসকমহলের আনুকূল্য সমসাময়িক মনীষীদের বিশেষ করে সমাজচিন্তকদের জন্য কতটা আবশ্যক ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বাকের সদর ছিলেন ব্যতিক্রম। কারণ তিনি এমন এক যুগে এবং এমন এক সমাজে বসবাস করতেন, যেখানে স্বৈরাচারী শাসকমহলের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও উচ্চারণ করার অবকাশ ছিল না, শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল সর্বত্র। অথচ তিনি সেই প্রতিকূলতার তোয়াক্কা না করে ঠিকই একত্ববাদী সামাজিক চিন্তা নিয়ে কাজ করেছেন, কথা বলেছেন, বই লিখেছেন। যদিও তাঁর এই সাহসিকতার মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত স্বৈরশাসকের হাতেই প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে।

বাকের সদরের সামাজিক ও ইতিহাস সংক্রান্ত চিন্তাধারায় প্রথমে গবেষণার বিষয়বস্তুকে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেন এবং এর বিভিন্ন মাত্রা তথা দিক্‌কে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণ করেন। অতঃপর চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি স্বীয় অভিমতকে ধর্মীয় ভাষ্যসমূহ তথা কুরআন ও সঠিক হাদীস দ্বারা সপ্রমাণিত করেন। চৈন্তিক, মানবিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক সকল বিষয়ে ধর্মীয় ভাষ্যাবলির সূত্রসম্বলিত ধারার মধ্যেই তিনি নিজ চিন্তাধারাকে চালিত করেন এবং সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করেন। এটা বাকের সদরের চিন্তা পদ্ধতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাকের সদর মানব সমাজের উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনায় মূলনীতি ধরেছেন 'মানুষের প্রতিনিধিত্ব'র ইতিহাসকে। কুরআনের বর্ণনার আলোকে তিনি এ ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম পর্যায়কে প্রতিনিধিত্ব যুগের ভূমিকা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মনে করেন, আদম (আ.) এর জন্য ধার্য হয় যে তিনিই হবেন মানুষ জাতির জন্য প্রথম প্রতিনিধি, যাকে আল্লাহ্ পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। আদম স্বীয় জীবন শুরু করলেন যেভাবে অন্য যে কোন মানুষ এ দুনিয়ায় তার জীবনকে শুরু করে। তবে একটি মৌলিক পার্থক্য সহকারে। তা হল, প্রত্যেক মানুষ [মাতৃ]ক্রোড়ে শৈশবকাল অতিক্রম করে বড় হয়। কারণ এ পর্যায়ে মানুষ স্বাধীনভাবে চলতে-ফিরতে, জীবনের সমস্যা সমাধান করতে ও তার প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারে না। সুতরাং মাতৃক্রোড়ের প্রয়োজন হয় যেখানে শিশু বেড়ে উঠতে ও প্রতিপালন লাভ করতে পারে, যতদিন না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়।

প্রত্যেক শিশুই সচরাচর তার পিতামাতা ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে প্রয়োজনীয় লালন পালন লাভ করে থাকে। কিন্তু প্রথম মানব যিনি এরূপ কোন পারিবারিক পরিমণ্ডলে বড় হননি, এ কারণে তার জন্য ব্যতিক্রম এক ক্রোড়ের দরকার ছিল যেখানে তিনি প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা পালনার্থে একদিকে জীবন ও এর জাগতিক সমস্যাবলিকে বুঝা এবং অপর দিকে তার নৈতিক ও আত্মিক কর্তব্য অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় পক্বতা ও সচেতনতা অর্জন করতে পারতেন।

4. mgvRe× Rxe‡bi DrcwË

সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল : 'মানুষ কেন সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে আসছে কিংবা এখনও করে যাচ্ছে?' বাকের সদর মনে করেন, এখানে প্রশ্ন একটি। কিন্তু সম্ভাব্য প্রশ্ন অনেকগুলো। মানুষ কেন সমাজবদ্ধ হয়েছে? তবে কি মানুষের মনগত আকর্ষণ ও বাধ্যগত স্বভাবই তাকে অন্য মানুষদের সাথে একসাথে জীবনযাপন করতে টেনে আনে? নাকি প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন বিগ্রহের ভীতি তাকে অন্য মানুষদের সাথে সঙ্গবদ্ধ হতে

প্রবৃত্ত করে? নাকি তার অভিজ্ঞতা এবং হিসাব-নিকাশে স্বার্থচিন্তার বুদ্ধিই তাকে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনকে সুবিধাজনক ও লাভজনক বলে প্রতিপন্ন করে অর্থাৎ অন্যের রোজগার থেকে সুবিধা গ্রহণের (শোষণ) আকাঙ্ক্ষা তাকে অন্যের পাশে এসে জীবন যাপনে উৎসাহিত করে? নাকি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তার অর্জিত অবগতির সাথে একযোগ হয়ে তার জন্য সমাজবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করার কোন বিকল্প পথ রাখে না?

-এগুলো সবই হচ্ছে একেকটি সম্ভাবনার কথা এবং একেকটি ব্যাখ্যা, যা সমাজচিন্তক ও দার্শনিকগণ 'মানুষ কি স্বভাবগতভাবেই সামাজিক জীব'- এ প্রশ্নের উত্তরে স্ব স্ব রচনার মধ্যে বিবৃত করেছেন।

4.1. gbxlx‡'i AwfgZ

†cø‡Uv I Avj-dvivwe : দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন, মানুষ সত্তাগতভাবেই একটি সামাজিক জীব।[২০] আর নগর কিংবা সমাজ এ কারণে উৎপত্তি লাভ করে যে মানুষ একাকী তার সমুদয় চাহিদাকে পূরণ করতে পারে না। এ কারণে তার অন্যদের সাহায্য প্রয়োজন হয়। প্লেটো আহার, বাসস্থান ও বস্ত্রকে সামাজিক জীবন গঠনে মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হিসাবে তুলে ধরেছেন।[২১]

অপরদিকে আবু নসর আল-ফারাবি এক্ষেত্রে একটি মিশ্র ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন। তিনি একদিকে যেমন মানুষের প্রাকৃতিক ও জৈবিক মৌলিক চাহিদাগুলোর সমাজবদ্ধ জীবন গড়ে ওঠার পেছনে ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন, অপরদিকে তদ্রূপ মানুষের মৌলিক আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলো যেমন পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা, সম্ভাব্য সর্বোত্তম পূর্ণতা অর্জন ইত্যাদি চাহিদাগুলোরও ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন।[২২]

প্লেটো যেখানে কেবল মানুষের প্রাকৃতিক ও জৈবিক চাহিদাগুলোকেই সমাজবদ্ধ জীবনের দিকে চালিত হওয়ার কারণ মনে করেছেন, আল-ফারাবি তার বিপরীতে মানুষের অস্তিত্বের অর্থপূর্ণ মৌলিক চাহিদাগুলোরও এক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে বলে মত দিয়েছেন। আল-ফারাবির দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ সমষ্টি ও সমাজবদ্ধ হওয়া ব্যতীত কখনোই কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতায় পৌঁছুতে পারে না। আর এ পূর্ণতা তখনই শিখরে পৌঁছায় এবং মানুষ তার নিজের জন্য পূর্ণতার কল্পনাযোগ্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হতে পারে, যখন 'একক কল্যাণময় বিশ্ব সমাজ' গড়ে উঠবে। আর মানুষ ঐক্যে পৌঁছে যাবে এবং একক বিশ্বসমাজে একক মানব জাতি একচেটিয়া হয়ে যাবে।[২৩]

Avjøvgv ZvevZvevC : সমকালীন ইরানের প্রখ্যাত দার্শনিক ও কুরআনের বিশ্বখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হোসাইন তাবাতাবাঈ (১৯০৪-১৯৮১) মানুষের শোষণকামী প্রবৃত্তি এবং অপরের সেবা থেকে সুবিধা গ্রহণের মানসিকতাকে মানুষের সমাজবদ্ধ হওয়ার পেছনে ব্যাখ্যা হিসাবে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Dm‡j dvjmv‡d I qv iv‡f‡k wiqwjRg (اصول فلسفه و روش رئالیسم) এর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম রেখেছেন 'আছলে ইস্তেখদাম ওয়া ইজতিমা' (Principle of utilization and society) নামে। এ অধ্যায়ে তিনি বিশদভাবে ও পূর্ণাঙ্গরূপে নিজের অভিনব এ মূলনীতির বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।

---

[২০]. উৎ. Frederick Copleston, *A History of Philosophy*, (ফা. অনু. সাইয়্যেদ জালাল উদ্দিন মুজতাবাবি), তেহরান : ইলমি ওয়া ফারহাঙ্গি, ১৩৬২ ফা.সন, ১ম খ., পৃ. ২৫৭।

[২১]. Plato, *The Republic*, (ফা. অনু. মুহাম্মদ হাসান লুতফি), তেহরান : খরাজমি প্রকাশনী, ১৩৮০ ফা. সন, খ. ২, পৃ. ৮৬৮-৮৬৯।

[২২]. আল-ফারাবি, AvivD Avnwj j gv'xbwZ Avj-dv'xjv, বৈরুত : দারুল মাশরিক, ১৯৯১ হি. ষষ্ঠ প্রকাশ, পৃ. ১১৭।

[২৩]. Frederick Copleston, *A History of Philosophy*, (ফা. অনু. সাইয়্যেদ জালাল উদ্দিন মুজতাবাবি), প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ.।

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র মতে, মানুষ অপরাপর প্রাণীকূলের ন্যায় আপনার চারপাশের পরিবেশের সাথে লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং নিজের চাহিদাসমূহ পুরণ করার নিমিত্তে অন্যদের থেকে সুবিধা গ্রহণ করে। কিংবা অন্যদেরকে নিজের চাহিদা পূরণে কাজে লাগায়। একারণে সে সমষ্টির মধ্যে যোগ দেয় এবং সমাজ গঠন করে। যাতে অন্যদের স্বার্থ থেকে বেশি বেশি ব্যবহার করতে পারে এবং অন্যদেরকে ভালভাবে কাজে লাগাতে পারে। সর্বাগ্রে ও সত্তাগতভাবে অন্যকে নিজের সেবায় ব্যবহার করা মানুষের একটি স্বভাব। এটা তার প্রধান কাজ। আর এর পরে গিয়ে সে সামাজিক জীব, যা একটি গৌণ ব্যাপার।[২৪]

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র এই মত অনুসারে মানবের মূলসত্তা ও প্রকৃতিতে সামাজিকতা বলে কিছু নেই। পরার্থপরতা ও সমাজকামিতা তার আসল ধারা নয়। বরং শোষণকামিতা ও অন্যদের থেকে উপকার ও সেবা আদায়কেই এ মতবাদে মানুষে মানুষে সম্পর্কের আসল ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। এর ফলশ্রুতিতেই সমাজ ও সামাজিক জীবন গড়ে উঠেছে যাতে মানুষদের পারস্পরিক উপকার গ্রহণের বিষয়টি বাস্তব রূপ দেওয়া যায় এবং নিয়মানুবর্তী রূপ পায়।

Aa¨vcK gZvRv †gvZvnnwi : অধ্যাপক মূর্তাজা মোতাহ্হারি (১৯১৯-১৯৭৯) আল্লামা তাবাতাবাঈ'র সরাসরি শিষ্য হয়েও এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর উপস্থাপিত মতটি বরং আল-ফারাবি'র মতের সাথেই বেশি মিলে। মোতাহ্হারি বলেন :

> 'মানুষদের সামাজিক জীবন নারী ও পুরুষের দাম্পত্য জীবনের সদৃশ। এ যুগলের প্রত্যেকেই সৃষ্টির মঞ্চে একই সমগ্রেরই অংশবিশেষ [তথা পরিপূরক] হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে। আর এদের প্রত্যেকেরই অন্তঃপুরে আপন সমগ্রে সংযুক্ত হওয়ার এক উদগ্র বাসনা বিদ্যমান।... মানুষ শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিভার বিচারে সবাই একসমান সৃষ্টি হয়নি। যদি এরূপ সৃষ্টি হত, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই সেটাই থাকত যা অন্যদের কাছেও রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রত্যেকে সেই জিনিসের অধিকারী থাকত না যা অন্যরাও অধিকারী নয়। স্বভাবতই তখন পারস্পরিক প্রয়োজন ও বন্ধনেরও কোন অবকাশ থাকত না এবং একে অপরের পরিষেবারও কোন সুযোগ থাকত না।
>
> মহান আল্লাহ্ মানুষদেরকে দৈহিক, আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ভাবাবেগগত শক্তি-সামর্থ ও প্রতিভার দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৃষ্টি করেছেন। আর এর মাধ্যমে তিনি সামাজিকভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্র [মুখাপেক্ষিতা] প্রস্তুত করে দিয়েছেন। মানুষের সামাজিক জীবন হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার, নিছক চুক্তি ও নির্বাচন করার বিষয় নয়, কোন বাধ্যবাধক ও চাপিয়ে দেওয়ারও বিষয় নয়।'[২৫]

ev‡Ki m'‡ii 'wófw½ : অন্যান্য সমাজচিন্তকের ন্যায় বাকের সদরও সামাজিক জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> 'মানুষ সহজাতভাবেই আত্মপ্রেমী ও নিজের চাহিদাসমূহ পূরণে প্রয়াসী এবং অতঃপর উক্ত চাহিদাসমূহ মেটাতে তার চারপাশের পরিবেশকে নিজের সেবায় ব্যবহার করার ভিত্তির উপরেই সে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে মানুষের জন্য তার এসব চাহিদা পূরণকল্পে অপরাপর মানুষকে ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কারণ সে অন্য ব্যক্তিদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যতীত তার চাহিদাসমূহ মেটাতে সক্ষম নয়। এরূপে [মানুষদের মধ্যকার] সামাজিক সম্পর্ক এসব [পারস্পরিক] চাহিদাগুলোর ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে, অতঃপর মানব

---

[২৪]. দ্র. মোহাম্মদ হোসাইন তাবাতাবাঈ, Dm‡j dvjmv‡d Iqv iv‡f‡k wiqwjRg, তেহরানঃ সাদরা প্রকাশনী, তা. নে. খ. ২, পৃ. ১৯৩-২০০।
[২৫]. দ্র. মূর্তাজা মোতাহহারি, Rv‡g‡q Iqv ZwiL, কোম : দাফতারে ইন্তেশারাতে ইসলামি, তা. নে. পৃ. ১৩-১৬।

> জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় তার উন্নয়ন ঘটেছে এবং সুফল বয়ে এনেছে। অতএব মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন মানবিক চাহিদাসমূহ হতে জন্মলাভ করেছে। আর সামাজিক ব্যবস্থা হচ্ছে সেই রূপ-কাঠামোই, যা সামাজিক জীবনকে ঐসব চাহিদাসমূহের ভিত্তিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মানুবর্তী করে তোলে।'[২৬]

বাকের সদরের এ বক্তব্যকে বিচার করলে আল্লামা তাবাতাবাঈ'র দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও বাকের সদর এ প্রসঙ্গে এর চেয়ে বেশি কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁর চিন্তার ভাবধারা থেকে এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালব্ধ সাক্ষ্য-প্রমাণসূত্রে মানুষের সামাজিক জীবনের নতুন এক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যেতে পারে। অর্থাৎ মানুষের শৈশবের পর্যায় আর তার বয়স্ক পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে এবং প্রত্যেক পর্যায়কে তার নিজস্ব ও বাস্তব পরিস্থিতি দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে। আমরা মানুষরা শৈশবকালে নিজের প্রধানতম জৈবিক ও শারীরিক চাহিদার কারণে পরিবারের প্রতি নির্ভরশীল। আমরা পরিবারের ক্রোড়ে লালিত পালিত হই এবং এ উপায়ে বেঁচে থাকি এবং জীবনযাপন অব্যাহত রাখি। আমরা পরিবারে যুক্ত হওয়াকে নিজেরা বেছে নেই না এবং জেনে-বুঝে পরিবারের সমষ্টির মধ্যে প্রবেশ করি না। বরং এক বাধ্যবাধক প্রয়োজনের তাগিদে একদিকে আমাদের স্বভাবগত চাহিদাসমূহ পুরণকল্পে এবং অপরদিকে আমাদের পিতামাতার সজ্ঞাত সন্তান-বাৎসল্যের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজের মধ্যে আমাদের জীবনের পথ মসৃণ হয়। এভাবে আমরা এমন এক অবস্থায় বেড়ে উঠি যখন আমরা সমষ্টির সাথে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। আর এ অভ্যাসই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। অতঃপর যখন আমরা যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব কালে উপনীত হই, আর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি বিকশিত হয়ে আমাদের মস্তিষ্কের সক্ষমতা বেড়ে যায়, তখন কখনো কখনো চিন্তা ছাড়াই ঐ অভ্যাস ও রীতিকে অব্যাহত রাখি এবং তা উপেক্ষা করার ক্ষমতা নিজের মধ্যে খুঁজে পাই না। আবার কখনো কখনো ঐ অভ্যাস ও রীতির পর্যালোচনা ও অধ্যয়নে লিপ্ত হই, নিজের মানবপ্রেমী ও গোত্র-প্রীতিমূলক আবেগ ও অনুভবগুলোকে একদিকে রাখি এবং অন্যদের কষ্ট, বিপত্তি ও আবেদনসমূহের মূল্যকে রাখি আরেক দিকে। পক্ষান্তরে অন্যদের সাহায্যার্থে আমাদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে রাখি তৃতীয় আরেকটি দিকে, আর পরিশেষে অন্যদের সেবা ও সাহায্যমূলক প্রচেষ্টাসমূহকে রাখি অন্য আরেকদিকে। এভাবে আমরা অন্যদের সাথে জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক, প্রাপ্তি ও প্রদেয় সেবাসমূহের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ কষে থাকি। এমতাবস্থায় আমরা সজ্ঞাতে ও সজ্ঞানে হয় অন্যদের সাথে জীবনকে অগ্রগণ্য করি এবং সর্বদা সমষ্টি ও সমাজের সঙ্গী হয়ে চলি (সর্বসাধারণ জনমানুষ যেমনটা করে থাকে), আর নয়ত বিচ্ছিন্ন ও একঘরে জীবনকে বেছে নিই এবং অন্যান্য মানুষদের সাথে একসাথে মিশে চলা থেকে বিরত থাকি (যেমনটা মুষ্টিমেয় কিছু লোক করে থাকে)।

মোটকথা, বাকের সদর মনে করেন, মানবের সামাজিক জীবনের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোন একঢালা ব্যাখ্যা কিম্বা একক নিয়ামক খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং মানবের বিভিন্ন বয়সকালের এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে (তাদের অবগতি ও বুঝক্ষমতা অনুযায়ী) পার্থক্য করতে হবে। শিশুরা তাদের জৈবিক ও শারীরিক চাহিদাসমূহ পূরণার্থে অজ্ঞাতসারে ও বাধ্যবাধকভাবে পরিবার ও পরিজনদের সাথে যুক্ত হয় এবং তাদের সেবা দ্বারা উপকৃত হয়। অথচ বয়স্করা এরূপ নয়। তারা এমন এক শ্রেণির হয়, যে শ্রেণির এক দিক গঠিত পারিবারিক, সামষ্টিক গোষ্ঠী ও জাতিগত জীবনের প্রতি আধা-সজ্ঞাত ও আধা-সচেতন অভ্যাস দ্বারা, আর অপর দিকটি গঠিত সম্পূর্ণ জ্ঞাতসার সহজাত আগ্রহ আর স্বজন-পরিজন ও সমাজ-সমষ্টির সাথে একসাথে জীবনযাপনকে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে।

[২৬]. বাকের সদর, BKwZmv ‘bv, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-লুবনানি, ১৩৯৮ হি. পৃ. ২৯৭-২৯৮।

4.2. e¨w³ Avmj bvwK mgvR?

সমাজের প্রকৃতি তথা স্বরূপ কী? এ বিষয়টি যদিও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত এবং সমাজতাত্ত্বিকরা এর কোন কোন দিক সম্পর্কে অনেক যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষণ করার অসামান্য প্রয়াস চালিয়েছেন এবং অনেক সাফল্যও অর্জন করেছেন, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এ বিষয়টির কিছু কিছু দিক এখনও অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ রয়ে গেছে। সাধারণত সামাজিক বিজ্ঞানে যেটা প্রসঙ্গ তা হচ্ছে ‘সমাজ’-এর অর্থ ও তাৎপর্য কী? হয়ত এর উত্তর দেওয়াটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আদতেই কি ব্যক্তিদের থেকে পৃথকরূপে ‘সমাজ’ নামে স্বতন্ত্র কিছু বাস্তবে বহিঃজগতে অস্তিত্বমান রয়েছে নাকি নেই? সমাজের এই অস্তিত্ব এবং মৌলিকত্ব বিষয়ক আলোচনাই হচ্ছে সমাজ সংক্রান্ত অন্য সব আলোচনার পূর্বশর্ত।

ধারণা করা হয় যে মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন, তিনি হলেন খাজা নাসিরুদ্দিন তুসি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে খাজা তাঁর AvLjvK-G bv‡mwi গ্রন্থে এ বিষয়টি অবতারণা করার প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে আবু নাস্‌র আল-ফারাবি তাঁর দর্শনের গ্রন্থাবলির মধ্যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। তাঁর পরবর্তীকালে ইখ্‌ওয়ানুস সাফা ও ইবনে খালদুন একইভাবে বিষয়টির অবতারণা করেছেন। আর সমসাময়িক কালে ড. মুহাম্মদ ইকবাল, আল্লামা সাঈয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ, অধ্যাপক মূর্তাজা মুতাহ্‌হারি প্রমুখ এ বিষয়ের উপর গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করেছেন। সময়ের পরিক্রমায় সামাজিক দর্শনে এ বিষয়টি শক্তিশালী আলোচনা ও বিশ্লেষেণের স্থান তৈরি করে নিয়েছে। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকির সদরও সামাজিক চিন্তায় এ বিষয়ে স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। BKwZmv‘bv গ্রন্থের মধ্যে বাকের সদর ‘মাজমুআয়ে মাবাহিসে উলুমুল কুরআন ওয়া আল-তাফসির’(مجموعة مباحث علوم القرآن و التفسير) শীর্ষক পর্বে সমাজ সংক্রান্ত যে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন, সেখানে তিনি সমাজের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২৭] তিনি মনে করেন, সমাজের মৌলিকতায় বিশ্বাসের চিন্তাটি হেগেল ও একদল ইউরোপীয় দার্শনিকের চিন্তাবিশেষ। তারা মনে করেছেন সামাজিক কর্ম, ব্যক্তির কর্ম থেকে স্বাধীন ও পৃথক। তারা বলে থাকেন, আমাদের একটি মৌলিক ও বুনিয়াদি জিনিস রয়েছে, যার নাম সমাজ। এ সমাজের সদস্যরা রয়েছে এবং বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের উদরের মধ্যে ও তারই অস্তিত্বের মধ্যে সংস্থাপিত, যেমনভাবে দেহের মধ্যে কোষসমূহ সংস্থাপিত থাকে। আর নিজের জন্য সমাজের অভ্যন্তর থেকে বাহির অভিমুখে একটি খিড়কি খুলে রাখে। ব্যক্তির যতটা পরিমাণ প্রতিভা ও সৃজনীশক্তি থাকে, ততটা পরিমাণে সে এ খিড়কি দ্বারা সমাজের ভেতরে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

কিন্তু বাকের সদর বলেন, এরূপ চিন্তা ও বিশ্বাস সঠিক নয়। ব্যক্তির পশ্চাতে সমাজের জন্য কোনই তাৎপর্য বিদ্যমান নেই। ব্যক্তিরা ব্যতীত সমাজের কোনরূপ মৌলিকতা নেই।[২৮] যদিও সমাজ কর্ম করতে পারে এবং তার প্রভাব তথা কার্যকারিতা থাকতেও পারে। কিন্তু সমাজের যে কর্ম আর ব্যক্তির যে কর্ম, এদুয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

4.3. mgv‡Ri †gŠwjKZ cm‡½ wPšÍwe‘‡‘i ‘wóf w½mgn

দর্শনে ‘মৌলিকত্ব’ কথাটি বহুল ব্যবহৃত একটি পরিভাষা। দর্শনের পরিভাষায় কোন কিছুর মৌলিকত্ব বলতে বুঝায় তার বহিঃর্জাগতিক প্রকৃত অস্তিত্বসত্তা। এর ঠিক বিপরীত কথাটি হচ্ছে যা অপ্রকৃত; মৌলিক নয়। সমাজচিন্তার

---

২৭. দ্র. বাকের সদর, BKwZmv‘bv, (ফা. অনু. মাহদী ফুলাদবান্দ), তেহরান : ১৩৬০ ফা. সন, পৃ. ৪১২।

২৮. Cv¸ ³

ক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়ায় আসলে 'অস্তিত্ব' সমাজের নাকি ব্যক্তির? যদি অস্তিত্ব প্রকৃতই সমাজেরই হয়, তাহলে ব্যক্তি হবে অ-প্রকৃত। কিন্তু যদি প্রকৃত অস্তিত্ব ব্যক্তির হয় তাহলে সমাজ হবে অ-প্রকৃত।

এ অর্থে মৌলিকত্ব অতীতে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে ততটা লক্ষণীয় বিষয় ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা পরস্পর ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠার কারণে এ প্রসঙ্গটি দর্শন থেকে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায়ও ঢুকে পড়েছে।

দার্শনিক অর্থে সমাজের মৌলিকত্ব ও প্রকৃত অস্তিত্ব প্রসঙ্গে চিন্তাবিদদের মধ্যে পরস্পর বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। কেউ কেউ দাবি করেছেন 'সমাজ'-ই মৌলিক। আবার কারো কারো দাবি 'ব্যক্তি'-ই মৌলিক। আর কেউ কেউ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই মৌলিক ও প্রকৃত বলে অভিমত প্রদান করেছেন।

ইতিপূর্বে যেমনটা ইঙ্গিত করা হয়েছে, মৌলিকত্ব প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন আল-ফারাবি। তাঁর দৃষ্টিতে সমাজ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী নয়। কারণ, সমাজের প্রকৃতি ও সারসত্তা তার ব্যক্তিদের ব্যতিরেকে নতুন বা ভিন্ন কোন জিনিস নয়। সমাজ বলতে বুঝায় একদল জনসমষ্টিকে, যারা এক জায়গায় সমবেত হয় এবং পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে চলে। সমাজকে কখনোই একটি দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করা যায় না যারা একত্রিত ও একতাবদ্ধ হয়ে একই লক্ষ্যপানে চলে। কারণ সমাজের ব্যক্তিবর্গ আর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রধানতম বৈ-সাদৃশ্য হচ্ছে এটা যে সমাজের ব্যক্তিরা সজ্ঞাতে ও সচেতনভাবে স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে থাকে। অথচ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কোন ধরনের চেতনা ও বোধহীন।[২৯] তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষ সৌভাগ্যে পৌঁছুনোর জন্য অন্যদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মুখাপেক্ষী। আর এ অভীষ্ট পূরণের জন্য সে এমন জায়গায় বাসস্থান বেছে নেয় যা অন্য মানুষদের সংস্পর্শে হয়। এ কারণে মানুষকে 'সঙ্গপ্রিয় প্রাণী' ও 'সামাজিক প্রাণী' বলা হয়।[৩০]

সমাজের প্রতি মানুষদের আকর্ষণ ও ঝোঁক হচ্ছে 'উপকরণ' হিসাবে, 'উদ্দেশ্য' নয়। যদিও অনেক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ আল-ফারাবির এ অভিমতে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ কেউ যেমন ইংরেজ সমাজচিন্তক টমাস হব্‌স্ ও ফরাসি সমাজচিন্তক রুশো তাঁর এ অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে কেউ কেউ যেমন হার্বাট স্পেন্সর ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ তাঁর অভিমতের বিরোধিতা করেছেন। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আল-ফারাবি সর্বপ্রথম এ বিষয়টি উত্থাপন করেন।

ইখ্ওয়ানুস সাফাও মানুষদের পার্থিব মঙ্গল ও পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনের জন্য সমাজের অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য বলে অভিমত দিয়েছেন। তবে তারা সমাজের মৌলিকত্ব বা স্বাধীন অস্তিত্ব মানেন নি।[৩১]

পরবর্তীকালে আল-গাজ্জালি প্রায় একইরূপ ব্যাখ্যা সহকারে বলেন, মানুষ বাধ্যতার বশে এবং বস্তুগত প্রয়োজনের তাগিদে একত্রে সমবেত হয় এবং 'সমাজ' নামক প্রপঞ্চের উৎপত্তি ঘটায়।[৩২] এদিকে ম্যাক্স ভেবার স্বীয় সমাজ চিন্তায় এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই বেছে নিয়েছেন।[৩৩]

---

[২৯]. আল ফারাবি, AvivD Avnwj Avj gw'bvZ Avj dw'jv, বৈরুত : দার ওয়া মাকতাবাতু আল-হিলাল, ২০০২, পৃ. ১১৯।
[৩০] . cÖv¸³
[৩১]. দ্র. ইখওয়ানুস সাফা, ivmwqj Avj-BLIqvbm Avm-mvdv, দারু সাদির, তা. নে. খ. ৩, পৃ. ৩৭৫।
[৩২]. দ্র. মোহাম্মদ তাওয়াক্কুল, Rv‡g †kbwQ-‡q gv‡idvZ, তেহরান : ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সেন্টার, ১৩৮৩ ফা. সন, পৃ. ৪৮২।
[৩৩]. cÖv¸³

সমাজ কি ব্যক্তি হতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে প্রকৃত ও মৌলিক অস্তিত্বের অধিকারী হয়ে থাকতে পারে?- এ প্রশ্নের উত্তরে বাকের সদর বলেন :

> ‘আমাদের জন্য এটা সমীচীন নয় যে আমরা কিছু কিছু পশ্চিমা চিন্তাবিদের মতো করে চিন্তা করব এবং বলব যে, সমাজের একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক অস্তিত্ব রয়েছে এবং ব্যক্তিদের ব্যতিরেকেই এর পরিধি ও সদস্যবর্গ রয়েছে। এ ধরনের চিন্তা আসলে হেগেল এবং একদল ইউরোপীয় দার্শনিকের চিন্তাপদ্ধতি। তারা মনে করেছেন সমাজের কর্ম ব্যক্তির কর্ম হতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। তারা সমাজ ও ব্যক্তির কর্মের মধ্যে পার্থক্য করে এটা বলতে চান যে সমাজ নামে একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক জিনিস আমাদের রয়েছে, যার সদস্যরা [ব্যক্তি] আছে। প্রকৃতপক্ষে সকল ব্যক্তিই সমাজের উদরের মধ্যে ও তার অস্তিত্বসত্তার মধ্যে অন্তর্গত। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটি কোষের ন্যায় এই মৌলিক এককের গঠন করে এবং সমাজের ভিতর হতে নিজের জন্য একটি বাতায়ন সমাজের অভিমুখে খোলে। আমাদের জন্য এ ধরনের কল্পনাচারী হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। আমরা ব্যক্তিদের যেমন তকী, হাসান, রেযা এদের বাইরে সমাজের জন্য কোন তাৎপর্যে বিশ্বাসী নই। আমরা এই ব্যক্তিদের বাইরে সমাজের জন্য কোন মৌলিকত্ব স্বীকার করি না। কারণ, সমাজ সম্পর্কে হেগেলের এ ব্যাখ্যা তার পূর্ণ সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণের সাথে সম্পৃক্ত।’[৩৪]

বাকের সদরের এ বক্তব্য অনেকাংশে মিলে যায় স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩)-এর মতের সাথে। তিনি এ বিষয়টির উপর জোরারোপ করেন যে সমাজ ব্যক্তি থেকে পৃথক কোন সত্তা নয় যে তার মৌলিকত্ব ও স্বরূপ মানতে হবে। তিনি ‘ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ’ (Classical Individualism)-এর আলোকে বিশ্বাস করেন, ব্যক্তিমানব যখন একত্রে সমবেত হয়, তখন অন্য কোন সারবস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যায় না। তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি ভেবে দেখার অবকাশ রাখে। অবশ্য পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর এ অভিমতের সাথে প্রচণ্ড বিরোধিতা করে বলেছেন, ‘এটা একটা ভ্রষ্ট ধারণা যে কল্পনা করা হবে ব্যক্তিরা একত্রে সমবেত হওয়ার পূর্বে স্বাধীন অস্তিত্ব সত্তার অধিকারী ছিল। কারণ, যে মাত্র আমরা অস্তিত্ব জগতে পা রাখি, তৎক্ষণাৎ দুনিয়া আমাদের মধ্যে নিজের কাজ আরম্ভ করে দেয়। প্রত্যেক মানব-ব্যক্তি ইতিহাসের প্রত্যেক পর্যায়ে একটি সমাজে জন্ম নেয় এবং উক্ত সমাজ তাকে জীবনের প্রথম বছরগুলোতে ছাঁচে ফেলে দেয়। যখন সে কথা বলে সেটা তার ব্যক্তিগত ঐতিহ্য নয়; বরং সে যে সমষ্টির মাঝে বেড়ে উঠেছে তাদের থেকে এক প্রকার সামাজিক ভাবে অর্জিত [বৈশিষ্ট্য]। ভাষা ও পরিবেশ উভয়ই তার চিন্তার ধরন নির্ধারণে প্রভাবশীল। সমাজ বিহীন ব্যক্তি চিন্তা ও ভাষা হীন।’[৩৫]

ইবনে খালদুন, যাকে সমাজ বিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করা হয়, তিনি তাঁর A¨j-gKÏgv গ্রন্থে বিশেষ করে ‘সমাজের নিয়ম-কানুন’ শীর্ষক অধ্যায়ে অনেকগুলো বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। অথচ তাঁর সামাজিক আইন ও নিয়ম সম্পর্কে সবিস্তর আলোচনা থেকে সমাজের স্বাতন্ত্র তথা মৌলিকত্বকে প্রমাণিত করা যায় না।

ড. মুহাম্মদ ইকবাল সমাজের মৌলিকত্বে বিশ্বাস পোষণ করে বলেন, ব্যক্তি হচ্ছে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সমাজের সংস্কৃতিতে ব্যক্তির পরিচয়সত্তা বিলীন হয়ে যায়। তিনি মনে করেন, খুদী কেবলমাত্র অন্যদের ও সমাজের খুদীসমূহের সমাবেশে বিকশিত হয়, খুদীসমূহের সমাবেশ থেকে দূরে থেকে নয়। কারণ ব্যক্তিরা একা একা নিজেদের প্রয়োজনসমূহ মেটাতে সক্ষম হয় না। মানুষ সামষ্টিকভাবেই পরিচয় লাভ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ একটি প্রকৃত ও বাস্তব প্রপঞ্চ হিসাবে পরিগণিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমাজে যুক্ত হতে হবে, যাতে সমাজব্যবস্থার মধ্যে স্বীয় পরিচয়সত্তার বিলীন ঘটায় এবং জাতির সমুদয় অতীত ও ভবিষ্যৎ গৌরবকে নিজের মধ্যে সমন্বিত

---

[৩৪]. বাকের সদর, Av¨j-mbvb Av¨j-ZwiwLq¨v wdj KiAvb Av¨j Kwig, (ফা. অনু. মুসাভী ইস্ফাহানি), তেহরান : তাফাহিম পাবলিকেশন্স, ১৩৮১ ফা.সন, ৩য় মুদ্রণ, পৃ. ১০৯-১১০।

[৩৫]. E. H. Carr, *What Is History*, (ফা. অনু. হাসান কামশাদ), তেহরান : খরাজমি পাবলিকেশন্স্, ১৩৭৮ ফা. সন, ২য় মুদ্রণ, পৃ. ২৮০।

করে। এ কারণে ব্যক্তিমাত্রই যে সমাজের সাথে যুক্ত, ঐ সমাজের সংস্কৃতি ব্যতিরেকে তার বিকাশ ও পূর্ণতা সম্ভব নয়।[৩৬]

সমাজের মৌলিকত্বে বিশ্বাসী চিন্তাবিদদের ছাড়াও আরেক দল চিন্তাবিদ রয়েছেন যারা যুগপৎভাবে ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিকত্বে বিশ্বাস করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আল্লামা তাবাতাবাঈ ও তাঁর বরেণ্য শিষ্য অধ্যাপক মূর্তাজা মোতাহ্হারি। আল্লামা তাবাতাবাঈ বিষয়টির অবতারণা করেছেন এবং অধ্যাপক মোতাহ্হারি এর বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।[৩৭]

সম্ভবত সমাজের স্বাতন্ত্র ও মৌলিকতায় বিশ্বাস জোরদার হওয়ার পেছনে যি ভিত্তিটি কাজ করেছে তা হল ইতিহাসের গোড়ার দিকে মানুষ সামষ্টিক বিবেকের অধিকারী ছিল, ব্যক্তিক বিবেকের নয়। সেখানে সবাই সামষ্টিক মানসিকতা নিয়ে জীবন যাপন করতো, ব্যক্তিক মানসিকতা নিয়ে নয়। তাদের মধ্যে 'আমরা' অনুভব ক্রিয়াশীল ছিল, 'আমি' নয়। সমষ্টিই মৌলিক ছিল, ব্যক্তি নয়।

4.4. Zvrch weÁvbi wbwi‡L e¨w³ I mgv‡Ri †gŠwjKZv cm½

ব্যক্তির অস্তিত্ব মৌলিক নাকি সমাজের অস্তিত্ব মৌলিক–এটা এমন একটা প্রসঙ্গ, যা প্রাচীনকাল থেকেই সমাজচিন্তক ও সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। 'ব্যক্তি' কথাটি কখনো বিশেষ হিসাবে 'সামগ্রিক' এর বিপরীতে প্রয়োগ হয়। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির অর্থ বুঝায় একটি সুনির্দিষ্ট অস্তিত্ব, যার নির্দিষ্ট অস্তিত্বসত্তা রয়েছে এবং স্বতন্ত্র পরিচয়সত্তার অধিকারী। এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পরিচয়সত্তার কারণে দুজন ব্যক্তি সর্বদিক থেকে সদৃশ হলেও তারা একই ব্যক্তি হতে পারে না। এ অর্থে 'সামগ্রিক' এর অর্থ দাঁড়ায় এক সুবিস্তর তাৎপর্য, যার মধ্যে উক্ত তাৎপর্যের সকল ব্যক্তিই অন্তর্ভূক্ত হয়। যেমন 'মানুষ' নামক সামগ্রিক তাৎপর্যটি। যা সকল মানব ব্যক্তির উপরেই সমানভাবে প্রযোজ্য হয়।[৩৮]

আবার কখনো কখনো 'ব্যক্তি' তাৎপর্যটি সামাজিক এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে 'ব্যক্তি' বলতে বুঝায় স্বতন্ত্র মন-মানসিকতা, শক্তি, তৎপরতা ও প্রতিভার অধিকারী মানুষকে, যে জীবনের অধিকারী এবং যার প্রতিভা ও কামনা-বাসনা রয়েছে।

ব্যক্তিও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে কখনো কখনো স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অর্থ করা হয়। এ দৃষ্টিকোণ অনুসারে ব্যক্তি হচ্ছে সমাজের ভিত্তি আর সমাজ হচ্ছে ব্যক্তির গঠনকারী ও ব্যাখ্যাকারী।

আবার কখনো এটা চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক অর্থে বুঝায়। ব্যক্তি ও সমাজের চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক তথা 'সামাজিক চুক্তি' কথাটির অর্থ হচ্ছে এটা যে একগুচ্ছ চুক্তিভিত্তিক বিষয় ইতিহাসকাল ধরে এবং প্রত্যেক সমাজেই তার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে সমাজ ও ব্যক্তিকে একে অপর থেকে আলাদা করতঃ এতদুভয়ের প্রত্যেকের জন্য পৃথক ক্ষেত্র অনুমোদন করেছে।[৩৯]

---

[৩৬]. দ্র. মোহাম্মদ তাওয়াক্কুল, Rv‡g †kbwQ-‡q gv‡idvZ, তেহরান : ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সেন্টার, ১৩৮৩ ফা.সন, পৃ. ৫১৫।

[৩৭]. মূর্তাজা মোতাহহারি, Rv‡g‡q I qv ZwiL, কোম : দাফতারে ইন্তেশারাতে ইসলামি, তা. নে. পৃ. ৩৩৫।

[৩৮]. মোহাম্মদ তাকি জা'ফারি, kvi‡n bvnRj evjvMv, তেহরানঃ দাফতারে নাশরে ফারহাঙ্গে ইসলামি, ১৩৭৬ সৌ. সন. খ. ১, পৃ. ১৫৪।

[৩৯]. cv¸³, পৃ. ১৫৮।

এ মর্মে রুশো বলেন :

> ‘আমাদের এমন একটা সংস্থা তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব এবং সম্পর্ক রক্ষার জন্য সমগ্র শক্তিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে পারি যাতে আমরা যখন সমগ্রের সঙ্গে মিলিত হই তখন আমরা নিজেদের সম্মতিতে নিজেদের ইচ্ছারই মাত্র অনুগত হই এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা ও শক্তি পূর্বের মতোই অক্ষুন্ন থাকে। তার কোন ব্যত্যয় না ঘটে।’[৪০]

4.5. mgv‡Ri Rb¨ ‘vkwbK †gŠwjKZv bvKP I mvgwwRK †gŠwjKZv MnY

এমন হতে পারে যে সমাজের জন্য প্রকৃত ও বাস্তব অস্তিত্ব কেউ নাও মানতে পারেন। কিন্তু বহিঃনিষ্কাশনের উৎস হিসাবে মানব সমাজের জন্য আমরা সামাজিক মৌলিকতায় বিশ্বাস রাখতেই পারি এবং সমাজের জন্য প্রভাবশীলতা, অগ্রবর্তিতা ও অধিকার মানতেই পারি। একারণে ব্যক্তির প্রকৃত ও বাস্তব অস্তিত্ব আবশ্যিকভাবে না মেনেও ব্যক্তির অধিকার ও সমাজের অধিকার নিয়ে কথা বলাই যায়।

এ বিষয়টি অধ্যাপক তাকি মেসবাহ[৪১]’র বক্তব্যে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে বাকের সদরের ভাষ্যেও এটা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ যদিও তিনি সমাজের মৌলিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু ইসলাম প্রথমবার ব্যক্তি ও সমাজের জন্য আলাদা আলাদা অধিকার প্রবর্তন করেছে। কাজেই যদিও বাকের সদর সমাজের জন্য ব্যক্তির মতোই হিসাব নিকাশের প্রতি মত পোষণ করেন, কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে সমাজের স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তির কতেক আচার-আচরণ, ব্যক্তির প্রেক্ষিতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবসম্পন্ন হয়। আর কতেক আচরণ সমাজ তথা মানব ইতিহাসের প্রেক্ষিতে পাড়ি জমায় এবং এ দিক থেকে আলাদা আলাদা হিসাব নিকাশের অধিকারী হয়। একারণে তিনি বিশ্বাস করেন যে ইসলাম জীবনের নবতর সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছে এবং এমন সব আইনকানুন প্রবর্তন করেছে যেখানে ব্যক্তি ও সমাজের অধিকার বিবেচনায় রাখা হয়েছে।[৪২]

অতএব বাকের সদর ব্যক্তির যেমন প্রকৃত অস্তিত্বকে স্বীকার করেন, সমাজের সেরূপ কোন প্রকৃত অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তির আচরণ আর সামাজিক আচরণের পার্থক্য ঐ তৃতীয় মাত্রার (অর্থাৎ সমাজের বিস্তৃত পরিসরে ঢেউ সৃষ্টি করা ও সমাজকে আন্দোলিত করা) মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তাই সমাজের জন্য প্রকৃত ও দার্শনিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।[৪৩]

তিনি স্পষ্ট করে বলেন :

> ‘...এ ব্যাপারে কোন ভুল বুঝাবুঝি ঘটা উচিত নয় যে, ইউরোপীয়দের মতো আমরাও বিশ্বাস করে থাকি সমাজ অস্তিত্বশীল ও স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা। বরং আমরা যেটা বলি সেটা হল এই যে, ব্যক্তির কর্ম আর সমাজের কর্ম ভিন্ন ভিন্ন। ব্যক্তির কর্মের দুইটি চেহারা বা অভিমুখ রয়েছে। অর্থাৎ তার কর্তৃকারণ ও উদ্দেশ্যকারণ থাকে। কিন্তু যখন বস্তুগত কারণও প্রবেশ করে অর্থাৎ ব্যক্তির কর্ম সমাজের অঙ্গনকেও আন্দোলিত করে এবং সমাজের পরিসরে প্রভাব বিস্তার করে, তখন এটাকে বলি সামাজিক কর্ম। একারণে উক্ত কর্তা আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে।’[৪৪]

---

[৪০]. iæ‡kvi †mvk¨vj K›Uv±, অনু. সরদার ফজলুল করিম, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, পৃ.৩৬।

[৪১]. অধ্যাপক তাকি মেসবাহ ইয়াযদি (জন্ম ১৯৩৪) সমসাময়িক শীর্ষস্থানীয় ইরানি দার্শনিক ও পশ্চিমা দর্শন বিশেষজ্ঞ।

[৪২]. দ্র.বাকের সদর, dvjmvdvZbv, বৈরুত : দার আত-তাআরুফ, ১৯৮৯, পৃ. ৪৩।

[৪৩]. দ্র. সাইয়্যেদ মুনজির আল-হাকীম, gRZvgvDbv wd wdKix ZiwQ Avj-knx‘ ewKi Avj-m‘i, তেহরান : মারকায দিরাসাতু আল-ইলমিয়া, ১৩৮৮ ফা. সন, পৃ. ১৭২-১৭৮।

[৪৪]. বাকের সদর, Avj-gv‘ivmvZj KiAwbq¨v, বৈরুত : দারু আত-তাআরুফ লিল-মাতবুয়াত, ১৪০০ হি. পৃ. ৮৬।

4.6. ev‡Ki m`‡ii AwfgZ

মৌলিকত্ব প্রশ্নে বাকের সদরের বক্তব্যগুলো তাঁর বিভিন্ন লেখনীর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে এসেছে। এসব বক্তব্যগুলো কোথাও কোথাও কিছুটা পরস্পর অসঙ্গতিপূর্ণ হিসাবে প্রতীয়মান হয়। কিছু কিছু স্থানে তিনি 'সমাজের মৌলিকতা' মতবাদের সমালোচনা করেছেন এবং সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে নাকচ করে দিয়েছেন। এটাকে তিনি একটি মার্কস্‌বাদী মতবাদ হিসাবে অভিযুক্ত করে এর শিকড় হেগেলীয় মতবাদের মধ্যে নিহিত বলে উল্লেখ করেছেন। এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> '...তবে এটা উচিত নয় যে কতেক ইউরোপীয় দার্শনিকের ন্যায় [আমরাও] ভ্রান্তির শিকার হব এবং সমাজকে একটি বিকট মূর্তির অস্তিত্ব বলে জানবো, যা একটি একক দেহসমতুল্য হবে এবং ব্যক্তিদের থেকে স্বাধীন থাকবে। আর এর প্রত্যেক ব্যক্তিই একেকটি কোষের ন্যায় এই বিরাটাকায় দেহের মধ্যে স্থান নিবে। এটা হচ্ছে হেগেলের এবং তাঁর পক্ষাবলম্বী কতেক ইউরোপীয় দার্শনিকের ধারণা...। কিন্তু ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। আর আমাদের এতটা পরিমাণে ঐ ধারণার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত এই রূপকথার বিরাটাকায় [সমাজরূপী] দেহ নিয়ে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই।'[৪৫]

বাকের সদর অন্যত্র এই একই বক্তব্যের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন :

> 'সামষ্টিক অর্থনীতি সমাজের প্রতি একটি বৃহৎ সৃষ্টিসত্তা হিসাবে দেখে থাকে, যেখানে তার ব্যক্তিরা দ্রবীভূত হয়ে মিলেমিশে গেছে এবং সেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্থান হচ্ছে দেহের মধ্যে কোষের স্থানের ন্যায়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, যা ব্যক্তিদেরকে একটি বৃহৎ সামাজিক পরীক্ষণাগারে মিশ্রণ ঘটিয়ে বিরাটাকায় সমাজ দেহে দ্রবীভূত করে ফেলে, এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, সমাজের ব্যক্তিদের মাধ্যমে যেসব কর্ম সম্পাদিত হয়, এগুলো আর ব্যক্তিদের কর্ম থাকবে না। কারণ, ব্যক্তিরা সকলে [সমাজ নাম্মী] আরেকটি বৃহৎ সত্তায় মিশে গেছে এবং কর্মের কর্তার সাথে তার কর্মের ফলাফলের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন সমাজই [কর্মসমূহের] প্রকৃত কর্তা এবং সকল ব্যক্তির কর্মের ফলাফলের মালিক হবে...। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক...। কেননা, ইসলাম সমাজকে ব্যক্তিদের পশ্চাতে একটি বৃহৎ সত্তা রূপে দেখে না যা তাদেরকে একদিক থেকে অপরদিকে চালিত করবে। তাছাড়া [আসলে] সমাজ বলতে অসংখ্য ব্যক্তির সমাবেশ বৈ আর কিছুই নয়। একারণে সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এটা যে ব্যক্তিদেরকে এমন এক মানব হিসাবে বিবেচনা করব, যে মানব চলাফেরা করে এবং কর্ম করে থাকে।'[৪৬]

উল্লেখ্য, বাকের সদরের কিছু কিছু লেখার মধ্যে ব্যক্তিদের থেকে স্বতন্ত্র এক সমাজের প্রকৃত অস্তিত্বের পক্ষে কথা বলতে দেখা যায়। তিনি এ বিষয়ে কুরআনের কতিপয় আয়াতেরও সমর্থন নিয়েছেন, যেখানে স্পষ্টতই ঘোষণা করা হয়েছে যে ইতিহাসের নির্দিষ্ট নিয়ম ও সূত্র রয়েছে । যেমন 'প্রত্যেক জাতির একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না'-[৪৭] এ আয়াতে আরবি اجل (AvRvj) কথাটি আয়ুষ্কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল আছে, প্রত্যেক সমাজেরও তদ্রূপ নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল রয়েছে। অর্থাৎ একটি সমাজ, যা উক্ত সমাজের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদের সম্মিলিত পছন্দ-অপছন্দ, চিন্তা-চেতনা এবং সামর্থ ও সম্ভাবনার অভিন্ন যোগাযোগের ভিত্তিতে চলে, ঐ সমষ্টিরও ব্যক্তির ন্যায় আয়ুষ্কাল, মৃত্যু, জীবন ও গতি রয়েছে। ব্যক্তির ন্যায় সমাজও বাঁচে এবং মরে। আবার ব্যক্তির মৃত্যু যেমন আয়ুষ্কালের নিয়ম ও সূত্রের অনুবর্তী, সমষ্টির মৃত্যুও তদ্রূপ নিয়ম ও সূত্রের অনুবর্তী।[৪৮]

---

[৪৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০।
[৪৬]. ________ , BKwZmv'bv, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-লুবনানি, ১৯৭৭, পৃ. ৩০৯-৩১১।
[৪৭]. Avj-KiAvb, ইউনুস: ৪৯।
[৪৮]. দ্র. বাকের সদর, BKwZmv'bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭।

এখন এটা হতে পারে যে আমরা বাকের সদরের লেখনীতে এই পরস্পর অসমঞ্জস বক্তব্যগুলোর মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে পারি এভাবে যে, আমরা ধরে নিব বাকের সদরের প্রথমোক্ত বক্তব্যগুলো স্বয়ং বাকের সদরের রচনা ছিল। আর দ্বিতীয়োক্ত বক্তব্যগুলো তাঁর বক্তব্যের ক্যাসেট থেকে শুনে শুনে কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে অকস্যাৎ হত্যা করার কারণে তিনি এ লেখাগুলো আর রিভিউ করার সুযোগ পাননি। তিনি যদি লেখাগুলো রিভিউ করে দিতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয় এ অসঙ্গতি দূর হয়ে যেত। তবে এটাও ঠিক যে, বাকের সদরের বক্তব্যগুলোও পরস্পর অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। যেমন Avj-gv'ivmvZj KiAwbq¨v গ্রন্থে লিপিবদ্ধ তাঁর চতুর্থ ভাষণটি একই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ তাঁর ষষ্ঠ ভাষণের সাথে পরস্পর বিপরীত ও সমন্বয়ের অনুপযুক্ত। প্রথমোক্ত ভাষণে তিনি সমাজ ও সমষ্টির জন্য স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং আয়ুষ্কাল রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অথচ পরবর্তী ভাষণে তিনি এ বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়েছেন এবং এ বৈশিষ্ট্যকে শুধুমাত্র ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

মোটকথা, দেখা যাচ্ছে যে 'মৌলিকত্ব' প্রশ্নে অধ্যাপক মোতাহ্হারি'র মাঝামাঝি ও সমন্বয়মূলক মতকেই অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থন করা যায়। একটি সমাজের তুলনা কম্পিউটারের একটি সফটওয়্যারের ন্যায়, যা মানুষ কর্তৃক ডিজাইনকৃত এবং ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এরই অব্যাহত ধারায় তা স্বীয় ডিজাইনারদের মস্তিস্ক থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। এতদসত্ত্বেও তা গতিশীল, পরিবর্তনযোগ্য এবং হ্রাস-বৃদ্ধির উপযোগী। সমাজসমূহও অনুরূপ বলা যায়। হুবহু ব্যক্তিদের মত নয়। বরং ব্যক্তিদের মিথস্ক্রিয়া ও সংশ্রবের সমষ্টি থেকে সামাজিক যোগাযোগের এক সুশৃঙ্খল ও আদর্শসমৃদ্ধ সম্পর্কের বন্ধন উৎপত্তি লাভ করে; যা প্রগতিশীল এবং পরিবর্তন ও সম্প্রসারণযোগ্য বটে। এটা ব্যক্তিদেরই সাথে এবং ব্যক্তিদের পন্থা ও আচরণের উপর কর্তৃত্বশীল ঠিকই, কিন্তু হুবহু তা নয়। বরং স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এটা বহির্জাগতিক, দৃশ্যমান এবং প্রত্যক্ষণযোগ্য বটে। কিন্তু তদ্সত্ত্বেও একটি স্বতন্ত্র যৌগবিশেষ, যার অস্তিত্ব একান্তই স্বতন্ত্র ও প্রতীকী। অন্য কোনো বস্তু, দ্রব্য কিংবা যৌগের সাথে এটা তুলনীয় নয়। এর অবস্থা জানা যায় এর প্রভাব ও ক্রিয়ার মাধ্যমে। একারণে কখনো কখনো এটা জীবন, সক্ষমতা, তীক্ষ্ণতা ও উৎকর্ষতার শিখরে বিরাজ করে। আবার কখনো কখনো নিতান্তই দুর্বল, শীথিল, পরস্পর বিক্ষিপ্ত এবং পশ্চাদপদ অবস্থায় বিরাজ করে থাকে।

অতএব বাকের সদর একদিকে সমাজের কর্ম ও স্বতন্ত্র কর্মলিপির প্রতি বিশ্বাস রাখা এমনকি আল্লাহ্র সম্মুখে উক্ত কর্মলিপি উপস্থিত করার বিষয়ে বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও ব্যক্তিকেই মৌলিক বলে মনে করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, আমরা কেবল ব্যক্তিরাই অস্তিত্বমান রয়েছি, যেমন যায়েদ, বাকের, খালিদ প্রমুখ। এদের পশ্চাতে অবস্থিত ঐ অবয়বটির কোন মৌলিকতা নেই।[৪৯]

4.6. e¨w³i Kg I mgv‡Ri K‡gi cv_K¨

ব্যক্তির কর্ম ও সমাজের কর্মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বাকের সদর এ পার্থক্য বলতে মনে করেন যে ব্যক্তির কর্মের থাকে দুইটি দিক (বা মাত্রা)। একটি হচ্ছে 'কারণ' এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'লক্ষ্য-উদ্দেশ্য'। কিন্তু সমষ্টির কর্মে ঐ দুইটি দিক ছাড়াও আরেকটি তৃতীয় দিক থাকে। আর সেটা হল কর্মের 'প্রভাব' (বা ঢেউ যা সমাজে উৎপত্তি হয়)।

সুতরাং সামাজিক কর্মের তিনটি দিক থাকে। একটি দিক কর্ম সম্পাদনকারীর সাথে সম্পর্কিত। অ্যারিস্টটলের ভাষায় যাকে বলা হয় 'কর্তৃকারণ'। অপর দিকটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। এটাকে বলা হয়

[৪৯].__________ , Avj-Bmjvg BqvK' Avj-nvqvZ, কোম : মাতবাআতু আল-খাইয়্যাম, ১৩৯৯ হি. পৃ. ৬।

'উদ্দেশ্যকারণ'। আর তৃতীয় কারণটি কর্মের অধিক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত, যে অঙ্গনে কমর্টি সম্পাদিত হয় এবং যেখানে ঐ কর্মের প্রভাব ঢেউয়ের ন্যায় আছড়ে পড়ে। এটাকে বলা হয় কর্মের 'বস্তুগত তথা ক্ষেত্র কারণ'। এই তৃতীয় দিকটি কেবলই সামাজিক ও ঐতিহাসিক কর্মের বৈশিষ্ট্য।[৫০] কেননা, একটি কর্ম 'সামাজিক কর্ম' হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য তা ঐতিহাসিক কর্ম বলে গণ্য হতে হবে এবং এটা মানতে হবে যে ঐতিহাসিক কর্ম জাতি ও সমাজের জন্য সম্পন্ন হয়ে থাকবে। যদিও উক্ত কর্মের প্রত্যক্ষ কর্তা একজন কিম্বা কয়েকজন ব্যক্তি হতে পারে। কিন্তু যে ঢেউ সে সৃষ্টি করে সেই বিচারে এটা একটি সামাজিক কর্ম।

বাকের সদর দাবি করেন, কুরআনে ব্যক্তির কর্ম ও সমাজের কর্মের মধ্যে পার্থক্য করে দেখা হয়েছে। কেননা, কুরআন যখন ব্যক্তির কর্মলিপির কথা উত্থাপন করে তখন সমাজ তথা জাতিরও একটি কর্মলিপি রয়েছে বলে উল্লেখ করে থাকে। যে সমস্ত কর্মের দুইটির বেশি দিক থাকে না, সেগুলো মানুষের ব্যক্তি কর্মলিপিতে লিপিবিদ্ধ হয়। আর যে কর্মগুলোর তিনটি দিক থাকে সেগুলো ব্যক্তি কর্মলিপিতেও লিপিবদ্ধ হয়, পাশাপাশি সামাজিক তথা জাতির কর্মলিপিতেও লিপিবদ্ধ হয়। অন্যকথায় বলা যায়, কর্মের 'কারণ' আর 'উদ্দেশ্য'- এ দুইটি দিকের বিচারে কৈফিয়তের সম্মুখীন হবে ব্যক্তি। আর কর্মের তৃতীয় দিক অর্থাৎ এর ঢেউ তথা প্রভাবের বিচারে কৈফিয়তের সম্মুখীন হবে সমাজ (জাতি)। যেমন একটি আয়াতে বলা হচ্ছে :

> 'এবং প্রত্যেক জাতিকে দেখবে ভয়ে নতজানু হতে। প্রত্যেক জাতিকে তার কর্মলিপি দেখতে আহ্বান করা হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা করতে আজ তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। এ হল আমার নিকট সংরক্ষিত কর্মনামা যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্যভাবে সাক্ষ্য দিবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।'[৫১]

এখানে জাতির কর্মলিপির কথা বলা হয়েছে, যে জাতি আপন প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবার সামর্থ রাখে না। তারা ভয়ে নতজানু। এরূপ একটি জাতির জীবদ্দশার কর্মলিপি একটি সমাজের ন্যায় উক্ত জাতির কাছেই সোপর্দ করা হবে। 'প্রত্যেক জাতিকে তার কর্মলিপি দেখতে আহ্বান করা হবে'-এ বাক্যাংশটি নির্দেশ করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি করে পৃথক কর্মলিপি বিদ্যমান থাকা ছাড়াও প্রত্যেক সম্প্রদায় ও জাতির জন্যও একটি করে সামষ্টিক কর্মলিপি রয়েছে। তবে এ বক্তব্যটি কোন আজব বক্তব্য হিসাবে প্রতীয়মান হয় না, যেহেতু মানুষের দু'ধরনের কর্ম রয়েছে। যথা 'ব্যক্তিগত কর্ম' এবং 'দলগত তথা সামষ্টিক কর্ম'। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জন্য দু'প্রকার কর্মলিপি থাকার বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বটে।[৫২]

পক্ষান্তরে কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো ব্যক্তির কর্ম নিয়ে কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ :

> 'প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি গ্রন্থ (কর্মলিপি) বের করে দেব যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় পাবে। আমি বলব : তুমি তোমার গ্রন্থ পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'[৫৩]

- এভাবে বাকের সদর সিদ্ধান্তে পৌছান যে, যেমনভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ, আর এ কর্মলিপি থেকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন কর্মই বাদ পড়ে না, তদ্রূপভাবে প্রত্যেক জাতিই তার সামাজিক কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ।[৫৪]

---

[৫০]. ___________ , Avj-gv'ivmvZj Bmjvwgq¨v, তেহরান : দারুল কিতাব আল-ইরানি, তা. নে. পৃ.

[৫১]. Avj-KiAvb, জাসিয়া : ২৮-২৯ ।

[৫২].দ্র.বাকের সদর, bvkAvZ AvZ-ZvkvBh¨ Iqv Avj-wkq¨v, (ফা. অনু. আলি হুজ্জাতি কেরমানি), তেহরান : কানুনে নাশর ওয়া পাঝুহেশহায়ে ইসলামি, তা. নে. পৃ. ১০।

[৫৩]. Avj-KiAvb, বনি ইস্রাঈল : ১৩-১৪।

[৫৪]. দ্র.বাকের সদর, Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wdj KiAvb, তেহরান : রুজবেহ প্রকাশনী, তা. নে. পৃ. ৮৬।

5. mgvR I BwZnv‡mi wbqgbxwZ cm½

বাকের সদর কুরআনের ভাষ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করেন যে, ইতিহাসের নিজস্ব নিয়ম ও রীতি রয়েছে, যা প্রকারান্তরে সমাজ ও ইতিহাসেরই নিয়ম হিসাবে পরিগণিত। বাকের সদরের বিশ্লেষণে একদিকে সমাজের যেমন কোন স্বাধীন অস্তিত্বসত্তা নেই। অপরদিকে সমাজের রয়েছে নিয়ম, নির্দ্ধারিত সময়সীমা (মৃত্যু), কর্মলিপি ও আহ্বান। এখন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে সমাজ কিম্বা ইতিহাসের নিয়মের বিষয়টি আসলে কী?

তিনি ব্যক্তির কর্ম ও সমাজের কর্মের মধ্যে যে ভেদরেখা টেনেছেন, তার আলোকে বলেন :

> ‘ইতিহাসের নিয়মের বিষয়টি হচ্ছে একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত কর্ম, যা ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে এবং নিজের ক্ষেত্রকেও সমাজ ও জাতি হতে গ্রহণ করে। কর্ম হতে যে ক্ষেত্র ও ঢেউ উৎপত্তি লাভ করে তার ব্যাপ্তি ও প্রসার ঐ ঢেউ ও ক্ষেত্রের সমাণুপাতিক, যা তার উৎপত্তি ঘটায়।’[৫৫]

আল্লামা তাবাতাবাঈ সমাজের স্বাধীন অস্তিত্বসত্তা প্রমাণে কুরআনের যেসব আয়াতের সহায়তা গ্রহণ করেছেন, বাকের সদর সেই একই আয়াতগুলো থেকেই ইতিহাস তথা সমাজের নিয়ম ও রীতিসমূহ নিঃসৃত করেছেন তাঁর Avj-mbvb Avj-ZvwiwLq¨v Iqv Avj-dvjmvdvZj BRwZgvCq¨v wd Avj-gv‘ivmvZj KiAwbq¨v গ্রন্থের মধ্যে। তিনি অবশ্য কুরআনের একটি পরিভাষা[৫৬]র সমর্থন নিয়ে এ জাতীয় নিয়মগুলোকে ‘আল-সুনান আল-ইলাহিয়্যা’ (السنن الالهية তথা খোদায়ী নিয়ম-রীতি) হিসাবে নামকরণ করেছেন। নিচে বাকের সদর উদ্ভাবিত ইতিহাসের এরূপ কতিপয় উল্লেখযোগ্য নিয়মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হল :

RwZi ÔgZ¨Õ

বাকের সদর মনে করেন, কুরআনে বিবৃত সমাজের সামগ্রিক নিয়মসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম নিয়ম হল ‘সমাজের মৃত্যুবরণ’। ইতিহাসে এভাবে বিভিন্ন সমাজ ও জাতির মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে এবং জাতিসমূহের ধ্বংস হওয়াকে একটি খোদায়ী নিয়ম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যেমনভাবে মানুষের আয়ুষ্কালের শুরু ও পরিসমাপ্তি রয়েছে, সমাজেরও তদ্রুপ আয়ুষ্কাল রয়েছে এবং ঐ আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পর সমাজ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে :

> ‘প্রত্যেক জাতির জন্যই রয়েছে মৃত্যু। কাজেই যখন তাদের মৃত্যু আসে তখন এক মুহূর্ত বিলম্বও করে না, ত্বরাও করে না।’[৫৭]

লক্ষণীয় যে, এখানে ‘মৃত্যু’ কথাটি সংযুক্ত করা হয়েছে উম্মাহ্ তথা জাতি’র সাথে; কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে নয়। এ মৃত্যু ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হতে ভিন্নতর একটা কিছু। অর্থাৎ সমাজ ও জাতির একটা নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল থাকে যা সমষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর এ সমষ্টি মিলে একটি সমাজ গঠন করে। যেখানে সমাজের ব্যক্তিরা একই সম্প্রদায় ও জাতিভুক্ত বলে গণ্য হয় এবং তারা তাদের শক্তি-সামর্থ ও সম্ভাবনা থেকে উৎসারিত মূলনীতি ও আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক ও বন্ধন দ্বারা একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া বজায় রাখে। এরূপ সমাজ ও সমষ্টিকে কুরআন ‘উম্মাহ’ তথা জাতি নামে আখ্যায়িত করে, যে উম্মাহ্র মৃত্যু থাকে, থাকে জীবন ও গতিশীলতা।[৫৮]

---

[৫৫]. cv¸³|

[৫৬]. যেমন সূরা আহ্যাব : ৬২ ‘পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল Avjøvni mbvZ Z_v wbqg। তুমি কখনও আল্লাহ্র নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।’

[৫৭]. Avj-KiAvb, আ’রাফ : ৩৪।

[৫৮]. বাকের সদর, Avj-mbvb Avj-ZvwiwLq¨v wd-Avj KiAvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬।

সুতরাং প্রতীয়মান হচ্ছে যে, একজন ব্যক্তির যেমন গতিশীলতা ও তৎপরতা থাকার কারণে সে জীবন্ত থাকে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করে। একটি জাতিও তদ্রূপভাবে একটি একক হিসাবে জীবিত থাকে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করে। অর্থাৎ সমাজ তথা জাতিও একটি জীবন্ত এককসত্তা। অতঃপর তা মৃত্যু ও ধ্বংসের কবলে নিপতিত হয়। যেমনভাবে একজন ব্যক্তির মৃত্যু একটি নির্দিষ্ট ক্ষণ ও বিধি ও নিয়মের অধীন থাকে যা শেষ অবধি তার ওপর নেমে আসে, সমাজ ও জাতিসমূহের তেমনি নির্দিষ্ট ক্ষণ ও প্রতিশ্রুত মুহূর্ত নির্ধারিত থাকে এবং এমনকিছু বিধি ও নিয়ম রয়েছে যা প্রত্যেক জাতি কিম্বা সমাজের মৃত্যুকে নির্ধারণ করে।

cw_e kw¯Í I e‘jv

বাকের সদর ইতিহাস তথা সমাজের জন্য আরেকটি যে নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে ‘পার্থিব শাস্তি বা বদলা’। পার্থিব শাস্তি হচ্ছে একটি অবধারিত ও অমোঘ শাস্তি যা প্রাকৃতিকভাবেই একটি অন্যায়াচারী সমাজের উপর নেমে আসে। এ শাস্তি কেবল সমাজের বিশেষ শ্রেণি বা দলের অর্থাৎ শুধুই অন্যায়কারীদের উপর নেমে আসে না। বরং সকলের উপরে নেমে আসে।[৫৯] এ প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষ্য খুবই স্পষ্ট :

> ‘এবং তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান, ওদের কৃতকর্মের জন্য তিনি ওদের শাস্তি দিতে চাইলে তিনি ওদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু ওদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত রয়েছে, যা থেকে ওদের পরিত্রাণ নেই। ঐসব জনপদ - ওদের অধিবাসিবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন ওরা সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং ওদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।’[৬০]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

> ‘আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাদের সময় পূর্ণ হলে আল্লাহ্ তাঁর দাসদের শাস্তি অথবা পুরস্কার দেবেন।’[৬১]

এসব ভাষ্য থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, জনে জনে ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজও স্বীয় গর্হিত কৃতকর্মের কারণে শাস্তির সম্মুখীন হবে। এমতাবস্থায় যখন খোদায়ী শাস্তি অবতীর্ণ হয়, তা গোটা সমাজকেই আক্রান্ত করে। কিন্তু কেন এ শাস্তি শুধু অন্যায়কারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সমাজের সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করবে? সে প্রশ্নের উত্তরে বাকের সদর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> ‘এখানে আলোচনা হচ্ছে অত্যাচারী ও খোদাদ্রোহী একটি সমাজ ও একটি জাতির নিজ হাতের কামাই স্বরূপ তার অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি সম্পর্কে। এ স্বাভাবিক পরিণতি উক্ত সমাজের বিশেষ একটি দলের অর্থাৎ অত্যাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং ঐ সমাজের সকল সদস্য তথা ব্যক্তিকেই আক্রান্ত করবে। যদিও তাদের সবার পরিচয়সত্তা ও আচার-আচরণ একরকম নয়। আমরা দেখতে পাই যে বনি ইসরাঈল জাতি যখন অন্যায় ও খোদাদ্রোহিতার কারণে বিপথগামিতা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন তা কেবল বনি ইসরাঈলের অত্যাচারী ও অন্যায়কারী লোকগুলোকেই আক্রান্ত করেনি। বরং এ বিপর্যয়, ব্যক্তি মূসাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। যে মুসা ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী, নিষ্কলুস নির্মোহ, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সাহসী প্রতিবাদী।’[৬২]

---

[৫৯]. cv¸ ³, পৃ. ৮৫-৮৬।
[৬০]. Avj KiAvb, কাহ্ফ : ৫৮-৫৯।
[৬১]. cv¸ ³, ফাত্বির : ৪৫।
[৬২]. বাকের সদর, Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb, cv¸ ³, প. ৯২

বাকের সদর তাঁর এ ব্যাখ্যার সপক্ষে উপরোক্ত আয়াতকে সামনে রেখে বলেন, এই যুক্তি ও নিয়মের ভিত্তিতে বলা যায়, যখন দুনিয়ায় কোন সমাজের উপর কোন শাস্তি আপতিত হয়, তখন ইতিহাসের বিধি ও নিয়ম বলে দেয় যে এ শাস্তি শুধু উক্ত সমাজের মন্দলোক ও অত্যাচারীদের উপরেই আপতিত হবে না, বরং সকল শ্রেণিকেই আক্রান্ত করবে।

আর এ কারণেই কুরআনে বলা হয়েছে :

> ‘তোমরা ধর্মদ্রোহিতাকে ভয় কর, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।’[৬৩]

বাকের সদর এ আয়াতটিকে নিচের এ আয়াতের সাথে তুলনা করেছেন :

> ‘কেউ কারও পাপের ভার বহন করবে না..।’[৬৪]

অতঃপর তিনি এ সিদ্ধান্ত দেন যে, পারলৌকিক শাস্তি সরাসরি পাপের কর্তার উপর আপতিত হবে। কিন্তু পার্থিব শাস্তি আরও ব্যাপকতর পরিসর জুড়ে আপতিত হবে। এটা ইতিহাসের নিয়ম; পারলৌকিক মাপকাঠি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে পরজগতের শাস্তির কোন কথা নয়।

bweMY‡K DrLvZ I RwZmg~‡ni cZb

বাকের সদরের বিশ্বাস মতে, কুরআনে নির্দেশিত আরেকটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম হল আল্লাহ্ প্রেরিত নবিগণকে উৎখাত করার কারণে জাতিসমূহের পতন ঘটা। অবশ্য ‘পতন’ বলতে তিনি এখানে বুঝিয়েছেন তাদের সামাজিক সংহতি ও একাত্মতা বিনষ্ট হওয়া। এ কথার সপক্ষে তিনি কুরআনের আরেকটি আয়াত উল্লেখ করেন :

> ‘(হে নবি) ওরা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চুড়ান্ত চেষ্টা করেছিল- তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য। তাহলে তোমার পরে ওরাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকতো। আমার রাসুলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদের পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ একই নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না।’[৬৫]

এ আয়াতের মধ্যে ‘তাহলে তোমার পরে ওরাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকতো’- এ কথাটি দ্বারা সম্ভবত এটা বুঝানো হয়েছে যে, প্রেরিত নবির উৎখাতের পর জনতা একটি প্রতিরোধী বিরুদ্ধ জনতা হিসাবে অবশিষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ তাদের সামাজিক অবস্থান ভেঙ্গে পড়বে, যদিও জনসংখ্যার দিক দিয়ে পরিবর্তন হবে না। কিন্তু তাদের গর্হিত কাজ অর্থাৎ নবিকে উৎখাত করার ফলে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব ধ্বসে পড়বে ও তাদের মধ্যকার সংহতি ও একাত্মতা বিলীন হয়ে যাবে।

এটা এমন একটা নিয়ম যা বাস্তবে সংঘটিত হয়েছিল এবং যার সত্যতা প্রমাণিত। মক্কার অধিবাসীরা রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে উক্ত নগরী থেকে বিতাড়িত করার পর কিছু দিন অতিবাহিত হতে না হতেই মক্কা রাসুলুল্লাহ্র বিরোধিতা করা ও তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘাঁটি হিসাবে গুরুত্ব হারিয়ে ফেললো। আরো কয়েক বছর পার না হতেই সেই মক্কা নগরীই হয়ে উঠল ইসলামের প্রাণকেন্দ্র এবং ইসলামি রাষ্ট্রের আওতাধীন। এটাই হল ঐতিহাসিক তথা

---

[৬৩]. Avj KziAvb, আনফাল : ২৫।
[৬৪]. cÖ¸3, ফাত্বির : ১৮।
[৬৫]. cÖ¸3, বনি ইস্রাঈল : ৭৬-৭৭।

সামাজিক নিয়ম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা। যে নিয়ম সম্পর্কে কুরআনের জোরালো দাবি হচ্ছে, 'তুমি আল্লাহ্‌র নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।'[৬৬]

6. mgv‡Ri MVb‰kjx

সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তি কেবলমাত্র সমাজের একজন সভ্য নয়, তার থেকেও বেশি। সে হল একটি আত্মা, সে হল কর্মকর্তা এবং তার কাজের মধ্য দিয়ে তার নিজের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। কেবলমাত্র অপরের থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধের মধ্যেই ফুটে ওঠে না, বরং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে তার কাজের স্বাতন্ত্র্যে, অর্থাৎ নিজের চেতনা ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, অপরের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা ভেবে সে যখন কাজ করতে পারে। ব্যক্তির নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি তার কাজের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। তার মানে এই নয় যে, একজন ব্যক্তি অপর দশজনের মত আচরণ করবে না। অনেক সময় অপরে যেরূপ আচরণ করে, ব্যক্তিও সেভাবে আচরণ করে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, সে বিনা বিচারে অপরের কর্মপন্থা অনুসরণ করে; বরং তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুমোদিত বলেই সেই কর্মপন্থা সে অনুসরণ করে।

অপরদিকে সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল। তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোন সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক নয়। দুটি মানুষ একই পথ দিয়ে একই স্থানে চলেছে, কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই। যেহেতু দুটি মানুষ একই স্থানে একই সময়ে রয়েছে বা উভয়ের দৃষ্টি একই বস্তুর উপর নিবদ্ধ, তাতেও বলা যেতে পারে না যে তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু যে মুহূর্তে একজন আরেকজনকে জানে বা তার সম্পর্কে সচেতন হয় বা পরস্পরকে অভিবাদন জানায় বা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে, তখনই সামাজিকতার শুরু হয়। এজন্য গিসবার্ট বলেন, 'সামাজিকতা বা সমাজ হল একটি মানসিক ব্যাপার।'[৬৭]

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে একাধিক মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। যথা-

(ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

(খ) সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ

(গ) আঙ্গিকবাদ এবং

(ঘ) ভাববাদ বা গোষ্ঠীচেতনাবাদ।

(K) e¨w³¯^vZš¿ev` : এ মতবাদ অনুযায়ী সমাজ হল বিভিন্ন স্বাধীন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সমষ্টি বা সমাবেশ। এখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্বন্ধ তা হচ্ছে নিছক বহিরাগত বা বাইরের যোগাযোগ। সেজন্য সমাজ হল বহু ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কৃত্রিম সমষ্টি বা সমাবেশ, যেখানে ব্যক্তি পরস্পরের উপর নির্ভর নয়। শুধুমাত্র সুবিধার খাতিরে সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্য কার্য করে। এই মতবাদ অনুযায়ী 'সামাজিক চুক্তি'র ফলেই সমাজের উৎপত্তি। হব্‌স, রুশো প্রমুখ লেখকগণ এই মতবাদ প্রচার করেছেন। তবে এ মতবাদের সমালোচকরা এটাকে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ ব্যক্তি ও সমাজ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত।

---

[৬৬]. cv¸ ³, আহ্‌যাব: ৬২।

[৬৭]. '*Sociality or Society is esentially a mental phenomenon*' - P. Gisbert :*Fundametal of Sociology*, Bombay :Orient Blacswan, 2012, p9.

(L) mgwóev' ev mgvRZšev' : এই মতবাদ অনুযায়ী সমাজের জন্য ব্যক্তির অস্তিত্ব। ব্যক্তির নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। সমাজ আছে বলেই ব্যক্তি, নতুবা ব্যক্তির পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হত। সমাজ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিকে কতকগুলো দায়িত্ব দেয় এবং তার কর্মসূচিও নির্দিষ্ট করে দেয়। ব্যক্তির উচিত সেই দায়িত্ব পালন করা ও সেই নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করা। ব্যক্তির উপর সমাজের সকল রকম অধিকার আছে কিন্তু সমাজের উপর ব্যক্তির কোন অধিকার নেই। প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রীক মনীষীবৃন্দ সমাজকেই বড় করে দেখেছেন। অবশ্য সমালোচকগণ এ মতবাদকে চরমপন্থী মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করে তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত দিয়ে থাকেন।

(M) Aw½K gZev' : এই মতবাদ অনুযায়ী জীবদেহের সঙ্গে তার বিভিন্ন অংশের যে সম্পর্ক, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সেই রূপ সম্পর্ক বর্তমান। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়, আঙ্গিক। অর্থাৎ পরস্পর নির্ভর এমন অংশের সমন্বয়ে একটি জীবন্ত জীবদেহ সদৃশ। সমাজও মানবদেহের মত একটি জীবন্ত প্রাণী। মানবদেহে যে ঐক্য দেখা যায়, সমাজ দেহেও সেই ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এই ঐক্য হল যথার্থ সংহতি, যেখানে সমগ্র, অংশের উপর এবং অংশ, সমগ্রের উপর নির্ভরশীল। জীবদেহের বিভিন্ন অংশের যেমন পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি সমাজ বাদ দিয়ে ব্যক্তিরও কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। জীবদেহের বা সমগ্রের জন্যই কোষের অস্তিত্ব; সমাজ বা সমগ্রের জন্যই ব্যক্তির অস্তিত্ব। অংশের যথার্থ ক্রিয়ার উপর জীবদেহের সুস্থতা নির্ভর করে, ব্যক্তির যথাযথ ক্রিয়ার উপর সমাজের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। হার্বার্ট স্পেন্সার[৬৮], ম্যাকাইভার[৬৯], ব্লান্টস্লি প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এই মতবাদের প্রবক্তা। এ ব্যাপারে সমালোচকদের বক্তব্য হচ্ছে, জীবদেহের গঠন ও কার্যাবলির সঙ্গে সমাজের গঠন ও কার্যাবলির কিছু সাদৃশ্য থাকলেও জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে পার্থক্যকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নয়।

(N) fveev' ev †Mvôx‡PZbvev' : এ মতবাদ অনুসারে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক যান্ত্রিক বা আঙ্গিক নয়। সমাজের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক হল আত্ম-সচেতন সত্তার স্বাধীন সংগঠন। একটি সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের বৃহত্তম সত্তাই হল তার সামাজিক সত্তা, মানুষের আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতা আসে সমাজের মাধ্যমেই। সমাজ বহির্ভূত মানুষের পক্ষে জীবনের পরম কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। জন কেয়ার্ড ভাববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যক্তির এবং সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেছেন :

> 'সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তি প্রকৃত মানুষ নয়, সে মানবতার একটি খণ্ডমাত্র। যে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উপাদান মানুষের জীবনের সারবস্তু, সে তা থেকে বঞ্চিত।'[৭০]

সমাজবাদীরা সমাজকে জীবদেহরূপে কল্পনা না করে একটি মন বা এক বৃহত্তর চেতনারূপে কল্পনা করেছেন। গ্রীণ, ব্রাডলে, বোসাঙ্কোয়েট প্রমুখ মনীষীগণ ভাববাদী মতবাদের প্রচার করেছেন। তবে সমালোচকরা বলেন, ভাববাদীরা সমাজ এবং ব্যক্তির নিবিড় সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি উভয়ের সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ব্যক্তির মন বা চেতনার অতিরিক্ত কোন সমষ্টিগত মন বা চেতনা বা সামাজিক মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলে নানারকম দার্শনিক সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতিতে পৃথক পৃথক বৃক্ষ ছাড়া যেমন

---

[৬৮]. দ্র. Herbert Spencer, *Principles of Sociology*, pp. 436-450.

[৬৯]. "Society's cell are individual persons, its organs and systems are associations and *institutions*."

[৭০]. "*The abstract individual (apart from society) is not truly man but only a fragment of humanity, a being* devoid of moral and spritual elements which are of the essence of man's life". – John Caird*: Introduction to Philosophy of Religion*,Glasgow : J. MacLehose And Sons; Sixth Edition edition (1910), p. 229.

একটি বৃহত্তর সমষ্টিগত বৃক্ষের (অর্থাৎ বনবৃক্ষ) অস্তিত্ব নেই, তেমনি সমাজস্থ ব্যক্তি-মনের অতিরিক্ত কোন বৃহত্তর সমষ্টিগত মনের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং গোষ্ঠীমন বা সামাজিক মনকে এখানে রূপক হিসাবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

বাকের সদরের সমসাময়িক মুসলিম মনীষীদের মধ্যে অধ্যাপক মূর্তজা মোতাহ্হারি সমাজের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন তাঁর বিখ্যাত R¨v‡g Iqv ZwiL গ্রন্থে। সেখানে[৭১] তিনি সমাজের প্রকৃতি ও গঠনশৈলী সম্পর্কে বিদ্যমান মতবাদগুলোকে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন :

c_g gZ : সমাজ হচ্ছে একটি কল্পিত বিষয়। এ মতানুসারে ব্যক্তিমানুষ ও তাদের আচরণ আর কর্মকাণ্ড বৈ অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই।

wØZxq gZ : সমাজ হচ্ছে একটি কৃত্রিম যৌগ। এখানে কৃত্রিম যৌগ বলতে এটা বোঝানো হয়নি যে ব্যক্তিদের সমাবেশে সমাজ নামক একটি নতুন জিনিস উৎপত্তি লাভ করেছে। বরং ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি এবং তাদের পরস্পরের মিথস্ক্রিয়াই বোঝানো হয়েছে। এটা এমনভাবে ঘটে যে কৃত্রিম যৌগের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদের কর্মকাণ্ড ও মিথস্ক্রিয়া আর তাদের ব্যক্তিক অবস্থার কর্মকাণ্ড ও পরস্পর প্রভাব বিনিময়ের চরিত্র হুবহু একরকম নয়। অবশ্য যৌগের কার্যটা নতুন কার্য বা প্রভাব নয় যে তা ব্যক্তির কার্য ও প্রভাবের সাথে সূত্রবদ্ধ হবে না। যেমন যন্ত্র। যার কার্য তার সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশসমূহের কার্য ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু যন্ত্রাংশগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে উক্ত কার্য এমনভাবে পাওয়া যায় যা যৌগের অংশসমূহের বিচ্ছিন্নতার অবস্থায় কখনোই সম্ভব নয়।

ZZxq gZ : সমাজ হচ্ছে একটি প্রকৃত যৌগ সত্তা। এখানে প্রকৃত যৌগ সত্তা বলতে বোঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন এক জিনিস এবং নতুন এক বাস্তবতা উৎপত্তি লাভ করা, যা উক্ত যৌগের গঠনকারী উপাদান ও অংশসমূহ থেকে ভিন্ন কিছু। প্রকৃত যৌগকে কয়েকটি রূপে কল্পনা করা যেতে পারে। কিছু কিছু যৌগ সত্তায় উক্ত যৌগের গঠনকারী অংশগুলো কেবল মস্তিষ্ক দ্বারা বিশ্লেষণের পরেই বিভাজিত করা যায়। এ প্রকারের যৌগসমূহের উপাদান তথা অংশসমূহকে বহির্জগতে কখনোই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপে পাওয়া যায় না। যেমন গাছপালা ও জীবজন্তু হচ্ছে প্রকৃত যৌগের উদাহরণ। কেননা এসবের অংশসমূহের বহির্জগতে পৃথিকীকরণ কোন কোন ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। যেমন মাটির কণাকে গাছ শোষণ ও আত্মীভূত করে। কিম্বা শুক্রাণু জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত হয়। এরা এদের গতিপথে পূর্ণতা লব্ধ হয়ে নতুন দ্রব্যসত্তায় পরিণত হয় এবং নতুন বাস্তবতার উৎপত্তি ঘটায়।

এ শ্রেণির যৌগগুলোতে কিছু কিছু অবস্থা বা পরিস্থিতিতে বহির্জগতে অংশসমূহের পৃথকীকরণ কল্পণা করা যায় বটে, কিন্তু যখন নতুন জিনিস উৎপত্তি লাভ করে যা উক্ত অংশ বা উপাদানসমূহ দ্বারা গঠিত যৌগ বৈ নয়, তখন উপাদান বা অংশগুলোর কোনটাই সমগ্র তথা পূর্ণ যৌগরূপের বাইরে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সত্তার অধিকারী থাকে না।

আবার কিছু কিছু প্রকৃত যৌগসত্তা রয়েছে যাদের অংশসমূহের জন্য স্বাধীনতার একটা মাত্রা পর্যন্ত কল্পনা করা যেতে পারে। যেমন মানবসত্তা, যা দেহ ও প্রাণ দ্বারা গঠিত একটি যৌগ সত্তা। এ যৌগ একটি একক প্রকৃত যৌগ। তার দেহ প্রাণসত্তা ধারণ করার পূর্বে পূর্ণতার কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে। অতঃপর যখন প্রাণসত্তার অধিকারী হয় তখন তার দেহ, যা মানব অস্তিত্বের বস্তুগত উপাদান বা অংশ, তা প্রাণসত্তার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার অধীনে আসে এবং তার সাথে একাকার হয়ে একক অস্তিত্বসত্তায় পরিণত হয়, তার রূপান্তর ও বিবর্তনের সাথে সাথে সেও রূপান্তরিত ও বিবর্তিত হয়।

---

[৭১]. দ্র.মূর্তাজা মোতাহ্হারি, R¨v‡gÕ Iqv ZwiL, কোম : সাদরা প্রকাশনী, তা. নে. পৃ. ১৬-২৬।

যারা সমাজের জন্য এর অংশসমূহের অস্তিত্বের ভিন্ন কোন অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন এবং সমাজকে প্রকৃত যৌগের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারা সমাজের অস্তিত্বকে ঐ জাতীয় যৌগ বলে মনে করতে পারেন না যার অংশসমূহ কেবল মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ ব্যতীত একে অপর থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক হয় না। বরং তারা বহির্জগতের স্বাতন্ত্র্য ও যৌগের প্রতিই দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। কারণ ব্যক্তিবর্গের বহিঃঅস্তিত্ব তথা সমাজবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তাদের স্বতন্ত্র উপস্থিতির বিষয়টি এমন একটি বিষয় যা অভিজ্ঞতা ও অনুভব দ্বারা প্রমাণিত। তা অস্বীকার করার জোঁ নেই। ব্যক্তিদের বহিঃঅস্তিত্ব যা হচ্ছে সমাজের বস্তুক উপাদান বা অংশ, তা এতটাই স্পষ্ট ও প্রমাণাতীত যে তাতে কোন সংশয় চলে না। বরং যদি কোন সংশয় বা সন্দেহ থাকে, সেটা উক্ত ব্যক্তিদের যৌগের মাধ্যমে যে নতুন সত্তা বা স্বরূপ গঠিত হয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই, যার নাম 'সমাজ'।

ব্যক্তি মানব প্রত্যেকেই সহজাত গুণাবলি এবং প্রকৃতি থেকে অর্জিত গুণাবলি নিয়ে সামাজিক জীবনে প্রবেশ করে। সমাজে আত্মিকভাবে একে অপরের মধ্যে আত্মীভূত হয়ে যায় এবং নতুন এক আত্মিক পরিচিতি লাভ করে যা 'সামষ্টিক আত্মা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ যৌগ স্বয়ং এক প্রকার স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক যৌগ, যার কোন দৃষ্টান্ত মেলে না।

PZ_ gZ : সমাজের প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে। অবশ্য তৃতীয় মতের সাথে এর পার্থক্য এটা যে, এ মতানুযায়ী ব্যক্তিরা সমাজের অগ্রে অস্তিত্বশীল হয়। আর সমাজ ব্যক্তিদের পরস্পর কার্য ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার নিজস্ব রূপ লাভ করে, এমনভাবে যে যখনই ব্যক্তিদের সামাজিক আচার আচরণ পাল্টে যায়, তখন সামষ্টিক আত্মার সাথে তাদের ঐক্য ও বন্ধন তথা সমাজের রূপও পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু চতুর্থ মতে ব্যক্তিরা সমাজের পরিচিতির পূর্বে কোন প্রকার অগ্রবর্তিতার অধিকারী থাকতে পারে না।

এ মতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, মানব ব্যক্তিরা সমাজের অস্তিত্বের পূর্বে কোন মানব পরিচয়ের অধিকারী নয়। একটি শূন্য পাত্রসম, যা কেবল সামষ্টিক আত্মা গ্রহণ করার সক্ষমতা রাখে। মানুষের সামাজিক অস্তিত্বকে বিবেচনার বাইরে রাখলে প্রত্যেকেই তারা নিছক একেকটি প্রাণী মাত্র, যার শুধু মনুষ্যত্বের প্রতিভা রয়েছে। আর মানুষের মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মনুষ্য চিন্তা, আবেগ-অনুভব, ঝোঁক-প্রবণতা, আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যা কিছুই মানবের সাথে সম্পর্কিত হয়, সে সবই সামষ্টিক আত্মার ছায়ায় উৎপত্তি লাভ করে। সামষ্টিক আত্মাই মানুষের এ শূন্য পাত্রকে পূর্ণ করে এবং ব্যক্তিকে একটি ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

এ মতানুসারে যদি মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব না থাকতো তাহলে সে ব্যক্তি মানবের মানস ও ব্যক্তি মনস্তত্ত্বেরও অধিকারী হত না।[৭২]

উপরোক্ত চারটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি মূলত সমাজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং ব্যক্তিকেই আসল বলে গণ্য করে। ফলে ইহা সমাজতত্ত্বকে সামাজিক মনস্তত্ত্বে নামিয়ে আনে। আবার চতুর্থ মতটি সমাজ ও সমষ্টিকেই আসল বলে গণ্য করে এবং মনস্তত্ত্বকে সমাজতত্ত্বে ফিরিয়ে আনে।

তবে এ চারটি মত কিম্বা এ বিষয়ে আরও যেসব মতামত রয়েছে সেগুলো আসলে দুটি মূল ভাগে বিভক্ত হয়।

GK. e¨w³¯^vZš¿¨ev` : যেসব মতবাদ সমাজের জন্য ব্যক্তি হতে কিংবা ব্যক্তির কার্য ও প্রভাব হতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

'B. mgvR¯^vZš¿¨ev` : যেসব মতবাদ সমাজকে বিশেষ অস্তিত্বের অধিকারী বলে মনে করে।

৭২. Cv¸³, পৃ. ১৯-২০।

সমাজের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ধরন, সামাজিক মতবাদসমূহের উপর প্রভাব ফেলে এবং সমাজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক যে ব্যাখ্যাই প্রদান করুক না কেন, তার মতবাদ ঐ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। একারণে যে সকল সমাজতাত্ত্বিক সামাজিক বিষয়াবলি সম্পর্কে মতবাদ প্রদান করেছেন, তারা প্রত্যেকেই সমাজের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রকাশ্যরূপে কিংবা অন্তবর্তীরূপে কোন একটি মতকে গ্রহণ করেছেন।

7. ev‡Ki m‘‡ii ÔKvibj AwK‘Õ ZË

বাকের সদর সমাজের গঠনশৈলী সম্পর্কিত আলোচনায় নিরপেক্ষ থাকেননি। তিনি হাকিমগণের পথ অনুসরণ করে কুরআনের আয়াতের সাহায্যে ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজের স্বতন্ত্র্য অস্তিত্বের ব্যাপারটি আলোচনায় এনেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর Kvibj AwK‘ (قرن الأكيد) তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রদত্ত ব্যাখ্যাটিও একেবারেই অভিনব। উসুল শাস্ত্রে বহুল পরিচিত এ তত্ত্বটি তিনি ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। নিচে সমাজের গঠনশৈলী সম্পর্কে বাকের সদর কর্তৃক প্রয়োগকৃত Kvibj AwK‘ তত্ত্বের উপরে আলোকপাত করা হল। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সূক্ষ্ম সম্পর্ক গড়ে উঠতে মানব মস্তিষ্ক কীভাবে ক্রিয়া করে থাকে সেটাই Kvibj AwK‘ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য।

ÔKvibj AvKx‘Õ ZË Avm‡j Kx?

আরবী ভাষায় Kvb (قرن) কথাটির অর্থ হচ্ছে 'সংসক্তি'। আর Avj-AvKx‘ (الأكيد) কথাটির অর্থ হচ্ছে 'তীব্র'। সুতরাং 'কারনুল আকিদ' কথাটির আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় 'তীব্র সংসক্তি'। সাধারণত ভাষাতত্ত্বে শব্দের সাথে অর্থের যে সম্পর্ক, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাকের সদর উসুল শাস্ত্রে এই তত্ত্ব উত্থাপন করেন। তাঁর দৃষ্টিতে 'শব্দ' ও তার 'অর্থ'র মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে আরোপিত ও সৃষ্ট। কিন্তু যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হচ্ছে, আমরা শব্দ ও তার অর্থের মধ্যে এত অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক পরিলক্ষ্য করি কেন, যে সম্পর্ক অনেকটা কার্য ও কারণের সম্পর্কের ন্যায় অবিচ্ছেদ্য? যেমন উদাহরণস্বরূপ, 'আসমান' কথাটি শোনামাত্রই শ্রোতার মস্তিষ্ক ধাবিত হয় শূন্য আকাশের পানে। এখানে আসমান শব্দটি যে অর্থ নির্দেশ করে তা ঐ শূন্য আকাশ ঠিকই। সকল শব্দই এভাবে মস্তিষ্ককে স্ব স্ব অর্থের দিকে চালিত করে থাকে। এ সংযোগের রহস্য কী? তবে কি শব্দ ও অর্থের মধ্যে নিছক আরোপিত তথা চুক্তিগত সম্পর্কই বিদ্যমান, যা এ দুয়ের মাঝে এরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধন রচনা করে দেয়?

এটা এমনই একটি প্রশ্ন যে বিষয়ে 'সামাজিক চুক্তিবাদী' পণ্ডিতদের কাছে স্পষ্ট কোন উত্তর নেই। বাকের সদর 'অর্থ'র জন্য 'শব্দ' চুক্তি সংক্রান্ত এ ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানে মানব মস্তিষ্কের বিশ্লেষণে প্রয়াসী হন এবং মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়াশীল বিশেষ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনের পথ ধরে এ ভাষাগত উভয়-সংকটের সমাধান করার চেষ্টা করেন।

বাকের সদরের দৃষ্টিতে মানব মস্তিষ্কের উপর বিশেষ সৃষ্টিগত ও বাস্তব নিয়মাবলি কর্তৃত্বশীল। এরূপ দুটি সামগ্রিক নিয়ম হচ্ছে-

১. ইন্দ্রিয়পথে কোন জিনিস বা তার অনুরূপ কোন কিছুর ছবি ইন্দ্রিয়ছাপ হিসাবে মস্তিষ্কে চলে যাওয়া। উদাহরণস্বরূপ কাগজের উপর কোন হিংস্র জন্তুর ছবি দেখলে মানুষের মস্তিষ্ক স্বয়ং ঐ জন্তুর ইন্দ্রিয়ছাপের প্রতি স্থানান্তরিত হয়।

২. যখন দুটি জিনিস পরস্পর ঘনিষ্ট ও নিবিড় সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এমনভাবে যে একটিকে দেখার সাথে সাথে মানব মস্তিষ্ক অপর জিনিসটির প্রতি স্থানান্তরিত হয়, তখন একটি জিনিসের কল্পনার সাথে সাথে অপর জিনিসটির ছবিও মস্তিষ্কে ভেসে ওঠে। তবে এক্ষেত্রে উভয় জিনিসের মধ্যকার যে কোন রূপ সম্পর্ক ও শর্তযুক্ততাই যথেষ্ট নয়। বরং তীব্র ঘনিষ্ঠতা ও যোগবন্ধন থাকতে হবে।

এ তীব্র যোগবন্ধনও দুটি (পরিমাণগত ও গুণগত) কারণ থেকে উৎপত্তি লাভ করতে পারে :

K. cwigvYMZ KviY : এক্ষেত্রে দুটি প্রপঞ্চের একসাথে অত্যাধিকবার পুনরাবৃত্তি ঘটার ফলে এ যোগবন্ধন তীব্রতর হয়ে ওঠে। যেমন, ধরা যাক দুজন বন্ধুকে আমরা সবসময় একসাথে চলতে ফিরতে দেখি। এ ঘটনা এত বেশিবার ঘটতে দেখেছি যে যদি কখনও এদের একজনকে আরেক জন ছাড়া একাকী দেখতে পাই, তখন মনের অজান্তেই মস্তিষ্ক অন্য বন্ধুর সন্ধান করে ফেরে। এরূপ ঘটার কারণ আর কিছু নয় কেবল তাদেরকে পুনঃ পুনঃ একত্রে দেখে অভ্যস্ত হয়ে পড়া ব্যতীত। যার ফলে মস্তিষ্ক তাদের মধ্যে এক তীব্র যোগবন্ধন আবিষ্কার করে নিয়েছে এবং মস্তিষ্ক এ যোগবন্ধনকে অবিচ্ছেদ্য মনে করে থাকে।

L. ¸YMZ KviY : এক্ষেত্রে দুটি প্রপঞ্চের মধ্যকার তীব্র যোগবন্ধনের পরিস্থিতি যে ব্যক্তি উক্ত তীব্র যোগবন্ধনকে উপলব্ধি করে, তার কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশীল হওয়া। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি একটি শহরে গিয়ে অতিশয় কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং প্রায় অলৌকিকভাবে উক্ত রোগ হতে মুক্তি লাভ করে, তাহলে যখনই তার সামনে উক্ত শহরের নাম উচ্চারণ করা হয়, তৎক্ষণাত উক্ত শহরে তার কঠিন ব্যধির কথাও মনে পড়ে যায়।

এ তত্ত্বের ব্যাখ্যায় মনোবিদ্যা ও জীববিদ্যার কতিপয় পরিভাষার সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রখ্যাত রুশ মনোবিদ ইভান পাভলোভ (১৮৪৯-১৯৩৬) প্রথমবারের মতো ক্লাসিক্যাল কণ্ডিশনিং থিওরী (classical conditioning theory) উপস্থাপন করেন। তিনি কিছুসংখ্যক কুকুরের উপর পরিচালিত একটি পরীক্ষণে বিশেষ একটি ঘণ্টা বাজানোর মাধ্যমে কুকরগুলোকে খাবার প্রদান করতেন। এ প্রক্রিয়াটি তিনি অনেকবার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। কিন্তু একবার তিনি শুধু ঘণ্টাই বাজালেন, অথচ কুকুরদের কোন খাবার দিলেন না। এ পরীক্ষণের মাধ্যমে তিনি একটি চমৎকার ফলাফলে উপণীত হলেন। দেখা গেল, ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে কুকুরগুলোর মুখে লালা নিঃসরিত হতে লাগলো। অথচ এ সময় কোন খাবারের ব্যবস্থা ছিল না। তিনি দুটি পরস্পর সম্পর্কিত জিনিসের মধ্যে এরূপ তীব্র সংসক্তি ও প্রভাবকে ‘কণ্ডিশনিং’ সম্পর্ক বলে অভিহিত করেন।

mvgwRK wel‡qvewj mgvav‡b ÔKvibj AwK‘Õ Z‡Ëi c‡qvM

এখানে মূল ধারণাটি হচ্ছে, মস্তিষ্ক ও ভাষার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সামাজিক কাঠামোকে ব্যাখ্যা করা যায়। অন্যকথায়, সামাজিক কাঠামোসমূহের দ্বিবিধ ও জটিল প্রকৃতিকে একটি মস্তিষ্ক ও ভাষাগত তত্ত্বালোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে যে মানব মস্তিষ্কে বিশেষ প্রাকৃতিক ও সৃষ্টিজাত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মস্তিষ্কের উপর কর্তৃত্বশীল এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল ‘কারনুল আকিদ’ (তথা তীব্র সংসক্তি)-র নিয়ম। সংক্ষেপে এ তত্ত্বটিকে নিম্নোক্ত রূপে চিত্রায়িত করা যেতে পারে :

যদি মস্তিষ্কে x ও y প্রপঞ্চদ্বয়ের মধ্যে এক প্রকার তীব্র যোগবন্ধন ও সংসক্তি অর্জিত হয়, তাহলে এ দ্বয়ের যে কোন একটির সাথে সাক্ষাত ঘটার সাথে সাথে মস্তিষ্কে তার সঙ্গী প্রপঞ্চটির কল্পনা ভেসে ওঠার কারণ হবে। এ তীব্র সংসক্তি পরিমাণগত হতে পারে, আবার গুণগতও হতে পারে ।

K. cwigvYMZ msmw³ : যদি x ও y অনেকবার একইসাথে মস্তিষ্কের নিকট উপস্থিত হয়, তাহলে মস্তিষ্ক এ দ্বয়ের যে কোন একটির সম্মুখীন হওয়ার সাথে সাথে অন্যটির প্রতি ধাবিত হয়।

L. ¸YMZ msmw³ : যদি x প্রপঞ্চটি কোন না কোন কারণে s ব্যক্তির নিকট অতীব গুরুত্ববহ হয়ে থাকে, অপরদিকে x প্রপঞ্চটির y এর সাথে তীব্র সংসক্তি ঘটে থাকে, এমনকি যদি তা স্রেফ একবারের জন্যেও ঘটে থাকে, তাহলে s ব্যক্তির মস্তিষ্ক y এর সাক্ষাত লাভের সাথে সাথে x র প্রতি ধাবিত হয়।

ভাষা অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতোই একটি সামাজিক সংস্থা। ভাষার সামাজিক সংস্থা বিশ্লেষণের জন্য ÔKvibj AwK‘Õ সূত্র ব্যবহার করা যায় এরূপে যে, যদি কোন চিহ্ন যেমন s সেটা ধ্বনিগতই হোক আর লিখিত রূপই হোক, চুক্তির ভিত্তিতে কিম্বা অন্য কোন সূত্রে কোন বিশেষ অর্থ যেমন m এর সাথে কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কে সংসক্তি লাভ করে থাকে, তাহলে মস্তিষ্ক এ দ্বয়ের যে কোন একটির সাক্ষাত লাভ করা মাত্রই অপরটির দিকে চালিত হবে।

we‡kølY

ÔKvibj AwK‘Õ তত্ত্ব মূলত উসুলশাস্ত্রে ‘শব্দ’ (word) ও তার ‘অর্থ’ (meaning)-এর মধ্যকার নিবিড় সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয় বিষয়ক একটি তত্ত্ব। বাকের সদর প্রথমবারের মত ‘ব্যক্তি’ ও ‘সমাজ’ এর মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণে এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করে দারুন অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি সামষ্টিকতাবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবাদ শীর্ষক বিতর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবাদের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। এখানে এ তত্ত্বটির প্রয়োগিক দিকটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার। যেমনভাবে ‘শব্দ’ ও ‘অর্থ’র মধ্যে কোন প্রকৃত সম্পর্ক থাকে না, নিছক একটি চুক্তিগত তথা আরোপিত সম্পর্ক, যা মানব মস্তিষ্কের সহজাত প্রক্রিয়ায় নিবিড় সংসক্তির মাধ্যমে তীব্র রূপ লাভ করে এতটা পর্যন্ত যে, শব্দটি শ্রবণমাত্রই মস্তিষ্ক তার অর্থের কাছে চলে যায়; যেন এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শব্দ ও অর্থের মধ্যকার এই তীব্র সংসক্তিকেই আরবি ভাষায় বলা হয়েছে ‘কারনুল আকিদ’।

একইভাবে শব্দের স্থলে যদি ‘ব্যক্তি’কে আর অর্থের স্থলে যদি ‘সমাজ’কে গণ্য করা হয়, তাহলে এদুটির মধ্যকার নিবিড় সংসক্তি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তখন খুব অনায়াসেই বুঝতে সক্ষম হব যে কেন ‘ব্যক্তি’ কথাটি শোনা কিম্বা কল্পনা করার সাথে অনিবার্যভাবে আমাদের মস্তিষ্ক ‘সমাজ’-এর ধারণায় চলে যায় এবং এদুয়ের মধ্যবর্তী সম্পর্ককে অবিচ্ছেদ্য বলে প্রতীয়মান হয়! তাই বলা যায়, বাকের সদর ব্যক্তি ও সমাজের স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যায় Kvibj AwK‘ তত্ত্বের যে সূক্ষ্ম প্রয়োগ করেছেন, তা একদিকে যেমন অভিনব, অপরদিকে তেমনি সামাজিক চিন্তার একটি প্রাচীন সমস্যা সমাধানে কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। এভাবে আমরা যদি ভাষাতত্ত্বের সূত্রাবলিকে সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করে সাফল্য পাই, তাহলে অন্য আরও অনেক সামাজিক বিষয়াবলি সমাধানের পথ উন্মুক্ত হতে পারে।

8. mgv‡Ri MVb Dcv'vb (Z_v ¯Í¤)mgn

বাকের সদর সমাজের গঠনশৈলী নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটির সহায়তা গ্রহণকরেছেন :

> 'আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন- আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। অথচ আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।'[৭৩]

এ আয়াতের আলোকে বাকের সদর বলেন, সমাজের জন্য তিনটি মৌলিক উপাদান তথা স্তম্ভ রয়েছে। যথা :

GK. মানুষ

'B. পৃথিবী (সামগ্রিক অর্থে জগত)

wZb. একটি অস্পৃশ্য (আধ্যাত্মিক) বন্ধন। যা একদিকে মানুষকে পৃথিবী তথা জগতের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ করে। অপরদিকে তা মানুষকে অপর মানুষদের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ তিনটি অক্ষই হচ্ছে পৃথিবীতে সমাজের স্তম্ভসমূহ।

তিনি অতঃপর বলেন :

> 'যখন আমরা মানব সমাজগুলোকে পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই যে, সকলেই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভের বেলায় এক ও অভিন্ন মত। পৃথিবীর কোথাও এমন একটি সমাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে কোন মানুষ থাকবে না, যে মানুষ অপর মানুষের সাথে জীবনযাপন করে না। অথবা সমাজটি পৃথিবীর বুকে থাকবে না। কিংবা উক্ত সমাজের কার্যকলাপের জন্য প্রকৃতির সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না। অর্থাৎ প্রত্যেক সমাজই এ দুই স্তম্ভের বেলায় এক ও অভিন্ন। কিন্তু তৃতীয় স্তম্ভের বেলায় এসে প্রত্যেক সমাজেরই একটি স্বতন্ত্র বন্ধন রয়েছে। সমাজসমূহ এ বন্ধনের ধরন-প্রকৃতির ক্ষেত্রে ও এর গঠন পদ্ধতির ক্ষেত্রে একে অপর থেকে ভিন্ন। তৃতীয় স্তম্ভটি হচ্ছে সমাজের বিবর্তনশীল ও পরিবর্তনশীল অংশ এবং প্রত্যেক সমাজেই এটা একে অপর থেকে ভিন্ন। প্রত্যেক সমাজই এ বন্ধনকে একেক রূপে গড়ে থাকে।'[৭৪]

তৃতীয় স্তম্ভ হিসাবে পরিগণিত এ স্তম্ভটির দুইটি ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ বন্ধন ত্রি-মাত্রা বিশিষ্ট। আর অপর ব্যাখ্যা মোতাবেক এটা চতুর্মাত্রা বিশিষ্ট হয়। এই চতুর্মাত্রার মাত্রা চতুষ্টয় হল যথাক্রমে পৃথিবী, মানুষ, প্রকৃতি এবং আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক। যদি কোন একটি সমাজে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করে, তাহলে উক্ত সমাজে যে সমস্ত মানুষ জীবনযাপন করবে, তাদের বিশ্ববীক্ষা হবে একত্ববাদী এবং তারা এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে যে এক আল্লাহ্ ব্যতীত জগত ও জীবনের জন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন উপাস্যও নেই। আর স্বীয় জীবনের সাথে মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা হচ্ছে ইস্তিখলাফ তথা 'প্রতিনিধিত্ব'র ভূমিকা। অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তাকে নেতৃত্ব (مقام الامامة)-র মর্যাদা প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক মণিব ও ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। বরং একজন 'আমানতদার' এর সাথে 'আমানতকৃত বস্তু'র মধ্যকার সম্পর্কের ন্যায় হবে। অনুরূপভাবে এক মানুষের সাথে অপর মানুষ তথা তার অপর ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক হবে কোন সামাজিক অঙ্গনে খোদায়ী 'প্রতিনিধিত্ব'র দায়িত্ব পালনে দুই সহকর্মীর মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কের ন্যায়। এখানে কোন রকম মণিব ও ভৃত্যের কিম্বা প্রভু ও অনুদাসের সম্পর্ক নেই।

---

[৭৩]. Avj-KziAvb, বাকারা : ৩০।

[৭৪]. দ্র.বাকের সদর, dvjmvdvZbv, দ্বাদশ প্রকাশ, বৈরুত : দারুল তাআরুফ লিল মাতবুআত, তা. নে. পৃ.৩৮ ।

কুরআন উপস্থাপিত এ কাঠামোর বিপরীতে এক ত্রি-মাত্রিক সম্পর্কের মতবাদ রয়েছে, যা মানুষদেরকে মানুষ ও প্রকৃতির সাথে সম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র দিকের সাথে যে কোন রকম বন্ধনকে উপেক্ষা করে থাকে। যা সামাজিক সম্পর্ক তথা বন্ধনকে তার চতুর্থ দিকটি (অর্থাৎ আল্লাহ্) হতে শূন্য করে ফেলে। আর এই চতুর্থ দিকটি স্বীকার না করার ফলে এ সামাজিক বন্ধনের অভ্যন্তরে প্রত্যেকটি অংশের সাথে অপর অংশের সম্পর্ক ওলোট-পালট হয়ে যায় এবং সামাজিক কাঠামোটি অন্যরূপে উপস্থাপিত হয়। এ কাঠামোয় মালিকানার বিভিন্ন রূপ এবং মানুষদের প্রভুত্ব ও মণিবত্বের বিভিন্ন রূপ পরিদৃষ্ট হয় যা জীবনের প্রদর্শনী মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।[৭৫]

সুতরাং বাকের সদরের বিশ্বাস মতে সামাজিক স্তম্ভসমূহের মধ্যে হতে যে জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সামাজিক জগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ধরনটা। যদি এ দৃষ্টিভঙ্গি খোদায়ী হয়ে থাকে এবং নিজের সম্পর্ক ও বন্ধনের ক্ষেত্রে বিশ্বজগতের স্রষ্টাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে গণ্য করে, তাহলে প্রকৃতি ও অপর মানুষদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও খোদায়ী হবে। কিন্তু যদি আল্লাহ্‌কে পর্যবেক্ষণে না নেয়, তাহলে প্রকৃতি ও অপর মানুষের প্রতি তাদের আচরণ হবে বস্তুগত স্বার্থের নিরিখে। এ সম্পর্কে বাকের সদরের দৃষ্টিভঙ্গি আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

দুঃখজনকভাবে বাকের সদরের রচনাবলির কোথাও সমাজের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা চোখে পড়ে না। তবে তিনি সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। সেগুলো এখানে তুলে ধরা হল :

১. সমাজের বিশেষ চিন্তা, আদর্শ এবং বিশ্বাসগত ভিত্তি থাকে।

২. সমাজের বিশেষ এক জন্ম থাকে, যা একটি জাতি তথা সামাজিক সত্তারূপে উৎপত্তি লাভ করে এবং একটি জীবনের অধিকারী হয়।

৩. সমাজ গতিশীল হয়।

৪. খোদায়ী রীতি ও নিয়মসমূহ সমাজের উপর এবং এর গতি (অর্থাৎ ইতিহাস)-এর উপর কর্তৃত্বশীল থাকে।

৫. এসব রীতির ব্যাপক-বিস্তৃত পরিধি রয়েছে যা মানুষের স্বাধীনতা ও এক্তিয়ারের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

৬. সমাজ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।

৭. কিয়ামতের দিন সমাজ, সামষ্টিক তলবের মাধ্যমে পুনরুত্থিত হবে, যাতে অসত্য সম্পর্ক হতে সত্য সম্পর্ক চিহ্নিত হয়ে যায় এবং পর্যালোচনা করা হয়। কুরআনে একে 'তাগাবুন[৭৬] দিবস' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৮. প্রত্যেক সমাজের কৃতকর্মের বিশেষ আমলনামা রয়েছে।

পাশাপাশি বাকের সদর মূল্যবোধভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। অতঃপর এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রেখে তিনি ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা বলে দাবি করেন। তিনি Avj gv'ivmvZj Bmjwgq¨v এবং dvjmvdvZbv গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থার মূল্যবোধগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে এভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন :

---

৭৫. দ্র. মোহাম্মদ হোসাইন তাবাতাবাঈ, Dm‡j dvjmv‡d Iqv iv‡f‡k wiqwjRg, তেহরান : সাদরা প্রকাশনী, তা. নে. খ. ২, পৃ.৩২৭।

৭৬. তাগাবুন (التغابن) আরবী শব্দ। এর দুটি অর্থ রয়েছে - (১) একে অপরের ক্ষতি করা (২) দুঃখ-আফসোস করা। অত্র সূরার নামকরণে মূলত দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য।

১. এ সামাজিক ব্যবস্থা মানবের অস্তিত্ব ও জীবন সম্পর্কে একটি সঠিক ও বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা তুলে ধরে যাতে মানুষ সঠিক জ্ঞানতত্ত্বের নির্দেশনা লাভ করতে পারে।

২. মানুষের স্বভাব-চাহিদা ও আবেগ-অনুভবের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

৩. মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে, মানুষের প্রকৃতিকে নয়।

৪. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ এ সমাজব্যবস্থার একটি প্রধানতম স্তম্ভ।

৫. সহজাত ও মূল্যবোধগত উদ্দীপকসমূহ আর সামাজিক ও সর্বজনীন কল্যাণ ভাবনার মধ্যে একটি সামঞ্জস্যশীল ও সমতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।

পরিশেষে বাকের সদর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইসলামি সমাজ দর্শন এই সমুদয় বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী।[৭৭] তিনি মনে করেন, মানুষের সামাজিক প্রকৃতিকে কয়েকটি তাড়না বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করলে চলবে না। মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মূল রয়েছে আরও গভীরে- মানুষের সত্তার মধ্যে নিহিত। তাই মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। মানুষের মধ্যে রয়েছে সামাজিক আবেগ যার লক্ষ্য হল 'ব্যাপকতর মেলামেশা এবং পরস্পরের ডাকে সাড়া দেবার ইচ্ছা'। এই আবেগবশত মানুষই নিজের সঙ্কীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা উত্তীর্ণ হয়ে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। এ কেবলমাত্র অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করার মনোভাবই নয়। এ হল অপরের স্বীকৃতি পাওয়ার এবং অপরকে স্বীকার করে নেওয়ার, অপরকে ডাকার এবং অপরের ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রবণতা। সুতরাং বলা যেতে পারে, সামাজিকতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একই মনুষ্য প্রকৃতির দুটি ভিন্ন দিক।

[৭৭]. বাকের সদর, dvjmvdvZbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

wØZxq Aa¨vq

GKZev‘x mgvRKvVv‡gv Ges HwZnvwmK weeZbavi v

wØZxq Aa¨vq

GKZev‘x mgvRKvVv‡gv Ges HwZnvwmK weeZbavi

সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদরের সামাজিক দর্শন গড়ে উঠেছে তাঁর একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষার উপর ভিত্তি করে। যদি এ কথা সঠিক হয়ে থাকে যে প্রত্যেক ব্যক্তি সেভাবেই কর্ম করে যেভাবে সে বিশ্বকে দেখে অর্থাৎ বিশ্বজগত সম্পর্কে যে ধারণা আমাদের মস্তিষ্কে চিত্রিত হয়েছে, তা আমাদের কর্ম, বিশ্বাস এবং সামাজিক আচরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে...তাহলে তখন দার্শনিকদের সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তা-দর্শনও বিশ্বের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ধরন অনুযায়ী গড়ে উঠবে- এটাই স্বভাবিক। সার্ত-এর ভাষায় 'প্রত্যেকে সেভাবেই বাঁচে যেভাবে সে বিশ্বকে চিনে।'[১]

একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষা অনুসারে বিশ্বজগত কতেক কালা উপাদান, শক্তি ও নিয়মের সমষ্টি নয়। বরং এ বিশ্বজগত হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিয়মানুবর্তী উপাদান, অংশ, নিয়ম ও শক্তিসমূহের সংস্থা, যার অর্থবহ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। তদানুসারে 'মানুষ'ও এ সংস্থায় একটি অর্থপূর্ণ, উদ্দেশ্যসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল অস্তিত্বসত্তা হিসাবে মূর্ত হয়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে একত্ববাদ এক দ্বি-মাত্রিক রূপ লাভ করে। এর একটি মাত্রায় থাকে 'বিশ্বপ্রতিপালকত্ব' আর অপর মাত্রায় থাকে 'দাসত্ব'। অর্থাৎ একত্ববাদ হচ্ছে বিশ্বপ্রতিপালক এবং বিশ্বচরাচরের মাঝে এক ব্যাপকভিত্তিক ও অত্যাবশ্যকীয় সম্পর্ক।

সুতরাং বিশ্বজগত, যা খোদায়ী জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হতে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং প্রতিপালকত্ব ও দাসত্বের সম্পর্কের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা কোনক্রমেই অহেতুক ও অকারণ হতে পারে না। বরং স্রষ্টার চিরায়ত পরিচালনা ও পরিকল্পনার অধীনে চলে। আর মানুষও বিশ্বজগতের একটি অংশ, বরং শ্রেষ্ঠতম অংশ হিসাবে কোন অযথা ও উদ্দেশ্যহীন অস্তিত্বসত্তা নয়।[২]

অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্যসম্পন্ন বিশ্বজগত নিয়ম ও বিধানাবলি দ্বারা পরিচালিত হয় যা খোদায়ী নিয়ম (সুন্নাতে ইলাহী) হিসাবে পরিগণিত। এর ভিত্তিতে দেখা যায় বাকের সদরের সমাজ দর্শনে দ্বিতীয় মূলস্তম্ভটি হচ্ছে 'খোদায়ী নিয়ম' বিদ্যমান থাকার বিশ্বাস, যা বিশ্বজগতের উপর কর্তৃত্বশীল।

তদ্রূপ আল্লাহ্ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেকের অধিকারী করে মানুষকে স্বকীয় ও সহজাত শ্রেয়তা প্রদান করেছেন। মানুষের এ শ্রেয়তা তার মধ্যে বিদ্যমান থাকা বুদ্ধি, চিন্তা, উপলব্ধি ও চেতনা থেকে অর্জিত। এখানেই একত্ববাদের ব্যাপক ও গঠনমূলক ভূমিকা প্রকাশ পায়। আর তা হচ্ছে অস্তিত্বজগত সম্পর্কে সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উপহার। এ দৃষ্টিভঙ্গি যেমন সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী, তদ্রূপ গঠনমূলক এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা মানুষ ও সমাজের গতিপথ, লক্ষ্য এবং চলার দিককে সুনির্দিষ্ট করে দেয়। বাকের সদর বলেন :

> 'একত্ববাদের অবদান হচ্ছে, তা আমাদেরকে চিন্তাগত দৃষ্টি এবং সুস্পষ্ট আইডোলজি দান করে। একত্ববাদ মানুষের সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে একটি অনন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ অর্থাৎ মহাপবিত্র আল্লাহ্'র মধ্যে সমন্বিত করে দেয়।'[৩]

---

[১]. উৎ. হাসান রাহব্ধু, f‡Sn nv‡q BRwZgwq-wmqvmx‡q Bmjvg, তেহরান : ইন্তেশারাতে কালাম, ১৯৭৯, পৃ. ৯৮।

২.'তোমরা কি মনে করেছিলে যে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবির্তত হবে না?'-Avj KiAvb, আল-মুমিনুন : ১১৫।

[৩]. বাকের সদর, Avj-gv'ivmvZj KiAwbq¨v, বৈরুত : দারুত তাআরুফ লিল মাতবুআত, তা. নে. পৃ. ১৯৭।

অপরপক্ষে মানুষ তার নিজ জীবন পরিচালনায় আপন বিবেক, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি, নির্ণয় ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় স্বাধীনতার অধিকারী। মানুষের এ স্বাধীনতা তার বুদ্ধি ও বিবেকের মতই সত্তাগত ও সহজাত; অর্জিত বা আপতিক নয়। এ কারণে খোদায়ী নিয়মসমূহও যখন মানুষের ভাগ্য পরিণতির সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তা মানবীয় দিক লাভ করে। ফলে মানুষ কর্তৃক তা পর্যালোচনা, শনাক্তকরণ ও উদ্‌ঘাটনযোগ্য থাকে। কাজেই তার বুদ্ধি কিংবা স্বাধীনতার সাথে এর কোন বৈপরীত্য তথা বিরোধ ঘটে না।

1. ev‡Ki m‘‡ii GKZev‘x mgv‡Ri i/cKvVv‡gv

বাকের সদরের দৃষ্টিতে একত্ববাদী সমাজ ‘একত্ববাদ’ নামক এক মহাসূত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন :

> ‘ইসলামি বিশ্বাসের মূলস্তম্ভই হচ্ছে একত্ববাদ। ইসলাম এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষদেরকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছুর শাসনকে ভিত্তিহীন বলে মনে করে। বিশ্বজগতের উপর আল্লাহ্‌র শাসন ও মালিকানার প্রতি বিশ্বাসই মানুষের ভেতরকার ও বাইরের মুক্তির ভিত্ রচনা করে।’[৪]

বাকের সদরের একত্ববাদী ব্যাখ্যায় প্রাথমিকভাবে তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়। যথা :

১. অস্তিত্বজগতের উপর আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ শাসনকর্তৃত্ব।

২. বিশ্বজগতের উপর কর্তৃত্বশীল খোদায়ী নিয়মসমূহের ক্রিয়াশীলতা।

৩. মানুষের স্বাধীনতা ও নির্বাচন ক্ষমতা।

বাকের সদরের দৃষ্টিতে বিশ্বজগত ও মানুষের উপর আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব মূলত ও প্রকৃতই আল্লাহ্‌র অধিকার। আর আল্লাহ্ নিজের নিরঙ্কুশ শাসনকর্তৃত্ব এবং অস্তিত্বজগতের উপর ক্রিয়াশীল সৃষ্টিগত নিয়মনীতির ভিত্তিতে বুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষকে তার ভাগ্য পরিণতির উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। অর্থাৎ অন্য সকল সৃষ্টিচরাচরের তুলনায় মানবসৃষ্টির ভিত্তিকে এমনভাবে পরিকল্পনা করেছেন যাতে মানুষ নিজের সমাজকে পরিচালনা করার সক্ষমতা ও সামর্থ রাখে। আর মানুষের এই সহজাত সামর্থ তাকে এমন এক অধিকার এনে দেয় যাকে ‘অভিভাবকত্ব’র অধিকার বলা হয়। বাকের সদর আল্লাহ্‌প্রদত্ত মানুষের এ অধিকারকে ‘খিলাফাত’ (তথা প্রতিনিধিত্ব) রূপে বিশ্লেষণ করেছেন।

ÔmeRbxb cwZwbwaZÖ (الخلافة العامة) gZev‘

বাকের সদর এর মতে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য ‘সার্বভৌম শাসনকর্তৃত্ব’ অন্য যে কোন কিছুর পূর্বে, একটি ‘প্রাকৃতিক অধিকার’। মালিকানাভুক্ত জিনিসের প্রতি মালিকের অন্তর্জাত যে সম্পর্কযোগ, তা থেকেই এ অধিকার জন্ম নেয়। আর এটাই হল আল্লাহ্‌র প্রকৃত শাসনকর্তৃত্ব। আর মানুষের আধিপত্য হচ্ছে সেটা, যার ভিত্তিতে ব্যক্তি মানুষরা নিজেদের সামষ্টিক ভাগ্য পরিণতিকে গড়তে পারে। এই অধিকার প্রথমত আল্লাহ্‌র সার্বভৌম শাসনকর্তৃত্ব থেকে উদ্ভূত, যা প্রতিনিধিত্ব প্রবিধানের আওতায় মানুষের কাছে ন্যাস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এটা অপ্রকৃত, আপেক্ষিক এবং সীমাবদ্ধ।[৫]

---

৪. বাকের সদর, mivZ Avb BKwZmv‘ Avj gRZvgv Avj-Bmjwg, তেহরান : বেযারাত আল-ইরশাদ আল-ইসলামি, তা. নে., পৃ. ৯-১০।
৫. _________, wLjvdvZj Bbmvb Iqv kvnv‘vZj Aww¤qv, বৈরুত : দার আল-মাআরিফ আল-হিকামিয়্যাহ্, ২০১৪, পৃ. ৫০-৫৩।

তিনি মানুষের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সম্পর্কে বলেন, মানব জীবনের প্রথম পর্যায়ে (প্রাথমিক ঐক্যের যুগে) পৃথিবীতে মানুষের আধিপত্য মানুষের খিলাফাত (তথা প্রতিনিধিত্ব) রূপে ছিল। এর আরবি পরিভাষা হচ্ছে الإستخلاف (আল-ইস্তিখলাফ)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে (মানুষদের মতপার্থক্য ও বিভেদের যুগে) নবিগণের অভিভাবকত্বের পালা আসে। এ যুগে নবিগণের নিষ্পাপত্বের কারণে মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও তত্ত্বাবধান -উভয়ই একই রেখায় সুসঙ্গতি লাভ করে।

তৃতীয় পর্যায়ে পবিত্র ইমামগণের মাধ্যমে অভিভাবকত্ব অব্যাহত থাকে। আর চতুর্থ পর্যায়ে অন্তর্ধানকালীন যুগে পুনরায় 'মানুষের প্রতিনিধিত্ব' বাস্তব রূপ লাভ করে এবং সাধারণ জনমানুষ নিজের এবং সমাজের ভাগ্য পরিণতি পরিচালনা করে থাকে। তবে যেহেতু শাসনকর্তৃত্বের একটি দিক হচ্ছে ধর্মীয়, একারণে মানুষের শাসনকর্তৃত্বের পাশাপাশি মুজতাহিদ (তথা ফকীহ)-র তত্ত্বাবধান ও সাক্ষ্যের আবশ্যকতা দেখা দেয়। আর সবশেষে পঞ্চম পর্যায়ে পুনরায় ইমামগণের শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এ পর্যায়ে 'প্রতিনিধিত্ব' ও 'সাক্ষ্য' পুনরায় এক হয়ে যাবে।[৬]

বাকের সদর এ ধরনের শাসনকর্তৃত্বকে 'মানুষের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত বেলায়াত'[৭] বলে আখ্যায়িত করেন, যা সৃষ্টিতত্ত্বেরই অধিভুক্ত বিষয়। তিনি সামগ্রিকভাবে মানুষের প্রতিনিধিত্বের দুইটি দিক রয়েছে বলে মনে করেন। একটি হচ্ছে খোদায়ী দিক। আর অন্যটি হচ্ছে মনুষ্য দিক। খোদায়ী দিকে মানুষের প্রতিনিধিত্ব কিম্বা আমানতদারিত্ব হচ্ছে সৃষ্টিগত ও সহজাত প্রবৃত্তিগত।[৮] আর মনুষ্য দিকে সর্বজনীন আমানত (গ্রহণ), যা মানুষ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এটা তার অন্তর্জাত।

অতঃপর এ দুয়ের সমন্বয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> "... সুতরাং মানুষের উপর সর্বজনীন প্রতিনিধিত্ব جعل (তথা সৃজন) এবং عرضه (তথা পরিবেশন) এর সৃষ্টিতাত্ত্বিক দিক রয়েছে, অর্জিতও নয়, বিধানগতও নয়। যেহেতু মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিতভাবে এই শাসনকর্তৃত্ব বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ও শর্তাবলি বিদ্যমান রয়েছে, কাজেই সৃষ্টিগতভাবে এবং সহজাত প্রবৃত্তিগতভাবে (প্রাকৃতিক ও অন্তর্জাতভাবে) এর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজ স্কন্ধে তুলে নেয়। এই ভিত্তিতে মানুষের সর্বজনীন প্রতিনিধিত্ব মানবের দিক থেকে 'এক সর্বজনীন আমানত'।"[৯]

ÔcwZwbwaÕ wnmv‡e gvbl

বাকের সদর এই 'প্রতিনিধি তত্ত্ব'র ব্যাখ্যায় আরবি ভাষায় কয়েকটি পরিভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। 'প্রতিনিধিত্ব' কথাটির আরবি পরিভাষা হচ্ছে 'আল-খিলাফাহ্'। তিনি এ পরিভাষাকে আরও কয়েকটি শব্দের সাথে যুগল করে মোট পাঁচটি পরিভাষার উপর আলোকপাত করেছেন। যথা :

১. খিলাফাতুল ইনসান (خِلافَةُ الإنسان) : মানুষের প্রতিনিধিত্ব
২. আল-খিলাফাতু আল-আম্মাহ্ (الخِلافَةُ العامّة) : সর্বজনীন প্রতিনিধিত্ব
৩. আল-ইস্তিখলাফ (الإستخلاف) : প্রতিনিধিত্ব প্রদান

---

[৬]. দ্র., Avj Bmjvg BqvK' Avj nvqvZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।
[৭]. ولايت (বেলায়াত) আরবি শব্দ। এর অর্থ অভিভাবকত্ব, কর্তৃত্ব ইত্যাদি।
[৮]. এখানে মূলত এ আয়াতটির প্রতি ইশারা করা হয়েছে-Ôwbðq Avwg AvKvk, cw_ex I ceZgvjvi cwZ G AvgvbZ AcY Ki‡Z †P‡qwQjvg| Iiv f‡q enb Ki‡Z A¯xKvi Kij, wKš gvbl Zv enb Kij| gvbl †Zv wb‡Ri cwZ AwZkq AwePvix Ges †m AwZkq AÁ|Õ- Avj-KiAvb, আহ্যাব : ৭২।
[৯]. বাকের সদর, Avj Bmjvg BqvK' Avj nvqvZ, তেহরানঃ ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক সার্ভিসেস্, তা. নে. পৃ. ১৩৪।

৪. আল- ইস্তি'মাম (الإستئمام) : নেতৃত্ব প্রদান

৫. আল-ইস্তি'মান (الإستئمان) : আমানত প্রদান

বিখ্যাত আরবি ভাষাতাত্ত্বিক রাগেব ইস্পাহানি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ Avj-gdiv'vZ Avj-KiAvb গ্রন্থে 'আল-খিলাফাহ্' পরিভাষাটির আভিধানিক অর্থ করেছেন এভাবে:

> 'খিলাফাহ্ হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব, কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিজনিত কিংবা মৃত্যুজনিত কিংবা অপারগতাজনিত অথবা প্রতিনিধির মর্যাদা বৃদ্ধিজনিত কারণে। আর এই শেষোক্ত কারণের ভিত্তিতেই আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ বন্ধুদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।'[১০]

বাকের সদর এখানে মানুষের প্রতিনিধিত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন :

> 'মহান আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধিত্ব দ্বারা মর্যাদা প্রদান করেছেন। ফলে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি - এ বিবেচনায় জগতের অপরাপর সৃষ্টি চরাচর হতে সে স্বতন্ত্র।'[১১]

cwi fvlvÎ‡qi we‡kølY

(K) Avj-Bw¯ÍLjvd (الإستخلاف):

বাকের সদর ইস্তিখ্লাফ কথাটিকে 'প্রতিনিধি নিযুক্ত করা' অর্থে গ্রহণ করেছেন। ইস্তিখ্লাফ এর মধ্যে তিনটি সম্পর্ক উদ্দেশ্য। যথা :

ক. মানুষের নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক (ব্যক্তি)।

খ. এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের সম্পর্ক (সমাজ)।

গ. মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক (জগত)।

এ ত্রিমুখী সম্পর্কের বন্ধনকে নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে বিন্যাস করা যায় এরূপে :

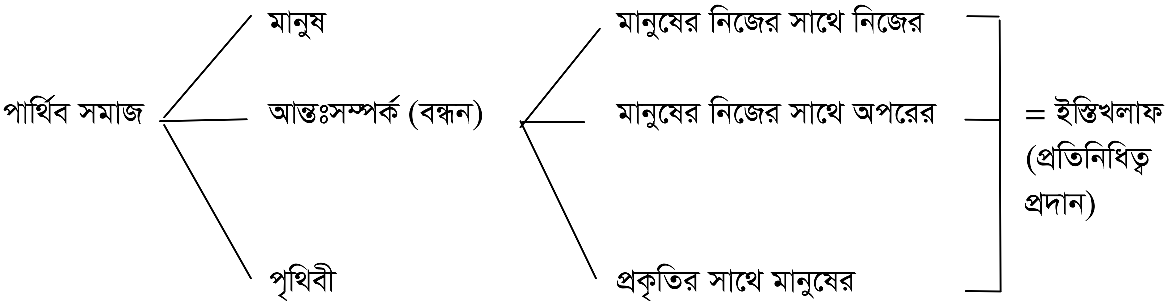

এই আন্তঃসম্পর্ক এটাই প্রতিপন্ন করে যে মানুষের তিন দিকের ভাগ্যপরিণতির ব্যাপারে তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে। যথা :

(১) তার নিজের ভাগ্য পরিণতি

(২) সমাজের ভাগ্য পরিণতি এবং

(৩) প্রকৃতির ভাগ্য পরিণতি।

---

[১০]. রাগেব ইস্পাহানী, Avj-gdiv'vZ wd Mwie Avj-KiAvb, তেহরান : নাশর আল-কিতাব, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৫, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

[১১]. বাকের সদর, wLjvdvZj Bbmvb Iqv kvnv'vZj Awš¤qv, তেহরান : জিহাদুল বানা, ১৯৭৮, পৃ. ৮।

মানুষ এ তিনটি ব্যাপারে আমানতদার। তাছাড়া যদিও ইস্তিখ্লাফ হচ্ছে একটি সামাজিক আন্তঃবন্ধন, কিন্তু এর এক প্রান্ত এই সমাজের বাইরে অবস্থিত। কেননা, এই যে সমাজ উৎপত্তি লাভ করেছে, এ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছে এর বহির্ভূত কোন এক নিয়ামক। আর সেটাই হচ্ছে এই সামাজিক আন্তঃবন্ধনের মূল ভিত্তি। অতএব চুড়ান্তভাবে দেখা যাচ্ছে যে, এই আন্তঃবন্ধন গড়ে উঠেছে চারটি প্রান্ত বা দিক দ্বারা। এ চারটি দিকের মধ্যে বাইরের প্রান্তটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইস্তিখ্লাফের ভিত্তিই হল সেটা। স্বভাবতঃই ইস্তিখ্লাফের বন্ধন এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে তা বাইরের এ স্তম্ভটিকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। বাকের সদর ইস্তিখ্লাফের স্তম্ভ চতুষ্টয়ের বর্ণনা দেওয়ার পর লিখেন :

> ‘মানুষের জীবনের সাথে তার আচরণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা হচ্ছে ‘প্রতিনিধিত্ব’ এবং ‘নেতৃত্ব’-এর ভূমিকা। অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন এবং তাকে নেতৃত্বের পদে আসীন করেছেন। এ পার্থিব সমাজে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক মণিব ও ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। বরং এ সম্পর্ক হচ্ছে একজন আমানতদার ব্যক্তির সাথে তার নিকট সংরক্ষিত আমানতী বস্তুর সম্পর্কের অনুরূপ। আর সমাজের যে কোন অঙ্গনে এক মানুষের সাথে অপর মানুষের সম্পর্ক খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনার্থে দুইজন সহকর্মীর সম্পর্কের ন্যায়। এ সম্পর্ক কোন শাসক ও শাসিতের, কিংবা মণিব ও ভৃত্যের অথবা উপাস্য ও উপাসনাকারীর সম্পর্কের মত নয়।’[১২]

বাকের সদরের তত্ত্ব মোতাবিক ইস্তিখ্লাফের উপাদান বা স্তম্ভগুলো হচ্ছে :

১. প্রতিনিধি নিযুক্তকারী : (مُستَخلِف - মুস্তাখ্লিফ) - স্বয়ং আল্লাহ

২. নিযুক্ত হওয়া প্রতিনিধি : (-مُستَخلَف মুস্তাখ্লাফ) - মানুষ

৩. যার ব্যাপারে প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছে: (مُستَخلَف عليه - মুস্তাখ্লাফ আলাইহী)- মানুষ, সমাজ এবং পৃথিবী।

ইস্তিখলাফের এ চতুর্মাত্রিক আন্তঃসম্পর্ককে মপলফঃ পিরামিড সদৃশ ডায়াগ্রামের মাধ্যমেও চিত্রায়িত করা যায় :

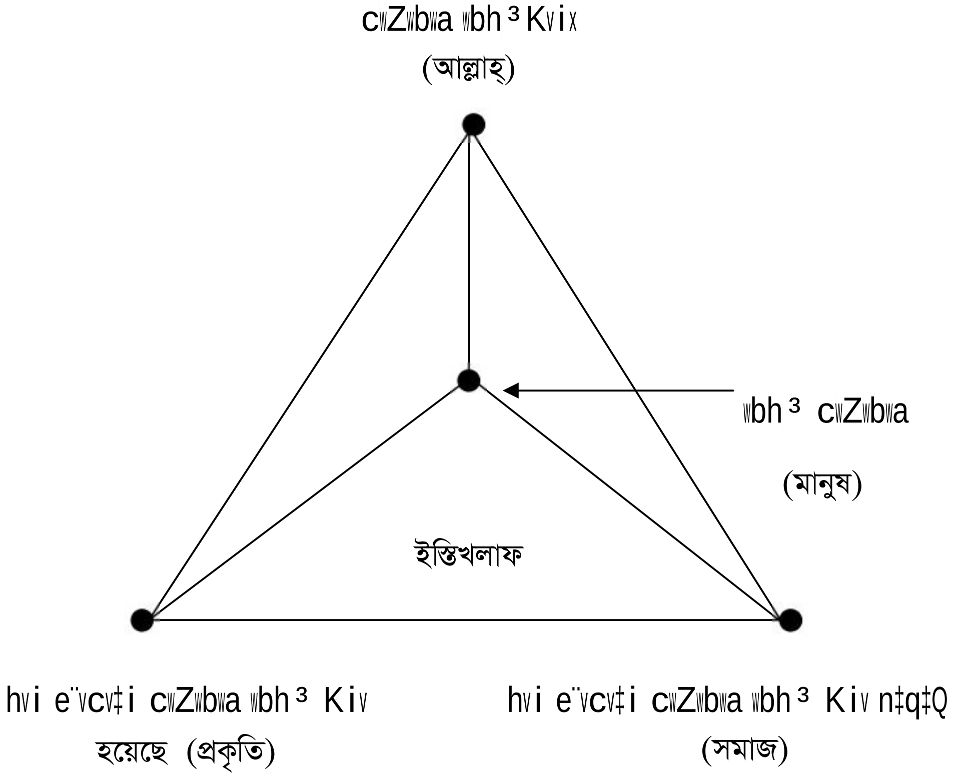

---

[১২]. cv¸³, পৃ. ১২৯।

বাকের সদর দাবি করেন[১৩], যদি এ সামাজিক সম্পর্কের পিরামিড থেকে আল্লাহ্ কে সরিয়ে ফেলা হয় তাহলে গোটা পিরামিডই ধ্বসে পড়বে। তখন আন্তঃসম্পর্কের সমীকরণ সম্পূর্ণভাবে ওলোট পালট হয়ে যাবে এবং সামাজিক জীবনের কাঠামো অন্য রূপ পরিগ্রহ করবে। ফলে সমাজে শাসনকর্তৃত্ব ও মালিকানার বিষয়গুলো বিচিত্র চেহারায় আবির্ভূত হবে যার বিভিন্ন প্রকারের নমুনা ইতিহাসের পাতায় পাতায় চোখে পড়ে, যুগে যুগে মানব সমাজ যেগুলো দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

সুতরাং যে জিনিসটি সামাজিক সম্পর্কের সারবস্তুকে আমূল পরিবর্তন করে ফেলে, সেটা হল সমাজের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে 'প্রতিনিধি নিযুক্তকারী'র উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি। বাকের সদর বলেন :

> 'মানব সমাজ অন্য যে কোন ধরনের সম্পর্ক বা বন্ধনের পূর্বে একটি কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর তা হচ্ছে তাঁর প্রতিনিধিত্বের কেন্দ্র অর্থাৎ আল্লাহ্, যিনি তাকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।'[১৪]

(L) Avj-Bw¯Íôgvg (الاستئمام)

'ইস্তি'মাম কথাটির অর্থ হচ্ছে ইমাম নিযুক্ত করা। বাকের সদরের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে ইমাম (তথা নেতা)-এর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এটা আসলে মানুষের প্রতিনিধিত্বেরই আরেকটি পরিভাষা। ঐশী দিক (অর্থাৎ নিযুক্তকারীর দিক) থেকে বিবেচনা করলে একে বলা হবে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা (ইস্তিখ্লাফ)। আর পার্থিব দিক (অর্থাৎ মানুষের দিক) থেকে বিবেচনা করলে একে বলা হবে নেতা ও নেতৃত্ব (ইস্তি'মাম)। অর্থাৎ মানুষ একদিকে যেমন পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি, অপরদিকে তদ্রূপ ইমাম হিসাবে নেতা এবং শাসকও বটে। 'ইমাম' কথাটির তাৎপর্য সৃষ্টিতাত্ত্বিক; বিধানগত নয়। অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টিগত সহজাত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিই এর ভিত্তি এবং মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলি (তথা বুদ্ধি ও স্বাধীনতা)-র অধিকারী। আর একারণেই এর অর্থ সাধারণ ও সর্বজনীন; বিশেষ নয়।

(M) Avj-Bw¯Íôgvb (الاستئمان)

বাকের সদরের ব্যাখ্যা মোতাবিক ইস্তি'মান কথাটির অর্থ হল 'আমানত হস্তার্পণ' করা। বিশ্বস্তের কাছে আমানত তুলে দেওয়া। আমানত গ্রহণ করা হচ্ছে একটি 'সৃষ্টিগত গ্রহণ' (রাজি হওয়া) এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি খোদায়ী রীতি, যা সম্পন্ন হয়েছে। মানুষের পক্ষ থেকে এই আমানতকে গ্রহণ করার মাধ্যমে 'সৃষ্টিগত গ্রহণ' সংঘটিত হয়েছে এবং 'ঐতিহাসিক রীতি'-এর উপর প্রযোজ্য হয়েছে।[১৫]

ফলে পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্ব (ইস্তিখ্লাফ) এবং নেতৃত্ব (ইস্তি'মাম) হচ্ছে সমাজের সাথে মানুষের একটি আমানতের সম্পর্ক, আমানতদারের সাথে আমানতি জিনিসের এক সম্পর্ক। এটা হচ্ছে সেই আমানত, যা গ্রহণ করতে আকাশ, পর্বত ও মাটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে।[১৬]

---

[১৩]. cv¸³, পৃ. ১৩০।

[১৪]. _________ , Avj-Bmjvg BqvK' Avj-nvqvr, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

[১৫]. _________, Avj-gv'ivmvZj KiAvwbq¨v, বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল মাতবুয়াত, ১৯৮৯, পৃ. ১৩৩।

[১৬]. দ্র.'নিশ্চয় আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল। মানুষ তো নিজের প্রতি অতিশয় অবিচারী এবং সে অতিশয় অজ্ঞ।' Avj-KiAvb, আহ্যাব : ৭২

বাকের সদর মনে করেন, প্রতিনিধি নিযুক্তির কাজটি আল্লাহ্‌র। আর আমানতদারীর কাজটি মানুষের। সুতরাং 'খিলাফত' ও 'ইমামত' অর্পণ করা হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। কিন্তু তা গ্রহণের ঘটনা ঘটে মানুষের পক্ষ থেকে, আমানতস্বরূপ।[১৭] আর এ হস্তার্পণ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক-সামাজিক কিম্বা ঐতিহাসিক রীতি; বিধানগত বিষয় নয়।[১৮]

বাকের সদর অতঃপর 'ইস্তিখ্‌লাফ' সম্পর্কে এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেন যে, ইস্তিখ্‌লাফ এর বিষয়টি কি শুধুমাত্র ব্যক্তি আদম (আ.)-এর জন্য স্বতন্ত্র? নাকি একটি সর্বজনীন বিষয় এবং গোটা মানবজাতি এর মধ্যে শামিল? এর উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সাথে ফেরেশতাকূলের কথোপকথন থেকে প্রতিপন্ন হয় যে বিষয়টি শুধুমাত্র আদম (আ.)-এর জন্যই স্বতন্ত্র নয়। বরং ফেরেশেতাদের আপত্তির ধরণ থেকে বুঝা যায় যে এটা একটা চলমান এবং চিরায়ত ব্যাপার; যা বিশ্বের ইতিহাসে একটি নিয়ম (সুন্নাত) হিসাবে উত্থাপিত হয়। অতএব এ ফলাফলে উপণীত হওয়া যায় যে, 'ইস্তিখ্‌লাফ' একটি সাধারণ ও সর্বজনীন বিষয় (অর্থাৎ গোটা মানব জাতির জন্য প্রযোজ্য)। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিগত ইস্তিখ্‌লাফ মানুষের পূর্ণতার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই নির্ধারণকৃত।[১৯]

তিনি এ মতবাদকে মানবের সহজাত প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, স্বাধীনতা, স্বাধীন নির্বাচনক্ষমতা, ইচ্ছা, প্রত্যয় এবং একত্ববাদ ও শুরা-পরামর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেন।[২০]

বাকের সদর মানুষের প্রতিনিধিত্ব তত্ত্বের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরেছেন এরূপে-

ক. খোদায়ী গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং অন্তহীন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বজায় থাকা।[২১]

খ. আল্লাহ্‌তে না পৌঁছুনো পর্যন্ত মানুষের অব্যাহত পূর্ণতার যাত্রা চলমান থাকা।[২২]

গ. রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি, রাষ্ট্র ও সরকার গঠন।[২৩]

ঘ. মানুষের স্বাধীনতা থাকা এবং পরাধীনতা থেকে পলায়ন।[২৪]

ঙ. সাধারণতা ও সর্বজনীনতা (অর্থাৎ বিশেষ কোন ব্যক্তি বা শ্রেণির সাথে সম্পৃক্ত নয়)।[২৫]

চ. খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে সমান ও সমতা। অর্থাৎ প্রত্যেকেই এ আমানত বহন করার অধিকার রাখে এবং এর দায়িত্ব বহন করে। আর আইনের সামনে সবাই সমান।[২৬]

পাশাপাশি প্রতিনিধিত্ব'র সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটিরও তিনটি বার্তা রয়েছে। যথা :

১. সমাজে অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব।

২. আমানতদারী এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন।

---

১৭. cÖv¸³, পৃ. ১৩২।

১৮. cÖv¸³|

১৯. এ মর্মে Avj-KiAv‡bi সূরা নম্‌ল : ৬২, সূরা আ'রাফ : ৬৯ এবং সূরা আনআম এর ১৬৫ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

২০. বাকের সদর, wLjvdvZj Bbmvb Iqv kvnv'vZj Awš¤qv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২১. cÖv¸³, পৃ. ১৭-১৮।

২২. ________, gv'ivmvZj KiAwbq¨v, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

২৩. ________, Zvdmxi Avj-gI'qx wjj KiAvb, কুয়েত : আল-দার আল-ইসলামিয়্যা, ১৯৮২, পৃ. ২২৯।

২৪. ________, wLjvdvZj Bbmvb Iqv kvnv'vZj Awš¤qv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১২।

২৫. ________, mivZb Avb Avj-BKwZmv' Avj-Bmjwgq¨v, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২৬. ________, jgnvZ wdKwnq¨v Avb gvkiæwq 'v¯—i Avj-Rgûwiq¨vZ Avj-Bmjwgq¨vZ wd Bivb, নাজাফ : প্র. নে. ১৩৯৯ হি. পৃ. ১৪।

৩. সমাজে তত্ত্বাবধান, সাক্ষ্য ও অংশগ্রহণ।[২৭]

এ তিনটির প্রত্যেকটি কাজই মানুষের বুদ্ধি ও স্বাধীনতা থেকে উৎসারিত। বাকের সদরের এরূপ একত্ববাদনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিকে নিম্নোক্ত প্রয়োজনসমূহের মধ্যে সংক্ষেপিত করে তুলে ধরা যায় :

GKZev' Ges gvb‡li gva¨‡g Avjøvni cwZwbwaZ

একত্ববাদী সমাজের অস্তিত্বগত পরিচয়ের ভিত্তি হচ্ছে 'তাওহীদ' তথা একত্ববাদ। যদি আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ক এ সমাজ থেকে তিরোহিত হয়ে যায় তাহলে এ সমাজের পরিচয়ও বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সামাজিক সম্পর্কসমূহ ওলোট-পালট হয়ে যায়।

GKZev' I wecøe

বাকের সদরের দৃষ্টিতে বিপ্লব জন্ম নেয় একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস থেকে। একজন বিপ্লবী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নবিগণের বিপ্লব শুরুতে একত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎপত্তি লাভ করে থাকে। অতঃপর সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ ও অত্যাচার থেকে আত্মিক পরিশুদ্ধি আসে। এ বিপ্লবী মানুষ কখনই একজন সর্বাত্মক আদর্শে পরিণত হতে পারে না, যদি না সর্বপ্রকার স্বার্থকামিতা ও শোষণের মানসিকতা তার স্বভাব থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে।

GKZev' I ivó

বাকের সদরের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি নবুওয়াতী প্রপঞ্চ, যা জনমানুষের সহজাত প্রবৃত্তির বিজয়ী হওয়ার পর্যায় পার হয়ে যাওয়ার পর উদ্ভব লাভ করে। মানবের চাহিদাসমূহের প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি ঘটার সাথে সাথে সমাজের শক্তিশালী ও দুর্বলদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিটি সমাজে বিভেদ দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতা ও বিখণ্ডতা রোধ করার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নবিগণ এ রাষ্ট্রের বুনিয়াদকে খোদায়ী শিক্ষার ভিত্তিতে গোড়াপত্তন করেছেন।

GKZev' I ¯vaxbZv

ইসলামে স্বাধীনতার ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস (ঈমান) ও একত্ববাদ (তাওহীদ)। কেননা, আল্লাহ্‌কে একনিষ্ঠভাবে উপাসনা করা থেকেই স্বাধীনতার সূত্রপাত হয় এবং শেষ পরিণতিতে যে কোন দাসত্ব ও শৃঙ্খলা থেকে মানবের মুক্তি অর্জিত হয় এবং সে স্বাধীনতায় পৌঁছায়। বাকের সদর এ মর্মে বলেন :

> 'কiAvb একত্ববাদের পথ ধরে মানুষকে আল্লাহ্ ভিন্ন অপর সব কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে এবং ঊর্ধ্বলোকের সাথে যোগবন্ধন স্থাপন করতে পেরেছে। একত্ববাদ হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত শিখরের সনদ এবং সকল পরিসরে মানবের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র'[২৮]

---

[২৭]. ________ , wLjvdvZj Bbmvb I qv kvnv'vZj Awm¤qv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।
[২৮]. cv¸³|

GKZev' I ceÙ×

বাকের সদর বিশ্বাস করতেন যে পাশ্চাত্যের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ পশ্চিমাদের কর্মপন্থার শুদ্ধতার কারণে নয়, বরং এসব প্রকল্পের সাথে ইউরোপীয়দের প্রীতি ও সহযোগিতার কারণে। তাই আমাদের উচিত এমন কোন বিকল্প কর্মপন্থা নির্বাচন করা যা মানবের ও বিশ্বজগতের প্রতি আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। মুসলিম জাতির কাছে ইসলাম হচ্ছে প্রবৃদ্ধি ও বিকাশলাভের পথে অভিযাত্রার সূচনাবিন্দু।

GKZev' I mvgvwRK b¨vqwePvi

ন্যায়পরতা হল একত্ববাদ নামক বৃক্ষের একটি প্রশাখা। কারণ ন্যায়পরতা হচ্ছে আল্লাহ্‌র অন্যতম একটি গুণ; যেমনভাবে জ্ঞান, পরক্রমশীলতা এবং ইচ্ছাও আল্লাহ্‌র একেকটি গুণ। ইসলামে একত্ববাদ, ন্যায়পরতা, নবুওয়াত, কিয়ামত ইত্যাদি স্তম্ভসমূহের ধারাক্রমের মধ্যে সামাজিক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে এবং মানুষের জীবনের সাথে তা বিশেষ সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ।

সামাজিক বিবেচনায় একত্ববাদের তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহ্‌কে বিশ্বজগতের একক অধিপতি মান্য করা। ন্যায়পরতার তাৎপর্য হচ্ছে বিশ্বজাহানের এই একক অধিপতি, স্বীয় ন্যায়নীতি পরায়নতার সুবাদে একজন মানুষকে অপর একজন মানুষের উপরে কিংবা একটি জাতিকে অপর একটি জাতির উপরে শ্রেয় গণ্য করেন না। বরং সর্বদা যোগ্যবান দলকেই তাঁর প্রদত্ত সমস্ত নেয়ামতরাজির উপর কর্তৃত্ববান করে থাকেন।[২৯]

GKZev' I BwZnv‡mi MwZc_

বাকের সদরের উপস্থাপিত বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হয় যে, মানুষের অভ্যন্তরের সারসত্তাই ইতিহাসের গতিপথকে নির্মাণ করে থাকে। বাকের সদর এ দৃষ্টিভঙ্গিকে কুরআনের বাণীস্পন্দন থেকে নিঃসৃত করেছেন। প্রত্যেক সমাজের উন্নতি ও পরিবর্তন খোদ্ উক্ত জাতির অভ্যন্তরের পরিবর্তনের উপর এবং স্বয়ং মানুষের মন ও আত্মার পরিবর্তন সাধনের উপর নির্ভরশীল। অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মূল পাদপীঠ হচ্ছে 'আদর্শ'। আর এ উত্তম আদর্শই অভ্যন্তরের পুনর্গঠনের সূচনাবিন্দু হিসাবে পরিগণিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

2. Bw¯ÍLjvd (cÖwZwbwaZ) n‡"Q mgv‡Ri PZ_© gvÎv

বাকের সদর সমাজের স্তম্ভ তথা উপাদানসমূহের সম্পর্ককে ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক সম্পর্ক রূপে পৃথক করে দেখিয়েছেন। ত্রিমাত্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ, প্রকৃতি ও মানুষের স্বজাতি ভাইয়ের সাথে সম্পর্কের কথা আসে। তবে কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে আরও একটি সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, যদিও সেটা অবস্থিত সমাজের বাইরে এবং অন্যগুলোর তুলনায় তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে সম্পর্কটা হচ্ছে ইস্তিখলাফ তথা প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক।

কাজেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে 'মুস্তাখলিফ' তথা প্রতিনিধি নিযুক্তকারী হিসাবে। আর নিযুক্ত প্রতিনিধি হচ্ছে মানুষ ও তার স্বজাতিভুক্ত ভাইয়েরা। সুতরাং সমগ্র মানুষই নিযুক্ত প্রতিনিধি। ঐ কথার ভিত্তিতে এ বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মণিব বা কর্তা নেই। আর মানুষ হচ্ছে তাঁর প্রতিনিধি ও বিশ্বস্ত আমানতদার।

---

[২৯]. দ্র. __________ , Avj-Bmjvg BqvK' Avj-nvqvZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

এ চতুর্থ মাত্রাটি সমাজের কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন সূচিত করে। এরই ভিত্তিতে উক্ত চতুর্থ মাত্রার প্রভাবে দুজন মানুষের সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তাদের দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক আমানত রক্ষায় অংশীদারিত্বের সম্পর্কের রূপ পরিগ্রহ করে।[৩০] এ ভিত্তিতে বাকের সদরের দৃষ্টিতে একত্ববাদী সমাজগুলোতে চতুর্মাত্রিক সম্পর্কবিশিষ্ট সমাজকাঠামো আর নাস্তিক্যবাদী সমাজগুলোতে ত্রিমাত্রিক সম্পর্কবিশিষ্ট সমাজকাঠামো নিরূপণ করা যায়।

বাকের সদরের শীর্ষস্থানীয় শিষ্য সাইয়্যেদ বাকের আল-হাকিম এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তর পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন। সেখানে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বস্তুত সকল সমাজেই এ চতুর্থ মাত্রাটি বিদ্যমান রয়েছে। পার্থক্য শুধু এটুকু যে নাস্তিক্যবাদী সমাজগুলোতে এ চতুর্থ মাত্রাটি 'শয়তান' কর্তৃক পরিচালিত ও নির্দেশিত হয়। কেননা,

> 'আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, বিভ্রান্তকারীরা তাদের অভিভাবক। এরা তাদের আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। ওরাই দোযখের অধিবাসী, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।'[৩১]

তিনি বলেন, মানুষ দু'ধরনের কিম্বা দুই রূপের সম্পর্কের মধ্যে অবস্থান করে। একপ্রকার হচ্ছে ইস্তিখলাফ তথা প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক। যার মর্মকথা হল খোদায়ী ও সত্য হওয়া। স্বয়ং আল্লাহ্ই হচ্ছেন যার চতুর্থ মাত্রা। যিনি মানুষকে প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত ও প্রেরণ করেছেন।

আর অপর প্রকার হচ্ছে কামনা-বাসনা ও সীমা লঙ্ঘনের সম্পর্ক। এটাই হচ্ছে সেই সম্পর্ক যার চতুর্থ মাত্রাটি হচ্ছে শয়তান এবং যা কামনা-বাসনা, বিপথগামিতা আর অবাধ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টিগত সম্পর্কের মূলনীতির ভিত্তি মোতাবিক একদিকে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক আর অপরদিকে মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর যে সমাজব্যবস্থা এ সম্পর্কের রূপ ও ধরনকে নির্ধারণ করে এবং মনুষ্য সমাজসমূহ সমাজের ভৌতিক উপাদানসমূহের দিক থেকে একে অপরের সাথে কোন পার্থক্য করে না, সেটা হচ্ছে সমাজের চতুর্থ মাত্রাটি অর্থাৎ আল্লাহ্।[৩২]

বাকের সদরের মতে, প্রতিনিধিত্বের মধ্যে দুইটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ-

এক. দায়িত্বশীলতা তথা জবাবদিহিতা এবং

দুই. আমানত রক্ষা।[৩৩]

দায়িত্ব স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়। কারণ স্বাধীনতা ব্যতীত দায়িত্ব অর্থহীন। কুরআনের ভাষায়-

> 'আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ হবে।'[৩৪]

---

৩০. দ্র.সাইয়্যেদ মুনজির আল-হাকীম, gRZvgvDbv wd wdKix ZiwQ Avj-knx' ewKi Avj-m'i,বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল মাতবুয়াত, ২০১২, পৃ. ১৮৯-১৮৯।

৩১. Avj-KiAvb, বাকারা : ২৫৭।

৩২. দ্র. সাইয়্যেদ বাকের আল-হাকিম, Rv‡g wkbwQ Avh w''Mv‡n †KviAvb, ফা. অনু. মুসা দানিশ, মাশহাদ : ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ১৩৭৮ সৌ. সন, পৃ. ১০৭-১০৮।

৩৩. দ্র.বাকের সদর, Avj-Bmjvg BqvK' Avj-nvqvZ, কোম : ইন্তেশারাতে দারু আল-সাদর, ১৪২৯ হি. পৃ. ৬১।

৩৪. Avj-KiAvb, দাহর : ৩।

৩. gvbe mgv‡Ri HwZnwmK wee©Zbaviv

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় পৃথিবীর বুকে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায় প্রায় ৪০০ কোটি বছর পূর্বে। আবার এ পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণী, যা অবশিষ্ট রয়েছে তার ইতিহাসও প্রত্যাবর্তন করে প্রায় ১০০ কোটি বছর পূর্বে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর ইতিহাস প্রত্যাবর্তন করে প্রায় ৫০ কোটি বছর পূর্বে। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে মানব জাতির অস্তিত্ব অনধিক ত্রিশ লক্ষ বছর আগে ধরা হয়, যা অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। অন্যকথায় বলা যায়, মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ। অথচ জীববিজ্ঞানীরা গর্ভজাত স্তন্যপায়ী প্রাণীকূলের পূর্ব-ইতিহাস, যার মধ্যে মানুষ অন্যতম, কমপক্ষে ৭ কোটি বছর বলে নিরূপণ করেছেন। বিশেষজ্ঞগণের অনুমান, আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে জন্ম নেওয়া সর্বমোট মানুষের সংখ্যা প্রায় ৯০০০ কোটি জন হবে। যা প্রায় ৩ লক্ষ প্রজন্ম পরম্পরায় অব্যাহত থেকেছে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদের আলোকে পৃথিবীর বুকে প্রথম মানবের উৎপত্তি প্রায় ৪০ লক্ষ বছর পূর্বে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। মানুষের পরিচিতি তথা সংজ্ঞা কি- এ নিয়েও নানা মত রয়েছে। তবে বর্তমানে এ সংক্রান্ত দুটি সংজ্ঞাই বৈজ্ঞানিক ও সূক্ষ্মতার মাপকাঠিতে অধিকতর আলোচিত :

প্রথম সংজ্ঞাটিতে জীববিজ্ঞানের একটি দৃষ্টিভঙ্গিকেই বিবেচনায় রাখা হয় এবং মানবের দৈহিক সূচকগুলোকেই সংজ্ঞায়নের মূল অক্ষ ধরা হয়। অর্থাৎ মানুষ হচ্ছে ২৩ জোড়া ক্রমোজম বিশিষ্ট একটি দ্বি-পদী স্তন্যপায়ী প্রাণী।

আর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি বেশি বেশি সমাজতাত্ত্বিক ও মানবিক বিজ্ঞানের পণ্ডিতদের মতামতকেই গুরুত্ব দেয় এবং দাবি করে যে, মানুষ হচ্ছে একটি সংস্কৃতিবান প্রাণী।

দ্বিতীয় সংজ্ঞাটির ভিত্তিতে মানুষের ইতিহাসকে বিশ থেকে পচিশ লক্ষ বছর বলে অনুমান করা যেতে পারে। কেননা, প্রাচীনতম যে সাংস্কৃতিক নিদর্শন উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে তা ঐ সময়কালেরই নিদর্শন বলে অনুমান করা হয়। মানবের সবচেয়ে প্রাচীনতম নিদর্শনাবলি যা হস্তগত হয়েছে, তা থেকে অনুধাবন করা যায় যে প্রাথমিক যুগের মানুষরা আজকের মানুষদের তুলনায় কিছুটা খাঁটো, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির মস্তিষ্কবিশিষ্ট, ৩২ টি দাঁত বিশিষ্ট শক্তিশালী দুটি দাঁতের পাটির অধিকারী ছিল। তবে দাঁতগুলো অনেকটা তৃণভোজী প্রাণীদের সদৃশ ছিল। আর তাদের হাতদুটি ছিল কিছুটা বেশি লম্বা। ১৯৭০ এবং ১৯৯০ এর দশকে আফ্রিকার ইথিওপিয়া থেকে আবিষ্কৃত জীবাশ্ম থেকে এসব নমুনা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এর উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ বছর পূর্বের এ মানুষরা প্রথম দু'পায়ে হাঁটতো, এদের হাত ও পা দুটি হুবহু আজকের মানুষদের মতোই ছিল। আর এদের উচ্চতা ছিল আনুমানিক ১.২ মিটার। এদের মস্তিষ্কের আকার ছিল বর্তমান মানুষদের এক-তৃতীয়াংশ (৫০০ ঘন সেন্টিমিটার প্রায়)। পূর্ব-আফ্রিকার বনাঞ্চলে ছিল এদের বাস। বর্তমান ইথিওপিয়া, কেনিয়া এবং তাঞ্জানিয়া ছিল ঐ বনভূমির অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর এই অঞ্চলে সবচাইতে প্রাচীন জীবাশ্ম হিসাবে এ কঙ্কাল আবিস্কার হওয়া, যাকে আজকের মানুষদের আদিপুরুষ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, এর ফলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে মানবের উৎপত্তি ঘটেছে পূর্ব-আফ্রিকায়। কিন্তু কোন সাংস্কৃতিক উপাদান বিদ্যমান না থাকায় এ জীবাশ্মগুলো মানুষের কি-না, এ প্রশ্ন থেকেই গেছে। ফলে এগুলো যে মানব কঙ্কাল সেটা জীববিজ্ঞানীদের কাছে সমর্থিত হয়েছে ঠিকই, তবে সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্বের বিচারে এগুলোকে মানব সদৃশ †nv‡gv n¨wewjm, †nv‡gv B‡i±vm এবং †nv‡gv m¨wc‡qÝ নামে অভিহিত করা হয়।

be¨c¯Íi hMxq wecøe

আনুমানিক ১৫ হাজার বছর পূর্বে মানব সমাজ নতুন আরেক গভীর সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় উপনীত হয়। এ অধ্যায়ে মানুষরা বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যীয় অঞ্চলে গৃহপালিত পশুপালনে সক্ষম হয়। অনুরূপভাবে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠার মাধ্যমে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তন করতে উদ্যোগ নেয় এবং 'উৎপাদন অর্থনীতি' নামক এক নতুন কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করে। প্রকৃতপক্ষে এ অধ্যায়ে পশুপালন ও কৃষিকাজ প্রথমবারের মত তাদের জীবনের সাথে মিশে যায় এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে মানুষের জীবনযাত্রার ধরন-পদ্ধতি বদলে দেয়। এর ফলশ্রুতিতে গ্রাম্য সমাজব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটে। এই বিবর্তনটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে বিজ্ঞানীরা এটাকে 'নব্যপ্রস্তর যুগীয় বিপ্লব' নামে আখ্যায়িত করে থাকেন।

gvbe mgv‡Ri weeZbavi v m¤ú‡K gbxlx‡`i AwfgZ

সামাজিক বিবর্তনধারা সংক্রান্ত মতবাদগুলোকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। তবে প্রসিদ্ধ পন্থায় মতবাদগুলোকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। একটি হল রৈখিক মতবাদ এবং দ্বিতীয়টি চক্রাকার মতবাদ।

রৈখিক মতবাদ বলতে উদ্দেশ্য, সমাজের বিবর্তন ধারাকে একটি সরল রেখা ধরে সামনের দিকে অগ্রসরমান বলে ব্যাখ্যা করা। যেখানে সমাজ একটি রেখা ধরে একবিন্দু থেকে অপরবিন্দুতে বিবর্তন লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীকৃত এক উন্নত বিন্দুতে উপনীত হয়। আর চক্রাকার মতবাদ বলতে বুঝায় সভ্যতা তার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং পূর্ণতার পর্যায় চক্রাকারে অতিক্রম করে পুনরায় পতনের মুখে পড়ে। অর্থাৎ এই বিবর্তন ধারা একটি চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে এবং এর মধ্যে এক ধরনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে। রৈখিক মতবাদসমূহের মধ্যে অগস্ত কোঁত এবং কার্ল মার্কস্-এর মতবাদই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ˆiwLK gZev`

AM¯Í †KvZ : অগস্ত কোঁত-এর রৈখিক মতবাদকে তাঁর ত্রয়স্তর সূত্র (Law of Three Stages)-এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ তিনটি স্তর হচ্ছে-,

১. ধর্মতাত্ত্বিক স্তর (the theological stage).
২. আধিবিদ্যক স্তর (the metaphysical stage) এবং
৩. প্রত্যক্ষবাদী স্তর (the positive stage).

এ সূত্র অনুযায়ী মানব চিন্তার বিবর্তনধারাকে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির স্তর থেকে আধিবিদ্যক স্তর এবং অবশেষে প্রত্যক্ষবাদী স্তরে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। আসলে কোঁত-এর ত্রয়স্তর সূত্রে মনপন্থী ও আদর্শবাদের দিকটাই প্রবল। তদ্‌সত্ত্বেও তিনি মানব প্রজাতির মনোবিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তরকে উক্ত পর্যায়ের বিশেষ এক প্রকারের সামাজিক সংস্থা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন অতিপ্রাকৃতিক স্তরটি উপাসনালয়ের যাজকদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং সামরিক শাসকরা সেখানে শাসন জারী করে থাকে। এ স্তরে মানুষের মন ঘটনাপ্রবাহ ও বিষয়সমূহকে প্রভূসমূহের ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, তারা সকল ঘটনাবলি ও বিবর্তনকে খোদাগণের ইচ্ছার দ্বারা ব্যাখ্যা করে থাকে।

আবার সামাজিক সংস্থার আধিবিদ্যক তথা দার্শনিক স্তরটি চার্চের কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বেশি বেশি মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যাবলির সাথে মিলে যায়। এ পর্যায়ে মানব মস্তিষ্ক প্রাকৃতিক ও মানব জীবনের ঘটনাপ্রবাহকে এমন সব শক্তির প্রতি সম্পৃক্ত করে থাকে যে তারা নিজেরা থাকে গুপ্ত, কিন্তু তাদের নির্দশনসমূহ প্রকাশ্য। অন্যভাবে বলা যায়, মানবের ঘটনা ও বিবর্তনসমূহের কারণ ব্যাখ্যায় নিজের বুদ্ধির শরণাপন্ন হয়। অগস্ত কোঁত-এর মতে, দার্শনিক কিংবা আধিবিদ্যক স্তরটির প্রথম স্তরের সাথে তেমন কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, এই স্তরে ধারণা ও অনুমানের স্থান দখল করে ফেলে বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণ। কিন্তু এখনও মানুষের চিন্তা নিরঙ্কুশ ও আধ্যাত্মিক সত্যের অন্বেষণ করে বেড়ায়, যেগুলো সে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না।

আর তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে প্রত্যক্ষবাদী স্তর, যা সবে শুরু হয়েছে। এ স্তরটি শিল্পপতিদের কর্তৃত্বাধীনে এবং জ্ঞানীদের পরিচালনাধীনে থাকে। এ স্তরে মানুষ কারণিক ও যোগাযোগগত সম্পর্কসমূহ আবিষ্কারের চেষ্টা চালায়, যা হয়ত কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে কিম্বা সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন প্রপঞ্চের মাঝে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এ স্তরে এসে অনুমান ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ই প্রত্যক্ষণ ও অভিজ্ঞতার অনুগামী হয়ে পড়ে। এ স্তরকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক তথা বাস্তবতার স্তর। দৃশ্যত অগস্ত কোঁত তাঁর বিবর্তন সূত্রটি উপস্থাপন করেন ইউরোপে যেসব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই। কেননা, প্রত্যেকটি স্তরকেই তিনি ইউরোপের ইতিহাসের বিশেষ এক সময়কালের সাথে প্রযুক্ত করে দেখিয়েছেন। অবশ্য অগস্ত কোঁত তাঁর জীবনের শেষ দিকে ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ‘¨ wiwjwRqb Ae wnDg¨vwbwU©র গোড়পত্তন করেন এবং মরমীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এভাবে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষবাদী মূলনীতি থেকে দূরে সরে আসেন। তাঁর এই চিন্তার মোড় ঘুরে যাওয়া আসলে তাঁর প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের সাথে কোন সঙ্গতি রাখে না।

Kvj gvKm : কার্ল মার্কসের Theory of Social Change তত্ত্বটিও একটি রৈখিক তত্ত্ব। এর মধ্যে সামাজিক জীবনের দুইটি উপাদান বিশেষ স্থান দখল করে আছে। একটি হল প্রযুক্তির (উৎপাদন শক্তি) উন্নয়ন এবং আরেকটি হল সামাজিক শ্রেণিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ। এ তত্ত্ব অনুযায়ী মানবসমাজ প্রাথমিক যৌথ সমাজ প্রথা, দাস প্রথা, সামন্তবাদ এবং পুঁজিবাদের (বর্জুয়া) পর্যায়সমূহ অতিক্রম করে এসেছে। এরপর সমাজতন্ত্রে প্রবেশ এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে একটি শ্রেণিহীন সমভোগবাদ (কমিউনিজম)-এ পৌঁছুবে। মার্কসের এই রৈখিক পরিবর্তনধারা বিগত কয়েক দশকে বিশেষ করে চীন বিপ্লবের পরে বক্রতার মুখে পড়ে এবং ১৯৬০ থেকে পরবর্তী দশকগুলোতেও ভাববাদীদের কর্তৃক অ-পুঁজিতান্ত্রিক প্রবৃদ্ধির পথ উত্থাপনের পর নিজ মূল্যমান ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

PµvKvi gZev‘

চক্রাকার মতবাদপন্থীদের মধ্যে ইবনে খালদুন, টয়েনবি, পারসন্স ও স্পেঙ্গলারের নাম উল্লেখযোগ্য।

Be‡b Lvj‘b : ইবনে খালদুন তাঁর Avj-gKwÏgv গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, সভ্যতাসমূহের একটি সূচনা এবং একটি পরিণতি থাকে। আর এগুলোর পরিবর্তন সংঘটিত হয় চক্রাকারে। তিনি পরিবর্তনের মূল কারণ হিসাবে ‘আসাবিয়া’ তত্ত্ব উত্থাপন করেন। অর্থাৎ বেদুঈন মানুষরা একস্থানে বসবাসকারী মানুষদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক। ইবনে খালদুনের লেখনী থেকে ‘আসাবিয়া’ বলতে যে ধারণা জন্মে তা হল একটি গোত্রের সাহসিকতা, স্বাধীনতা, সহমর্মিতা, গোত্রীয় সুসংবদ্ধতা, কওমী বংশধারা, ধর্মীয় বিশ্বাস, রক্তের বন্ধন, ঝুঁকি ও দানশীলতা ইত্যাদি

বৈশিষ্ট্যাবলি। কোন গোত্র বা রাজবংশ 'আসাবিয়া' শক্তিতে বলীয়ান হয়েই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে এবং নিজেদেরকে অন্যান্য গোত্র অথবা বংশ থেকে শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ করতে সক্ষম হয়।

ইবনে খালদুন বিশ্বাস করেন যে সমাজসমূহ আক্রমণ, পরমোন্নতি, বিলাসিতা, স্বৈরাচার এবং পতন- এই পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

cvimÝ : চক্রাকার মতবাদপন্থী আরেকজন হলেন মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক ট্যালকট পারসন্স (Talcott Parsons : ১৯০২ -১৯৭৯)। তাঁর দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে সিস্টেম তথা পদ্ধতিগত। আর তাঁর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিবর্তনগত। তিনি মনে করতেন সিস্টেমের কাজই হল সমাজে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করা। এর ফলে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কোন ধরনের বিচ্ছিন্নতা রোধে বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র পর্যায় পর্যন্ত যোগাযোগ ও সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে।

আর বিবর্তনগত দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সর্বদা সমাজের বিবর্তনের দিকে চোখ রাখতেন। এ বাবদ তিনি সমাজসমূহের ইতিহাসকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন :

১. প্রাথমিক পর্যায় থেকে মানব সমাজসমূহের ইতিহাসের প্রথমভাগ।

২. মানব সমাজসমূহের মধ্যম পর্যায়ের ইতিহাস।

৩. বর্তমান ইতিহাস (অর্থাৎ পারসন্সের তৎকালীন যুগ)।

পারসন্স এ অধ্যায়গুলোর প্রত্যেকটিকে একেকটি বৃহৎ সামাজিক সিস্টেম হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তিনি ইতিহাসের অধ্যায়গুলোর একটি থেকে আরেকটিতে পরিবর্তনের কারণস্বরূপ দুটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন-

এক. সমাজসমূহের বিবর্তন এবং

দুই. সমাজসমূহে বিশৃঙ্খলা থাকা।

mvgvwRK cwieZ©b cwµqvq cfve we¯ÍviKvix wbqvgKmgn

সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় এবং বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহকে সংক্ষেপে এভাবে তালিকাভুক্ত করা যায়। যথা :

১. জনসংখ্যার আধিক্য।

২. সামাজিক কাজের ভাগাভাগি।

৩. অর্থনৈতিক নিয়ামক এবং

৪. প্রযুক্তি

নিঃসন্দেহে প্রযুক্তি বিপ্লব হচ্ছে এমন একটি ঘটনাপ্রবাহ, যার প্রভাবে দুই শতক কাল আগে থেকে আজ অবধি পশ্চিমা সমাজে গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই প্রপঞ্চটি গ্রাম্য সমাজসমূহকে পাল্টে দিয়ে ঐতিহ্যবাহী রীতি-প্রথাগুলোকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ খুলে দেয়।[৩৫]

---

৩৫. দ্র. ড্যানিয়েল লিটল, f¨wiwUm Ae †mvk¨vj G·‡cø‡bkb, ফা. অনু. আব্দুল করিম সুরুশ, তেহরান : মুআসসেসেয়ে ফারহাঙ্গী সেরাত, ১৩৭৩ সৌ. সন, পৃ. ৯৯।

এখানে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল, সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী একটি নিয়ামক হিসাবে প্রযুক্তিকে কী ডুর্খাইমের জনসংখ্যা ও কাজ ভাগাভাগির নিয়ামকের চাইতে কিম্বা কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক নিয়ামকের চাইতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা যায়?

কোন কোন গবেষক ও তাত্ত্বিক, ইতিহাসের নিরিখে সমাজসমূহকে শ্রেণিবিন্যাস করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে একটি মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করেছেন। মার্কিন ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও প্রযুক্তি-দার্শনিক লুইস মামফোর্ড (১৮৯৫-১৯৯০) হচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

†kl ‘B kZK

বিগত দুই শতক কালে মূলত দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি চোখে পড়ে। একটি পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কার্ল মার্কস্ ও তাঁর অনুসারীদের দৃষ্টিভঙ্গি।

পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস গবেষকদের গবেষণায় ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ কয়েকটি যুগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিল্প অথবা কৃষি, শিল্প ও শিল্পোত্তর, অথবা প্রাথমিক যুগ, প্রত্নতাত্ত্বিক যুগ, অন্ধকার যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ।

এর বিপরীতে রয়েছে ঐতিহাসিক মার্কসীয় মতবাদ। এ মতবাদে ইতিহাসকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে থাকে। যথা:

১. প্রাথমিক যৌথ যুগ (Primitive Communism)।
২. ক্রীতদাস যুগ (Slavery)।
৩. সামন্ততান্ত্রিক যুগ (Feudalism)।
৪. পুঁজিতান্ত্রিক যুগ (Capitalism) এবং
৫. সমাজতান্ত্রিক যুগ (Socialism)।

এ মতবাদে ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় এক-ধরনের অন্তর্নিহিত আত্ম-গতিশীলতার কথা বলা হয়। যে গতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব, যা পরবর্তীকালে দ্বান্দ্বিক মতবাদ হিসাবে পরিচিতি পায়। রুশ ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ডিয়াক্নফ্ তাঁর *The Paths of History* গ্রন্থে ইতিহাসের এ পরম্পরা সম্পর্কে নিখুঁত বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। মানবের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক উপলব্ধি মানুষের সৃষ্টিজাত গুণাবলি ভিত্তিক, যা মানুষের চিন্তা এবং প্রযুক্তি- এ দুটি অঙ্গনে প্রকাশ পায় এবং মনোবৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব ও অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে থাকে।[৩৬] তিনি বর্ণনা করেন যে, মানবের ইতিহাসের প্রক্রিয়ার সর্বোত্তম রূপকে একটি নদীর ধারার সাথে তুলনা করা যায়। নদীর ধারার একটি উৎস থাকে এবং সূচনাতে সেটা একটি নালার চেয়ে বেশি কিছু নয়। অতঃপর এর বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং শেষ পরিণতিতে এটি সাগরে গিয়ে শেষ হয়। তবে নদী ও ইতিহাসের মধ্যে এই সাম্রাজ্যবাদী তুলনা কী যথেষ্ট যে আমরা বলব ইতিহাসও শেষ পরিণতিতে ইতিহাসের এক সাগরে গিয়ে পতিত হবে। অথচ এখনও অনেক অচেনা নিয়ামক রয়েছে যেগুলো ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে!

---

[৩৬]. দ্র.Igor M. Diakonoff, *The Paths of History*, Cambridge University Press, 1999.

অপরদিকে সামন্তবাদী সম্পর্কসমূহের বিপরীতে বিশ্ব ইতিহাসের নিরিখে শ্রম ও পুঁজির মাঝে সম্পর্ক ছিল এবং আছে। একটি সমাজব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ নিঃসন্দেহে এমন একটি প্রপঞ্চ, যা শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় সমাজের পরে উৎপত্তি লাভ করেছে। তবে প্রশ্ন হল, 'পুঁজিতন্ত্র' পরিভাষাটি বিশেষত ঐ সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব, যেখানে কেবল পুঁজিপতিরা নয়, বরং শ্রমিকরাও সংখ্যালঘু। আর ঐ সমাজের অধিকাংশ জনসমষ্টিই সেবাখাতে কর্মরত থাকে?

অধিকাংশ শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের পেশাভিত্তিক জনসমষ্টির বিন্যাস এরূপই। গবেষকরা এরূপ সমাজগুলোকে শিল্পোন্নত বলে নামকরণ করে থাকেন। যদিও ডিয়াক্নফ্ এ সকল সমাজকে পুঁজিবাদ উত্তর সমাজ বলে আখ্যায়িত করেন। মোটকথা, মার্কস্বাদের মূলনীতিসমূহকে গ্রহণ করা হোক বা না হোক, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বহাল থাকবে এবং নিজের বিকাশ ও উৎকর্ষতার সূত্রসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ থাকবে।

ডিয়াক্নফ্ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মানবের ইতিহাসের প্রক্রিয়ার দ্রুতগামী ও ঊর্দ্ধমুখী বিকাশ রয়েছে। আর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের আকাবাঁকা ফলাফলের মধ্যে একটি নঞর্থক ঊর্দ্ধমুখী বিকাশ রয়েছে। অনুরূপভাবে ইতিহাসের প্রত্যেক ধাপে সময়কাল ক্রমান্বয়েহ্রাস পেয়েছে। যেমন :

প্রথম পর্যায় (আদিম সমাজ) : আনুমানিক ৩০ হাজার বছর।

দ্বিতীয় পর্যায় (প্রাথমিক যৌথ সমাজ) : আনুমানিক ৭ হাজার বছর।

তৃতীয় পর্যায় (প্রাথমিক প্রত্নতাত্ত্বিক সমাজ) : আনুমানিক ২ হাজার বছর।

চতুর্থ পর্যায় (পরবর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক তথা সম্রাটীয় সমাজ) : আনুমানিক ১৫০০ বছর।

পঞ্চম পর্যায় (মধ্যযুগীয় সমাজ) : প্রায় ১০০০ বছর।

ষষ্ঠ পর্যায় (মধ্যযুগীয় উত্তর স্থায়ী স্বৈরতন্ত্রীয় যুগ) : আনুমানিক ৩০০ বছর।

সপ্তম পর্যায় (পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ) : প্রায় ১০০ বছর।

অষ্টম পর্যায় - পুঁজিবাদ উত্তর সমাজ।[৩৭]

মার্কিন অর্থনীতিবিদ Whitman Rostow (১৯১৬-২০০৩)-র গবেষণা মোতাবেক জাতীয়তার উন্মাদনা ও স্বদেশ পূজার মনোবৃত্তি উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, জাতীয়তার উন্মাদনা বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা ও চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ রাশিয়ান জারদের একের পর এক পরাজয়, রুশদের মধ্যে জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে দেয় এবং ১৯১৭ সনে সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সংঘটনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এই একই কথা চীন, জাপান, আমেরিকা ও জার্মানীর বেলায়ও প্রযোজ্য। এসব জাতি সাধারণত বিশ্বাস করতো যে একমাত্র একটি জাতীয় ও স্বদেশপুজারী এবং বিদেশী শক্তিসমূহ থেকে স্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার মাধ্যমেই জাতীয় ঐক্য এবং সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভবপর। আর কেবল এরূপ পরিস্থিতিতেই সমাজের আর্থিক, কারিগরী ও মানব সম্পদকে অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে সুসংগঠিত করা যায়।

---

[৩৭]. দ্রঃ http://www.fariborzbaghai.org.

4. Avj-KiAvb I BwZnv‡mi wbqgbxwZ

বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর চিন্তাধারা এবং তাদের উপর দিয়ে যেসব বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ বয়ে গেছে সেগুলো ইতিহাস আকারে লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মান চিন্তাবিদদের মধ্যে শক্তিশালী হয়। এর আগে, ইউরোপীয়দের নিকট ইতিহাস বলতে কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী আর সেনা-সম্রাটদের ইতিহাসের বর্ণনা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। একইভাবে মুসলমানদের নিকট ইবনে খালদুনের সময়কাল (খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ শতক) পর্যন্তও ইতিহাস বলতে এটাই বুঝাতো। খ্রিষ্ট ধর্মের নেতৃবৃন্দ এবং তার চেয়ে বেশি ইহুদী ধর্ম স্বীয় অনুসারীদেরকে এই বিশ্বাসই শিক্ষা দিত।

তবে Avj-KiAvb মানবেতিহাসের আদি সূত্রপাত নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আলোকপাত না করেই প্রথম মানব হিসাবে নবি আদম ও তাঁর জীবনসঙ্গীনির প্রতি ইশারা করেছে। অবশ্য কুরআন ইতিহাসের ঘটনাবলিকে নিছক পূর্ব-যোগসূত্রহীন, অন্ধ, আকস্মিক কিম্বা নিজে নিজে সংঘটিত কোন ঘটনা বলে মনে করে না। নিয়তিকে মেনে নেওয়া এবং অদৃশ্যের নির্দেশের বিপরীতে চোখ-কান বুঁজে আত্ম-সমর্পণ করাকে KiAvb প্রত্যাখ্যান করে। KiAvb চায় মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করতে, যাতে তারা যেন ধারণা না করে যে সবই বাধ্যবাধকতা। এ ব্যাপারে KiAvb ইতিহাসের নিয়মনীতির উপরেই নির্ভর করে। বাকের সদরের সামাজিক চিন্তায় ইতিহাসের এই নিয়মনীতি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি ইতিহাস সম্পর্কে KiAv‡bi বিশ্লেষণকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং ঐতিহাসিক নিয়মনীতিসমূহকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। KiAvb এরূপ নিয়মনীতিকে 'সুন্নাতুল্লাহ'[৩৮] তথা খোদায়ি রীতি-নিয়ম হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। KiAv‡bi এই বক্তব্য মানবের সামাজিক ইতিহাসের অনেক জট খুলতে চমৎকার ভূমিকা রেখেছে। তাই বাকের সদর KiAvb কর্তৃক এ তাৎপর্যটি (অর্থাৎ ইতিহাসের নিয়ম-নীতিসমূহ) আবিষ্কারকে একটি মহা সাফল্য বলে অভিহিত করেছেন। কারণ আমরা আমাদের জ্ঞানতত্ত্বের পরিসরে KiAvbকে সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসাবে জানি, যা এই তাৎপর্যটি উত্থাপন করেছে। এমনকি এর উপর গুরুত্বারোপও করেছে এবং এর নিকট বিদ্যমান সন্তোষ বিধানকারী যত উপায় রয়েছে সে সবগুলোর দ্বারা ইতিহাসের এসব নিয়ম ও রীতিগুলোর উপর জোরারোপ করেছে। আর 'ইতিহাসের ঘটনাবলি নিজে নিজে ঘটে'- এরূপ অমূলক চিন্তার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছে। একইভাবে যারা বিশ্বাস করে যে এসব ঘটনাবলি অদৃশ্য ভাগ্যলিখন বিশেষ এবং এগুলোর বিপরীতে আমাদের কেবলই আত্ম-সমর্পণ ও সন্তুষ্টিপ্রকাশ ব্যতীত কোন গতি নেই- KiAvb তাদের এ চিন্তাকেও নাকচ করে দিয়েছে।

ev‡Ki m'‡ii we‡kølY

বাকের সদর মনে করেন, এই মহা KiAwbK আবিষ্কার মানব জীবনে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ভূমিকা অনুধাবনের ব্যাপারে মানুষের চিন্তার অবগতি ও সতর্কতার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে KiAvb অবতীর্ণ হওয়ার আট শতাব্দীকাল পরে এসে আজ খোদ্ মুসলমানদের হাতেই এ উদ্দেশ্যে নানা প্রয়াস ও প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ইবনে খালদুন ইতিহাসের পর্যালোচনা এবং এর নিয়ম-নীতিসমূহ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর পরে, অন্ততপক্ষে চার শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরে এসে মুসলমানরা যে চিন্তাধারাকে বাদ দিয়েছিল, সেটাকেই পাশ্চাত্য চিন্তা আকড়ে ধরে এবং রেনেসাঁর প্রথমভাগেই তারা এর অর্থকে হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হয়। মুসলমানরা

---

[৩৮]. 'এটাই আল্লাহর (রীতি) সুন্নাত, প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে, তুমি আল্লাহ্‌র এ বিধানে কখনো পরিবর্তন পাবে না।' Avj-KiAvb, ফাত্‌হ্‌: ২৩।

ইতিহাসকে বুঝা ও ইতিহাসের চরিত্র ও নিয়ম-রীতিগুলোকে অনুধাবনে যে চিন্তার গভীরতায় পৌঁছুতে সক্ষম হয়নি, কিন্তু পশ্চিমারা অচিরেই এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়।

বাকের সদর মনে করেন, KiAvb বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন স্বরে ইতিহাস দর্শন নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেছে। কখনো কখনো ইতিহাসের নিয়ম-নীতিসমূহ বর্ণনা করেছে। আবার কখনো কখনো এগুলো আবিষ্কারের প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছে এবং তত্ত্বসমূহ ব্যক্ত করেছে। তিনি ইতিহাসের নিয়মসমূহ আবিষ্কার এবং ইতিহাস দর্শন শিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে বলেন :

> ‘সাধারণ মানুষরা ইতিহাসের ঘটনাবলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন একগুচ্ছ ঘটনারাশি বলে মনে করে থাকে, যেগুলো ঘটে থাকে আকস্মিকভাবে কিম্বা ভাগ্যের লিখনের ভিত্তিতে অথবা আল্লাহর হুকুমে, যার সম্মুখে আমাদের আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অথচ কুরআন এ চিন্তার কঠোর বিরোধিতা করে এবং কোন ঘটনাকেই কারণ ছাড়া কিংবা জোরপূর্বক ও তার সামনে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে বলে ব্যাখ্যা করে না। বরং মানুষকে এ মর্মে সাবধান করে দেয় যে, এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ক্রিয়াশীল। মানুষকে তার ভাগ্যের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসব নিয়মগুলোকে জানতে হবে। আর এসব নিয়মের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে হলে এগুলোকে ভালভাবে চিনতে হবে। অন্যথায় মানুষ এমনকি যদি চোখ বুঁজেও থাকে, তবুও এ নিয়মগুলো তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। কাজেই মানুষের উচিত চোখ খুলে এসব নিয়ম-নীতিগুলোকে দেখা, যাতে সে এগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যেন উল্টা না হয় যে সেগুলোই মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।’[৩৯]

BwZnv‡mi weeZbaviv

ইতিহাসের চাকা কী পূর্ণতা ও ন্যায়পরতার দিকে এগিয়ে চলেছে, নাকি অন্ধকার, দুর্নীতি ও সর্বনাশের দিকে? অধ্যাপক তাকি জা’ফরি[৪০] ইতিহাসের গতিধারাকে পূর্ণতা ও বিবর্তনধারা বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, ইতিহাসে মানুষের পূর্ণতার গতিধারা হচ্ছে একটি অস্পষ্ট এবং অব্যাখ্যেয় ও প্রমাণ-অযোগ্য গতিধারা। কেননা, আমরা সবাই যে জিনিসটাকে প্রত্যক্ষ করে থাকি, তা হচ্ছে প্রকৃতিতে মানুষদের চিন্তাচেতনা ও হস্তক্ষেপের বিস্তার এবং এমন কতেক গুরুত্বপূর্ণ স্তরে মানুষদের অনুপ্রবেশ, যেগুলো এ পর্যন্ত বিশেষ করে বিগত দুই শতাব্দীকালে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খুবই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই বিস্তার ও অনুপ্রবেশ, যা সমুদয় মনুষ্য মূল্যবোধ ও মহত্বগুলোকে পদদলিত করে দিয়েছে, এটাকে কী পূর্ণতা বলা যায়?

অবশ্য বাকের সদর এখানে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর দাবি মতে, ইতিহাসের গতিধারা হচ্ছে পূর্ণতা ও বিবর্তনমূলক। আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা হচ্ছে ইতিহাসের পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও চূড়ান্ত অর্জন। তিনি পশ্চিমা সভ্যতাকে চেনা ও জানার জন্য এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য মুসলিম সমাজগুলোকে পরামর্শ প্রদান করেছেন। কেননা, এ সভ্যতা হচ্ছে ইতিহাসে অতীতের সভ্যতাসমূহের ধারায় চূড়ান্ত অর্জন। তবে বাকের সদর পাশ্চাত্যের অর্জনগুলোকে ‘বস্তু ও অভিজ্ঞতাগত’ আর ‘সামাজিক ও রাজনৈতিক’ - এ দুভাগে বিভক্ত করেন। এর মধ্যে প্রথম ভাগটি থেকে উপকৃত হওয়াকে তিনি সহজতর এবং অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগটি সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস হল ইসলামি সংস্কৃতি ও তাৎপর্যসমূহকেই আকড়ে থাকা উচিত এবং পূর্ণ সাবধানতা

---

[৩৯].বাকের সদর, Avj-mbvb Avj ZvwiLqv wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, তেহরান : মারকাযে নাশরে ফারহাঙ্গে রাজা, ১৯৯০, পৃ.৮৪।

[৪০]. অধ্যাপক আল্লামা মোহাম্মদ তাকি জা’ফরি (১৯২৫-১৯৯৮), প্রখ্যাত ইরানি চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তিনি এমন একজন ব্যতিক্রম মুসলিম মনীষী ছিলেন, যিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও দর্শনের উপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রায় শতাধিক পশ্চিমা দার্শনিকের সাথে পত্র মারফত কিম্বা প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে মত বিনিময় চালিয়ে যেতেন। ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন তাঁদের মত অন্যতম।

বজায় রেখে যা কিছু সুস্পষ্ট ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, শুধু সেটা থেকে উপকৃত হতে হবে। যদিও এক্ষেত্রে ধর্মের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার বিপদ থেকেও সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। বিগত দুই শতাব্দীকালে অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ পাশ্চাত্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ভ্রান্ত বুঝের কারণে মনের অজান্তেই বিকৃতি ও বিদআতের কবলে পড়েছেন। আবার অনেকে ধর্মের পরিবর্তিত কাঠামোর মধ্যে আটকা পড়ে এবং সেটাকে নিরঙ্কুশকরনের মাধ্যমে আধুনিক দুনিয়ার অগ্রগতিসমূহ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে কিছু ভাল দিক রয়েছে। তবে খুব সতর্কতার সাথে এগুলোর সামনে যেতে হবে। কেননা তাদের অধিকাংশ তত্ত্ব ও মতবাদই তাদের ভ্রষ্ট চেতনা দ্বারা কলুষিত। উদাহরণস্বরূপ, ফুকুইয়ামা'র The End of History and the Last Man তত্ত্বটি, যা অন্যান্য সভ্যতাসমূহের উপর পাশ্চাত্যের বিজয় এবং গোটা বিশ্বে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। কিম্বা হান্টিংটন-এর Clash of Civilizations তত্ত্বটি, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করবে বলে দাবি করে থাকে- পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি ও স্বরূপ যে কতটা সাম্রাজ্যবাদী চেতনায় দুষ্ট, তা এসব তত্ত্ব থেকে সহজে অনুমান করা যায়।

ইতিহাসের বিবর্তন তথা পূর্ণতার আলোচনা, '(মুসলমানদের শেষ যুগের ইমাম মাহদি)-র আত্মপ্রকাশ স্বেচ্ছাধীন' মতবাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। এ মতবাদের ভিত্তিতে, আত্মপ্রকাশ হচ্ছে বুদ্ধি পূর্ণতায় পৌঁছুনো এবং বিজ্ঞানের পরম উন্নতি ও বিকাশ, যা গতির দ্রুততা প্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এ প্রসঙ্গে বাকের সদরের অভিমত হচ্ছে, আজ উত্তরাধুনিক যুগ খোদাদ্রোহী রাষ্ট্রসমূহ হতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং রাষ্ট্রগুলোকে একটি পৌরসভার পর্যায়ে ছোট করে ফেলার চিন্তা করছে। এই বিবর্তন হচ্ছে মানবের অভিজ্ঞতার ফসল আর এই হতাশাকে ইমাম মাহদি'র বৈশ্বিক বিপ্লবের ক্ষেত্র বলে মনে করা যায়। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আজ যে ইসলামপ্রীতির জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, এটা আসলে মানবেতিহাসের পূর্ণতার একটি লক্ষণ। এই অবসরে জাতিসমূহ একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং বিশ্বের অন্যায় ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।

BwZnv‡mi jÿ¨ I MwZ

প্রকৃতিতে দু'ধরনের গতি রয়েছে :

এক. বাধ্যবাধক ও অত্যাবশকীয় গতি, যা তার পূর্বের কারণ দ্বারা প্রভাবিত এবং মানুষের তাতে কোনই ভূমিকা নেই।

দুই. মানুষের ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত ও উদ্দেশ্যসম্পন্ন গতি। মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে, তারই আলোকে সে প্রকৃতি জগতে এমন এক ঢেউ সৃষ্টি করে যাতে ঐ সকল আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করতে পারে।

বাকের সদর এ বিষয়টিকে গভীর থেকে পর্যালোচনা করেছেন। মানুষ, মানুষের অন্তর্নিহিত সারবস্তু দ্বারা ইতিহাসের ভিত্তিকে নির্মাণ করে। অন্যান্য গতি থেকে ইতিহাসের গতির স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকা। অর্থাৎ ইতিহাসের গতি হচ্ছে একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসম্পন্ন গতি। ইহা শুধু কার্য-কারণ সূত্রের অধীন নয় যে কেবলমাত্র তার কারণের প্রতি ও তার অতীতের প্রতি নির্ভরশীল থাকবে। বরং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথেও সম্পৃক্ত। আর যেহেতু গতি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত, সুতরাং এর উদ্দেশ্য কারণ রয়েছে, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বটে। ভবিষ্যৎ, তার ঐতিহাসিক সক্রিয় গতিকে নির্মাণ করে। এমন ভবিষ্যৎ, যা এই মুহূর্তে অস্তিত্বমান নয় এবং শুধুমাত্র তার মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্ত্ব দ্বারা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় এবং গতি সৃষ্টি করে। এ কারণে মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্ব এক দিক

থেকে চৈন্তিক দিকের নির্দেশ করে, অর্থাৎ এমন একটি দিক যার মধ্যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও কল্পনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, তদ্রূপ অপর দিক থেকে এমন এক শক্তি ও ইচ্ছার নির্দেশ করে, যা মানুষকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করে এবং চিন্তা (তথা লক্ষ্য) ও ইচ্ছা একসাথে মিশে ভবিষ্যৎকে নির্মাণের ক্ষমতা এবং সামাজিক অঙ্গনে ঐতিহাসিক তৎপরতার গতি সৃষ্টিকারী শক্তির বাস্তবায়ন হয়।

gvbe Rxe‡b BwZnv‡mi fwgKv

মানুষের চিন্তা-চেতনায় ইতিহাসের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ইতিহাস হতে শুধু যে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে, তা নয়। বরং ইতিহাস যে সমস্ত শক্তি, নির্বাচন ও পরিস্থিতি আমাদেরকে বর্তমান কালে পৌঁছে দিয়েছে, সেগুলো উপলব্ধির মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের নিজেদেরকে আরও ভালভাবে জানতে সাহায্য করে। এ কারণে দার্শনিকরা কিছুকাল পর পর ইতিহাসকে পর্যালোচনা এবং ইতিহাসভিত্তিক জ্ঞানের প্রকৃতির প্রতি মনোনিবেশ করে থাকেন। উপরোক্ত সমুদয় বিষয়গুলো 'ইতিহাস দর্শন' শীর্ষক একই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ইতিহাস দর্শন বিষয়টি একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যা ভাববাদী, প্রত্যক্ষবাদী, যুক্তিবাদী, কালামবিদ ও অন্যান্যদের বিশ্লেষণ ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা গঠিত হয়েছে।

অপরদিকে ইউরোপীয় ও ইঙ্গ-মার্কিনীদের মধ্যে এবং হের্মেনেউটিক্সপন্থী (Hermeneutics) ও প্রত্যক্ষবাদীদের মধ্যে ইতিহাস রয়ে গেছে দর্শন সীমা-পরিধি নির্ণয়ের পর্যায়েই। ইতিহাস দর্শন সম্পর্কে সমস্ত মতবাদের একটি সুস্পষ্ট চিত্র উপস্থাপন করা প্রায় অসম্ভব। তবুও ইতিহাস সম্পর্কে দার্শনিকদের লেখনীসমূহ হচ্ছে বিশেষ কিছু প্রশ্নকে ঘিরে একগুচ্ছ আলোচনা, যার মধ্যে প্রত্যেকের নিজস্ব পরাপ্রকৃতি, হের্মেনেউটিক্স, জ্ঞানতত্ত্ব এবং ইতিহাসমুখিতা অন্তর্ভুক্ত। সে প্রশ্নগুলো এরূপ :

১. ইতিহাস কোন্ ধরনের ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্ম, সামাজিক গঠন কাঠামো, যুগ-কাল, অঞ্চল, সভ্যতা, বৃহৎ প্রভাববিস্তারী ঘটনাপ্রবাহ এবং কি ধরনের ঐশ্বরিক অভিপ্রায় দ্বারা গঠিত ?

২. ইতিহাস কি তার গঠনকারী ব্যক্তিগত ঘটনাবলি ও ক্রিয়াকর্মের বাইরে একটি সমগ্রের ন্যায় অর্থ, গঠন কাঠামো এবং নির্দিষ্ট চলার পথের অধিকারী?

৩. ইতিহাসকে শনাক্তকরণ, প্রতিফলন ও ব্যাখ্যার জন্য কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয়?

৪. মানুষের ইতিহাস কতুটুক তার বর্তমানকে নির্মাণকারী?

বাকের সদর ইতিহাস দর্শনের উপর গভীর গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তিনি ইতিহাসের নিয়মানুবর্তিতা এবং KiAv‡b বিধৃত এতদ্‌সংক্রান্ত বিধানসমূহের উপর স্বীয় আলোচনাকে কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে অবতারণা করেছেন। পাশাপাশি তিনি কতিপয় বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী মতবাদের প্রতি কিছু ইঙ্গিত করেছেন এবং তাদের দুর্বলতাগুলোর পর্যালোচনা ও সমালোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর এসব আলোচনা অগ্রসর হয়েছে কয়েকটি প্রশ্নকে ঘিরে। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন যে, মানবেতিহাসের গতি ও বিবর্তন কি কোন বিশেষ নিয়ম তথা বিধানের অনুগামী? অর্থাৎ ইতিহাসের অঙ্গনে মানুষের ভূমিকা কি? ইতিহাসের চালিকা শক্তিই বা কি? আর ধর্ম ও ঐশীপুরুষগণ কি ইতিহাসের চলার পথে অবদান রাখেন?

বাকের সদরের মতে, মানুষের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন দুদিক থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর একটি দিক, পরিবর্তন-ক্রিয়ার সারবস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ অতিমানবীয় তথা ঐশ্বরিক ব্যাপার এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় বিধান ও নিয়ম কানুনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর পরিবর্তনের অপর দিকটি মানবীয়। এ দিকটি সেই সকল ক্রিয়াকর্মের সাথে

সম্পৃক্ত যা বিশ্বাসগত শক্তিসমূহ এবং সামাজিক রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘাতসমূহের সম্মুখীন হয়। পরিবর্তনকে যখন এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হবে তখন তা একটি মনুষ্যকর্ম হিসাবে পরিগণিত হবে।[৪১]

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ঐশীপুরুষগণ যেসব পরিবর্তন সাধন করেছেন তা দুই রূপ : একটি রূপ হল প্রত্যাদেশ ও ধর্মীয় নিয়ম বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে তা পরা-ঐতিহাসিক ও ঐশ্বরিক। কিন্তু এর আরেকটি রূপ হল এটা অন্যান্য মানুষদের চেষ্টা-প্রয়াসের বিপরীতে একটি মনুষ্য চেষ্টা-প্রয়াস। আর একারণেই তা একটি ঐতিহাসিক কর্ম। একে একটি ঐতিহাসিক কর্ম আখ্যায়িত করা হবে একারণে যে ইতিহাসের নিয়ম তথা সূত্রসমূহ এতে ক্রিয়াশীল এবং ইতিহাসের মঞ্চ নামক এ বিশ্বমঞ্চের ঘটনাসমূহের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য বিধাতা যেসব বিধান দিয়েছেন সেগুলো তার উপর কর্তৃত্বশীল। তাই KiAvb যখন জনমানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলে তখন আসলে পরিবর্তনের দ্বিতীয় দিকটিই পর্যালোচনা করে। অর্থাৎ মানুষকে নিয়ে কথা বলে, ঐশ্বরিক বিষয় নিয়ে নয়। এভাবে বাকের সদর স্পষ্ট করেন যে পরিবর্তনের দ্বিতীয় দিকটিই KiAv‡bi দৃষ্টিতে বিবেচ্য। অতঃপর তিনি KiAv‡bi আলোকে ইতিহাসের নিয়ম ও রীতিসমূহকে আবিষ্কারের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে সমীক্ষণ এবং সেগুলো নিয়ে অনুধ্যান পরিচালনার মাধ্যমে ইতিহাস-বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক নিয়মাবলির অঙ্গনে বিভিন্ন সত্য ফুটে ওঠে। বাকের সদর KiAv‡bi কতিপয় ভাষ্যের[৪২] আলোকে দাবি করেন যে, ইতিহাসের নিয়ম-রীতির অবগতিই পারে মানুষকে সৃষ্টিকর্তার সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত করতে। এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা সাবা'র ৩৪ ও ৩৫ নং ভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

> 'ইতিহাসকাল জুড়ে সকল জাতি ও সমাজে ঐশীপুরুষদের সাথে ধনে-জনে সমৃদ্ধ বিত্তশালীদের বিরোধের সম্পর্ক ছিল, যা একটি ঐতিহাসিক নিয়ম হিসাবে নির্দেশ করে।'[৪৩]

5. ev‡Ki m'‡ii 'wó‡Z BwZnv‡mi wbqg-bxwZmg‡ni ˆewkó¨vewj

ইতিহাসের নিয়ম-নীতির সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা সাধারণ ও সর্বজনীন। অর্থাৎ ইতিহাসের নিয়মগুলো অখণ্ডনীয় ও অলঙ্ঘনীয়। এ বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের নিয়মসমূহকে বিজ্ঞানের চরিত্র দান করে। কেননা, বিজ্ঞানের কারণসমূহের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা সামগ্রিক, সর্বব্যাপী এবং অলঙ্ঘনীয় হয়।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ নিয়ম-নীতিগুলো ঐশ্বরিক। KiAvbও এ কথার উপর জোরারোপ করে থাকে। এ নিয়মগুলো আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত। মানুষের আল্লাহ্ সংযুক্তিকে পরিচর্যা করার নিমিত্তে এ নিয়ম। অর্থাৎ মানুষ এমনকি যখন প্রকৃতি থেকে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হবে তখনও সে আল্লাহ্র সাথে ও খোদায়ী বিধি-নিয়মের সাথে সংযুক্ত। অন্যকথায় বলা যায়, মানুষ তখনই প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বশীল নিয়মসমূহের অধীন জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা হতে সমৃদ্ধ হতে পারবে যখন সে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে না যাবে। কারণ সৃষ্টিকর্তা স্বীয় ক্ষমতাকে এ নিয়মসমূহের মাধ্যমেই কার্যকর করেন। এসব নিয়ম ও বিধান আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। বিশ্বজগত পরিচালনায় তাঁর প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তা মূর্ত হয়ে ওঠে।[৪৪]

---

[৪১]. দ্রঃ বাকের সদর, Av‌j-mbvb Avj ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

[৪২]. যেমন সূরা মুহাম্মদ : ১০, সূরা ইউসুফ : ১০৯, সূরা হাজ্জ : ৪৫-৪৬, সূরা কাহ্ফ : ৩৬-৩৭।

[৪৩]. দ্র.বাকের সদর, Avj-mbvb Avj ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

[৪৪]. দ্র.cv¸³, ১৪১।

এখানে কেউ হয়ত আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারে যে, ইতিহাস বিজ্ঞানকে যখন আল্লাহ্ তথা অদৃশ্যের সাথে যুক্ত করা হবে, তখন তা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার অযোগ্য হয়ে পড়বে!

এ আপত্তির প্রেক্ষিতে বাকের সদরের উত্তর হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনাকে KiAvb অদৃশ্যের রঙ দ্বারা রঞ্জিত করে না যে তার ফলে উক্ত ঘটনাকে তার অন্যান্য সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং শুধুমাত্র সরাসরি আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। KiAvb আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ককে কার্যকারণ সম্পর্কের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত করে না। বরং ইতিহাসের নিয়ম-নীতিকে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করে মাত্র। অর্থাৎ সম্পর্ক ও যোগ বন্ধনসমূহের ধরনকে আল্লাহ্র দিকে নির্দেশ করে। KiAvb এ বিশ্বজগতের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের মাঝে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার বিষয়টি মেনে নিয়েছে। কিন্তু KiAv‡bi বক্তব্য হল- আসলে এ সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহ্র প্রজ্ঞা এবং বিশ্বজগতের পরিকাঠামো ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মঞ্চে তাঁর উত্তম পরিকল্পনা ও পরিমাত্রা নির্ধারণের একটি ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং KiAvb যখন ইতিহাসের নিয়ম-নীতিকে খোদায়ী বেষ্টনে পরিবেষ্টিত করতে চায় তখন সে ইতিহাসকে শুধু তার খোদায়ী ব্যাখ্যা দ্বারাই ব্যাখ্যা করতে চায় না। বরং এই সত্যের উপর গুরুত্বারোপ করতে চায় যে এসব নিয়ম খোদায়ী বিধানের বহির্ভূত নয়।

ইতিহাসের নিয়ম-নীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা ও বাধ্যবাধকতার বিষয়টি। ঐতিহাসিক নিয়মসমূহ কখনোই মানুষের হাতের ঊর্দ্ধে নয়। এ প্রসঙ্গে KiAvb যে চিত্র তুলে ধরেছে সেখানে মানুষের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতাটি প্রধান ভূমিকা রাখে। বাকের সদর এ মর্মে KiAv‡bi কতিপয় ভাষ্যের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ :

> ‘আল্লাহ অবশ্যই কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।’[৪৫]
>
> কিংবা ‘ওরা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, ওদের আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।’[৪৬]
>
> অথবা, ‘যেসব জনপদ– ওদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন ওরা সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং ওদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।’[৪৭]

BwZnv‡mi wbqgmg~‡ni mxgv-cwiwa

ইতিহাসের নিয়মসমূহ ইতিহাসের ঘটনাবলি সংঘটনের পথে প্রবাহমান। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলির পথ পরিক্রমা যতদূর অবধি বিস্তৃত হোক না কেন, ততদূর কি ইতিহাসের নিয়মসমূহের অংশ? তবে কি সমস্ত ঘটনাবলিই ইতিহাসের নিয়মসমূহ দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত, নাকি কেবল আংশিক ঘটনাবলির উপরে এর নিয়ন্ত্রণ ও শাসন চলে?

বাকের সদরের মতে, সঠিক উত্তর হল এসব ঘটনার নির্দিষ্ট একটি অংশই কেবল ইতিহাসের নিয়মের অধীনে চলে। আর অপর কিছু ঘটনা রয়েছে (যেমন পদার্থ, রসায়ন, শরীরতত্ত্বীয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে) যেগুলোর উপর অন্য কোন নিয়ম কর্তৃত্বশীল। কাজেই ইতিহাসের নিয়মসমূহ যে কোন পরিসরেই কর্তৃত্ব করে না।

---

[৪৫]. দ্র. আল-কুরআন, রা’দ : ১১।
[৪৬]. Cv¸³ ,জ্বিন : ১৬।
[৪৭]. Cv¸³, কাহ্ফ : ৫৯

তবে কোন্ কোন্ পরিসরে এ কর্তৃত্ব চলে সে প্রসঙ্গে বাকের সদর ইতিহাসের আঙ্গিনায় প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে এক প্রকার সম্পর্ক ও বন্ধনের প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং বলেন :

> 'ইতিহাসের আঙ্গিনায় কতেক প্রপঞ্চের মধ্যে যে বন্ধন ও সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, তা হচ্ছে লক্ষ্যের অভিমুখে এমন এক বন্ধন, যা কোন অভিষ্টে পৌঁছুনোর জন্য প্রগতি ও তৎপরতাকে বিন্যস্ত করে থাকে। যা দার্শনিকদের পরিভাষায়, কর্তৃকারণ ছাড়াও উদ্দেশ্য কারণেরও অধিকারী। এ জাতীয় বন্ধনসমূহ সবখানে নেই। অন্য কথায় বলা যায়, এ বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে কর্মে উদ্দেশ্য-কারণের ভূমিকা এবং এটা সত্যসত্যই যে, কর্ম ভবিষ্যৎ অভিসারী এবং ভবিষ্যৎ প্রবণতাশীল। এতদসত্ত্বেও জানতে হবে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসম্পন্ন প্রত্যেক কর্মই ঐতিহসিক কর্ম নয় এবং এটা বলা যাবে না যে ইতিহাসের নিয়মসমূহ তার মধ্যে প্রবাহমান। বরং তৃতীয় আরেকটি মাত্রা বিদ্যমান রয়েছে এবং কোন কর্ম ঐতিহাসিক হওয়ার জন্য সেই মাত্রাকে বিবেচনায় নিতে হবে। কাজেই প্রথম মাত্রাটি হচ্ছে কর্তৃকারণ, দ্বিতীয় মাত্রাটি হচ্ছে উদ্দেশ্য কারণ আর তৃতীয় মাত্রাটি হচ্ছে যেটা ইতিহাসের নিয়মসমূহের সীমানার মধ্যে প্রবেশের জন্য আবশ্যক, তা হচ্ছে বস্তু তথা উপাদান কারণ। শেষোক্ত কারণটি হচ্ছে একটি শর্ত, যাতে কর্ম সামাজিক দিক্‌বিশিষ্ট হয়।'[৪৮]

সমাজ, একটি কর্মের বস্তুগত (তথা উপাদান) কারণ গঠন করে। অর্থাৎ কর্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই তো একটি কর্মকে আমরা ঐতিহাসিক কর্ম হিসাবে চিনি এবং ঐতিহাসিক কর্ম 'সমাজ' এর জন্য ঘটে থাকুক এটাকে আবশ্যক মনে করি। ফলে হতে পারে যে আমরা এমন কোন কর্মকে ঐতিহাসিক নিয়ম বলে আখ্যায়িত করি অথচ উপস্থিত রয়েছে একজন ব্যক্তি, কিন্তু যে ঢেউ সে তোলে, সেই কারণে একটি সামাজিক কর্মে পরিণত হয়। অতএব ঐতিহাসিক কর্ম (যার উপর ঐতিহাসিক নিয়মসমূহ কর্তৃত্বশীল থাকে), তা হচ্ছে এমন কর্ম যা লক্ষ্যের সাথে সংযোগের ভরবাহী হয়। একই সাথে আবার ব্যক্তিক ক্ষেত্রসীমার চেয়েও বিস্তৃততর ক্ষেত্রের অধিকারী থাকে এবং এমন ঢেউ সৃষ্টি করতে পারে যে, সমাজ তার বস্তুগত (তথা উপাদান) কারণ গঠিত করতে পারে। আর এরূপে একটি কর্ম হয়ে ওঠে সামাজিক কর্ম।[৪৯]

BwZnv‡mi e¯‘ev`x e¨vL¨v cm‡½ ev‡Ki m`i

বাকের সদর ইতিহাসের যে দর্শন উপস্থাপন করেছেন সেখানে বস্তুকে পরিবর্তনের উপাদান কারণ হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্যে ইতিহাসের পূর্ণ বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অধিকতর জনপ্রিয়। 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' অভিধাটি আজ পাশ্চাত্যকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা হচ্ছে সমাজ বিকাশের সর্বাধিক সাধারণ নিয়মাবলি ও চালিকাশক্তি সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের অঙ্গীভূত অংশ। কার্ল মার্কস্ ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেল্‌স দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রধান ধারাসমূহ সামাজিক জীবনের ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা উদ্‌ঘাটন করেছেন।[৫০]

সামাজিক ঘটনাবলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্দেশ্যেই ইউরোপে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। সমাজবিকাশের, সামাজিক আচরণে বা সামাজিক পরিবর্তনের কি কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ রয়েছে? যদি থাকে সেগুলো কি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য? প্রাকৃতিক নিয়মাবলিকে ভৌতবিজ্ঞান যেভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, মানব সমাজকে কি সেভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? সামাজিক শৃঙ্খলা কেমনভাবে রক্ষিত হয়, শৃঙ্খলা রক্ষার সামাজিক

---

[৪৮]. বাকের সদর, Zvdmxi Avj-gI'qx mbvb Avj-ZwiLxq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।
[৪৯]. cÖv¸³, পৃ. ১৫৯।
[৫০]. সোফিয়া খোল্‌দ, mgvRwe`¨vi msw¶ß kã‡KvI, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৯০, পৃ. ৩১-৩২।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রকরণগুলোই বা কী কী? সমাজ পরিবর্তিত হয় কেন? অতি সামাজিক কোন শক্তি কী এর নিয়ন্ত্রক? সমাজ বিনাশক বাস্তবতার মৌলিক উপাদানগুলোই বা কী কী? - এই মৌলিক সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্নসমূহের মার্কসীয় আলোচনা-পদ্ধতি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা নামে পরিচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মার্কসের কাছে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্যই সমাজের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এঙ্গেল্স ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন :

> 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কথাটি আমি ব্যবহার করি ইতিহাস ধারার এমন একটা ধারণা বোঝাবার জন্য, যাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ ও মহতী চালিকা-শক্তির সন্ধান করা হয় সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণিতে সমাজের তজ্জনিত বিভাগের মধ্যে এবং সব শ্রেণির পারস্পরিক সংগ্রামের মধ্যে।'[৫১]

অজ্ঞেয় অতি-সামাজিক তথা অতি-প্রাকৃতিক কোন শক্তি নয়, মানুষই মানব সমাজের নির্মাতা, তার ইতিহাসের মুখ্য কারক– এই উপাত্তকে ভিত্তি করে মার্কস্ ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন বলে অধিকাংশ বোদ্ধাই মনে করে থাকেন।[৫২] তবে বাকের সদরের ইতিহাস দর্শনের সাথে মার্কসীয় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' তত্ত্বের একটি মৌলিক পার্থক্য হল সামাজিক পরিবর্তন বা রূপান্তরের ব্যাখ্যায় অতি প্রাকৃতিক শক্তি তথা আল্লাহ্র ভূমিকা নিয়ে। বাকের সদর এসব পরিবর্তন বা রূপান্তরের পশ্চাতে একচেটিয়া কোন কারণ নয় বরং একাধিক কারণের বিশ্লেষণ করেন এবং ইতিহাসের নিয়ম-নীতিকে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করেন। কিন্তু মার্কসীয় মতে, মানুষের ইতিহাস হল একমাত্রিক, একচেটিয়া। অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থার অংশভাক্ ব্যক্তি ও তার বাস্তব পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ইতিহাস।

সমাজ পরিবর্তনের কারণটি ঠিক কী? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে মার্কস্ ও এঙ্গেল্স সমাজের চরিত্র ব্যাখ্যার প্রচলিত অ-বস্তুবাদী ব্যাখ্যাগুলোকে বর্জন করেন। হেগেলের ভাববাদী চিন্তা বা মনুষ্যচরিত্রের মত অনৈতিহাসিক ধারণার পরিবর্তে মার্কস্ ও এঙ্গেল্স বস্তুজগতের মধ্যেও সমাজ পরিবর্তনের কারণগুলোকে অনুসন্ধান করতে প্রয়াসী হন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বটি এই প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি। সংক্ষেপে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :[৫৩]

১. ইতিহাসের ব্যাখ্যা কোন অতি-জাগতিক শক্তির আঙ্গিকে বা নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার নিরিখে করার প্রয়োজন নেই। উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী মানুষের সৃষ্টিশীল শ্রমক্ষমতা সমাজ ও প্রকৃতির রূপান্তরের কারক।

২. ইতিহাস গতিবান। উৎপাদন ব্যবস্থার গতিশীল রূপান্তর ইতিহাসে গতি সঞ্চার করে।

৩. ইতিহাসের গতিমুখ পরিবর্তন হয় বক্রগতিকে, একরৈখিকভাবে নয়। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক অন্বয়ের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সাধিত হয়। জন্ম হয় সমাজ বিপ্লবের। এইভাবে ইতিহাসের গতি ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটে হাত ধরাধরি করে চলে।

কার্ল পপার, মের্লো পন্তি, কোলাকভস্কি প্রমুখ তাত্ত্বিকরা মার্কস্বাদকে ঐতিহাসিক নির্দ্ধারণবাদী দোষে দুষ্ট বলে দাবি করেছেন। তাদের মতে সমাজের বিকাশে কোন ঐতিহাসিক নিয়ম নেই বা (আদিম সাম্যবাদী সমাজ-দাস

---

[৫১]. ফ্রেডরিখ এঙ্গেল্স, BD‡Uwcqv I ˆeÁwbK mgvRZš, ২০ এপ্রিল ১৮৯২, ইংরেজি সংস্করণের জন্য বিশেষ ভূমিকা, মার্কস এঙ্গেল্স রচনা সংকলন, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশনা, মস্কো, পৃ. ১১।

[৫২]. দ্রঃ শোভনলাল দত্তগুপ্ত ও উৎপলঘোষ, gvKmxq mgvRZË, কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৪,পৃ . ৪১।

[৫৩]. দ্র.cv¸[3], পৃ. ৪৬।

সমাজ-সামন্ত সমাজ-পুঁজিবাদী সমাজ-সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ)- এই ধরনের কোন পূর্ব নির্ধারিত ঐতিহাসিক ক্রম নেই। নিয়ম মেনে একটি সমাজের পর অপর একটি সমাজের আবির্ভাব ঘটে না। তারা আরও মনে করেন যে ইতিহাসবাদী হিসাবে মার্কস্ যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা বাস্তবায়িত হয়নি।[৫৪]

তবে পপার ও মের্লো পন্তি মার্কস্‌বাদের কতটুকু সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় মার্কস্ বা এঙ্গেল্স কোথাও বলেননি যে পৃথিবীর সব সমাজই আদিম সাম্যবাদী স্তর থেকে পরবর্তী স্তরগুলোর মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী স্তরে উন্নতি হবে। তারা যা বলেছিলেন তা হল সমাজবিকাশের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল থাকে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। মানব সমাজের ইতিহাস, ইতিহাস নামক কোন অমোঘ শক্তির অধীন নয়। ইতিহাস বলতে মার্কস্ ও এঙ্গেল্স বুঝিয়েছেন মূলত মানুষের সচেতন কর্মকাণ্ডকে।

ev‡Ki m‘i Dc¯wcZ BwZnv‡mi wbqg-bxwZi wZbi/c

বাকের সদর দাবি করেন, Avj-KiAv‡b ইতিহাসের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে তিনটি রূপ উপস্থাপিত হয়েছে।[৫৫] যথা :

এক. শর্তসাপেক্ষ রূপ কাঠামো
দুই. অবশ্যম্ভাবী রূপ কাঠামো
তিন. অনবশ্যম্ভাবী রূপকাঠামো।

GK. kZmv‡cÿ i/cKvVv‡gv

এ রূপ কাঠামোটি একটি শর্তসাপেক্ষ অনুজ্ঞার আকারে প্রকাশ লাভ করে। এতে দুইটি প্রপঞ্চ কিম্বা দুই গুচ্ছ প্রপঞ্চের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ আন্তঃসম্পর্ক শর্ত ও তার ফলাফলকে তীব্রভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল করে দেয়। শর্তসাপেক্ষ ঐতিহাসিক নিয়মসমূহ মানুষের সাধারণ জীবনে অনেক সেবা ও সুবিধা প্রদান করে এবং মানুষের গড়ে উঠার ক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রাখে।[৫৬] উদাহরণস্বরূপ, 'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে'- কথাটি একটি শর্তসাপেক্ষ রূপকাঠামোর দৃষ্টান্ত। কেননা, এখানে জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটাকে একটি পূর্বশর্তের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আর তা হল উক্ত জাতি নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করা।

‘B. Aek¨¤¢vex i/cKvVv‡gv

কুরআনে ইতিহাসের নিয়ম-নীতির দ্বিতীয় রূপকাঠামোটি একটি অনিবার্য বাস্তবঘটিত ও অবশ্যম্ভাবী অনুজ্ঞা রূপে উপস্থাপিত হয়। সেখানে হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ নেই, প্রতীক্ষার কোন অবকাশ থাকে না। উদহারণস্বরূপ বলা হয় যে সূর্য অমুক দিনে গ্রহণ লাভ করবে। মানুষ এক্ষেত্রে অবস্থা ও পরিস্থিতির কোনরূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ নেই। কারণ এখানে অনুজ্ঞার রূপটি শর্তসাপেক্ষ নয়। বরং একটি অমোঘ ও অনিবার্য অনুজ্ঞা রূপে বাস্তবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

---

[৫৪]. cv¸ ³, পৃ. ৫০।
[৫৫]. বাকের সদর, Avj-mbvb Avj ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj- Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।
[৫৬]. নমুনা স্বরূপ দ্র. সূরা রা'দ :১১, সূরা জ্বিন : ১৬, সূরা বনি ইস্রাঈল : ১৬।

wZb. Abek¨¤vex (Z_v bgbxq) i/cKvVv‡gv

এ রূপ কাঠামোটি প্রথমোক্ত রূপকাঠামোর বিপরীত। শর্তসাপেক্ষ অনুজ্ঞার বেলায় মানুষের ঝোঁক ও প্রবণতাসমূহের সাথে কোন কাজ নেই। কিন্তু অনবশ্যম্ভাবী রূপকাঠামোতে মানুষের ঝোঁক ও প্রবণতাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রকারের নিয়মসমূহ যা KiAv‡bi নিকট বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, এগুলো হচ্ছে এমন সব নিয়ম, যা এক প্রকারে মানুষের ঐতিহাসিক গতির প্রাকৃতিক ঝোঁক ও প্রবণতাসমূহকে গঠন করে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এ ভূমিকা রাখা কোন অনিবার্য ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম রূপে নয়। কারণ এটা স্পষ্ট যে ঝোঁক-প্রবণতা আর অনিবার্য নিয়মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে সাধারণ ধারণা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক বিধি-নিয়ম বলতে বুঝায় যা মানুষের পক্ষ থেকে লঙ্ঘনযোগ্য নয়। কেননা মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহকে লঙ্ঘন করতে এবং তার অনিবার্যতাকে এড়িয়ে চলার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু ঝোঁক-প্রবণতা নমনীয় এবং তার বিরুদ্ধাচারণ করা যায় বা তার বিপরীতে দাঁড়ানো যায়। যদিও বিরুদ্ধ পথে চলার ফলে ইতিহাসের নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে বিরুদ্ধাচারণকারী ক্রমেই পরাভূত ও বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সুতরাং এ সব নিয়মের কতেক অংশ বিরুদ্ধাচারণ যোগ্য। কিন্তু কতেক ঝোঁক-প্রবণতা রয়েছে যেগুলো সাময়িকভাবে রুখে দাঁড়ানো যায় বটে, কিন্তু চূড়ান্ত পরিণতিতে ইতিহাসের নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধাচারণকারীকেই বিধ্বস্ত করে দেয়। এটাই হল ইতিহাসের গতিধারায় মানুষের মৌলিক ঝোঁক-প্রবণতার বৈশিষ্ট্য।[৫৭]

মানুষ তথা মানুষের অভ্যন্তরীণ সারবস্তুই ইতিহাসের গতির ভিত্তিকে রচনা করে। ইতিহাসের গতি একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসম্পন্ন গতি। এ গতি শুধুমাত্র কার্যকারণ নিয়মের অধীন নয় যে এর কারণের এবং অতীতের উপর নির্ভরশীল থাকবে। বরং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হয়। যেহেতু সেটা উদ্দেশ্যসম্পন্ন গতি, কাজেই তা উদ্দেশ্য কারণের অধিকারী থাকবে এবং ভবিষ্যত বিচারী। প্রকৃতপক্ষে মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছা শক্তি তার অন্তরের গঠনকারী এবং তার অন্তর্নিহিত সারবস্তু এ দুইটি ভিত্তিগত স্তম্ভের মধ্যে দেখা যায়। কাজেই মানুষের অন্তর্নিহিত সারবস্তু ইতিহাসের গতি গঠনকারী। বাকের সদরের দৃষ্টিতে এই অন্তর্নিহিত সারবস্তু সমাজের ভিত্তি, কাঠামো ও উপরিকাঠামো হিসাবে গণ্য হয়। তিনি অতঃপর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে 'অনুসৃত' ও 'অনুসরণকারী' তথা কারণ ও কার্যের মধ্যকার যে সম্পর্ক, সে দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় বাইরে ও অন্তঃপুরে পরিবর্তন একই সাথে এবং সমান তালে চলতে হবে যাতে মানুষ তার অন্তঃপুর অর্থাৎ মন, চিন্তা, ইচ্ছা ও আকাঙ্খাসমূহকে গড়তে পারে। এ বিষয়ে জোরারোপ করা হয় যে এই অভ্যন্তরীণ ভিত্ (Base) বাইরের উপরিকাঠামোর (Superstructure) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হতে হবে।[৫৮]

6. BwZnv‡mi MwZc‡_i wfwËB n‡"Q gvbl

বাকের সদর মানুষকেই ইতিহাসের গতির ভিত্তি বলে মনে করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, ইতিহাসের গতি হচ্ছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি গতি। উদ্দেশ্য কারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ভবিষ্যৎপানে। ভবিষ্যৎ আপাতত নেই। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বে সে অস্তিত্বশীল। মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্ব হচ্ছে ঐতিহাসিক গতির ভিত্তি। মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছার মধ্যে তা প্রস্ফুটিত হয়। চিন্তা ও ইচ্ছার রসায়ন ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করে। ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তাই ঐতিহাসিক গতির ভিত্তিকে নির্মাণ করে। সুতরাং সামাজিক পরিকাঠামো এই অন্তর্নিহিত সত্তার উপরেই ভিত্তিশীল।

---

[৫৭]. বাকের সদর, Avj-mbvb Avj ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।
[৫৮]. cv¸³, পৃ. ১৯৫।

এ কথার অর্থ হচ্ছে সামাজিক অঙ্গনে পরিবর্তন নির্ভর করে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিবর্তনের উপর। KziAv‡b সে কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে এভাবে-'নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতির পরিবর্তন ঘটান না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের আপন সত্তার পরিবর্তন ঘটায়।'[৫৯]

এর ফল দাঁড়ায় এটা যে প্রচেষ্টা চলবে দুই দিকে সমান্তরালে - ভেতরে এবং বাইরে।

মানবের সহজাত প্রবৃত্তির দুটি দিক রয়েছে। একদিকে তা সামাজিক সমস্যাবলি নিরসনে মানুষের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। অপরদিকে তা ধর্মের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহের পথ ধরে তার জন্যে সর্বজনীন স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করে তোলে। বাকের সদর মনে করেন, ইসলাম জীবনের নবতর সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছে এবং এমন সব আইন-কানুন প্রবর্তন করেছে যেখানে ব্যক্তি ও সমাজের অধিকার বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।[৬০]

জীবন ও কর্মের সহজাত প্রবৃত্তিগত যে মানদণ্ড (অর্থাৎ আত্মপ্রেম), তার সাথে যেসব মানদণ্ড যথার্থ ও কাঙ্ক্ষিত (অথাৎ যা সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে)- এদুয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে ধর্ম। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যে মানদণ্ড নিহিত রয়েছে তা হল তার আত্মপ্রেম। এ আত্মপ্রেম তথা আমিত্বই তাকে তার ব্যক্তিস্বার্থের দিকে আহ্বান করে। আর ধর্মের মাধ্যমে যে মানদণ্ড নির্দেশ করা হয়েছে তা তাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রতি আহ্বান করে। ধর্ম এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে দুইটি পথে সম্পাদন করে থাকে। একটি পথ হচ্ছে জীবনের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে। এ ব্যাখ্যায় যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হল, জগতকে পারলৌকিক জীবনের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হিসাবে এবং এ পথে চেষ্টা ও প্রয়াস চালানো হলে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হয়। আর সেটা তখনই অর্জিত হয় যখন ব্যক্তি একদিকে যেমন তার ব্যক্তিগত স্বার্থ পুরণে ব্রতী থাকে, একইসাথে সমাজের স্বার্থ পুরণেও ব্রতশীল হবে। অন্যকথায় বলা যায়, সমাজের জন্য কর্ম ও প্রচেষ্টার তাৎপর্যগত ব্যপ্তি ঘটানোর মাধ্যমে প্রকৃত স্বার্থ ও মুনাফা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও ব্যক্তির পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জিত হয়। সুতরাং ধর্ম ব্যক্তিকে সামাজিক অংশগ্রহণের দিকে চালিত করে এবং একইসাথে কর্মের সূচক হিসাবে নির্ধারণ করে 'ন্যায়পরতা'কে, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিও অন্তর্ভূক্ত হয়।[৬১]

বাকের সদর সামাজিক ক্রিয়ার চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যখন কোন সমাজ চিন্তা ও ইচ্ছার দৃষ্টিকোণ থেকে তার ঐক্য ও সংহতিকে হারিয়ে ফেলে এবং বিভেদ ও অনৈক্যে লিপ্ত হয় তখন যা ঘটে, সেটা কয়েকভাবে কল্পনাযোগ্য-

প্রথমত, বাহির থেকে যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া- সেক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। বিভেদ ছড়িয়ে পড়বে এবং সমাজ দুর্বল হয়ে পড়বে। আর স্বীয় আদর্শ হারিয়ে বিজাতীয় আদর্শের পেছনে ঘুরে বেড়াবে।

- এটা হচ্ছে একটি আত্মবিস্মৃত সমাজের ভাগ্য পরিণতি। আর এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সবকিছুর আগে প্রয়োজন নিজের অবস্থাকে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। আর এ আকাঙ্ক্ষার বীজ জন্মাতে হয় জাতির গভীর অন্তঃপুরে। উপনিবেশবাদ কবলিত দেশে দেশে মুক্তির আন্দোলনগুলো জন্ম নিয়েছে এই পথ ধরেই।

---

[৫৯]. Avj-KziAvb, রা'দ : ১১।

[৬০]. দ্র. বাকের সদর, dvjmvdvZbv, বৈরুত : দার আল-তাআরুফ, ১৯৮৯, পৃ. ৪৩।

[৬১]. দ্র. c‡ev³, পৃ. ৪৭।

বাকের সদর মানুষের ভেতরে তিনটি উপাদানকে পৃথক করেছেন। যথা-

১. নফ্স (আমিত্ব)

২. চিন্তাশীল বুদ্ধি এবং

৩. চিন্তার সারবস্তু ও সক্রিয় ইচ্ছা

বুদ্ধি হচ্ছে মানব অভ্যন্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যার মাধ্যমে স্বভাব-প্রকৃতি ও ইচ্ছাকে একই দিকে অভিমুখী করা যায় এবং ক্ষমা ও ত্যাগের ন্যায় আচরণের জন্য পথ উন্মুক্ত করা যায়। যেহেতু পৃথিবী হচ্ছে পরলোকের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ এবং তা সংযম, ত্যাগ, অন্যদের সাথে বন্ধন আর সামষ্টিক স্বার্থ বজায় রেখে চলা ব্যতীত অর্জিত হয় না, সেহেতু অভ্যন্তরীণ ঝোঁক-প্রবণতা ও উদ্দীপনাসমূহ সামাজিক স্বার্থের সাথে একমুখী হয়ে যায় এবং সমাজের মূল সমস্যাবলি সমাধান হয়ে যায়। সুতরাং স্বভাব-প্রবণতা, যেটা হচ্ছে আচরণের প্রথম চালিকাশক্তি, তা চিন্তাগত ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী বটে। আর বুদ্ধিই পারে বিশুদ্ধকে ভেজাল থেকে আলাদা করতে। সুতরাং তখন এ দুইয়ে মিলে নিখাঁদ চিন্তার বিষয়বস্তুকে আয়ত্ব করতে পারে। চিন্তা হচ্ছে মানবের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফসল। আর মানুষের ইচ্ছা হচ্ছে তার নিজের উপর যা কিছু আবশ্যক মনে করে তা বাস্তবায়নের হাতিয়ার। সুতরাং ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ হচ্ছে সেই চিন্তার বিষয়সার যা মানুষ আয়ত্ব করে থাকে। যদি সেটা যথাযথ ও সঠিক হয় তাহলে তার আচরণ সঠিক হবে। অন্যথায় সে ভ্রষ্ট পথেই চলবে। কাজেই চিন্তার বিষয়সারের উপর সবিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে মানুষ নিজের জন্য যে শ্রেণির আদর্শ আর পরম উদ্দেশ্য বেছে নেয় তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তাই বাকের সদর মনে করেন, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা যতই একত্ববাদ ও পারলৌকিকতার মাখামাখি হতে দূরে থাকবে আর যতই প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠবে, ততই সে অন্যকে শোষণে প্রবৃত্ত হবে। 'বস্তুত মানুষ তো দ্রোহী হয়, যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত দেখে।'[৬২]

সুতরাং ইসলাম এমন এক সম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করে যা মানুষকে তার স্বজাতি ভাইয়ের সাথে ন্যায়পূর্ণ সম্পর্কের দিকে চালিত করে এবং সর্বপ্রকার অন্যায় হতে বিরত রাখে। সেক্ষেত্রে প্রকৃতির সাথেও তার সম্পর্ক অন্য এক রঙ পরিগ্রহ করে এবং সর্বজনীন শান্তি ও সুখ বিরাজের কারণ হয়। KiAv‡bi ভাষায়-

> 'আর যদি জনপদের অধিবাসীরা বিশ্বাস করতো ও সাবধান হয়ে যেত, তবে তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ অবারিত করতাম, কিন্তু তারা অবিশ্বাস করেছিল, সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছি।'[৬৩]

7. gvb‡li mnRvZ cewË I mvgvwRK cwiPq

বাকের সদরের মনে করেন, মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবণতা বিদ্যমান, যা তাকে সামাজিক পরিচয় প্রদান করে। মানুষের সামাজিক জীবন হচ্ছে মানবিক চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহের জাতক। আর সামাজিক ব্যবস্থা হচ্ছে সেই কাঠামোটি, যা সামাজিক জীবনকে উক্ত চাহিদাসমূহের ভিত্তিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক করে তোলে।[৬৪] বাকের সদর কয়েকটি ধাপে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিসমূহের কিছু নমুনা উপস্থাপন করেছেন। যথা :

---

৬২. cÖv¸³, আলাক : ৬।

৬৩. cÖv¸³, আ'রাফ : ৯৬।

৬৪. বাকের সদর, BKwZmv‘bv, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-লুবনানি, ১৩৯৮ হি. পৃ. ২৯৭-২৯৮।

K) wecixZ wj‡½i cwZ AvKlY : মানুষের মধ্যে তার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান। আর এ আকর্ষণ বিবাহ ও পরিবারের ভিত্ রচনার কারণ হয়। অবশ্য এটা আকর্ষণের পর্যায়ের কথা, সেই আইন ও সমাজের পর্যায়ের কথা নয় যে সমাজ এই আকর্ষণ থেকে সমকামিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেমন লুত জাতি, যারা নিজেদের দোষেই নিজেদের সমাজের ধ্বংস ডেকে আনে। এটা তো প্রাকৃতিক প্রবণতা হতে বিচ্যুতি, বেশি দিন টিকে না।

L) ciæl I bvixi g‡a¨ KvR fvMvfwWMi ceYZv : এটাও একটি বিষয়গত প্রবণতা, কোন আইন থেকে উৎসারিত নয় যে যান্ত্রিক গতি হিসাবে গণ্য হবে। এ প্রবণতাও কালক্রমে লঙ্ঘিত হতে পারে। যেমন পুরুষ ঘরে শিশু লালন করবে আর স্ত্রী বাইরে কাজে বের হবে। কিন্তু এটাও যেহেতু মানুষের স্বভাব প্রবণতার পরিপন্থী বিষয়, সে কারণে তা টেকসই হবে না।

M) AvcwZK ixwZ-c_vi Rb¨ 'óvšÍ : ধর্ম হচ্ছে সামাজিক আপতিক রীতি-প্রথার জন্য একটি দৃষ্টান্ত। এ ভিত্তিতে ধর্ম নিছক আইন প্রবর্তক নয়, বরং ঐতিহাসিক নিয়ম প্রথারই একটি প্রথা। একারণেই আল্লাহ্ ধর্মকে কখনো কখনো আইন ও নিয়ম প্রবর্তক হিসাবে পরিচয় দেন।[৬৫] আবার কখনো কখনো একে সহজাত প্রবৃত্তির মোতাবিক এক গতি হিসাবে জানিয়েছেন।[৬৬]

অবশ্য এ প্রথাটিও কখনো কখনো লঙ্ঘিত হতে পারে। কিন্তু যেহেতু ঐ লঙ্ঘন মানবের সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় সে কারণে তা বেশি দিন টিকে না।[৬৭]

8. mvgwRK wµqvK‡gi wfwË‡Z mvgwRK wbqgbxwZi e¨vL¨v

উদ্ধৃত KiAv‡bi ভাষ্যসমূহ থেকে প্রতিপন্ন হয় যে সমাজমাত্রই সেখানে নিয়ম ও বিধান থাকে। আর এ তাৎপর্যটি KiAv‡bB প্রথমবার ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এ বিষয়বস্তু ছিল না। KiAvb খোদায়ী রীতি তথা নিয়মের কথা বিবৃত করার মাধ্যমে মানুষদেরকে এ মর্মে সাবধান করে দেয় যে তারা যেন এ সব নিয়ম-নীতিকে চিনে নেয় যাতে সেগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এমনটা নয় যে ঐসব নিয়মনীতিগুলো বাধ্যবাধক হবে এবং মানুষের উপর শাসন করবে।

মানুষের ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত এবং এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ভবিষ্যতের প্রতি। সুতরাং ভবিষ্যৎ ও অতীত একই যোগসূত্রে গাঁথা। একারণে বাকের সদর ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতাবাদীদের থেকে দূরে সরে এসেছেন এবং ক্রিয়ামূলক ভিত্তির প্রেক্ষিতে সমাজের ভবিষ্যত কাঠামো আর ব্যক্তিদের বর্তমান ক্রিয়াকলাপ ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মাঝে কারণগত সম্পর্ক স্থাপন করেন।

---

[৬৫]. ÔAwg †Zvgv‡'i Rb¨ wbawiZ K‡iwQ (mcwZwôZ) ag hvi wb‡'k w'‡qwQjvg bn‡KÑ hv Awg cZ¨v‡'k K‡iwQ †Zvgv‡K- hvi wb‡'k w'‡qwQjvg Bevnxg, gmv I Cmv‡K, GB e‡j †h, †Zvgiv ag‡K cwZwôZ Ki Ges I‡Z gZ‡f' K‡iv bv| Zwg Askxev'x‡'i hvi cwZ AvnŸvb KiQ Zv Zv‡'i wbKU 'en g‡b nq| Avjøvn hv‡K B"Qv a‡gi cwZ AvKó K‡ib Ges †h Zvi AwfgLx nq Zv‡K a‡gi w'‡K cwiPwjZ K‡ib|'– শুরা : ১৩।

[৬৬]. ÔZwg GKwbôfv‡e wb‡R‡K a‡g cwZwôZ K‡iv, Avjøvni cKwZi AbmiY Ki, †h cKwZ Abhvqx wZwb gvbl mwó K‡i‡Qb, Avjøvni cKwZ‡Z †Kvb cwieZb †bB| GwUB mij ag, wKš AwaKvsk gvbl Rv‡b bv|Õ – রূম : ৩০।

[৬৭]. এর ভিত্তিতে সূরা হাজ্জ এর ৪৭ নং আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা আসলে ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে নয়, বরং ঐতিহাসিক নিয়ম প্রথার পক্ষ থেকেই এ শাস্তি যা লঙ্ঘনকারীদের আক্রান্ত করে থাকে। ÔZviv kw¯Í ZiwšZ Kivi K_v e‡j, A_P Avjøvn Zvi cwZÁv KL‡bv f½ K‡ib bv| †Zvgvi cwZcvj‡Ki GKw'b †Zvgv‡'i MYbvi nvRvi eQ‡ii mgvb|Õ

এরূপ নয় যে, লক্ষ্যসম্বলিত হলেই যে কোন আচরণের উপর ঐতিহাসিক নিয়ম বা রীতি জারি হবে। বরং তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে হবে। এর জন্য অবশ্য প্রয়োজন হল তা সমাজে প্রবাহিত হওয়া এবং ঢেউ তথা আলোড়ন সৃষ্টি করা। সুতরাং ঐতিহাসিক আচরণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত হওয়া ছাড়াও সমাজের পর্যায়ে ফুটে উঠবে।

ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, বাকের সদরের বিশ্বাস মতে ঐতিহাসিক নিয়ম-নীতিকে ঐতিহাসিক নিয়ম-নীতি হিসাবে পরিগণিত হওয়ার জন্য কয়েকটি দিক্ বিদ্যমান থাকতে হবে। যথা :

- কর্তৃ কারণ
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- সুবিস্তৃত ক্ষেত্র (বস্তুগত কারণ)। যে ক্ষেত্র খোদ্ কর্মকেও ছাড়িয়ে যাবে। আর সে ক্ষেত্র হচ্ছে সমাজ। অর্থাৎ এমন কর্ম হবে যা ঢেউ তুলবে ।[৬৮]

আর এর জন্য যে সমস্ত বিষয়গুলো অত্যাবশ্যক সেগুলো হল:

১. বিশ্বজগতের গতি-প্রকৃতি এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন নিয়মানুবর্তী হওয়া।
২. কার্য ও কারণের পরম্পরা, সৃষ্টির সেই সর্বক্ষমতাশীল উৎসমূলে গিয়ে শেষ হতে হবে যিনি যে কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখেন।
৩. খোদায়ী নিয়ম ও রীতিসমূহ চিরায়ত। এগুলো রদবদলযোগ্য নয় কিংবা এতে কোন ব্যত্যয়ও ঘটে না।
৪. খোদায়ী নিয়মনীতিগুলো খোদার অভিপ্রায় হতে উৎসারিত হয় এবং তা বিশ্বজগতের স্রষ্টার ইচ্ছার সাথে পরিপন্থী হয় না।
৫. মানুষ খোদায়ী নিয়ম ও রীতিসমূহ নির্ণয় করার সামর্থ রাখে এবং তাকে সেগুলো বুঝার জন্য দায়িত্ব আরোপ করা যায়।
৬. খোদায়ী নিয়ম রীতির সঠিক অনুধাবনের মাধ্যমে এবং নিজের আচরণে সেগুলো একই অভিমুখে অভিমুখী করে তোলার মাধ্যমে মানুষ তার ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করতে পারে।
৭. সামাজিক নিয়মনীতিসমূহের বাস্তবায়ন ঘটে সামাজিক স্তম্ভ তথা উপাদানসমূহের মধ্যে। সেগুলো হচ্ছে মানুষ, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক আর প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক। এগুলো হচ্ছে সমাজের স্তম্ভসম এবং এগুলোর মধ্যকার যোগাযোগ ও সম্পর্কই হচ্ছে সমাজের প্রাণ। এর উপরেই সমাজ দণ্ডায়মান থাকে। আর যখন এ স্তম্ভত্রয়ের মধ্যকার সম্পর্কের আলোচনা উত্থাপিত হয়, তখন চতুর্থ উপাদানটির কথা সামনে চলে আসে। ঐ চতুর্থ উপাদানটিই অপর তিনটি উপাদানকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে এবং এটি উৎস লাভ করে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়ার মন্ত্র থেকে। আর প্রতিনিধি নিযুক্তির বিষয়টি ধর্ম আনয়নের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। সুতরাং ধর্ম হচ্ছে এমন এক ব্যক্তিগত ও সামাজিক রীতিপন্থা, যা ব্যক্তিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মকে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং এর উপাদানমণ্ডলী সমাজের ভেতরে ও পরিধিতে ক্রিয়া করে থাকে।
৮. উপরোক্ত বিষয়টি থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, সমাজে যে কোন পরিবর্তনের জন্য এই সম্পর্কসমূহের মধ্যে পরিবর্তন ঘটা আবশ্যক। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি পরিবর্তন না হবে এবং ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণ না

[৬৮]. বাকের সদর, Avj-gv' ivmvZj KiAwbq¨v, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮২।

করবে, ততক্ষণ সামাজিক পরিবর্তনও সংঘটিত হবে না। সমাজের পূর্ণতা লাভ ব্যক্তির পূর্ণতা লাভের মধ্যেই নিহিত।

৯. অতএব আমাদের দরকার সকল খোদায়ী নিয়মনীতিকে জানা। যাতে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের গতিপথের দিক নির্ধারণ করতে সক্ষম হই।

10. যদি এ সবগুলো বিষয় একত্রিত হয় তাহলে খোদায়ী নিয়ম ও রীতিসমূহের জ্ঞান গড়ে ওঠে।[৬৯]

gvb‡li AeMwZi Dci wfwËkxj mvgvwRK cwieZb

বাকের সদর ব্যাখ্যা করেন যে, KiAvb দুই দিক থেকে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে। একটি হচ্ছে শরীয়াত ও ওয়াহি'র সাথে এর সম্পর্কের দিক থেকে। অপরটি হচ্ছে স্বয়ং মানুষদের চেষ্টার সাথে এর সম্পর্ক, যা ঐতিহাসিক নিয়মের অধীনে প্রভাবের উৎস-কারণ হয়। যেমন, যখন ওহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের রহস্য উন্মোচন করা হয় তখন এটাকে ধর্ম ও ওয়াহি'র পরাজয় বলা হয়নি। বরং এটাকে ঐতিহাসিক নিয়মের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।[৭০] এখানে মনুষ্য চেষ্টার কথা আলোচনায় এসেছে। যদি তারা নিজের কাজকে সঠিকভাবে সম্পাদন না করে, তাহলে ঐতিহাসিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তা হচ্ছে তাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত হওয়া।[৭১] একারণে সামাজিক পরিবর্তন ব্যক্তিদের অবগতি ও সচেতনতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর KiAvb হচ্ছে সর্বপ্রথম গ্রন্থ, যা এ রহস্যের পর্দা উন্মোচন করেছে এবং বিশ্বকে কার্য ও কারণের দুনিয়া হিসাবে ঘোষণা করেছে। যেখানে মানুষের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়টিকে পরবর্তীকালে ইবনে খালদুন উত্থাপন করেন এবং পরবর্তী শতকগুলোতে এটা নিয়ে অনেক পর্যালোচনা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে যে, বাকের সদর তাঁর সামাজিক দর্শনে মানুষের চিন্তা ও অবগতির উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি সমাজের হিসাব নিকাশ হওয়ার বিষয়টিকে সমাজ ও ইতিহাসের পরিসরে মানুষের আচরণের প্রভাবের সম্প্রসারণ অর্থে গণ্য করেছেন। বাকের সদর মানুষকেই ইতিহাসের গতির মূল নায়ক বলে মনে করেন। তাঁর দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত উপাদান, যদ্বারা প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাকে একমুখী করে তোলা যায়।

অপরপক্ষে ধর্মের অবদান হচ্ছে মানুষের আত্মপ্রেম তথা স্বার্থপরতা ও নৈতিক মানদণ্ডের মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা। যে নৈতিক মানদণ্ড সর্বজনীন কল্যাণ, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সৌভাগ্যের প্রসূতি বটে।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক নিয়ম-নীতিসমূহ ঐতিহাসিক ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা অর্থে নয়। বরং ইতিহাস ও সমাজের নিয়মানুবর্তীতারই পরিচায়ক। মানুষের কর্মই হল ঐতিহাসিক ও সামাজিক নিয়ম-নীতিসমূহের প্রতিষ্ঠাকারী। একারণে বাকের সদর ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতাবাদীদের থেকে দূরে সরে এসেছেন এবং কর্মমুখী প্রেক্ষিতের মাধ্যমে ব্যক্তি মানবের বর্তমান কর্মকাণ্ড ও অভিপ্রায়ের সাথে সমাজের ভবিষ্যৎ কাঠামোসমূহের মাঝে এক সম্পর্ক ও যোগবন্ধন স্থাপন করেছেন। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনসমূহ লোকদের অবগতির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

---

[৬৯]. দ্র. সাইয়্যেদ মুনজির আল-হাকীম, gRZvgvDbv wd wdKix ZiwQ Avj-knx‘ ewKi Avj-m‘i, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯।

[৭০]. ÔGes gvb‡li g‡a¨ G (wec‡‘i) w‘b¸‡jvi chvqµ‡g Avwg A‘j-e‘j K‡i _wK, hv‡Z Avjøvn wekvmxMY‡K Rvb‡Z cv‡ib Ges †Zvgv‡‘i ga¨ n‡Z wKQ‡K mvÿx K‡i ivL‡Z cv‡ib Ges Avjøvn AZ¨vPvix‡‘i cQ›‘ K‡ib bv|ÕÑ আলে-ইমরান : ১৪০

[৭১]. Ôhw‘ †Zvgiv Awfhv‡b †ei bv nI, Z‡e wZwb †Zvgv‡‘i ggš‘ kw¯Í †‘‡eb Ges Aci RwZ‡K †Zvgv‡‘i ¯jwfwl³ Ki‡eb| †Zvgiv Zvi †KvbB ÿwZ Ki‡Z cvi‡e bv| Avjøvn mekw³gvb|Õ– তাওবাহ্: ৩৯।

আর সমাজের আদর্শ নমুনাটি বুদ্ধিবৃত্তির তৎপরতা, অবগতি এবং জ্ঞানগত চর্চার মাধ্যমেই রূপ লাভ করে। এই আদর্শ নমুনায় মানুষ আল্লাহ ভিন্ন অন্যের উপাসনা হতে মুক্ত হয় এবং যে কোন রকম অন্যায় ও অতিরিক্ত কামনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এরূপে সামাজিক বিপ্লব সাধিত হয়। সে নিজের প্রবৃত্তির সাথে যেমন সংগ্রাম করে[৭২], তদ্রূপ বাইরের খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করে।[৭৩] বাকের সদরের এ দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিপন্ন হয় যে, একটি আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থার চরিত্রে নিম্নলিখিতি বৈশিষ্ট্যগুলো অলঙ্কারস্বরূপ :

১. গোটা সমাজটাই একটাই অক্ষ ও কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে একত্রিত হয়।

২. সম্পর্ক ও যোগাযোগসমূহ আল্লাহ্র ইবাদতের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে।

৩. সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি পর্যায়ে ভ্রাতৃত্বের মানসিকতা স্পন্দিত ও প্রবাহিত থাকে।

৪. সমাজের লোকদের মধ্যে বিশ্বস্ততার মানসিকতা বিরাজ করে।

৫. কল্যাণ, ন্যায়পরতা ইত্যাদি সুকুমার মূল্যবোধসমূহের প্রতি অবিরাম চলার গতি বৃদ্ধি পায়।

9. mvgwRK Av'k I b¨vqciZv

সামাজিক আদর্শের আলোচনা আমাদেরকে সামাজিক অগ্রগতির ধারণায় নিয়ে আসে। আদর্শ মানেই পূর্ব থেকে ধারণা করে তাকে অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া। তবে কোন সমাজের পক্ষেই তার আদর্শ পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কোনদিনই আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তথাপি সমাজ তার আদর্শ রূপায়ণ থেকে দূরে সরে থাকতে পারে না। আদর্শের বাস্তবায়নের প্রয়াস চালিয়ে যাওয়াই বড় কথা। সুতরাং আদর্শের স্বরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকতে হবে, আদর্শ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা চাই। তা না হলে আমরা বুঝতে পারব না যে সমাজ অগ্রসর হচ্ছে কি না।

'সামাজিক আদর্শ' এবং 'সামাজিক আদর্শ লাভের প্রয়াস'- এ দুটি তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে একটি অসুবিধা দেখা দেয়। তা হল- আদর্শ আগে, না আদর্শের চেষ্টা আগে? কোন সমাজের আদর্শ বিচার করতে হলে কাজের মাধ্যমে তা বিচার করতে হবে। কাজেই এটা স্থির করা কঠিন যে, আদর্শের ধারণা আগে, না কাজের ধারণা আগে। তবে এভাবে বিষয়টি বুঝা যেতে পারে যে, কোন কাজ করতে হলে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা চাই। এই লক্ষ্যই কাজটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাজের গতিপথ নির্ধারণ করে। আর এই লক্ষ্যই সাময়িকভাবে আদর্শের রূপ নিয়ে ব্যক্তির কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। এই লক্ষ্য যখন অর্জিত হয় তখন অন্য একটি লক্ষ্য এই লক্ষ্যের স্থান দখল করে। এভাবে ব্যক্তি এক লক্ষ্য থেকে অন্য লক্ষ্যের দিকে গমন করে। কিন্তু পরম আদর্শ কোনদিনই মানুষ অর্জন করতে পারে না বলেই অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিকের বিশ্বাস।

সামাজিক অগ্রগতি যতই সম্প্রসারিত হয়, সামাজিক আদর্শও ততই সুস্পষ্ট হতে থাকে। সামাজিক আদর্শ যত উন্নত হবে, সামাজিক অগ্রগতিও তত অধিক হবে।

বাকের সদরের মতে, মানুষের ভবিষ্যৎ অভিসারী অভ্যন্তরীণ সারবস্তুকে 'আদর্শ' ধরে অগ্রসর হতে হবে। বাকের সদরের দৃষ্টিতে আদর্শ হল মানব সমাজের অভ্যন্তরীণ সারবস্তু গঠনকারী মূল অস্তিত্বসত্তা। তাঁর মতে পরম উপাস্যই (ইলাহ্) হলেন সেই আদর্শ, যার প্রতি প্রত্যেকটি মানুষেরই দৃষ্টি থাকে। এই স্থানটি মানবের

---

[৭২]. নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম যা 'আল-জিহাদ আল-আকবার' তথা বৃহত্তর জিহাদ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

[৭৩]. যা 'আল-জিহাদ আল-আসগার' তথা ক্ষুদ্রতর জিহাদ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মনোজাগতিক অস্তিত্বে কখনো কখনো এমন কিছু জিনিস এসে দখল করে নেয়, যে জিনিসটি এ স্থানের উপযুক্ত নয়। একারণে বাকের সদর মনে করেন, পবিত্র KiAv‡bi 'তুমি কি দেখ না যারা তাদের কামনা-বাসনাকেই স্বীয় উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে'[৭৪]- এ আয়াতটি দ্বারা মূলত আদর্শের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, কারো কারো কাছে কামনা-বাসনাই তাদের উপাস্য তথা আদর্শের স্থান দখল করে নেয়। তিনি লিখেন :

> "... সুতরাং [মানুষের] আকাঙ্ক্ষাসমূহ, নিজেই ইতিহাসের গতি সৃষ্টিকারী এবং তা নিজের পর্যায়ে মানুষের অন্তর্নিহিত সারবস্তুর মধ্যে একটি গভীরতর ভিত্তি। এই গভীর ভিত্তিটিই হচ্ছে সেই আদর্শ, যা সমস্ত আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু এবং সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রত্যাবর্তনস্থল হিসাবে পরিগণিত। মানব সমাজের এই 'আদর্শ' যতই উপযুক্ততর, উন্নততর ও মহত্তম হবে, আকাঙ্ক্ষাসমূহও তদানুপাতে যথাযথ ও সমুন্নত হবে। বিপরীতক্রমে 'আদর্শ' যতই সীমাবদ্ধ ও নিকৃষ্ট হবে, এ থেকে উত্থিত আকাঙ্ক্ষাসমূহও ততবেশি সীমাবদ্ধ ও নিকৃষ্ট স্তরের হবে।"[৭৫]

এ আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তি স্থল হতে উৎসারিত হতে পারে। আমরা বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে প্রভেদ করে থাকি। বাস্তব অর্থে যা বিদ্যমান রয়েছে, যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এবং আদর্শ অর্থে যা উপস্থিত নেই, অথচ যাকে আমরা লাভ করতে চাই। বাস্তব ও আদর্শ বিযুক্ত নয়। অর্থাৎ বাস্তবের মধ্যেই আদর্শ সম্ভাবনারূপে সুপ্ত থাকে এবং এ সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এই আদর্শকে লাভ করা যায়। এর অর্থ হল ব্যক্তির মধ্যে এমন সম্ভাবনা নিহিত আছে যার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে আদর্শটিকে লাভ করা যায়। ব্যক্তি-জীবনের এই আদর্শই তাকে জীবনপথে অগ্রসর হতে প্রেরণা যোগায় এবং তার জীবনের পরমার্থ লাভ করতে সহায়তা করে।

ব্যক্তির জীবনে যেমন পরিবর্তন আছে, পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তর আছে এবং একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে, সমাজ-জীবনেও তদ্রূপ। ব্যক্তি জীবনের মত সমাজ জীবনেও দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। একটি তার বাস্তব রূপ এবং অপরটি তার আদর্শ রূপ। আদর্শ ছাড়া যেমন ব্যক্তির অগ্রগতি সম্ভব নয় বা তার বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তদ্রূপ সমাজেরও যদি সেরূপ কোন আদর্শ না থাকে তাহলে সমাজ জীবনের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে বা সমাজ বিপথগামী হতে পারে। মানুষ তার বিচারবুদ্ধি দ্বারা সমাজের এই আদর্শকে নির্দিষ্ট ও নির্ধারণ করে থাকে। এরূপ আদর্শকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সমাজচিন্তক নানা বিশ্লেষণ হাজির করেছেন।

ম্যাকেঞ্জি[৭৬] সমাজের দুটি আদর্শের আলোচনা করেছেন। যথা - (ক) অভিজাত তান্ত্রিক আদর্শ (Aristocratic Ideal) এবং (খ) গণতান্ত্রিক আদর্শ (Democratic Ideal)। আবার কেউ কেউ (যেমন কার্ল মার্কস্ এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেল্স)[৭৭] মনে করেন যে, পূর্বোক্ত আদর্শ দুটির মধ্যে একটিও সমাজের উপযুক্ত আদর্শরূপে গণ্য হতে পারে না। সমাজের প্রকৃত আদর্শ হল সাম্যবাদ বা সমভোগবাদ। আবার কারো কারো যেমন গডউইন, প্রধোঁ, বাকুনিন, ক্রুপট্কিন প্রমুখের মতে যথার্থ আদর্শ হল নৈরাজ্যবাদ (Anarchism)।

সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর তাঁর বিখ্যাত Avj-mbvb AvZ-ZvwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig গ্রন্থের ইতিহাস দর্শন পর্বে মানুষের অন্তরসত্তার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইতিহাসের গতিময়তার ভিত্তিই হচ্ছে মানুষের অন্তরসত্তা।[৭৮] অর্থাৎ মানুষের অন্তরসত্তার বিনির্মাণ ক্রিয়ার প্রধান মেরু হচ্ছে 'উত্তম আদর্শ'। মানুষের অন্তরসত্তা সেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষার মূর্ত কারী, যা ইতিহাসকে গতিবান করে তোলে।

---

[৭৪]. Avj-KiAvb, ফুরকানঃ ৪২।
[৭৫]. বাকের সদর, Avj-mbvb Avj-ZvwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।
[৭৬]. Mackenzie, *Outlines of Social Philosophy,* London: George Allen and Unwin Ltd. 1918, p. 178.
[৭৭]. দ্র. কম্যুনিস্ট মেন্যুফেস্টো।
[৭৮]. বাকের সদর, Avj-mbvb Avj-ZvwiwLq¨v wd Avj KiAvb Avj -Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

তাছাড়া ইতিহাসকে গতিবান করে তোলা এসমস্ত আকাঙ্ক্ষাকেও উত্তম আদর্শই নির্ণয় ও নির্ধারণ করে থাকে। কেননা, ঐ আকাঙ্ক্ষাসমূহের সবই মানুষের জীবনের তথা গোটা মানব জাতির জীবনের জন্য উত্তম আদর্শের প্রতি একটি মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উৎসারিত হয়। বাকের সদর বলেন :

> "...তাই মানব জাতির অভ্যন্তরকে বিনির্মাণের জন্য 'উত্তম আদর্শ' সূচনা বিন্দু হিসাবে পরিগণিত হয়। আর এ আদর্শ প্রকৃতপক্ষে জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সামগ্রিক বীক্ষার সাথেই সম্পৃক্ত। প্রত্যেক সমাজেই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তির উপরেই তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সমাজ এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এবং এই মত-অভিমতের উপর ভিত্তি করেই নিজের আদর্শকে নির্ধারণ করে থাকে।"[৭৯]

বাকের সদর দাবি করেন যে ইতিহাসের গতি উদ্দেশ্য সম্বলিত ও আদর্শ ধারণ করার কারণে বিশ্বজগতের অন্যান্য গতির থেকে ভিন্ন ছিল। খোদ্ এই ইতিহাসের গতিগুলোও আদর্শসমূহের পার্থক্যের কারণে একে অপর থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ইতিহাসের প্রত্যেক গতিই বিশেষ এক আদর্শ ও প্রতীকের অধিকারী। আর এই আদর্শ ও প্রতীকই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করে থাকে। একইভাবে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোই সংশ্লিষ্ট আদর্শের পথে তৎপরতা ও প্রয়াসকে চাঙ্গা করে।

বাকের সদর তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে একটি কুরআনিক শব্দ 'ইলাহ্' (الله)-র উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। আরবি ভাষায় Bj\vn শব্দের অর্থ 'যাকে অর্চনা করা হয়'। অর্থাৎ উপাস্য, পরিচালনাকারী, আদেশদাতা ও আনুগত্যের পাত্র। ইলাহ্ বলতে KiA\‡b এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। এ কারণে, যে ব্যক্তি বা বস্তু এই স্থানটি দখল করবে, সে-ই 'ইলাহ'। কারণ সে-ই তো ইতিহাস নির্মাণ করে থাকে। A\j-KiA\b এমনকি মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে 'ইলাহ্' শিরোনামে আখ্যায়িত করে নবিকে বলেছে, 'তুমি কি দেখ না যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে?'[৮০]

অর্থাৎ মানুষের কু-প্রবৃত্তি এবং কামনা বাসনাও তার আদর্শের স্থানটি দখল করতে পারে। কেননা, তা উপাসনার পাত্রে পরিণত হয়, তা মানুষকে আদেশ দেয় ও চালিত করে। প্রকৃতপক্ষে কামনা-বাসনাই হচ্ছে আসল চালিকাশক্তি।

10. A\'‡ki cK\i‡f'

বাকের সদরের মনে করেন, মানব সমাজসমূহ যুগে যুগে নিজেদের জন্য যেসব আদর্শ নির্ধারণ করেছে সেগুলো মূলত তিন প্রকার :

এক. পুনরাবৃত্তিমূলক প্রতীক বা আদর্শ।

দুই. সংকীর্ণ দৃষ্টির প্রতীক বা আদর্শ।

তিন. সত্যিকার আদর্শ ।

GK. cbi\ve\wËgjK A\'k

সমাজে বিদ্যমান বাস্তবতা থেকেই এসব প্রতীকের উদ্ভব ঘটে। যখন বিরাজমান বাস্তবতাই সমাজসমূহের আদর্শের উৎস হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় এটা যে, এসব সমাজ একটি আপেক্ষিক বিষয়কে একটি নিরঙ্কুশ বিষয়ের স্থানে

---

[৭৯]. c\¸ ³, পৃ. ১৮৭।
[৮০]. A\j-KiA\b, ফোরকান : ৪৩।

স্থাপন করলো। বাকের সদরের দৃষ্টিতে, KiA\‡bi যে আয়াতগুলোতে অবিশ্বাসীরা এবং অংশীবাদীরা তাদের একত্ববাদী ধর্ম গ্রহণ না করার হেতু হিসাবে তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মের দোহাই দেওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো তাদের আদর্শের এই উৎপত্তি স্থলের প্রতিই ইঙ্গিত করে; যে উৎপত্তি স্থল পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার কারণে আদর্শের জন্য একটি উৎস হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে।

বাকের সদর সমাজের এ ধরনের প্রতীক তথা আদর্শগুলোকে পুনরাবৃত্তিমূলক বলে মনে করেন। কারণ এরূপ সমাজের কাছে ভবিষ্যতের জন্য কোন উদ্যোগ বা কর্মপরিকল্পনা নেই। তারা কেবল তাদের মধ্যে যেটা বিদ্যমান রয়েছে সেটারই প্রলম্বন নিয়ে ব্যস্ত। অর্থাৎ ভবিষ্যতের প্রতি অভিযাত্রায় তারা কোন পাথেয়'র চিন্তা করে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের আদৌ কোন মনোযোগ ও চেষ্টাই নেই। শুধু কেবল বিদ্যমান আদর্শকে ভবিষ্যতের কাছে স্থানান্তরিত করাকেই তারা যথেষ্ট বলে মনে করে। এই বর্তমান আদর্শটিকেও তারা পেয়েছে অতীতের কাছ থেকে এবং চক্রাকারে বর্তমানে স্থানান্তরিত করেছে। এভাবেই তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই সূঁতায় গাঁথা হয়। তাদের নিকট ভবিষ্যৎ বলতে অতীতেরই পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

মোটকথা, প্রথম প্রকারের আদর্শ বলতে বুঝায় সেই আদর্শকে, যার কল্পনার উৎস হচ্ছে বিদ্যমান বাস্তবতা। সমাজের মানুষদের মাঝে বিরাজমান অবস্থা ও পরিস্থিতি থেকেই এর উৎপত্তি। এ আদর্শটি একঘেয়ে ধরনের এবং পুনরাবৃত্তিমূলক। এরূপ আদর্শের ছায়াতলে ইতিহাসের গতিও একঘেয়ে ও পুনরাবৃত্তিমূলকই হবে।

বাকের সদরের মতে এর পিছনে মূলত দুটি নিয়ামক কারণ নিহিত - একটি হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক। অর্থাৎ মানসিকভাবে বিরাজমান বাস্তবতার সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়া এবং তার মধ্যেই মিশে যাওয়া। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বহির্জাগতিক। অর্থাৎ KiA\‡bi ভাষায় যেটাকে বলা হয়েছে 'ফেরাউন'দের আধিপত্য হিসাবে, যা ইতিহাসকাল জুড়ে চলে এসেছে।

সমাজের মানুষদের বিরাজমান অভ্যাসের দাসত্বপনা এবং আলসেপনা, যা ক্রমান্বয়ে তাদের মানসিক স্থবিরতায় পর্যবসিত হয়। যখনই কোন সমাজ এবং কোন জাতিকে এই মানসিক জড়তা ও স্থবিরতা গ্রাস করবে তখন সেটা একটি জমাটবদ্ধ সমাজ ও জাতিতে পরিণত হবে। কারণ শেষ পর্যন্ত তাদের আদর্শ ও উপাস্যকে বিদ্যমান ও প্রচলিত ঐ বাস্তবতা থেকেই গড়ে তুলবে। ফলে একটি আপেক্ষিক ও সীমাবদ্ধ বাস্তবতাই তাদের কাছে পরম আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হবে, যার উপরে আর কিছু তাদের জন্য অকল্পনীয় হবে।

দ্বিতীয় যে কারণে বাস্তবতার আধিপত্য টেকসই হয়, সেটা হল মানব সমাজে ফেরাউনদের দৌরাত্ম্য। যাদের সুবিধাই এটা যে সমাজের আদর্শ যেন এই বিদ্যমান বাস্তবতার মধ্যেই জট বেঁধে থাকে। ইত্যবসারে মর্ত্য থেকেও এক ধর্মের উদ্ভব ঘটবে। অর্থাৎ মর্ত্য থেকে এক আদর্শ দাঁড়িয়ে যাবে। যেহেতু তা মর্ত্যের, কাজেই তা পূর্ববর্তী আদর্শসমূহেরই পুনরাবৃত্তি বটে। ফলে ভবিষ্যৎও হবে পুনরাবৃত্তিপূর্ণ, যা মর্ত্য থেকেই উৎসারিত। বাকের সদর মনে করেন, এসব নিকৃষ্ট আদর্শকে রক্ষার লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে এগুলোকে ধর্মীয় মোড়কে ঢেকে ফেলা হয় এবং বিশেষ এক পবিত্রতা দান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এরূপ নিকৃষ্ট আদর্শের কোনটাই ধর্মীয় আবরণ বিবর্জিত নয়। এ ধর্মীয় মোড়ক প্রকাশ্যও হতে পারে। আবার গোপন ও অন্য কোন লেবেলের মোড়কেও হতে পারে। ফলে আদর্শ, সেটা যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন, তা ইলাহ্ তথা উপাস্যের স্থান দখল করে বসে যায়। আর এর সাথে সমাজের মানুষদের সম্পর্ক হয় পূজা-অর্চনা ও উপাসনার সম্পর্ক।

তবে এখানে একটা পার্থক্য রয়েছে। তা হল, যেসব ধর্মাচার এ সমস্ত নিকৃষ্ট ও পতিত আদর্শকে উপস্থাপন করে, তারা এই আদর্শের দাবি অনুসারে একেকটি সংকীর্ণ ধর্মাচার বটে। কারণ এই আদর্শ মানুষের দীর্ঘকালের ও

দূরবর্তী ভবিষ্যতের জন্য নিছক একশ্রেণির সাময়িক ও বিক্ষিপ্ত কল্পনারাশি ছাড়া কিছুই যোগায় না, অথচ তদ্‌সত্ত্বেও আদর্শ হওয়ার সুবাদে এমুহূর্তে সেটা তাদের নিকট বানোয়াটভাবে নিরঙ্কুশ ও অসীমের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাকের সদর ইঙ্গিত করে বলেন, নিরঙ্কুশ মর্যাদা দাবি কারী[৮১] এসব নিকৃষ্ট ও সসীম আদর্শগুলো হচ্ছে একেকটি তুচ্ছ ও সীমাবদ্ধ ধর্মাচার। যা বিভেদ ও অনৈক্যর কারণও বটে। আর এগুলোই একত্ববাদী ধর্মের বিপরীতে অবস্থান নেয়। যেমনটা ফেরাউন খোদার দাবী করে অবস্থান নিয়েছিল মূসার বিপরীতে।

আর যে সমাজ বা জাতি এরূপ মানব জীবনের সংকীর্ণ বাস্তবতা থেকে উৎসারিত প্রতীক ও আদর্শসমূহকে অর্চনা করে, তাদের জন্য ইতিহাসের গতি একটি একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন গতি হিসাবে দেখা দেয়। ফলে যেহেতু তারা অতীতকে নিজের বর্তমানে আর বর্তমানকে নিজের ভবিষ্যতে স্থানান্তর করে থাকে, একারণে প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনই ভবিষ্যৎ নেই। তাদের ভবিষ্যৎ বলতে তাদের অতীতেরই রোমন্থন ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে এসব বানোয়াট আদর্শ অচিরেই স্বীয় কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে এবং সমাজ একটি বিক্ষিপ্ত সমাজে রূপান্তরিত হবে। এই ভিন্ন পরিস্থিতিতে আর কোন উম্মাহ (তথা জাতি)-ই অবশিষ্ট থাকবে না। বরং উম্মাহ্‌র সদৃশ কিছু অবশিষ্ট থাকবে। বাকের সদর এরূপ অবস্থার নাম দিয়েছেন 'ছায়া সমাজ'। এ সমাজের সদস্যরা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে এবং নিজের সংকীর্ণ চিন্তা ও চেতনায় বিভোর থাকে। কারণ আর কোন আদর্শই তাদের সামনে বিদ্যমান নেই যাকে ঘিরে শক্তির উৎস্যসমূহ সমবেত হবে, প্রতিভাসমূহ যার দ্বারা আকৃষ্ট হবে এবং সর্বোপরি যার কারণে ত্যাগ স্বীকার করা হবে। ব্যর্থ সমাজ তখন হয়ে ওঠে স্বার্থপর। মানুষ সেখানে কেবল নিজের চাহিদাসমূহ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত হয়। আর ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত বিষয় ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করে। বাকের সদর এরূপ ছায়া সমাজের তিনটি সম্ভাব্য পরিণতির আভাস দিয়েছেন :

c_gZ, ভিনদেশিদের আগ্রাসনের বিপরীতে পরাজয় বরণ। ঐরূপ পরাজয়, যেরূপ পরাজয় বরণ করেছিল মোগলদের আক্রমণের বিপরীতে 'উম্মত'র সারসত্তা শূন্য মুসলমানরা।

wØZxqZ, বিজাতীয়দের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া এবং সর্বোতভাবে তাদের অনুসরণ করে চলা। বিজাতীয়রা, যারা ঐ পরস্পর বিক্ষিপ্ত হওয়া সমাজ তথা জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কেননা, যে জাতি তাদের অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত হওয়া প্রতীক তথা আদর্শকে হারিয়ে ফেলে তারা মূলত নিজেদের স্বকীয় পরিচয়সত্তাকেই হারিয়ে ফেলে। এরূপ অবস্থায় আদর্শের শূন্যতা পূরণকল্পে তারা বাইরে থেকে আমদানী করা বিজাতীয় আদর্শের অন্বেষণে নামে এবং তাতেই ঝুঁকে পড়ে ও অনুসরণ করতে থাকে।

বাকের সদরের উপরোক্ত এ মূল্যায়নটি বহুলাংশে মিলে যায় উনবিংশ শতকের শেষভাগের এবং বিংশ শতকের প্রথমভাগের মুসলমানদের অবস্থার সাথে। এ সময়কালে পশ্চিমা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি মুসলমানদের অতিমাত্রায় আসক্তি এতটাই প্রকট রূপ ধারণ করে যে তাদের সমগ্র চিন্তা-চেতনাই পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং মানুষদের জীবনযাত্রায়ও তা ভর করে। ফলে সবকিছুতেই তারা পাশ্চাত্যের অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ মুসলিম সমাজের দেহে পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ঢালাও অনুপ্রবেশ রোগের ঔষধ নয় বরং রোগের সংক্রমণ হিসাবেই বেশি তুলনীয় ছিল। বাকের সদর তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের সংস্কার পদক্ষেপকে এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

[৮১]. এরূপ দাবিকারী আদর্শসমূহ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে :ÔG¸‡jv †Zv †Kej gvÎ bvg, hv †ZvgivB Ges †Zvgv‡`i ce-ciæliv †i‡L‡Qv'- দ্র. আল-নাজ্‌ম : ২৩।

ZZxq সম্ভাব্য পরিণতিটি হতে পারে সমাজকে পুনরায় তার আপন পরিচয়ে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস। জাতির প্রাণে তার নিজস্ব আদর্শের বীজকে পুনর্বার বসিয়ে দেওয়া। যাতে এই বার এর ফলসমূহ আধুনিক যুগের উপযুক্তরূপে ফলে। বাকের সদর এ প্রসঙ্গে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের উদাহরণ টেনেছেন। ইরানের শাহ্ রেজা খান চেয়েছেন পশ্চিমা সমাজের আদর্শকে ইসলামি ভূ-খণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করতে। অপরদিকে নতুন ইসলামি আন্দোলনের চিন্তাবিদরা চেয়েছেন আসল আদর্শের বীজকে পুনর্বার উম্মাহ্-এর উর্বর ভূমিতে বুনতে। উপমহাদেশের অন্যতম সমাজচিন্তক ও দার্শনিক ড. ইকবাল লাহোরি'র প্রয়াসকেও এখানে উদাহরণ হিসাবে যোগ করা যেতে পারে। তাঁর *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* গ্রন্থটি মূলত এই প্রকারের সমাজ সংস্কারেরই সনদ স্বরূপ। পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় কৃষ্টিকে তিনি অন্তঃসারশূন্য দেখেছেন এবং একারণে স্ব-ভূমের মুসলিম জাতিকে তিনি আপন সত্তায় ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত খুদী-তত্ত্ব এ আহ্বানেরই ব্যাখ্যা বিশেষ। তবে এজন্য প্রয়োজন ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন।

‘B. msKxY ‘wói cZxK ev Av‘k

নিকৃষ্ট উপাস্য সম্বলিত সমাজ নিয়ে প্রথম প্রকার আদর্শের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হল। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে এক পা সামনে অগ্রসর হলেই পরিলক্ষিত হবে যে পুনরাবৃত্তিমূলক আদর্শসমূহ অচিরেই সমাজের বিশ্বাস ও ঐ বিশ্বাসের প্রতি তাদের আগ্রহকে কীভাবে মূল্যহীন ও নিষ্প্রভ করে ফেলে এবং কীভাবে একটি সেকেলে সমাজে পরিণত হয়। বাকের সদরের ভাষায় যা পরিণত হয় একটি 'ছায়া সমাজে'। এটাও ব্যাখ্যা করা হল যে এরূপ ছায়া সমাজ ইতিহাসের গতির নিরিখে কীভাবে সম্ভাব্য তিন ধরনের পরিণতির মধ্যে যে কোন একটি পরিণতি বরণ করে নেয়।

এরপর বাকের সদর দ্বিতীয় প্রকারের প্রতীক তথা আদর্শের পরিচয় জানার জন্য এবার এক পা পিছনে ফেলার আহ্বান জানান। তবেই দ্বিতীয় প্রকারের উপাস্য দৃষ্টিগোচর হবে। দ্বিতীয় প্রকারের এ আদর্শ জাতির ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা হতে উৎসারিত। এই আদর্শ, বিরাজমান বাস্তবতার পুনরাবৃত্তির ব্যাখ্যা নয়। বরং এটা ভবিষ্যতের প্রতি একরাশ প্রত্যাশা এবং নতুন সৃষ্টির প্রতি একান্ত উদ্দীপনা। কিন্তু এ ধরনের যে আদর্শগুলো, যদিও জাতির ভবিষ্যতের প্রতি এগুলোর দৃষ্টি থাকে, তদ্সত্ত্বেও এগুলো হল সংকীর্ণ প্রত্যাশা সম্বলিত সসীম আদর্শ। ভবিষ্যতের সংক্ষিপ্ত সময়কালই এদের দৃষ্টিতে থাকে। এই আদর্শ যেহেতু সংক্ষিপ্তকালীন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে অপেক্ষাকৃত জোরদারভাবে দৃষ্টিতে রাখে, একারণে এটা একটি কার্যকর আদর্শ বটে। কিন্তু এর বড় দুর্বলতাটা তখনই প্রকাশ পায় যখন এই সসীম আদর্শটি নিরঙ্কুশ আদর্শের স্থান দখল করে নেয়। এর ফলে এই সসীম আদর্শই ঐ নিরঙ্কুশ ও পরম আদর্শে পৌঁছুবার পথে অন্তরায় হয়। বিপদ হল এটা যে আমরা এই খণ্ডকালের সীমাবদ্ধ আদর্শকে অনুভূমিক ও উল্লম্বিকভাবে সার্বিকীকরণ করে ফেলি। অনুভূমিকভাবে যে আমরা সার্বিকীকরণ করে ফেলি এরূপ একটি উদাহরণ দিয়ে বাকের সদর বলেন, যেমন ঐ আদর্শে পৌঁছুতে হলে আমাদের দুর্বার চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হয়। অথচ এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত পরিসরের সীমাবদ্ধ আদর্শই সম্মুখে। ফলে অচিরেই মানুষ এই আদর্শের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং এই প্রত্যাশার সবচেয়ে দূরবর্তী ঠিকানার নাগাল পেয়ে যায়। আর ঠিক তখনই এই আদর্শ মানুষের অগ্রগতি ও উন্নতির পথে এক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এটা একটা প্রতীক তথা আদর্শ হয়ে গেছে এবং একটি উপাস্য ও ধর্মে পরিণত হয়েছে। এখন এটা একটি বিরাজমান বাস্তবতা এবং অবশেষে প্রকৃত পূর্ণতার অভিমুখে মানুষের অগ্রসর হওয়ার পথে একটি দুর্গম গিরিপথে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইকবাল লাহোরি'র একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেন :

> ‘ইউরোপের আদর্শবাদ কখনও তার ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে প্রাণবন্ত শক্তিরূপে ক্রিয়া করেনি। এর ফল দেখা দিয়েছে কতকগুলো পরস্পর অসহিষ্ণু গণতন্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে দরিদ্র-শোষণে ধনপতিদের সুযোগ সৃষ্টির রূপে। মানুষের নৈতিক অগ্রগতির পথে ইউরোপ আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবলতম প্রতিবন্ধকস্বরূপ। পক্ষান্তরে মুসলিম জাতিপুঞ্জ ঐশীবাণীর সহায়তায় এমন একটি চূড়ান্ত আদর্শের অধিকারী যার বাণী উদ্‌গত হয় জীবনের নিগুঢ়তম গভীরতা থেকে এবং যা মুসলিম জীবনের আপাতঃবহির্মুখী প্রকাশকে অন্তর্মুখী গতি দান করে। একারণে একজন সাধারণ মুমিনের কাছেও জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি এমন একটি দৃঢ় বিশ্বাসের ব্যাপার যে, তার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে সে দ্বিধাবোধ করবে না।’[৮২]

বাকের সদরের দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন যুগের ইউরোপের জন্য ‘স্বাধীনতা’র তাৎপর্য, এই দ্বিতীয় প্রকারের আদর্শের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। তাদের নিকট ‘স্বাধীনতা’র শ্লোগানই ইলাহ্’র স্থান দখল করে বসলো। এছাড়া আমরা আজকের সভ্যতার অঙ্গনেও এই আদর্শের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে এই সত্যকে অনুভব করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে যে ‘জাতীয়তাবাদ’ (Nationalism) বিভিন্ন জাতির পক্ষ থেকে একটি আদর্শ হিসাবে ধারণ করা হল, প্রথমে এরূপ প্রতিফলন করতে লাগলো যে, এসব জাতির কলিজায় নতুন আত্মার সঞ্চারণ করেছে। কিন্তু অচিরেই জাতীয়তাবাদ যে সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করতো, জাতিসমূহ সেগুলোতে উপনীত হওয়ার পর এই আদর্শের প্রান্তসীমায় গিয়ে যখন থেমে গেল, তখনই তারা একরাশ শূন্যতা, পতন, অবসন্নতা এবং অবিরাম বৈপরীত্যের সম্মুখীন হল। হয়ত তখন এর অমান্যও করল কেউ কেউ।

আর উল্লম্বিকভাবে সার্বিকীকরণ (তথা কালক্রম), যার কথা বাকের সদর উল্লেখ করেন, তা হল সময়ের পরিক্রমায় যে মানব গোষ্ঠীসমূহ গঠিত হয়। এই যে কালের পরিক্রমায় একগুচ্ছ পরিবারের একত্রে সমবেত হয়ে গোত্র গঠন, গোত্রসমূহের একত্রিত হয়ে উপজাতি গঠন, উপজাতিসমূহের একত্রিত হয়ে ‘উম্মাহ্’ তথা জাতি গঠন। বাকের সদরের দৃষ্টিতে, মানব সমাজের ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় এ সমস্ত তাৎপর্যের ইতিবাচক ক্রিয়াশীলতা থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে নিরঙ্কুশ বলে গণ্য করা ঠিক নয় যে মানুষ এর জন্য যুদ্ধ ও লড়াই করতে পর্যন্ত প্রস্তুত থাকবে। কেননা, বাকের সদরের দৃষ্টিতে ‘সত্যিকার নিরঙ্কুশ আদর্শ’-ই একমাত্র আদর্শ, যার জন্য মানুষের সংগ্রাম ও যুদ্ধ করা মানায়। আসলে সংকীর্ণ ও সসীম বিষয়কে পরম আদর্শের স্থলে বসানো এবং সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও মানবিক পর্বগুলোকে নিরঙ্কুশ বলে মনে করাই হচ্ছে এধরনের আদর্শ নির্বাচনের ক্ষতিকর দিক। Av‡j-KziAv‡b যে ‘মরীচিকা’[৮৩] এবং ‘মাকড়সার বাসা’[৮৪]র উপমা টানা হয়েছে, বাকের সদরের মতে, তা দ্বারা এরূপ ক্ষণস্থায়ী ও সসীম আদর্শগুলোকেই বুঝানো হয়েছে।

Av‘k, gwZ‡Z cwiYZ nIqv

বাকের সদর মনে করেন, অনেক ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের আদর্শ অব্যাহত থেকে দ্বিতীয় প্রকারের আদর্শে রূপান্তর লাভ করে। অর্থাৎ প্রথমে ইতিবাচক তবে সংকীর্ণ কামনা ও আকাঙ্ক্ষাকেই আদর্শ হিসাবে দৃষ্টিতে রাখা হয়।

---

[৮২]. ড. মুহাম্মদ ইকবাল, ‘¨ wiKb÷vKkb Ae wiwjwRqvm _U Bb Bmjvg, বঙ্গানু. অধ্যক্ষ ইবরাহী খাঁ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ২২৬-২২৭।

[৮৩]. ÔhvivAwekvmx, Zv‡`i Kg giæfwgi giwPKvi b¨vq, wccvmvZ hv‡K cwb g‡b K‡i _v‡K wKš‘ †m Ii wbKU Dcw¯’Z n‡j †`L‡e Zv wKQB bq Ges †m †mLv‡b Avjøvn‡K cv‡e, AZtci wZwb Zvi Kgdj cYgvÎvq †`‡eb, Avjøvn †Zv wnmve Mn‡Y ZrciÕ - নূর : ৩৯।

[৮৪]. ÔhvivAvjøvni cwie‡Z Ab¨‡K AwffveKiƒ‡c MnY K‡i Zv‡`i ‘óvšÍ gvKomv, †h wb‡Ri Ni ˆZwi K‡i Ges N‡ii g‡a¨ gvKomvi NiB †Zv ‘ejZg, hw` Iiv RvbZÕ- আনকাবুত : ৪১।

এরপর যখন এ চাওয়া পূরণ হয়ে যায়, তখন সেটা একটি বিরাজমান বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয় এবং প্রথম প্রকারের আদর্শের স্থলে বসে যায় এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলোই ধারণ করে। এ অধ্যায়ে জাতি চারটি পর্যায় অতিক্রম করে থাকে।[৮৫] প্রথমত জাতির কামনা ও প্রত্যাশা থেকে নেওয়া আদর্শের গতিশীলতা, যদিও এসব কামনা ও প্রত্যাশা সসীম বটে। বাকের সদরের দৃষ্টিতে এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র সাড়া দেওয়াটা KiAv‡b[৮৬] বর্ণিত সেই 'আল-আতা আল-আজিল' (-العطاء العاجل সত্ত্বর দান)। প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী দান জাতির ধারণক্ষমতা ও চাওয়া মাফিকই হবে। এই চাওয়া সীমাবদ্ধ পরিসর হেতু, অবধারিত হওয়া সত্ত্বেও ইহ্‌লোক ও পরলোকে জাহান্নাম ব্যতীত কোন পরিণাম লাভ করবে না।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হচ্ছে এ 'সত্ত্বর দান'-এর বাস্তব রূপ লাভের পর্যায়। বাকের সদরের ভাষায়, এ পর্যায়ে আদর্শ পরিবর্তিত হয় মূর্তিতে। অন্যকথায়, সসীম ঐ আদর্শ যা বাস্তব রূপ লাভ করেছে, তা একটি ভাস্কর্যে রূপান্তরিত হয়। আর যে সকল নেতা জনগণের অগ্রভাগে থেকে পথ প্রদর্শন ও নেতৃত্ব প্রদান করছিল, তারা 'নেতৃত্ব'র স্থান থেকে 'মহান' এর স্থানে উন্নীত হয়। অপরদিকে সাধারণ জনগণ, যারা আদর্শ অবধি নতুনত্ব ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল, তারাও এ পর্যায়ে একটি অনুগত ও অনুদাস দলে পরিণত হয়। বাকের সদরের মতে, Avj-KiAv‡bi নিম্নোক্ত আয়াতে এই দ্বিতীয় পর্যায়েরই বিবরণ এসেছে এভাবে :

> 'তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও জ্যেষ্ঠ লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। সুতরাং তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দান করুন।'[৮৭]

তৃতীয় পর্যায়টি হচ্ছে এসবের ঐতিহাসিক প্রলম্বন। প্রকৃতপক্ষে নতুন শক্তি একটি শ্রেণিতে পরিণত হয়, যার মসনদ পারিবারিক কিম্বা শ্রেণিগত পদ্ধতির ভিত্তিতে অথবা উত্তরাধিকার ও স্থলাভিসিক্তের ন্যায় অন্য কোন রূপে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছায়। এভাবে চলতে চলতে এ শ্রেণিটি একটি বিলাসী ও বৈভবের শ্রেণিতে পরিণত হয়, যারা বৃহৎ কোন লক্ষ্য তথা প্রত্যাশাও নিজেদের সামনে স্থির করেনি। শুধু কেবল তাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বিষয়েই গুরুত্ব প্রদান ব্যতীত তারা আর কিছু চিন্তা করে না। তৃতীয় পর্যায়টি হচ্ছে জাতির একে অপর থেকে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর্যায়। বিশেষ করে যখন পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট বাস্তবে সংঘটিত সত্যিকার আদর্শের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়।

আর চতুর্থ পর্যায়টি হচ্ছে অপরাধীদের জাতির উপর আসীন হওয়া এবং কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হওয়া, যা সবগুলো পর্যায়ের মধ্যে বিপজ্জনক। যেমনভাবে KiAv‡b বলা হয়েছে :

> 'এরূপে প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধান করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে, কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে।'[৮৮]

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইউরোপে হিটলার এবং নাৎসীদের উত্থান ছিল নতুন ইউরোপে সংকীর্ণ তথা সসীম আদর্শের ফল, যা ক্রমান্বয়ে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক আদর্শে পরিণত হয় এবং নাৎসী যুগে একে অপর থেকে ছিন্ন হয়ে যায়।

---

[৮৫]. বাকের সদর, Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৫।

[৮৬]. †KD cw_e mL-m‡¤vM Kvgbv Ki‡j Avwg hv‡K hv B"Qv mËi w'‡q _wK| c‡i Ii Rb¨ Rvnvbvg wbavi Y Kwi| †mLv‡b †m wbw›'Z I AbMn n‡Z 'ixKZ Ae¯vq c‡ek Ki‡e| Avi hviv wekvmx n‡q ci‡jvK Kvgbv K‡i Ges Ii Rb¨ h_vh_ †Póv K‡i, Zv‡'iB †Póv ¯xKZ n‡q _v‡K| †Zvgvi cwZcvjK Avcb 'vb Øviv G‡'i Ges I‡'i mvnvh¨ K‡ib Ges †Zvgvi cwZcvj‡Ki 'vb AeawiZ| দ্র. Avj-KiAvb, বনি ইসরাঈল : ১৮-২০।

[৮৭]. cv¸³, আহ্‌যাব : ৬৭।

[৮৮]. cv¸³, আনআ'ম : ১২৩।

wZb. mwZ¨Kvi Z_v cig Av‘k

তৃতীয় তথা সত্যিকার আদর্শটি হলেন স্বয়ং মহামহীম্ আল্লাহ্। মানুষ আদর্শের সম্মুখীন হওয়ার বেলায় নিরঙ্কুশ ও শর্তসাপেক্ষের মাঝে এবং সসীম ও অসীমের মাঝে চ্যালেঞ্জকে সমাধান করতে সক্ষম হয়। বাস্তবে মানুষের দিগন্তসীমা সসীম। একারণে সে নিরঙ্কুশ জ্যোতি থেকে যে জ্যোতি পাবে, সেটাও শুধু আভা ব্যতীত আর কিছুই হবে না। কিন্তু এই জ্যোতির আভাগুলোকেই আদর্শ বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়, যেমনটা দ্বিতীয় প্রকারের বেলায় ঘটে থাকে। বরং আদর্শ আর মানবের সীমাবদ্ধ ধারণক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করা বাঞ্ছনীয়, যে মানুষ নিরঙ্কুশ জ্যোতির আভাগুলোর চেয়ে বেশি কিছু ধারণ করার সক্ষমতা রাখে না। একারণেই ইসলামে মনোজাগতিক অস্তিত্ব ও মহামহীম আল্লাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য করার আবশ্যকতা গুরুত্ব পায়।

বাকের সদর KiAv‡bi 'হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কৃচ্ছ সাধন করে থাক পরে তুমি তা দেখতে পাবে'[৮৯]-এ আয়াতের আলোকে বলেন যে, মানুষ তার আপন জীবনে চলার পথে এক কঠিন তবে আল্লাহ্ অভিমুখে পূর্ণতার দিকে চলমান রয়েছে। বাকের সদর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন[৯০], আলোচ্য আয়াতটি একটি বাস্তব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। এমন নয় যে এদ্বারা মানুষকে এই পথে চলার কথা বলা হয়ে থাকবে। এমনকি অংশীবাদীরা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের আদর্শের অনুসরণকারীরাও মহান আল্লাহ্‌র অভিমুখে অগ্রসরমান রয়েছে। পার্থক্য শুধু দায়িত্বশীলতার সাথে অগ্রসর হওয়া আর দায়িত্বহীনতার সাথে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে। যখন নিরঙ্কুশ আদর্শের প্রতি মানুষের এগিয়ে চলাটা হবে জ্ঞাতসারে এবং তা সঠিক পথে স্থাপিত হবে, তখন সেটা হবে দায়িত্বশীলতার সাথে অগ্রসর হওয়া (অর্থাৎ ইবাদত)। কিন্তু যখন এগিয়ে চলাটা সজ্ঞাতে হবে না, তখন সেটা অগ্রসরতা ঠিকই, আল্লাহ্‌র অভিমুখে পরিভ্রমণ, কিন্তু সেটা হবে দায়িত্বহীন পরিভ্রমণ। কখনো কখনো এটাকে মরীচিকার পিছনে ছুটে চলার সাথে উপমা দেওয়া হয় এভাবে-

> 'যারা মরীচিকার পিছনে ছুটে চলে, যখন সেখানে পৌঁছায়, কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু মহামহীম আল্লাহ্‌কে পায়, যিনি তাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণে ক্ষিপ্র।'[৯১]

এই যে পরিভ্রমণ, এটা কোন স্থানিক পরিভ্রমণের ন্যায় একস্থান থেকে আরেক স্থানে ভ্রমণ নয়। এরূপ নয় যে পথ অতিক্রম করবে যাতে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছুতে পারবে। কারণ আল্লাহ্ পথের শেষপ্রান্তে যেমন রয়েছেন, তদ্রুপ পথের মাঝেও রয়েছেন। একদিকে যেহেতু মহান আল্লাহ্ নিরঙ্কুশ সত্তা এবং অসীম, পথেরও তদ্রূপ কোন শেষ নেই। প্রত্যেকে আপন আপন চেষ্টা ও অবগতি অনুযায়ী এ প্রচেষ্টা থেকে আদর্শকে পাবে। এমন কি যে লোকটি মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে, সেও আল্লাহ্‌কে পাবে। মোটকথা সসীম মানুষ আর অসীম আদর্শের মধ্যে এক অশেষ ব্যবধান থেকে যাবে। এমন একটি বিষয়, যা মানুষের নব-উদ্‌ঘাটনের অসীম ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করবে। এই আদর্শ মানুষের পরিভ্রমণে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করে। পরিমাণগত পরিবর্তন অর্থাৎ পথ অসীম হওয়া, যা মানুষের জন্য নব-উদ্‌ঘাটন ও পরিভ্রমণের অসীম ক্ষেত্র তৈরী করে। আর গুণগত পরিবর্তন অর্থাৎ মানুষকে নিরঙ্কুশ ও নিজ থেকে পৃথক আদর্শ সম্পর্কে দায়িত্বপরায়ণ করে। এই দায়িত্ব মানুষের খোদায়ী আত্মার সাথে তার মাটির সীমাবদ্ধ স্বভাব-প্রবৃত্তির চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে যায় এবং নিরঙ্কুশ আদর্শের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

---

[৮৯]. Avj-KiAvb, ইনশিক্বাক : ৬।
[৯০]. বাকের সদর, Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।
[৯১].Avj-KiAvb, নূর : ৩৯।

বাকের সদর এই আলোচনার ধারায় ঐশীপুরুষদের চ্যালেঞ্জসমূহের প্রতি ইশারা করেন, যারা মানুষদের মাঝে প্রতিমূর্তিতে পরিণত হওয়া নিকৃষ্ট ও সসীম আদর্শের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। এ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তৃতীয় প্রকার আদর্শের অনুসরণকারীদের সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার আদর্শের অনুসারীদের চ্যালেঞ্জ।

এই যে আদর্শ, যার প্রতি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জন্মায়, তা শুধু মানুষের অভ্যন্তরীণ সারবস্তুকে রঙীন করার অনুঘোটক। মানব অভ্যন্তরের এই সারবস্তুর সামনে যতসব অর্থনৈতিক, সামাজিক বা অন্যকোন প্রভাবশীল নিয়ামক এসে দাঁড়ায়, তার বিপরীতে এ আদর্শ কঠোর ভূমিকা রাখতে পারে। এর বিপরীত যে বক্তব্য মার্কস্‌বাদ ও অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ উত্থাপন করে থাকে তা সঠিক নয়। কেননা, তারা মানুষের বিশ্বাসকে ঐসব সামাজিক বা অর্থনৈতিক নিয়ামকের ফল বলে পরিচয় দেওয়ার চষ্টা করে এবং এরূপ প্রতিপন্ন করতে চায় যে মানুষের অভ্যন্তরীণ বস্তুসারও ঐসকল ঘটনাপ্রবাহ থেকে জন্ম নেয়। এধরনের দার্শনিক তত্ত্বগুলো, যারা মানুষের আকীদা-বিশ্বাসের স্বরূপ বিশ্লেষণে এধরনের প্রবণতাকে ধারণ করেছে, তারা একশ্রেণির সুনির্দিষ্ট সমালোচনার হাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারেনি। কিন্তু বাকের সদরের উপস্থাপিত ব্যাখ্যা হচ্ছে এমন একটি চিন্তাধারা, যা মানুষের বিশেষ কোন প্রকার বিশ্বাস ও আচরণকে অনুসরণ করার কারণসমূহ ব্যাখ্যার পথে যেসব ত্রুটি ও সমস্যার কথা উত্থাপন করা হয়, সেগুলো অপনোদনকারী। তাছাড়া ইতিহাসের গতি যে গুণগত মূল্য ধারণ করে সে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এটা একটা উত্তম ব্যাখ্যা।

এভাবে বাকের সদরের দর্শন ইতিহাসের গতি তত্ত্বের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত ও বাস্তবতা বিবর্জিত মতবাদসমূহকে দূরে ঠেলে দেয়। কারণ এ চিন্তার ভিত্তিতে গতি হচ্ছে ইতিহাসের জন্য একটি অবধারিত ও অত্যাবশকীয় বিষয় নয় যে সব সময় তা সামনে চলবে। আবার এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই যে গতি চক্রাকার ও পুনরাবৃত্তিমূলক হবে। বরং ইতিহাসের গতিশীলতা ঐসমস্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল, যেগুলো ইতিহাসকে গতিশীল করে তোলে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা সামনের দিকে চালিত করার ও এগিয়ে নেওয়ার শক্তির অধিকারী থাকবে, ততক্ষণ ইতিহাসের গতিশীলতা ইতিবাচকভাবে ও সামনের দিকে অগ্রসরমান পরিবর্তন হিসাবে রূপ লাভ করবে। কিন্তু যদি তা ইতিহাসের গতিকে উন্নতি ও সামনের দিকে চালিত করতে না পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে ইতিহাসের গতি এক জায়গায় থেমে থাকবে এবং এক পা থেকে আরেক পায়ে ঘুরতে থাকবে সে কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

সামাজিক আদর্শ এবং সামাজিক অগ্রগতি যতই বাস্তবায়িত হতে থাকে, সামাজিক আদর্শের স্বরূপ ততই বেশি উন্নত হয়। যে সমাজের আদর্শ যত উন্নত, সেই সমাজের অগ্রগতিও তত বেশি।

ZZxq Aa¨vq

mgvRZË Ges ÔBm j vwg gvb lÕ ZË

ZZxq Aa¨vq

mgvRZË Ges ÔBmjvwg gvbIÕ ZË

ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পশ্চিমা বিশ্বে সমাজবিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। এ সময় থেকেই সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব প্রণয়ন শুরু হয়। তবে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব কোন আকস্মিক ঘটনার ফল নয়। বরং এর পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল শতাব্দী প্রাচীন চিন্তাধারা এবং সমাজ বিষয়ক দর্শন। জানা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক মনীষী ও দার্শনিকদের চিন্তাধারা সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে বিগত শতাব্দীর দৃষ্টবাদ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব বিকাশে ব্যাপক উৎসাহ যুগিয়েছে। মারকিউজ (Marcuse)-এর মতে, সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি এই দৃষ্টবাদের মধ্যে এবং দৃষ্টবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সমাজবিজ্ঞান একটি স্বাধীন অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর থেকে এর চর্চা অব্যাহত রয়েছে। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর বহু খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানীদের তত্ত্বে ও মতবাদে সমৃদ্ধ হয়েছে এ বিজ্ঞান।

সমাজ জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে কতকগুলো প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে। যেমন- সমাজ জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূল্য কি? সামাজিক বিজ্ঞানগুলো যেসব নীতি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে সেগুলো কি যথার্থ বা যুক্তিযুক্ত? এসব নীতি এবং পদ্ধতির যথার্থতা কীভাবে নিরূপণ করা যেতে পারে? ব্যক্তির যেমন একটা আদর্শ আছে, উদ্দেশ্য আছে; সমাজ জীবনেরও কি তেমনি আদর্শ ও উদ্দেশ্য রয়েছে? বস্তুত আমরা ব্যক্তির উন্নয়নের কথা যেমন বলি, সমাজ জীবনের উন্নয়নের কথাও তেমনি বলি। বাকের সদর তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ dvjmvdvZbv-র মধ্যে বলেন :

> "যে সমস্যাটি দীর্ঘকাল ধরে মানুষের চিন্তাকে ব্যস্ত রেখেছে সেটা হচ্ছে সেই সামাজিক বিষয় যা নিম্নোক্ত এ প্রশ্নটির উত্তর হবে যে, 'কোন্ সমাজব্যবস্থা মানুষকে সামষ্টিক জীবনে তাকে সৌভাগ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম?"[১]

-তাঁর মতে এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। স্বভাবতই এ প্রশ্নটি এবং এর উত্তর মানব চিন্তায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর এর উত্তরের ধরনটাও সমাজসমূহের সৌভাগ্য অর্জনে মৌলিক ভূমিকা রাখে। কারণ একটি সামাজিক ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি ব্যাপার, যার সাথে সমাজের জীবন ও অস্তিত্বের সম্পর্ক জড়িত।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পৃথিবীতে গভীর দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধও পর্যন্ত গড়িয়েছে। অনেক বিপর্যয় ও অনেক দুঃখ-সুখের ইতিহাসও রচিত হয়েছে। কেননা, উত্তর হিসাবে যেসব বাদ-মতবাদের অবতারণা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বিচ্যুতি বিভ্রান্তিও কম ঘটেনি। যার ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন সমাজ চিন্তা ও দর্শনের।

বাকের সদর মানুষের সমাজচিন্তার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় এধরনের মতবাদগুলোর মধ্যে মোট চারটি সমাজব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন। যথা :

১. পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা
২. সমাজতন্ত্র
৩. কমিউনিজম
৪. ইসলামি সমাজব্যবস্থা

---

[১]. বাকের সদর, dvjmvdvZbv,বৈরুত : দার আত-তাআরুফ, ১৯৮৯, পৃ. ১৭২।

অবশ্য বাকের সদর স্বীকার করেছেন যে বর্তমান বিশ্বে এগুলোর মধ্যে হতে মাত্র দুইটি সমাজব্যবস্থাই কার্যত সক্রিয় রয়েছে। সে দুটি হল পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রকে তিনি পৃথিবীর সিংহভাগ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, এ সমাজব্যবস্থা মানুষের জন্য উপস্থাপন করা হয় যখন একনায়কতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মজুতদারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল। এ সংগ্রামের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস চালানো হয়। এ মতবাদ ব্যক্তির প্রতি সীমাহীন বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। ব্যক্তির কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করাই সর্বসাধারণ সমাজের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করার নামান্তর। আর রাষ্ট্র হচ্ছে এমন এক প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তিদের সমর্থন করে থাকে এবং তাদের কল্যাণ নিয়েই ভাবে। এ মতবাদ চারটি বিষয়ে স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা :

ক) রাজনৈতিক স্বাধীনতা
খ) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
গ) চিন্তার স্বাধীনতা এবং
ঘ) ব্যক্তি-স্বাধীনতা।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার আওতায় প্রত্যেক ব্যক্তির বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। প্রত্যেকের চাওয়া ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা এবং আইন ও বিধান প্রণয়নে সকলের মতামত গ্রহণ করা হয়। নির্বাচন ও প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সকলেরই সমানভাবে রয়েছে। আইনের চোখেও সবাই সমান। আর এই সমান সমান হওয়ার কারণেই সরকার গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় প্রাধান্য পাওয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। তবে সংখ্যালঘু মতামতের প্রতিও সম্মান দেখানো হয়। এভাবেই সুখ ও সৌভাগ্যময় সমাজের ভিত্ রচিত হয়।

আবার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা গড়ে ওঠে মুক্ত অর্থনীতির ভিত্তিতে। অর্থাৎ উৎপাদন ও ভোগ করার মালিকানা থাকবে শর্তহীন ও সীমাহীনভাবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোন পথে ও পন্থায় সম্পদ অর্জনের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করবে। চিন্তার স্বাধীনতা অর্থাৎ মানুষ চিন্তা ও বিশ্বাসের দিক থেকে মুক্ত স্বাধীন। প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চিন্তা করতে পারে এবং যে কাজ করতে চায় তা করতে পারে। সে নিজের চিন্তা বিশ্বাসকে ঘোষণাও করতে পারে এবং স্বীয় মতামত ও বিশ্বাসের প্রতিরক্ষাও করতে পারে। এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, কোন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, নজরদারি, কৈফিয়ত ও দমন পীড়ন চলবে না।

অপরদিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার আওতায় প্রত্যেক ব্যক্তি আচার-আচরণে পূর্ণ স্বাধীন থাকবে, যতক্ষণ না অন্যের অধিকারের সীমা লঙ্ঘিত হয়। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, বাক্-স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা রয়েছে। কেননা মানুষ একটি স্বাধীন অস্তিত্বসত্তা। তারই সমগোত্রীয় অর্থাৎ অন্য আরেকজন মানুষের তার ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই।

এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা হল এমন একটি সেবা সংস্থার ন্যায় যে মানুষের উক্ত সকল স্বাধীনতা ভোগের ব্যবস্থা করে দিবে এবং সমর্থন ও নিরাপত্তা প্রদান করে যাবে, এর বেশি নয়।

1. cwRev‘x MYZ‡š¿i e¨vcv‡i ev‡Ki m‘‡ii gj¨vqb

বাকের সদর তাঁর dvjvmvdvZbv গ্রন্থের মধ্যে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দীর্ঘ মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন। তিনি এ মডেলের সমাজব্যবস্থায় প্রধানত যেসব জিনিসের ঘাটতি প্রত্যক্ষ করেছেন সেগুলো এভাবে বিবৃত করা যেতে পারে-

e¯ev‘x gZv‘k

বাকের সদর মনে করেন, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি মতাদর্শ যা মানুষের বিভিন্ন অধিকারের কথা বলে এবং মানুষের স্বাধীনতার প্রতিরক্ষা করে ঠিকই, কিন্তু এটা একটি বস্তুবাদী মতাদর্শ। মানুষকে বিচার করে নিছক একটি চিন্তাশীল প্রাণী হিসাবে। যার সমস্ত চেষ্টা ও লক্ষ্য কেবল খাওয়া-পরা আর কামনার নিবৃত্তি করা। অথচ মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দিকগুলোকে অবজ্ঞা করা হয়। কারণ চিন্তাশীল মানুষ তার অস্তিত্ব নিয়ে ভাবে। উদরপুর্তি ও যৌন কামনার নিবৃত্তিই মানুষের সব কিছু নয়। বস্তুবাদে যেহেতু মানুষের জন্য এই জৈবিক ও বস্তুগত দিকটির বাইরে তার আত্মিক ও বিশ্বাসগত দিক সম্পর্কে কোন নির্দেশনা থাকে না, সে কারণে মানুষের যখন জৈবিক চাহিদাগুলো ভোতা হয়ে যায় তখন সে তার অস্তিত্ব নিয়ে হতাশা ও নিরাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। এ মর্মে বাকের সদর বলেন:

> ‘নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হচ্ছে একটি বস্তুবাদী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় মানুষ তার উৎস ও গন্তব্য ঠিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে বস্তুগত মুনাফা অর্জন। তাছাড়া এ ব্যবস্থাটি ভিত্তি তথা নিম্ন কাঠামো (Base) হিসাবে সুবিন্যস্ত কোন দর্শনের অধিকারী নয় যার কোন মূলনীতিমালা ও ভিত্তিস্তম্ভ থাকবে।’[২]

AwfffveKmjf KZc ÿ‡K A¯xKvi

এ মতবাদে মানুষের জীবনকে সুশৃঙ্খল করবে এমন কোন অভিভাবকসুলভ কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান থাকার কথা অস্বীকার করা হয়। অর্থাৎ এখানে কোন দায়িত্বশীল প্রশিক্ষক তথা দীক্ষা দাতা নেই যে কৈফিয়ত চাইবে কিম্বা কোন ভুলত্রুটির সংশোধন করে দিবে। কারণ মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে স্বাধীন হয়ে। একইভাবে মানুষে মানুষে সামাজিক সম্পর্কের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা হয় না এ মতবাদে। এই যদি হয় বাস্তবতা তাহলে পশু আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকলো কোথায়! কেননা, তাদের কাছেও তো দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ ও সমাজব্যবস্থার মূল্য নেই।

ˆbwZK gj¨‡eva A_nxb

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক মানসে বস্তুবাদ প্রবল রূপ ধারণ করায় এখানে নৈতিক মূল্যবোধ অর্থহীন হয়ে পড়ে। বস্তুবাদ নৈতিক ও আত্মিক বিষয়াবলির জন্য কোন অবকাশ রাখেনি। যদি নৈতিক মূল্যবোধ বলে কিছু থাকে তাহলে সেটা নিহিত রয়েছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা পুরণের মধ্যে। এক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে যখন সর্বজনীন স্বার্থের সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থের বস্তুগত দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন ব্যক্তিগত স্বার্থই নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। তাদের কাছে নৈতিকতা এটাই যে পুঁজির মুনাফা বৃদ্ধি করতে হবে যে কোন মূল্যে। এমনকি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বংসের মূল্যেও হয়।

---

[২]. Cv¸ 3, পৃ. ১৭৬, ৩য় প্যারা।

msL¨vjNiv wb‡®úwlZ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অধিকাংশের ভোটের সমর্থনে সরকার গঠিত হয়। আর সম্পদশালী লোকেরাই ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যায়, যে সম্পদ তারা অর্জন করেছে বাজারে অসুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। ‘অসুস্থ’ বলার কারণ তারা শুধু ব্যক্তিস্বার্থ ও বস্তুগত মুনাফাই একমাত্র লক্ষ্য মনে করে। আধ্যাত্মিক বিষয়াবলির প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক মানসের ধারাই এরূপ। ফলে সংখ্যালঘুদের নিষ্পেষিত ও নিশ্চিহ্ন হওয়া ছাড়া কোন গতি থাকে না।[৩]

বাকের সদর স্বীয় মূল্যায়ন উপস্থাপন করার পর উপসংহারে বলেন:

> ‘এ থেকে আমরা আরেকটি নিদারুণ ফলাফলে উপণীত হই। আর তা হল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কর্তাব্যক্তিরা যেহেতু যথেষ্ট ক্ষমতাধর এবং তাদের গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনাও এটাই দাবি করে, সেহেতু তারা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে আরও অন্যান্য এলাকাকেও নিজেদের করায়ত্তে আনার চিন্তায় লিপ্ত হয় দু’টি কারণে। প্রথমত, প্রচুর উৎপাদনের জন্য প্রচুর কাঁচামালের দরকার হয়। আর যেহেতু কাঁচামাল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে, কাজেই ঐসব এলাকাও নিজেদের করায়ত্তে আনা প্রয়োজন, যাতে স্বল্পমূল্যে উক্ত দ্রব্যাদি হস্তগত করা যায়। দ্বিতীয়ত, তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য নতুন নতুন বাজারের প্রয়োজন। কারণ সাধারণ মানুষের জীবনমান খুবই নিম্ন। একারণে তারা এসব পণ্যের যথেষ্ট খরিদ্দার নয়। অপরদিকে শিল্পপতিদের পুঁজি বৃদ্ধির বাসনা যতশীঘ্র সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাবার কারণ হয় ।
>
> উপরোক্ত দু’টি কারণে উৎপাদনকারীদের মধ্যে এ চিন্তা অনিবার্যত কাজ করে যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য নতুন নতুন বাজার খুঁজে পেতে হবে। আর এ বাজার তখনই খুঁজে পাওয়া যাবে যখন নতুন নতুন এলাকা তাদের কর্তৃত্বের অধীনে নেওয়া সম্ভব হবে।’[৪]

2. KwgDwb÷ WKwUb Ges mgvRZ‡š¿i mv‡_ Gi m¤úK

বাকের সদর কমিউনিস্ট চিন্তার উপরও গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন। কমিউনিস্ট চিন্তা বলতে মার্কস্‌বাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদই উদ্দেশ্য। এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলি তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন দ্বান্দ্বিক ও বস্তুবাদ উভয়ই পুরাতন দুইটি তাৎপর্য; মার্ক্‌সের উদ্ভাবিত নয়। প্রাচীন দার্শনিক চিন্তা থেকেই এগুলো এসেছে এবং হেগেলের হাতে আরও পরিপুষ্টি লাভ করেছে। আর মার্কসের হাতে যা ঘটেছে তা হল কেবল পাশ্চাত্য সমাজগুলোর উপর এর ব্যবহার ও প্রয়োগ।

কার্ল মার্কস্‌ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে দুইটি পন্থায় প্রয়োগ করেছেন :

১. মানব ইতিহাসকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যে ইতিহাস বিরোধ ও দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে নিখাঁদ বস্তুগত পরিক্রমণ করে থাকে।

২. কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা। তবে সেটা হবে শ্রমিকের জন্য ‘উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব’ প্রত্যাখ্যানের ভিত্তিতে, যে মূল্য চুরি করে নেয় পুঁজিপতিরা।

৩. দ্র. cv¸³, পৃ. ১৭৯-১৮০।
৪. cv¸³, পৃ. ১৭৯-৮০।

কাজেই মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বাকের সদরও যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সে অনুযায়ী মানুষের জন্য সামাজিক বিষয়টি হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের বিষয়। সমাজের শ্রেণিসমূহের মধ্যকার সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চলবে যতক্ষণ না গোটা সমাজটাই একই শ্রেণিতে পরিণত হয়। আর এ অবস্থাকেই বলা হয় 'কমিউনিজম' তথা সমভোগবাদ।

পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শামিল সকল দেশের শ্রেণি সচেতন শ্রমিকদের হাতে মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে এক শক্তিশালী অস্ত্র। বলশেভিক পার্টির প্রথম খসড়া কর্মসূচি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন:

> '[মার্কসীয় তত্ত্ব] সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রকে এক কল্পনাবিলাস থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করেছে। এই বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং এই বিজ্ঞানের সমস্ত দিক বিশদভাবে আরও বিকশিত ও সম্প্রসারিত করার পথ নির্দেশ করেছে। কিভাবে জমি, কারখানা, খনির মালিক প্রভৃতি পুঁজিপতিদের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে কোটি কোটি বিত্তহীন মানুষের ক্রীতদাসে পরিণত শ্রম-ভাড়া ও শ্রমশক্তি ক্রয় ব্যবস্থা আড়াল করে রাখে তা ব্যাখ্যা করে আধুনিক পুঁজিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করেছে। এটা প্রমাণ করেছে যে কীভাবে আধুনিক পুঁজিবাদের সমগ্র বিকাশ বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ধ্বংস সাধনে চালিত হয় এবং ফলে এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি হয় যা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব ও প্রয়োজনীয় করে তোলে। সমস্ত রকমের বিত্তশালী শ্রেণির সঙ্গে বিত্তহীন জনগণ ও তাদের নেতা শ্রমিকশ্রেণির যে সংগ্রাম, সেই শ্রেণি সংগ্রামকে সমস্ত প্রচলিত রীতি, রাজনৈতিক কুটচক্র, প্রতারণাময় আইন ও জটিল শিক্ষার আবরণের আড়ালেও চিনে নিতে এ শিক্ষা দিয়েছে। এ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের প্রকৃত কর্তব্য সুস্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে- সমাজের পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনার উদ্ভাবন নয়, শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত করার জন্য পুঁজিবাদীদের ও তাদের তাঁবেদারদের প্রতি ধর্মোপদেশ নয়, ষড়যন্ত্র সংগঠনও নয়, বরং তা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির শ্রেণি সংগ্রাম ও এই সংগ্রামের নেতৃত্বে সংগঠন যার চুড়ান্ত লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণি কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংগঠন।'[৫]

কার্ল মার্কস্‌ অসাধারণ গুরুত্ব সহকারে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ঐতিহাসিক অগ্রগতির ধারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক বিকাশের অনিবার্য পরিণতি হল মূলধনের একীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ (concentration and centralization)। মূলধনের একচেটিয়া রূপ গ্রহণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবি জনসাধারণের চরম দারিদ্র ও দুর্দশার চিত্র বিশ্লেষণ করে মার্কস্‌ এর চরম পরিণতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে লিখেছেন :

> 'মুলধনের বৃহৎ মালিকগোষ্ঠীর সংখ্যা নিরবচ্ছিন্নভাবে হ্রাসপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে ব্যাপক দুঃখ-দারিদ্র-দুর্দশা, অত্যাচার-উৎপীড়ণ, দাসত্ব, অধঃপতন আর শোষণ; আর এর সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে ওঠে শ্রমিক শ্রেণির বিদ্রোহ বিপ্লব। সবকিছু সত্ত্বেও ধনতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধারার মধ্য দিয়েই দ্রুত বেড়ে যায় শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যা, তারা হয়ে ওঠে সুশৃঙ্খল, একতাবদ্ধ, সুসংগঠিত। মূলধনের যে একচেটিয়া অবস্থা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয় এবং বেড়ে ওঠে, মুলধনের সেই একচেটিয়া অবস্থাই সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার সামনে এক দুরতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভূত অবস্থা আর শ্রমের সামঞ্জস্যহীন সামাজিক রূপ ক্রমশ বেড়ে শেষে এমন একটা সীমায় এসে পৌঁছায় যেখানে ঐগুলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার খোলসের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। তখনই এই খোলস ফেটে যায় টুকরো টুকরো হয়ে, ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যুঘণ্টা বেজে ওঠে; শুরু হয় বঞ্চনাকারীদের বঞ্চিত হবার পালা।'[৬]

---

৫. লেনিনের সংকলিত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, "আমাদের কর্মসূচী", পৃ. ৪৯১ রুশ সংস্করণ- উদ্ধৃতিটি ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা হতে প্রকাশিত A. Leontiev রচিত *Political Economy* গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ 'মার্কসীয় অর্থনীতি' সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৯-১০) হতে উৎকলিত।

৬. Karl Marx, *Capital*, Vol. 1, P. 766.

মার্কস্ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ K¨vwcUvj-এ এই নতুন সমাজের মূলভিত্তির রূপরেখা অঙ্কিত করে গেছেন। তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিয়ে এই নতুন সমাজের অর্থাৎ কমিউনিজমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির রূপ এঁকে দিয়েছেন। যেমন- ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে সমগ্র সমাজের সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা, সুপরিকল্পিত বণ্টন, সামাজিক শ্রমের ভিত্তিতে দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন, উৎপাদনের সকল শাখার সুষম বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ, উৎপাদন-শক্তিগুলোর যুক্তিসম্মত ব্যবহার, শ্রমজীবি জনসাধারণের সৃজনীশক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি। এভাবে সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি সর্বজনীন রূপে বিস্তার লাভ করবে, পুঁজিবাদের কবর রচিত হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার।

বাকের সদর কমিউনিজমকে সমাজতন্ত্র থেকে পার্থক্য করে দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন কমিউনিস্ট অর্থনীতির তিনটি প্রধান ভিত্তি হচ্ছে -

১. কমিউনিস্ট অর্থনীতি ব্যক্তি মালিকানাকে নাকচ করে এবং সমাজের আইনগত প্রতিনিধি হিসাবে ন্যায়পর রাষ্ট্রের হাতে তা তুলে দেওয়ার আহ্বান জানায়।
২. পুঁজিবাদী শ্রেণিকে নাকচ করে দেয় এবং জনগণকে একই শ্রেণিতে একতাবদ্ধ করে। একজন ব্যক্তি তার সম্পদ কুক্ষিগত ও পুঞ্জীভূত করতে পারবে না। মানুষকে শোষণ করে কেবল নিজের কামনা বাসনা পূরণ করতে পারবে না।
৩. কমিউনিজমের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে ‘প্রত্যেকে সামর্থ অনুযায়ী কাজ করবে, প্রত্যেকে প্রয়োজন অনুযায়ী পাবে।’[৭]

এভাবে কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্রকে একটি আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে তারা পুরোপুরিভাবে এ মতাদর্শকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম না হয়ে এমন বিশ্বাস পোষণ করলো যে প্রথমে মানুষকে তার চিন্তাচেতনা ও মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এ ঘটনাকে বাকের সদর কমিউনিজমের বিচ্যুতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৮] কেননা তারা এমন এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করলো যাতে কমিউনিজমের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার আগে সমাজতন্ত্রের চর্চা ঘটাতে হবে। অতঃপর মানুষ যখন এ নিজ প্রকৃতি (অর্থাৎ ব্যক্তিপ্রেম) থেকে হাত গুটিয়ে নিবে এবং রূপান্তরিত প্রকৃতি (অর্থাৎ সামাজিক ও সামষ্টিকতা বোধ) এর প্রতি অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, কেবল তখনই কমিউনিজমের বিধি-নিয়মগুলো বাস্তবায়ন করা যাবে।

3. KwgDwb÷ A_©e¨e¯'v m¤ú‡K evK‡i m'‡ii AwfgZ

বাকের সদর মনে করেন, কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা মানবের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন নয় এবং মানুষের আবেগ অনুভবের দিকটিও বিবেচনায় রাখেনি। তারা মানবের প্রয়োজনসমূহকে নিরাপদ করেনি, যে প্রয়োজনগুলোর ব্যাপারে তাদের তাত্ত্বিক স্লোগান ও বক্তৃতাসমূহ সদা-উচ্চকিত। কেননা, কমিউনিজম ব্যক্তি মালিকানাকে নাকচ করে। অথচ এটা মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধ একটি সিদ্ধান্ত। মানুষের আত্মপ্রেম ও ব্যক্তি-স্বার্থবোধকে আদৌ কি পরিবর্তন কিংবা নির্মূল করা সম্ভব? মানুষ কল্যাণ বিচার করে তার ব্যক্তি-দৃষ্টির জায়গা থেকে, এটাই তার স্বভাবজাত। অথচ কমিউনিজমে এ ব্যক্তি-মানব প্রবৃত্তিকে গ্রাহ্যই করা হয়নি। ব্যক্তি মানবের সব আকাঙ্ক্ষা ও

---

৭. দ্র.বাকের সদর, dvjmvdvZbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১- ১৮২

৮. cv¸³, পৃ. ১৮২।

উদ্দীপনাকে দাবিয়ে রেখে তাকে এমন এক বাধ্যবাধকতার স্থানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যেখানে তার জন্য যেটুকু নির্ধারিত করা হবে তার বাইরে পা বাড়ানোর অধিকার তার থাকে না।

এ প্রসঙ্গে বাকের সদর এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা করে বলেন :

> 'জ্বি, মানুষ যদি ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে বসে, আর ময়দানে দৈত্যকায় সমাজ একচেটিয়া অবস্থান নেয়, তাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু [বিশেষ করে যখন এ ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ হচ্ছে নিছক বস্তুগত অস্তিত্বসত্ত্বা] এরূপ কিছু কি [কখনো] ঘটবে?'[৯]

তিনি যোগ করেন-

> 'কেবলমাত্র একটি অবস্থায় মানুষের মধ্যে এরূপ ভৌতিক পরিবর্তন সম্ভবপর, তা হচ্ছে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাওয়া এবং মানুষের প্রকৃতিই বদলে যাওয়া। অবশ্য কমিউনিস্টগণ বিশ্বকে এরূপ এক প্রতিশ্রুত স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন।'[১০]

তিনি বলেন :

> 'আমি পুনর্বার উচ্চারণ করছি যে, কমিউনিজম সামাজিক সমস্যার যে সমাধান উপহার দেয়, তা ত্রুটিপূর্ণ। এ পদ্ধতি স্পর্শকাতর জায়গায় অঙ্গুলি ইশারা করে না। [বরং] পুঁজিবাদের সমস্ত দুর্দশাকে মালিকানা নাকচ করার মাধ্যমে নিরসন করতে চায়। আর সমস্ত দোষ ব্যক্তিমালিকানার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়। অথচ যে কারণে অনেক দুর্ভোগের জন্ম, সেটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমস্যা, মালিকানা সমস্যা নয়। আর মালিকানা হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটি বিষয় মাত্র।'[১১]

4. ev‡Ki m'‡ii ÔBmjwg gvblÕ ZË

বাকের সদর উপরোল্লিখিত অর্থব্যবস্থাদ্বয়ের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন উপস্থাপন করার পর ইসলামি সমাজব্যবস্থার রূপচিত্র তুলে ধরেন। ঘটনাক্রমে বাকের সদরের সমসাময়িক যুগটিতে বিশ্বসমাজ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দুই মেরুতে এমনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল যে এর বাইরে আর কোন সমাজব্যবস্থা কিংবা অর্থব্যবস্থার অস্তিত্বই কল্পনা করা যেত না। আর ঠিক এ জায়গাতেই বাকের সদরের অনুযোগ। তিনি বলেন :

> "তাদের ধারণায় এ দুটি ব্যবস্থা ব্যতীত আর কোন ব্যবস্থা নেই। [কিন্তু] বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, পুঁজিবাদী মানুষ আর সমাজতন্ত্রী মানুষ নিজ মর্যাদা ও অধিকার থেকে কোনই উপকৃত হয়নি। কারণ, পুঁজিবাদে মানুষ হচ্ছে এমন কেউ, যার শ্রমশক্তির মুনাফার নির্যাস অন্য কেউ হরণ করে নেয়, আর সে শুধু মুনাফা প্রদানকারী। নিজের জীবন ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে তার কোন নিশ্চিন্ততা ও নিশ্চয়তা নেই। অপরদিকে কমিউনিস্ট মানুষ প্রতি ক্ষণে হুমকির সম্মুখীন থাকে, তার সমস্ত গতিবিধি থাকে নজরদারীতে এবং সর্বদা সে নিপীড়ণ, হত্যা ও বন্দীদশার সম্মুখীন হয়। সর্বক্ষণ আতঙ্কিত, জীবনের মুক্তির স্বাদ থেকে বঞ্চিত। অথচ তৃতীয় আরেক জন মানুষ রয়েছে। সে হচ্ছে 'ইসলামি মানুষ'। সে নিজের মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী এবং নিজের এ আদর্শে সে উপনীত হতে সক্ষম।"[১২]

---

[৯]. C\/¸ক্ত, পৃ. ১৮৪।
[১০]. C\/¸ ³, পৃ. ১৮৪।
[১১]. C\/¸ ³, পৃ. ১৮৫।
[১২]. দ্র.C\/¸ ³ |

বাকের সদর দাবি করেন, ইসলাম মানুষের বস্তু ও আত্মিক উভয় দিককে দৃষ্টিতে রাখে। ইসলাম সমাজসমূহের মূল ব্যথার স্থানে আঙ্গুল রাখে এবং মনে করে যে, মানব জীবনের প্রতি বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করা গেলেই অনেক সমস্যার উপশম সম্ভব। ইসলাম কমিউনিজমের ন্যায় ব্যক্তি মালিকানাকে নাকচ করে না। বরং এমন এক গভীর অর্থের আলোকে উত্থাপন করে যা মানবের অস্তিত্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুঁজিবাদের সাথেও ইসলাম একমত নয়। তবে সেটা একারণে নয় যে কমিউনিজম একথা বলে তাই। বরং এর কারণ হল ইসলামের নিজেরই আর্থ-সামাজিক স্বতন্ত্র দর্শন রয়েছে। ইসলামের চোখে পুঁজিবাদ হচ্ছে মানুষের সহজাত মূলচেতনাসমূহের পরিপন্থী। বিশ্বের জন্য দরকার মানব জীবনকে অন্য কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ভাবে দেখার। আর বাকের সদরের দাবি মতে, সে দরকার মেটাতে পারে ইসলামি দৃষ্টিকোণ। কারণ, ইসলাম একটি ধর্ম হিসাবে মানুষের প্রতি সঠিকতম দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। তিনি মনে করেন, নিম্নোক্ত সূত্রগুলো এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে -

১. নিশ্চয় মানুষের জীবন পরম পূর্ণতার উৎস থেকে উৎসারিত। ইসলামের ভিত্তিই হচ্ছে জীবনের সেই উৎসমূলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ।

২. পৃথিবীতে মানুষের সাধারণ জীবনে চলার জন্য কিছু নৈতিক মানদণ্ড রয়েছে।

৩. ধর্ম আত্মপ্রেম ও মানবপ্রেমের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। কেননা, আত্মপ্রেম হচ্ছে এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই সহজাতভাবে বিদ্যমান। কাজেই এটাকে নির্মূল করার কিংবা বদলে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা না করে বরং যেটা প্রয়োজন, তা হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

৪. মানুষের বৈষয়িক উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো একটি বৈধ ব্যাপার এবং সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা করাও বিধিসম্মত। কিন্তু তা হতে হবে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নিবেদিত ও পরিমিত মাত্রায়।

৫. ধর্ম হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং মন্দ হতে প্রতিরক্ষায় নিরাপত্তা কপাটস্বরূপ। একইভাবে ধর্ম হচ্ছে মানুষের জন্য বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় জীবন দর্শন।

৬. ইসলাম মানব জীবনের জন্য কোন কাল্পনিক ব্যাখ্যা নয়, বরং প্রকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে। আর জীবনযাপনের সুযোগকে করেছে পরিব্যপ্ত এবং মানুষকে জীবনের প্রতি করেছে উদ্বুদ্ধ। তাই ইসলাম সামগ্রিক মূলনীতি ঘোষণা করেছে এভাবে-

> 'যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে তা তার নিজের জন্যই করলো, আর যে মন্দ করবে তা তার বিরুদ্ধে যাবে।'[১৩]

এরই সূত্র ধরে বাকের সদর বলেন :

> '[ইসলাম] জীবনের প্রকৃত ব্যাখ্যাকে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নির্ধারণ করে। ইহ্কালীন জীবনকে পারলৌকিক জীবনের ভূমিকাস্বরূপ গণ্য করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এমন এক মানসিকতার উন্মেষ ঘটায় যার ফলে সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে ইহ্জীবনের জন্য প্রয়োজন মাফিক চেষ্টা চালায়, স্রষ্টার সন্তুষ্টির মানদণ্ডের ভিত্তিতে ব্যক্তিস্বার্থ পূরণে ব্রতী হয়। পাশাপাশি সমাজের স্বার্থকেও এই একই মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিবেচনা করে থাকে।'[১৪]

৭. এখানে এসে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামষ্টিক স্বার্থ পরস্পর সঙ্গতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এদুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। অন্য কোন মতাদর্শের পক্ষে এরূপ অভাবনীয় সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

---

[১৩]. দ্র.Av¦j-KiAvb, ফুসসিলাত : ৪৬।

[১৪]. cÖv¸³|

৮. ইসলাম জীবনের বস্তুগত অনুধাবনের চেয়ে আধ্যাত্মিক অনুধাবনের উপর কেন্দ্রীয় গুরুত্ব প্রদান করে। কারণ যদি জীবনের আধ্যাত্মিকতা ও অর্থই না থাকে তাহলে তো মানুষ অবশিষ্ট থাকবে নিছক এক পশু রূপে। যার কাজ কেবলই আহার গ্রহণ ও নিদ্রাগমণ।

৯. ইসলাম ব্যাপকার্থে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও শিষ্টাচারে বিশ্বাসী ...

কারণ প্রত্যেক মানুষের কামনা বাসনা রয়েছে, যা তার সাথেই জন্মলাভ করেছে। এসব কামনা বাসনা সুতীব্র ও পাশব শক্তিসম্পন্ন। কাজেই যদি এগুলো নিয়ন্ত্রণে কোন নিয়ম-নীতি বিদ্যমান না থাকে, তাহলে অচিরেই মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে পাশবিকতা, ফলে তার মধ্যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসমূহের অকাল মৃত্যু ঘটে যাবে, অর্থহীন হয়ে পড়বে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা। তাই এগুলোর পরিচর্যার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধসমূহ।

বাকের সদর এভাবে জীবন, জগত ও সমাজকে সঠিকরূপে অনুধাবনের লক্ষ্যে ইসলামের সহায়তা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। তবে অবশ্যই তা হতে হবে এর গভীর সারসত্যকে বুঝে এবং নিছক ভাসমান চিন্তাধারা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। ধর্ম মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করে সামাজিক জীবনকে গঠিত করে। ধর্ম ব্যক্তির মনে সামাজিক মূল্যের বোধ সঞ্চারিত করে। ধর্ম ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে, অপরের চিন্তা ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে এবং চিন্তায় ও কার্যে বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম কেবলমাত্র এক ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির প্রতি নয়, সমস্ত বিশ্বের মানুষের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছার ভাব জাগরিত করে। আর এ সমস্ত নির্দেশনা ধারণ করে গড়ে ওঠে একজন 'ইসলামি মানুষ'।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। সেহেতু বিজ্ঞানের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জীবনে এসে পড়েছে। ফলে অনেকখানি সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠেছে মানব সমাজ। সংস্কারের স্থলে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনাকে ব্যাখা করার জন্য মানুষ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। সে কারণে অলৌকিক ঘটনামাত্রই মানুষের মনে তেমনভাবে আর বিস্ময় বা ভীতির ভাব জাগিয়ে তোলে না। কিন্তু তাই বলে আবার এমন ধারণা করাও ভুল হবে যে এই বৈজ্ঞানিক প্রভাব মানুষের ধর্মভাবের বিলুপ্তি ঘটাতে পেরেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন একটি চিরায়ত প্রশ্ন। বিশেষ করে ধর্মে বিশ্বাস নেই এমন লোকেরও যেমন অভাব সমাজে দেখা যায় না, তেমনি সমাজের এক বৃহত্তম অংশের মধ্যে ধর্মচেতনা এখনও খুবই প্রগাঢ়।

বাকের সদর জোর দিয়ে বলেন, পূর্বের মত বর্তমান যুগে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে ধর্মই সমাজের জটিল সমস্যাগুলোর জন্য প্রকৃত ঔষধ। বাকের সদর মূলত এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। ধর্মই পারে সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন ও মানুষের সাথে মানুষের সবরকম ভেদাভেদ দূর করে দিয়ে বৈশ্বিক ঐক্য ও সংহতির পথকে সুগম করে দিতে। বর্তমান যুগে ধর্মের ভূমিকা হবে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলা। অপরের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা কিম্বা হিংসার মনোভাব বহন করা যথার্থ ধর্মবোধের পরিচায়ক নয়। ধর্ম প্রতিটি মানুষকে নীতিপরায়ন, সদাচারী, কর্তব্যপরায়ন, উদার ও সংযমী হতে শিক্ষা দিবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় প্রকার কর্তব্য সম্পাদনে মানুষকে সমানভাবে সচেতন করে তুলবে এবং জীবনে পরম মূল্যগুলোকে আস্বাদন করে নিজের চারিত্রিক পূর্ণতা লাভে তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। ধর্মের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করলে মানুষ বুঝতে পারবে যে ধর্মান্ধতা মানুষকে সঙ্কীর্ণমনা, ক্ষুদ্রচেতা, স্বার্থপর ও নির্বিচারী করে তোলে। কিন্তু সেটা যথার্থ ধর্মাভাব নয়। কেবল সামাজিক পরিসরেই নয়, বরং বিশ্বশান্তি ও ঐক্যের পথে মানুষকে যথার্থ মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পারস্পরিক মিলনের যোগসূত্রটি দৃঢ় করে তুলতে হবে। এ কঠিন কর্তব্য একমাত্র ধর্মের দ্বারাই সম্ভব। সে কারণে সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে অতীতের তুলনায় বর্তমান যুগে ধর্মের ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

5. ‘BwU weåvwšÍi Ac‡bv‘b

এখানে দুইটি বিভ্রান্তি থেকে যায়। প্রথমত, ধর্মীয় চিন্তাধারা তার প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যবশত বাধ্যবাধকতাপন্থী হয়। ফলে ধর্ম মানুষের স্বাধীনতাকে নিজের অনুকূলে হরণ করে রাখে। দ্বিতীয়ত, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা। ধর্ম ও মতাদর্শসমূহের সাথে এর কোন কাজ নেই। মানুষই মূল, ধর্ম ও মতবাদসমূহ নয়।

c_g weåvwšÍ

স্বাধীনতা প্রসঙ্গটি ধর্ম ও বস্তুবাদের মধ্যে একটি অভিন্ন বিষয়। কেননা, মানুষ হচ্ছে একটি ঐশী-পার্থিব অস্তিত্বসত্তা। সে একাধারে আত্মার অধিকারী, আবার কামনা-বাসনাও তার মধ্যে সহজাত। দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে যে স্বাধীনতাকে বুঝানো হয়, সেটা মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। কতেক প্রাকৃতিক ও সৃষ্টিগত নিয়ামক, যেগুলো মোকাবিলা করার সামর্থ মানুষের নেই। যেমন পরিবেশ, উত্তরাধিকার, বংশানুক্রম, অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ এবং বস্তুগত চাহিদাসমূহের চাপ ইত্যাদি, যেগুলোর বিপরীতে মানুষ নিদ্দিষ্ট এক অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এটা কি মানুষের স্বাধীনতা বিনষ্ট করে দেয় না?

এ প্রশ্নের উত্তরে ঈমান ও কুফর, ধর্ম ও ধর্মহীনতার কোন ভূমিকা নেই। দুজনই ইতিবাচক জবাবও দিতে পারে, আবার নেতিবাচক জবাবও দিতে পারে। ঈমানদার মানুষ আর জড়বাদী মানুষের মধ্যে শুধু পার্থক্য একটাই। তা হল ঈমানদার ব্যক্তি উল্লিখিত নিয়ামকসমূহকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বলে জানে। এখন যদি ঈমানদার মানুষ দার্শনিক অর্থে স্বাধীনতাকে মেনে নেয়, তাহলে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে তার কাজে-কর্মে বাধ্য করেন না। আর যদি এ অর্থে স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, তার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ উল্লিখিত নিয়ামকসমূহের মধ্য দিয়ে স্বীয় বান্দাকে কাজে-কর্মে বাধ্য করে থাকেন। যাহোক, ঈমানদার ব্যক্তির দৃষ্টিতে এসব নিয়ামক স্বাধীনতাকে নাকচ করার প্রমাণস্বরূপ নয়।

কিন্তু জড়বাদী মানুষ উল্লিখিত নিয়ামকসমূহকে নিরঙ্কুশ অদৃশ্য শক্তির সাথে সূত্রবদ্ধ করে না। বরং সেখানেই দাঁড়িয়ে যায় এবং দার্শনিক পর্যালোচনায় লিপ্ত হয়। ফলে কখনো কখনো স্বাধীনতা নাকচের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কখনো বা আবার তা প্রমাণিত করে থাকে।[১৫]

একজন ঈমানদারের দৃষ্টিতে সামাজিক স্বাধীনতা অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহের বিপরীতে তার সংকল্প আরও দৃঢ়তর হওয়া। কিন্তু একজন জড়বাদীর দৃষ্টিতে এর অর্থ হচ্ছে অন্যের কর্তৃত্বকে নাকচ করা।

স্বাধীনতা ধার্মিক ও জড়বাদীর মধ্যে একটি অভিন্ন বিষয়। কিন্তু ধর্মীয় চিন্তাধারায় এটা এক রঙে আর জড়বাদী চিন্তায় অন্য এক রঙে প্রতিভাত হয়। সুতরাং এই যে বলা হয় ধর্ম তার প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যবশত স্বাধীনতাকে নাকচ করে- এটা নিছক একটি বিভ্রান্তিকর ও ভুল কথা। একইভাবে এই যে মনে করা হয় যে, উদার নৈতিকতাবাদ তার প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত বস্তুগত বৈশিষ্ট্যবশত ব্যবহারিক স্বাধীনতার প্রবক্তা হয়- এ উভয় ভুলই পশ্চিমাদের জীবনে এক ঐতিহাসিক সামাজিক ভ্রান্তি থেকে জন্ম নেয়। এটাকে একটা সাধারণ নিয়ম হিসাবে সব ধর্মের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যদিও চার্চ থেকেই এর উৎপত্তি হয় একদিকে পণ্ডিত ও সংস্কারবাদীদের

---

[১৫]. দ্র. ড. ইউসুফ কারাম, AvZ-Zvweq¨v Iqv gv evÕ‘v AvZ-Zvweq¨v, বৈরুত : মাকতাবাতু আছ-ছাকাফাতু আল-দ্বীনীয়্যা, তা. নে. পৃ. ১১০-১১৬।

মধ্যকার বিবাদ সূত্রে। অপরদিকে রাজনীতিবিদ ও পুরোহিতদের মধ্যকার বিবাদ সূত্রে। তারা ধরে নিয়েছিল যে চার্চ হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ ধর্মের নমুনা। এ ধারণা থেকে তার রায় দিয়ে বসল যে, ধর্ম হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যা স্বৈরতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা, যদি কারও সাথে ধর্মের প্রতীক যুক্ত হয়ে যায়, তাকে তার নিজের দৃষ্টিতে নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ প্রতিপন্ন করবে। আর অন্যদের প্রতি সে তাকাবে ক্রীতদাসের প্রতি মণিব যেভাবে তাকায় সেরূপে।

অথচ এখানে যে ব্যাপারটার প্রতি কারও খেয়াল নেই সেটা হচ্ছে, ধর্মের উপর এসব বিষয়গুলো আরোপ করা হয়েছে। কোনক্রমেই এগুলো ধর্মের অত্যাবশকীয় আচার নয়। বরং ধর্মের প্রকৃত সত্য থেকে বিচ্যুতি মাত্র। ধর্ম মানুষদেরকে আল্লাহ্‌র বন্দেগীর গহীন মর্মে একসমান বলে গণ্য করে থাকে। আর বড়ত্বকামিতা ও আত্ম-অহঙ্কারকে স্রেফ একটি প্রত্যাখ্যাত আচরণই নয়, বরং প্রকৃত একত্ববাদের পরিপন্থী বলে জানে। যে ধর্মীয় সমাজ সচেতন ও সজাগ, সেখানে এধরনের আচরণ জন্মই নিতে পারে না। এ মর্মে খোদায়ী বাণী হচ্ছে - 'এ পরলোক-যা আমি নির্ধারিত করি, তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না।'[১৬] অহঙ্কার তো ফেরাউনিদেরই মুখে শোভা পায়- '(....ফেরাউন উচ্চস্বরে বলল) আমিই তোমাদের মহাপ্রতিপালক..।'[১৭]

আর মার্কস্‌বাদ, যা প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র নিয়ে চিন্তায় থাকে, এটা বস্তুবাদী স্বৈরতন্ত্রের একটি প্রকাশ্য নমুনা বটে। একইভাবে মুসলমানদের মাঝে উমাইয়া শাসকগণ এবং প্রাচীন রোমান সম্রাটগণও ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে স্বৈরতন্ত্র চর্চাকারী দুটি উদাহরণ। কিন্তু এমনকি একটি উদাহরণও পাওয়া যাবে না যা প্রকৃত ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্র হবে। যদি ধর্ম অনিবার্যতই স্বৈরতন্ত্রের পথ হত, তাহলে মহানবী (সা.)কে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় স্বৈরাচারী শাসক হতে হত! অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ছিলেন অতিশয় বিনয়ী এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

বাকের সদর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সংক্রান্ত তাঁর কথোপকথনের মধ্যেই এ বিভ্রান্তি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সেখানে তিনি বলেন :

> 'মার্কসবাদের দৃষ্টিতে বিশ্বজগতে নিরঙ্কুশ সত্যসমূহের প্রতি ভাববাদের গুরুত্বারোপ সামাজিক আইন-কানুনের মধ্যে নিরঙ্কুশ মূল্যবোধসমূহের প্রতি বিশ্বাসের কারণ হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত ভাববাদ ও অধিবিদ্যা শ্রেষ্ঠ সত্যস্বরূপ নিরঙ্কুশ ও চিরন্তন [আল্লাহ্‌র] অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখবে, ততদিন সমাজের শ্রেষ্ঠতর প্রপঞ্চসমূহ যেমন শাসনকর্তৃত্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির প্রতিও ধ্রুব সত্য হিসাবে বিশ্বাস পোষণ করবে।'[১৮]

তিনি মার্কস্‌বাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেন, বিশ্বজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিরঙ্কুশ শক্তির প্রতি বিশ্বাস আর সমাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নিরঙ্কুশ শক্তির প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে কোনই অনিবার্য সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কয়েকটি উদাহরণও উল্লেখ করে বলেন, অ্যারিস্টটল, যিনি ছিলেন আধিবিদ্যক দর্শনের অগ্রদূত, অথচ রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি আপেক্ষিকতায় বিশ্বাস করতেন। তদ্রূপ তিনি তুলনা করেন প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ভূবনে সবচেয়ে বড় বস্তুবাদী দার্শনিক হেরাক্লিটাসের সাথে প্লেটোর, যিনি তাঁর আমলে ভাববাদী দর্শনের পুরোধা ছিলেন। হেরাক্লিটাস ডেমোক্রেসীয় বিপ্লবের বদলে যাওয়া পরিচয়সত্তা থেকে দূরে থেকেও বস্তুবাদী দর্শনের ধারক বাহক হন। পক্ষান্তরে প্লেটো ভাববাদী দর্শনের পুরোধা হয়েও বৈপ্লবিক চিন্তার দিকে আহ্বান জানাতেন। এদিকে পাশ্চাত্যের নতুন জগতে তিনি তুলনা করেন বস্তুবাদী দার্শনিক হবস্ এর সাথে মরমী দার্শনিক স্পিনোজার। হবস্ ইংল্যাণ্ডের গণবিপ্লবের বিরোধী ছিলেন এবং পরে ফ্রান্সে পলায়ন করেন এবং সেখানকার একনায়ক শাসনকর্তৃত্বের প্রতি সম্মতি জানান

১৬. Avj-KiAvb, কাসাস : ৮৩।
১৭. প্রাগুক্ত, নাযিয়াত : ২৪।
১৮. বাকের সদর, BKwZmv'bv, বৈরুত : দার আত-তাআ'রুফ, ১৯৮১, পৃ. ১২৮।

এবং এর সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থও রচনা করেন। আবার স্পিনোজা ভাববাদী দার্শনিক হয়েও জাতির জন্য শাসকের সমালোচনা করার অধিকার এমনকি বিপ্লবের অধিকারে পর্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন।[১৯]

wØZxq weåwš Í

এ বিভ্রান্তিটি সৃষ্টি হয় ভাসমান ও আবেগপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যেন এমন একটা অবস্থা যে, কেউ বলবে আমি ন্যায়পরতা চাই, কিন্তু কোন আইন-কানুন কিংবা ধর্ম বা মতবাদে আমার কোন কাজ নেই! একটি বিষয় যখন নিছক অন্তঃসারহীন স্লোগানে রূপ নেয় তখন তার অনেক সমর্থক পাওয়া যায়। কিন্তু যখন বাস্তবে তা সম্পাদনের প্রশ্ন আসে তখন এর নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যে কারণে অনেক বিচার বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন হয়।

কাজেই যে কেউ স্বাধীনতা চায়, তাকে অবশ্যই এর তাৎপর্য নিদ্দিষ্ট করে নিতে হবে- সে কি বস্তুগত অর্থে স্বাধীনতাকে চাইছে নাকি ধর্মীয় অর্থে স্বাধীনতাকে চাইছে? নাকি এ দুটির কোনটাই নয়!

-তবে এই নতুন তাৎপর্য আদর্শিক কাঠামোর বাইরে নয়। সুতরাং এই তাত্ত্বিক কাঠামোকেও ধর্মীয় ও বস্তুবাদী কাঠামোর মতই পর্যালোচনা করতে হবে। KiAvb স্বাধীনতার তৃতীয় একটি রূপের সন্ধান দেয়। এটা যতটা না প্রকৃত চিন্তা ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্টতা ও ঠগ্‌বাজির উপর প্রতিষ্ঠিত :

> 'তুমি কি দেখনি [তাকে], যে তার কামনাকেই স্বীয় উপাস্যস্বরূপ গ্রহণ করেছে!'[২০]

-এটা হল সেই উপাস্যের ধারণা, যার মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা নিমগ্ন রয়েছে এবং রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করার জিগির তুলে বহু জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছে। এই চিন্তা কোন সত্যিকার চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা বাস্তবতা হচ্ছে, হয় খোদায়ী নচেৎ জড়বাদী। সুতরাং যে সামাজিক ব্যবস্থা খোদায়ীও নয়, আবার বস্তুবাদীও নয়, এরূপ সমাজ ব্যবস্থার কোন দার্শনিক ভিত্তিও নেই। বাকের সদর বলেন :

> 'সামাজিক বিষয়াবলি জীবনের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো সঠিকভাবে প্রতিভাত হয় না যদি না জীবন, জীবনের বাস্তবতা এবং জীবনের পরিধিকে ব্যাখ্যা প্রদানকারী মৌলিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এরূপ সূত্র থেকে বিবর্জিত। ফলে নিরূপায় হয়ে পথভ্রষ্টতা ও ঠগ্‌বাজির উপরেই দণ্ডায়মান রয়েছে, অথবা দণ্ডায়মান রয়েছে তাড়াহুড়া ও স্বল্প সামর্থের উপর।'[২১]

সামাজিক বিষয়াবলির দর্শনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার একটি নমুনা হচ্ছে গণতন্ত্র (Democracy)।'গণতন্ত্র' চিন্তাটির জন্মই এমন এক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, যে বিশ্বাস মনে করে যে এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নেই যারা তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কামনা-বাসনার ক্ষেত্রে নিষ্পাপ হবে এবং মতামত প্রকাশ বা বিশেষজ্ঞতার দিক থেকে এমন উচ্চতায় থাকবে যে সামাজিক বিষয়গুলো তাদের কাছে সোপর্দ করা যায়। আর ন্যায়পরতা সৃষ্টি এবং জাতির জন্য যথার্থ জীবনমান প্রতিষ্ঠায় তাদের উপর ভরসা করা যায়।

এহেন বিশ্বাস অগত্যা নিখাঁদ বস্তুবাদী দর্শনের উপর নির্ভর করে, যেখানে সামাজিক ব্যবস্থার উৎস বলতে মানবের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছুকে অসম্ভব বলে মনে করে থাকে।[২২]

---

[১৯]. cv¸³, পৃ. ১২৯।
[২০]. Avj-KiAvb, জাছিয়া : ৩০
[২১]. বাকের সদর, Avj-gv'ivmvZj Bmjwgq¨v, বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-লুবনানি, ২০১১, পৃ. ৪৮।
[২২]. দ্র. cv¸³, পৃ. ৪৯।

সুতরাং‘গণতন্ত্র’ দার্শনিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অর্থে একটি বস্তুবাদী ব্যবস্থা।

বাকের সদর পাশ্চাত্য স্বাধীনতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন- ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতা। সামাজিক স্বাধীনতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় চিন্তা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। বাকের সদর অতঃপর এ চার প্রকার পাশ্চাত্য স্বাধীনতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেন এবং বস্তুবাদী কাঠামোর কারণে এর কু-পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন :

> ‘ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কামনা-বাসনা ও স্বভাবগুলোকে একটি বিকর্ষণ শক্তিতে পরিণত করেছে (অথচ এগুলো ছিল দৈহিক পরিপুষ্টির খোরাকের জন্য খোদা প্রদত্ত সতর্ককারী হাতিয়ার) যা মানুষকে অন্যান্য শক্তির বিপরীতে নিজের কর্তৃত্বাধীন করেছে। এভাবে স্বাধীনতা পথের শুরু থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কামনা-বাসনার হাত উন্মুক্ত ছিল এবং মস্তিষ্ক ও অন্য যেসব মানবিক গুণ মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে, সেগুলো ক্রিয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছিল, ততক্ষণ তার দ্বারা কোন কাজই হত না।’[২৩]

সুতরাং এই বাহ্যিক স্বাধীনতা, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার কামনা-বাসনার উপর বিজয়ী না হবে, ততক্ষণ এ স্বাধীনতায় তেমন কোন ফায়দা নেই এবং কোন সিদ্ধান্তের উৎস হতে পারে না। আর কামনা-বাসনা যেদিকে টেনে নিয়ে যায়, শুধু সেদিকে ছাড়া সে চলতে পারে না। বাকের সদর এ প্রসঙ্গে মার্কিনীদের মদ্যপান থেকে দূরে রাখতে আমেরিকান সরকারের ব্যর্থতার উদাহরণ দিয়েছেন। যদিও এ লক্ষ্যে বিরাট ও বিচিত্র সুযোগ-সুবিধা প্রস্তুত হয়েছিল, এটা থেকে দৃশ্যমানভাবে প্রতিপন্ন হয় যে মার্কিন সমাজ তার ব্যক্তিগত চালচলনে স্বাধীন নয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে যেসব জিনিসকে অপছন্দনীয় দেখে, সেগুলোকে ‘না’ বলতে পারে না। বস্তুবাদী সামাজিক মতাদর্শের পরিকাঠামোর মধ্যে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, তার জন্যও এই পরিণতি একটি প্রমাণিত ব্যাপার। বহির্জগতে এ স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত দুর্বলের উপর সবলের দৌরাত্ম্য হিসাবে প্রকাশ পায়, যতই তা আইনের বৈধ কাঠামোর মধ্যে হোক এবং বাহ্যিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন আর সকল মানুষের জন্য সাফল্যের সমান সুযোগ বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে হোক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের এক ময়দান। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকে প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধার সমানভাবে অধিকারী না থাকবে, ততক্ষণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য দানকারী সুযোগ-সুবিধার সমানাধিকারের আইন সামান্যই উপকার দিবে। বরং বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা ও সামর্থই সর্বাধিক প্রভাব ফেলবে। বাকের সদর বলেন :

> ‘পুঁজিপতিরা সমাজে তাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা হেতু এবং প্রচারণার হাতিয়ারসমূহ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা হেতু এবং কর্মী-সমর্থকদের ক্রয়ে তাদের সামর্থের সীমাবদ্ধতা হেতু সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের উপায়-উপকরণসমূহকে ব্যর্থ করে দেয়। আর সরকার, সামাজিক ও আইনপ্রণয়নকারী ব্যবস্থা পুজিবাদী উপায়-উপকরণ দ্বারা তার স্বার্থসিদ্ধির লোভে পুঁজিপতিদের আধিপত্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। অথচ ডেমোক্রেসির তাৎপর্য মোতাবিক ডেমোক্রেসি হচ্ছে সকলের অধিকার।
>
> এভাবে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র এমন এক সরকারে পরিণত হয় যে, এর সহায়তায় মুষ্টিমেয় একদল লাভবান হয় এবং এমন এক কর্তৃত্ব দাঁড়িয়ে যায় যে একদল এর দ্বারা অন্যদের বিপরীতে নিজেদের অস্তিত্বের সুরক্ষা করে। আর এমন এক মুনাফাকামী বুদ্ধিবৃত্তিতে উপণীত হয় যে, মুষ্টিমেয় একদলকে গণতন্ত্রীয় সংস্কৃতি থেকে সৌভাগ্যবান করে তোলে।

---

[২৩]. বাকের সদর, Avj-gv' ivmvZj KiAwbq¨v, বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল মাতবুআত, ১৯৮৯, পৃ. ১১৪।

> পরিশেষে আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সবচেয়ে মন্দতম পর্যায়ে উপনীত হই, যেখানে কর্তারা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রভাব ও প্রতিপত্তি দ্বারা অনুভব করে যে, বুদ্ধিবৃত্তি তাদের ব্যবস্থাকে দূর-দিগন্তে পৌঁছে দিবে এবং নতুন নতুন প্রভাব বলয় থেকে নিজেদের অভাবসমূহকে পূরণ করবে।'[২৪]

এভাবে 'সাম্রাজ্যবাদ' নামক প্রপঞ্চের উৎপত্তি ঘটে। আর জাতি ও সমাজসমূহ পথভ্রষ্ট হয় এবং না চাইতেই তারা দাসত্বে নিপতিত হয়। এসবই পাশ্চাত্য স্বাধীনতার গর্ভ থেকে জন্ম নেয়। পশ্চিমা স্বাধীনতা যে কেবল শিকলবন্দী, দাসত্ব আর কৃতদাসে পরিণত করা ছাড়া অন্য কোন পরিণতি বয়ে আনে না, উপরে বর্ণিত কুফলই এককভাবে তা প্রমাণে যথেষ্ট। সাম্রাজ্যবাদে এই ফলাফল আরও বেশি নিজেকে ফুটিয়ে তোলে। কারণ সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে বস্তুবাদী দাসত্বের পথে পশ্চিমা স্বাধীনতার ধারায় সর্বশেষ প্রান্ত।

6. B"Qv I ¯^vaxbZvi fwgKv

স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়। কখনো এর সংজ্ঞা ও অর্থ নির্ধারণকে কেন্দ্র করে। কখনো বা এর বাস্তবায়ন এবং মানুষ কতটুকু স্বাধীনতার অধিকারী সে বিষয়কে কেন্দ্র করে। আবার কখনো বা এর প্রকারভেদ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এর প্রভাবের মাত্রাকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়। বাকের সদর মনে করেন, কেউ মানুষকে স্বাধীনতা উপহার দেয় না। বরং যেহেতু মানুষ হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন প্রাণীসত্তা, একারণে মূলগত ও প্রাকৃতিকভাবেই সে স্বাধীন। বাকের সদরের দৃষ্টিতে ইসলাম প্রকৃত ও প্রতীকী স্বাধীনতাকে পরস্পরের সাথে মিশ্রিত করেছে। আসলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে বন্দীদশায় আবদ্ধ করার বন্ধনসমূহ থেকে তার মুক্তি সম্ভবপর হয় যথাযথ দীক্ষা, সৌভাগ্য, পূর্ণতা ও সত্যিকার মুক্তিতে পৌঁছুনোর জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

বাকের সদর মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি সম্পর্কে এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২৫] তিনি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। অতঃপর সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের স্বাধীনতাই মানুষের জন্য নির্ধারণ করে দেয় যে, সে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির মালিক থাকবে এবং নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করতে পারবে।[২৬] অনুরূপভাবে তিনি মনে করেন, মানুষ আল্লাহ্‌র সার্বভৌম কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার মাধ্যমে মানবের সার্বভৌমত্ব ও অন্যান্য বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে থাকে।[২৭]

বাকের সদরের এ দৃষ্টিভঙ্গির মর্মার্থ দাঁড়ায় এটা যে, মানুষ অন্য সবকিছুর পূর্বে আল্লাহ্‌র দাস মাত্র। আর যেহেতু দাসত্ব আল্লাহ্‌র জন্য, একারণে অন্য কারও কর্তৃত্বকে সে নিজের উপর বরদশত করে না। অথচ পাশ্চাত্য চিন্তা দর্শনে শুধুমাত্র বাহ্যিক বন্ধনগুলোই আলোচ্য। কিন্তু মানুষের অভ্যন্তরীণ বন্ধনসমূহের ব্যাপারে কর্তৃত্বশীলতাকে নাকচ করা হয় না।

---

২৪. cÖv¸³, পৃ. ৫৪।

২৫. দ্র.মনসুর মীর আহমাদি, "অধ্যাপক মোতহহারীর দৃষ্টিতে স্বাধীনতা", ÔAwa›`‡k‡q wmqvmx‡q gZvRv †gvZvnnvwiÕ শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলন, তেহরান, তা. নে. পৃ. ১৯৩-২২৩।

২৬. বাকের সদর, Avj-ûiwiqv wd Avj-KziAvb, বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল মাতবুয়াত, ১৯৮৯, পৃ. ৪১-৪৮।

২৭. ________, fimvjvZbv, বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-ইসলামি, ২০০৪, পৃ. ৬৭-৬৮।

¯vaxbZvi msÁv

বাকের সদরের রচনাবলিতে স্বাধীনতার সংজ্ঞা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন ইশারা নেই। কারণ ইসলামে 'স্বাধীনতা' প্রসঙ্গটি এমন কোন প্রসঙ্গ নয় যে পাশ্চাত্যের ন্যায় তা সভ্যতার ভিত্তি তথা শ্লোগানে পরিণত হবে। যদিও ইসলাম স্বাধীনতা সম্পর্কে নিজস্ব পর্যালোচনা তুলে ধরতে পিছপা হয়নি। একারণে মুসলিম চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে ব্যাপকভিত্তিক পর্যালোচনায় অবতীর্ণ হন না। পশ্চিমা চিন্তাবিদদের ক্ষেত্রে যা সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। তারা এ বিষয়ে সর্বাত্মক ও ব্যাপকভিত্তিক পর্যালোচনায় লিপ্ত হন। কারণ স্বাধীনতা'ই হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বুনিয়াদ। একারণে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের রচনাবলিতে স্বাধীনতা'র বিভিন্ন ও একাধিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। মন্টেস্কু বলেন:

> 'পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে স্বাধীনতা কথাটির ন্যায় আর কোন পরিভাষা এতটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধারণ করেনি।'[২৮]

কেউ কেউ বলেছেন, স্বাধীনতার সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। কারণ সংজ্ঞায় মাত্রাসীমা উল্লেখ করতে হয়, যে সীমার মধ্যে সংজ্ঞার বিষয়বস্তু অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব দিক থেকে আবদ্ধ থাকবে। আর যখনই সীমা আসবে তখনই স্বাধীনতা নাকচ হয়ে যাবে। এ কারণে স্বাধীনতার সংজ্ঞা অসম্ভব।[২৯]

বাকের সদর যদিও স্বাধীনতার সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোকপাত করেননি, কিন্তু তিনি অনুভব করেন যে এ মর্মে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উদ্‌ঘাটন করার জন্য এ আলোচনার বিভিন্ন দিক, যা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত, তা বুঝতে হবে এবং স্বাধীনতার সংজ্ঞা সম্পর্কে পশ্চিমাদের আলোচনার দিকে মনোযোগ রাখতে হবে। একারণে তিনি বলেন :

> "যখন 'স্বাধীনতা' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়, তখন এর সাধারণ অর্থই বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ অপরের শাসন ও কর্তৃত্বকে নাকচ করা। এটা হচ্ছে একটি অভিন্ন অর্থ, যা ইসলামি ও পাশ্চাত্য উভয় সভ্যতায় দেখতে পাওয়া যায়। যদিও প্রত্যেকের চিন্তার কাঠামো ও ভিত্তি আলাদা আলাদা।"[৩০]

অতঃপর তিনি স্বাধীনতার দ্বি-মাত্রিক অর্থাৎ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূলত বাকের সদর স্বাধীনতা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ব্যাখ্যাকে ইসলামি ব্যাখ্যা হতে পৃথক করার প্রয়াস পেয়েছেন। পাশ্চাত্য স্বাধীনতা হচ্ছে পশ্চিমা মানুষের যে কোন শক্তির সামনে বিনত হওয়াকে অস্বীকার করা এবং তার সাথে সমান সমান হওয়ার পর নিজ সত্তা ও ইচ্ছার ওপর তার শাসন ও কর্তৃত্ব থাকার বিশ্বাসের একটি ব্যাখ্যা। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে স্বাধীনতার অর্থ কেবল অন্যদের শাসনকে বিতাড়িত করা নয়, বরং মানুষের আচরণের উপর ধর্মের শাসনকেও বিতাড়িত করা, এমনভাবে যাতে স্রষ্টা ও পরকালের সাথে মানুষের বাস্তব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলাম স্বাধীনতার নেতিবাচক তাৎপর্যকে বিবেচনায় নেয় যা মানুষকে অন্যদের শাসন থেকে মুক্ত করে এবং তার থেকে সব শৃঙ্খল খুলে দেয়। এটা ঐশী ধর্মের একটি অন্যতম লক্ষ্য।

স্বাধীনতার এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই তাৎপর্যের মধ্যে পরস্পর কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামে স্বাধীনতা এবং বানোয়াট মূর্তি ও শৃঙ্খল হতে মুক্তি হল আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ দাসত্বের ও তদ্‌ভিন্ন অন্য সবকিছুর শাসনকর্তৃত্বকে নাকচ করার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ।[৩১] কিন্তু পাশ্চাত্যে অন্যদের শাসন থেকে স্বাধীনতা এবং অন্যদের সমকাতারভুক্ত হওয়া হচ্ছে মানুষের নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্ব এবং নিজের জীবন পদ্ধতি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীনতার ফলস্বরূপ। ইসলামে একজন মানুষ অন্য সবকিছুর পূর্বে সে আল্লাহ্‌র একজন দাস। একারণে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য

---

[২৮]. Montesquieu, *The Spirit of the laws*, Article 11 (Chapt. 2).

[২৯]. মাহ্‌দী আসেফি, nwKKvZj ûiwiqv, নাজাফ, তা. নে.পৃ. ৫৬-৫৭।

[৩০]. বাকের সদর, Avj-gv'ivmvZj Bmjwgq¨v, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

[৩১]. cv¸³, পৃ. ১০৮-১০৯।

কারও কর্তৃত্বকে মেনে নেওয়া এবং মূর্তির সামনে বিনত হওয়া তার জন্য সম্ভব নয়, সে মূর্তি কোন মানব বা দানব কিংবা কোন জড় মূর্তি ইত্যাদি যে রূপেই বা যে আকৃতিতেই থাকুক না কেন। সে উপাসনার কাজে অন্য সকল সৃষ্টির সমকাতারভূক্ত।

স্বাধীনতার অর্থ সম্পর্কে বাকের সদরের চিন্তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমসাময়িক মানুষদের সামাজিক সমস্যাবলির প্রতি মনোযোগ। তাঁর মতে, বিষয়টির একাডেমিক দিকসমূহের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করার ফলে তা প্রকাশিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পাইনি। অথচ এ বিষয়টি অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের তুলনায় টিকা-টিপ্পনীর ন্যায় পার্শ্ববর্তী অবস্থান রাখে। তিনি এমনকি যেসব প্রসঙ্গ একান্তই দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার অধীন, সেখানেও উক্ত প্রসঙ্গের সামাজিক দিকটি দৃষ্টি হতে দূরে রাখেননি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় dvjmvdvZbv ও Avj-Dmm Avj gwšÍwKqv wjj-Bw¯ÍKiv'য়ও এ ধরনের প্রবণতা বজায় রেখেছেন। মোটকথা বাকের সদরের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা হচ্ছে দুই প্রকারের। যথা (১) প্রাকৃতিক স্বাধীনতা এবং (২) সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

cvKwZK ¯^vaxbZv

যে সুবিধা স্বয়ং প্রকৃতির পক্ষ থেকে মানুষকে প্রদান করা হয় আসলে সেটা হচ্ছে ইচ্ছাশক্তিরই বাস্তবায়ন। যা প্রকৃতি ও জগত মানুষকে দিয়েছে এবং মানুষের সহজাত স্বভাবের একটি অংশস্বরূপ। এই যে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, যা দ্বারা মানুষ সমৃদ্ধ হয়েছে, প্রকৃতই এটা হচ্ছে মনুষ্যত্বের সত্তাগত ভিত্ এবং মানুষদের জীবনের গতিসঞ্চারক। সুতরাং এই স্বাধীনতা ব্যতীত মনুষ্যত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ অর্থে স্বাধীনতা পদ্ধতিগত বাস্তবায়নের বহির্ভূত।[৩২] প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা অধীনে প্রয়োগিক তথা ব্যবহারিক রূপ পরিগ্রহ করে।[৩৩]

mvgvwRK I ivR‰bwZK ¯^vaxbZv

সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে উদ্দেশ্য সেই স্বাধীনতা, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কর্তৃক মানুষকে প্রদান করা হয় এবং রাজনৈতিক সমাজ নিজ ব্যক্তিবর্গের জন্য যা অনুমোদন করে থাকে। এ ধরনের স্বাধীনতা আবার দু'প্রকারে বিভক্ত হয়। যথা : সত্তাগত স্বাধীনতা এবং প্রতীকী বা বাহ্যিক স্বাধীনতা।

mËvMZ (mvgvwRK I ivR‰bwZK) ¯^vaxbZv

এ প্রকারের স্বাধীনতা বলতে বুঝায় সেই ক্ষমতা, যা মানুষ সমাজ থেকে অর্জন করে। অর্থাৎ সমাজ কর্মের সঙ্গতি বিধানের জন্য উপকরণাদিরও সংস্থান করে এবং অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিও প্রস্তুত করে দেয়। এ পর্বে সামাজিক বিশেষ করে রাজনৈতিক বিকাশ গভীরতর হয়।

cZxKx (mvgvwRK I ivR‰bwZK) ¯^vaxbZv

এ প্রকারের স্বাধীনতা বলতে উদ্দেশ্য হল সমাজ ব্যক্তিদেরকে প্রতীকী সুযোগ প্রদান করে যাতে তারা স্বীয় প্রতিভাসমূহের পরীক্ষা করে দেখে এবং নিজের অভীষ্ট অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। কিন্তু এখানে ব্যক্তিদের নিজ

---

৩২. বাকের সদর, BKwZmv`bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮।

৩৩. cv¸³, পৃ. ২৮২।

অভীষ্ট অর্জনে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। যেমনভাবে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় এটা উদ্দেশ্য নয় যে স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে কিংবা সত্তাগত স্বাধীনতা সমৃদ্ধ হবে। বরং প্রতীকী স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার মধ্যেই ক্ষান্ত থেকে ব্যক্তির প্রতি কিছু সুযোগ প্রদান করা হয় যাতে সে নিজেকে পরীক্ষা করে। অথচ ইসলামে প্রকৃত (সত্তাগত) স্বাধীনতা ও প্রতীকী (বাহ্যিক) স্বাধীনতা পরস্পর মিশে একাকার হয়ে রয়েছে।[৩৪]

মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের মূলনীতি হল যেমনভাবে মানুষ প্রাকৃতিক দিক থেকে স্বাধীন, তদ্রূপ সমাজে অন্যদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধন অনুযায়ী তাকে স্বাধীন থাকতে হবে। ফলশ্রুতিতে সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার নীতিগত কর্তব্য হচ্ছে মানুষের মৌলিক ঝোঁক ও প্রবণতাসমূহের অনুমোদন দেওয়া এবং সেগুলো পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা। বাকের সদর যদিও এ পশ্চিমা নীতিকে মোটামুটি সঠিক বলে মনে করেন, কিন্তু তিনি একটি প্রশ্ন রেখে বলেন যে, যদি সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তব হয় এবং তার প্রতিপালন ব্যবস্থা মানবিক হয়, তাহলে কেবলমাত্র একটি মৌলিক মানবিক প্রবণতাকে স্বীকার করা এবং সম্পূর্ণ পরিসরে তা পূরণ করা আর অপরাপর প্রবণতাসমূহকে পূরণ না করা বৈধ হতে পারে না।[৩৫] প্রকৃত ও বাস্তব অঙ্গনে স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করা চূড়ান্ত পরিণতিতে মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়। কেননা, মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে অপরের কর্তৃত্বশীলতা থেকে মুক্ত থাকা।

মোটকথা বাকের সদর বিশ্বাস করেন, স্বাধীনতা হচ্ছে 'মানুষের কামনা বাসনার শৃঙ্খল হতে মুক্তি এবং আল্লাহ্‌র দাসত্বের নিমিত্তে বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় স্বীয় ইচ্ছাশক্তির মালিক থাকা।'[৩৬] এ মুক্তি রাজনৈতিক বিকাশ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঘটতে হবে। সুতরাং ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে কু-প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ও অবদমন করে থাকে। আর সর্বজনীন অঙ্গনেও চেষ্টা করে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে নস্যাৎ করে মানুষকে এসবের দাসত্ব হতে মুক্ত করতে। ফলে সর্বজনীন অঙ্গনে এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব সকল মানুষকে আল্লাহ্‌র সামনে এক সারিতে দাঁড় করায়। অতএব কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক দলেরই অপর দলের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা বিনষ্ট করার অধিকার নেই।

gvb‡li g‡a¨ ¯vaxbZvi Aw¯ÍZ

বাকের সদর মানুষের স্বাধীনতা বিষয়ে কয়েক দফা পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন স্থানে। যদিও সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এসেছে তাঁর "আল-হুররিয়া ফি আল-কুরআন" শীর্ষক বিশেষ নিবন্ধে।[৩৭] তিনি জোরালো কণ্ঠে বলেন :

> 'বিশ্বজগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চটি হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা। মানুষ হচ্ছে একটি স্বাধীন অস্তিত্ব সত্তা। বায়ু যেমন গাছের পাতাকে নাড়ায়, মানুষ অনুরূপ নয় যে সে চুক্তিভুক্ত শর্তাবলি দ্বারা কর্মে বাধ্য হবে। কারণ [তাহলে] একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসম্পন্ন অস্তিত্বসত্তা হিসাবে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। তবে চুক্তিগত পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে তার লক্ষ্যপানে চলার প্রেরণা সৃষ্টি করে। এ প্রেরণা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন কর্মগত অবস্থানের প্রেক্ষিতে মানুষের কল্যাণ উপলব্ধির সাথে সম্পৃক্ত।'[৩৮]

---

৩৪. Cv¸³, পৃ. ৩১৭।

৩৫. Cv¸³, পৃ. ৩১৮।

৩৬. দ্র. বাকের সদর, gvewb wnhe Avj-'vIqvZj Bmjwgq¨v, নাজাফ : তা. নে., পৃ. ৮২-৮৯।

৩৭. উল্লেখ্য, এ নিবন্ধটি পরবর্তীকালে দুটি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে প্রকাশিত হয়। একটি হচ্ছে বৈরুতের দার আল-যাহরা প্রকাশনা কর্তৃক BLZvibv jvKv শিরোনামের সংকলন (১৯৮২) এবং অপরটি একই প্রকাশনা থেকে Avj-gv'ivmvZ Avj-KiAwbq¨v শিরোনামের সংকলন।

৩৮. ________, Avj-ivmvj Iqvj gimvj Iqv Avj-wimvjvn্, বৈরুত : দার আত-তাআরুফ, ১৯৮৯, পৃ. ৬৫।

বাকের সদর আলোচনার এ পর্যায়ে দুই মুসলিম উপদল আশআরীয় ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যকার ÔRveiqvÕও ÔKv'wiqvÕ বিতর্কের প্রতি ইশারা করেন। আশআরীয় সম্প্রদায় জাবরিয়া তথা বাধ্যবাধকতা মতবাদে বিশ্বাসী। অর্থাৎ মানুষের কোনই কর্মস্বাধীনতা নেই। অপরপক্ষে মু'তাযিলা সম্প্রদায় কাদারিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। অর্থাৎ মানুষের পূর্ণ কর্মস্বাধীনতা রয়েছে। বাকের সদর এ বিষয়টির বিশ্লেষণে দুইটি প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। একটি হচ্ছে কালামশাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ এবং অপরটি দর্শনের প্রসঙ্গ।

কালামশাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে কোন ব্যক্তির কর্মের কর্তা কে?- এটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। মনুষ্য কর্মের কর্তা কি মানুষ নিজে নাকি স্বয়ং আল্লাহ্? আশআরীয়দের উত্তর হচ্ছে আল্লাহ্। এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে জাবরিয়া তথা বাধ্যবাধকতাবাদ। পক্ষান্তরে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের উত্তর হচ্ছে শুধুই মানুষ। আর মুসলিমদের অপর দল ইমামিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের উত্তর হচ্ছে উভয়ই নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী কর্তা।

আবার দর্শন প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে মনুষ্যকর্মের প্রকৃত স্বরূপ নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে? কর্তা কে, মানুষ নাকি আল্লাহ্ নাকি উভয়ই- তাতে কোন পার্থক্য নেই।

এই বিভক্তিকরণ এই কারণে যে, বাধ্যবাধকতাবাদকে প্রমাণের জন্য যদি আশআরীয়দের উত্তরকেই গ্রহণ করা হয় তাহলে কালামশাস্ত্রীয় প্রসঙ্গই যথেষ্ট। কিন্তু স্বাধীনতাকে প্রমাণ করার জন্য যদি মু'তাযিলা ও ইমামিয়া সম্প্রদায়ের উত্তরকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে আমাদের কালামশাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ ছাড়াও দর্শনের প্রসঙ্গের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ যদি কালামশাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় যে মনুষ্যকর্মসমূহের কর্তা স্বয়ং মানুষই, তাহলে স্বাধীনতার জন্য যা কিছু আবশ্যক, সে সবই অর্জিত হয় না। কেননা, সম্ভাবনা রয়েছে মনুষ্যকর্মে মানুষের কর্তৃত্বের ব্যাপারটি 'পোড়ানোর ক্ষেত্রে আগুনের কর্তৃত্বের' ন্যায় হতে পারে।[৩৯]

বাকের সদর শুধু তাত্ত্বিকভাবেই স্বাধীনতা প্রমাণ করেই ক্ষ্যান্ত হননি, বরং ইতিহাসে এর বাস্তব প্রকাশকেও দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি Avj-gv'ivmvZj KiAvwbq¨v গ্রন্থের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে ইতিহাস ও সমাজের গতিপথে মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাস এমন একটি মঞ্চ, যেখানে মানুষ ও আল্লাহ্র স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু Avj-KiAvb এ বিষয়টি নিখুঁতভাবে নিষ্পত্তি করেছে যে কীভাবে সবকিছুর সর্বকেন্দ্র অর্থাৎ আল্লাহ (যার কাছে সবকিছু এবং সব ব্যক্তির প্রত্যাবর্তন) এবং মানুষ (যাকে তার সাথে মানুষের আপেক্ষিকভাবে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে)- এদুয়ের মাঝে সঙ্গতি বজায় রেখে ইতিহাসের অগ্রযাত্রা চলমান রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতাও যেমন নিরঙ্কুশ নয়, মানুষের স্বাধীনতাও তদ্রুপ নিরঙ্কুশ নয়। বরং একটি মাঝামাঝি অবস্থা। এই দুই অক্ষের মধ্যে যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে এবং যেসব নিয়ম ও সূত্র এ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ক্রিয়াশীল রয়েছে এবং সর্বোপরি ইতিহাসের যে গতি এই যোগাযোগ থেকে উদগীরণ হয়, Avj-KiAvb সেটাকে 'সুন্নাত' (তথা রীতি) নামে আখ্যায়িত করেছে। KiAv‡b এই পরিভাষাটি সতের বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। অথচ সপ্তদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের উৎপত্তি পর্যন্ত মানুষরা এটা আঁচই করতে পারেনি। সুতরাং Avj-KiAv‡bi ভাষায় সুন্নাত বলতে বুঝায় একগুচ্ছ নিয়ম ও সূত্র, যা মানুষের স্বাধীনতা এবং আল্লাহ্র অনন্ত ইচ্ছার ভিত্তিতে সংস্থাপন করে থাকে।

---

[৩৯]. সাইয়্যেদ মাহমুদ হাশেমী, eûQ wd Bjg Avj-Dmj, কোম : দায়েরাতুল মাআরিফ আল-ফিক্হ আল-ইসলামি ইনস্টিটিউশন, ২০১০, খ. ২, পৃ. ২৭-৩০।

বাকের সদর বলেন :

> ‘ইতিহাসের নিয়মানুবর্তিতা এবং মানুষের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ভুল বুঝাবুঝি নিরসন করতে হতকুরআনকেই । KiAvb সরাসরি এ বিষয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে বিভিন্ন ঘটনাক্রম ও বিষয়াবলির অক্ষদণ্ড হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা।’[৪০]

এই ইতিহাসের নিয়ম (তথা সুন্নাত)-‡K KiAvb বর্ণনা করেছে ‘শর্ত-সাপেক্ষ’ রূপে । যেহেতু এটা নির্ভর করে দুটি পরিবর্তন সাধিত হওয়ার উপর : একটি মানুষের ভেতরে এবং অপরটি মানুষের বাইরের অবস্থায়। এধরনের একটি নিয়ম হচ্ছে KiAv‡bi নিম্নোক্ত ভাষ্যটি-

> ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।’[৪১]

mvgwRK Rxe‡b ¯^vaxbZvi fwgKv

সামাজিক স্বাধীনতা চার ধরনের। যথা :

(১) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

(২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

(৩) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং

(৪) চৈন্তিক স্বাধীনতা।

ধর্মীয় মতবাদসমূহে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে। বাকের সদরও তাঁর রচনাবলিতে এ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। সেখানে তিনি ইশারা করেছেন যে, এক্ষেত্রে আলোচনার মূল উদ্দেশ্য সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে স্বাধীনতা।

কিন্তু প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, অর্থাৎ প্রকৃতির বিপরীতে মানুষের এক্তিয়ার ও স্বাধীনতা, এটা নিয়ে ধর্মে কোন আদর্শিক বিবাদ নেই। বরং সবাই এটাকে মানুষের মর্যাদার প্রধানতম বহিঃপ্রকাশ বলে জানে। সুতরাং পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের পার্থক্য যেখানে সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষের মর্যাদা কী সামাজিক ও প্রাকৃতিক সকল অঙ্গনেই তার স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে, নাকি শুধু প্রাকৃতিক স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে? পাশ্চাত্য বেছে নিয়েছে প্রথম পছন্দটি এবং এর ভিত্তিতে যে কোন অঙ্গনে স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করাকে তারা মানবের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার নামান্তর বলে মনে করে থাকে। কিন্তু ইসলামের পছন্দ দ্বিতীয়টি।

বাকের সদর বলেন :

> “মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও যোগাযোগ হেতু যেসব সামাজিক দ্বন্দ্ব উদ্ভুত হয়, সেগুলোর আত্মা একই থাকে এবং একই উৎস ও একই মৌলিক বৈপরীত্য থেকে উৎসারিত হয়। আর তা হচ্ছে মানব দ্বান্দ্বিকতা (Human Dialectic)। এই দ্বান্দ্বিকতা জমিন থেকে খোদা পর্যন্ত প্রলম্বিত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ‘শ্রেষ্ঠতর বিরুদ্ধ’ বিজয়ী না হবে, ততক্ষণ সর্বদা মানুষ এক বিরুদ্ধ থেকে অপর বিরুদ্ধে নিপতিত হবে।”[৪২]

---

[৪০]. বাকের সদর, Avj-gv‘ivmvZj KiAvwbq¨v, cv¸ ³, পৃ. ৮৩-৮৪।

[৪১]. Avj-KiAvb, রা’দ : ১১।

[৪২]. বাকের সদর, আল-gv‘ivmvZj Bmjvwgq¨v, cv¸ ³, পৃ. ২০৬।

স্বাধীনতার বিষয়টি অপরাপর সামাজিক বিষয়ের ন্যায় উল্লিখিত দ্বান্দ্বিকতার কাছে ধরা দেয় এবং তারই একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগণিত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দুইটি পথ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি থেকে ভিন্ন এক পন্থায় দুইটি জিনিস পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে মানুষের নিজের উপর তার কর্তৃত্বের চিন্তা। অপরটি হচ্ছে মানুষ ও জগতের উপর আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের চিন্তা। প্রথমটি থেকে পাশ্চাত্য অর্থে স্বাধীনতা নিঃসৃত হয়। আর দ্বিতীয়টি থেকে ইসলামি অর্থে স্বাধীনতা নিঃসৃত হয়। কারণ ঐ দুইটি চিন্তা হচ্ছে পরস্পর বিপরীত চিন্তা। প্রত্যেকটি থেকে যে স্বাধীনতা নিঃসৃত হয়, তার প্রবণতা এবং প্রকৃতিও হয় পরস্পর বিপরীতমুখী। আর এ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটা। পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে শক্তিশালী স্বাধীনতা, দুর্বল স্বাধীনতাকে নাকচ করার জন্য একটি উপকরণে পরিণত হয়। এমনকি আইনের ঘেরাটোপের মধ্যেও মানুষ বস্তুগত ও দৈহিক কামনা-বাসনার হাতে বন্দী হয়ে পড়ে, যদিও বাইরে তাকে স্বাধীনই দেখা যায়। সুতরাং পাশ্চাত্য স্বাধীনতা আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত ও স্বাধীন করা এবং জগত ও মানুষের উপর তার কর্তৃত্ব দ্বারা শুরু হয়। আর বস্তুবাদের আধিপত্য ও দেহের বেপরোয়াপনার কাছে মানুষের অসহায় আত্ম-সমর্পণের মাধ্যমে সমাপ্তি লাভ করে।

কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তাটি আল্লাহ্‌কেই স্বাধীনতার উৎস বলে মনে করে এবং মানুষের জন্য নিজের উপরে প্রভুত্বকে নাকচ করে দেয়। বরং প্রভুত্বকে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক অধিকার হিসাবে গণ্য করে থাকে। মানুষের একটা কর্তব্য, সেটা হল আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। যদিও এটা কোন সহজ কাজ নয় বস্তুবাদের আধিপত্যের কারণে। এই আধিপত্যের শিকল থেকে মানুষকে মুক্ত করা শুধুমাত্র এর চেয়েও উচ্চতর কোন শক্তির ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ ব্যতিরেকে আদৌ সম্ভবপর হবে না। অতএব ইসলামি স্বাধীনতা শুরু হয় আল্লাহ্‌র বন্দেগি থেকে এবং তা সমাপ্তি লাভ করে বস্তুবাদের আধিপত্য ও প্রতারণা থেকে মুক্তির মাধ্যমে। আর এখানে এসেই দুই স্বাধীনতা প্রদায়ী মেরুর মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যায় এবং প্রত্যেকেই মানুষকে নিজের দাসত্বের দিকে আহ্বান করে যাতে অপর মেরু থেকে মুক্ত হয়ে আসে। সুতরাং কখনোই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বলতে কিছুর অস্তিত্ব নেই। স্বাধীনতা সর্বদা এক মেরুতে দাসত্বের এবং অপর মেরুতে মুক্তির স্বাদ আনে। ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের পার্থক্য হচ্ছে এটা যে, ইসলাম আল্লাহ্‌র দাসত্বকে মানুষের জন্য বস্তুবাদ থেকে মুক্তির পথ স্বরূপ ঘোষণা করে থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য বস্তুবাদের দাসত্বকে স্পষ্ট করে ঘোষণা করে না। বরং মানুষের নিজের উপর কর্তৃত্বের দিককে মুক্তির সূচনাস্বরূপ প্রকাশ করে থাকে। KiAvb এরূপ কর্তৃত্বকে ধোকা ও মিথ্যা স্বাধীনতা[৪৩] বলে আখ্যায়িত করেছে।

একত্ববাদ পার্থিব নিকৃষ্ট মূল্যসমূহের সাথে মানুষের সম্পর্ককে তুলে নেয় এবং তাকে গৌরবান্বিত করে যাতে সে আল্লাহ্‌র দাস এবং জমিনের কর্তা হয়। কিন্তু বস্তুবাদ করে এর উল্টোটা। অর্থাৎ ঐশী উৎকৃষ্ট মূল্যসমূহের সাথে তার সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয় এবং তার মাথাকে হেট করে দেয়। ফলে মানুষের অগ্রযাত্রার ধারা পরিণত হয় ঊর্দ্ধ থেকে পতনের দিকে। এটাই হচ্ছে বাকের সদরের উপস্থাপিত ব্যাখ্যা, যা তিনি পাশ্চাত্য স্বাধীনতা ও ইসলামি স্বাধীনতার মধ্যে অন্তর্নিহিত পার্থক্যকে তুলে ধরার জন্য Avj-gv'ivmvZj KiAwbq¨v গ্রন্থের মধ্যে বিশদভাবে উপস্থাপন করেছেন। বিশ্লেষণের পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন :

> ‘ইউরোপীয় মানুষের আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছেদ করা এবং ঊর্দ্ধাকাশের পরিবর্তে মাটির পৃথিবীর দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার ফলে তার উপরে শ্রেষ্ঠতর উৎসের অভিভাবকত্ব কিম্বা তার অস্তিত্বের বাহির থেকে সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়ার চিন্তা তার থেকে তিরোহিত হয়ে গেছে এবং মনন ও চিন্তার দিক থেকে তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে সে স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি এবং ব্যক্তিগত স্বাধিকারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এ ব্যাপারটি পরবর্তীকালে দর্শনের ভাষায় প্রকাশ পায় এবং ইউরোপের দর্শনের ইতিহাসে †MU wd‡jvmwd (Existentialism) নামে আখ্যায়িত হয়।’[৪৪]

---

[৪৩]. দ্রঃ Avj-KiAvb, জাসিয়া : ২৩।

[৪৪]. বাকের সদর, BKwZmv'bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

ˆPwšÍK ¯^vaxbZv

বাকের সদর মনে করেন, পাশ্চাত্যের চৈন্তিক স্বাধীনতা তখনই তার বিপরীত সারমর্মকে প্রকাশ করে যখন বলে যে, সব স্বাধীনতাই প্রকাশ পেতে পারবে কেবল স্বাধীনতার বিপরীত চিন্তা ছাড়া। এই বক্তব্য অধিকন্তই চৈন্তিক দাসত্বের কারণ হবে, অন্ধ অনুকরণ ও গোড়ামীকে সৌন্দর্য হিসাবে প্রতিভাত করবে আর কুসংস্কারকে পবিত্র করে তুলবে।[৪৫]

চিন্তার স্বাধীনতা আর পিতৃপুরুষ ও সমাজের অনুকরণ এবং পরিবেশ ও পুণ্যবানদের গৌরবকে ধরে রাখার অর্থ এটা নয় যে যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনভাবেই চিন্তা করবে। কেননা, এতে অন্যদের চিন্তা ও স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। প্রাচ্যে যে মূর্তি ও গাভী পূজা প্রচলিত রয়েছে, এর কি কোন চৈন্তিক ভিত্তি রয়েছে এবং এটা কি এক প্রকার চৈন্তিক স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে? নাকি শুধুমাত্র গোত্রীয় ও সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা যা পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে? একে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া মানেই কি চৈন্তিক স্বাধীনতা? তদ্রুপ অন্যদের প্রতি বিশেষ করে ইসলামের প্রতি পশ্চিমাদের যে বিদ্বেষ, এটা কি তাদের চৈন্তিক স্বাধীনতা থেকে উদ্ভুত, নাকি সেই আদিম জাহেলিয়্যাত থেকে উৎসারিত, যা জাতীয়তাবাদ ও বংশীয় শ্রেয়তা ইত্যাদি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক লেবেল লাগিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে?

এভাবে পাশ্চাত্য অর্থে চৈন্তিক স্বাধীনতা বলতে বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীর একটা টোপে পরিণত হয়েছে, অথচ এটা হতে পারতো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণের একটি আকর।

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, পাশ্চাত্য স্বাধীনতা এর ব্যাপক বস্তুবাদী অর্থে যা বুঝায় তা হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, চৈন্তিক ও ব্যক্তিগত অঙ্গনে মানুষের নিজের উপর তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও অন্যের প্রভুত্বকে নাকচ করার চিন্তা। যা বস্তু তথা জড়ের প্রভুত্বের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করেছে। অথচ ধরে নেওয়া হয়েছিল অন্যের প্রভুত্ব থেকে মানুষ নিস্তার পাবে। কিন্তু ফল দাঁড়িয়েছে বিপরীত। অর্থাৎ মানুষ নিস্তার লাভ করেছে ঠিকই কিন্তু সে জড়ের প্রভুত্বের অধীনে বন্দী হয়ে পড়ল যা স্বয়ং তার চেয়েও নিম্নতর।

বাকের সদর বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম মানুষকে জড়বস্তুর দাসত্ব থেকে আল্লাহ্‌র দাসত্বে পৌঁছে দিতে চায়। অর্থাৎ একটি নিকৃষ্ট জিনিসের দাসত্ব থেকে নিরঙ্কুশ পরম অস্তিত্বসত্তার দাসত্বে উন্নীত করতে চায়। যে দাসত্ব বস্তুগত চাহিদার চাপ থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় তা থেকে এমন এক দাসত্বে স্থানান্তরিত করতে চায় যা সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে জন্ম নেয়। বাইরে স্বাধীনতার আড়ালে যে নেপথ্য দাসত্ব তদস্থলে সুস্পষ্ট দাসত্বকে স্থলাভিষিক্ত করতে চায়, যার পশ্চাতে রয়েছে সত্যিকার স্বাধীনতা। ইসলাম এসেছে যাতে মানুষের থেকে জড়বস্তুর শিকলকে খুলে দিতে পারে[৪৬] এবং তাকে বলতে পারে যে, স্বাধীনতা অর্থাৎ একজন আরেকজনকে নিজের প্রভু হিসাবে গ্রহণ কর না। স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হচ্ছে, 'আল্লাহ ব্যতীত কাউকে উপাসনা করব না এবং কাউকেই তার সাথে অংশী হিসাবে গ্রহণ করব না।'[৪৭] এটাই নবিগণের পথ।

কুরআনের ঘোষণায় এসেছে :

> '... এবং তাদেরকে বলে দিন, নিজেদের মতো কাউকে উপাসনা করা ন্যাক্করজনক।'[৪৮][পক্ষান্তরে]'নিরঙ্কুশ সত্তার উপাসনা তো মন্দ কিছু নয়, বরং সহজাত বটে।'[৪৯] [এটাই পূর্ণতার পথ]

---

৪৫. cV¸ ³, পৃ. ১২৭।
৪৬. Avj-KiAvb, আ'রাফ : ১৫৬।
৪৭. Avj-KiAvb, আলে-ইমরান : ৬৪ ।
৪৮. cV¸ ³, আ'রাফ : ১৯২ ।

এ কারণে বাকের সদর সর্বদা তাঁর রচনাবলির মধ্যে এ মর্মে গুরুত্বারোপ করেন যে, একত্ববাদই ইসলামি সভ্যতার মূলভিত্তি। ইসলামি সভ্যতা তার ইতিবাচক, প্রভাবশালী ও সৃজনশীল গুণবৈশিষ্ট্যগুলোকে এই একত্ববাদ থেকেই লাভ করে থাকে। এই ব্যাখ্যা ন্যায়পরতা, কর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিকতাসহ জীবনের সকল বিষয়ে প্রবাহমান। একারণে বাকের সদর তাঁর 'নাযরাতু অম্মাহ ফি আল-ইবাদাত' (نظرة عامة فى العبادة) শীর্ষক প্রবন্ধে মানুষদেরকে পূর্ণতার দিকে টেনে আনতে এবং প্রধান প্রধান বৈপরীত্যসমূহ নিরসনে নিরঙ্কুশ অস্তিত্বসত্তা (আল্লাহ্)-র প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সেখানে তিনি বলেন :

> 'ইউরোপীয় মানুষ রেনেসাঁর শুরুতে স্বাধীনতাকে উৎকৃষ্টতর মূল্যবোধের স্থলে গ্রহণ করে নেয়। কারণ সে জীবনের সর্বাঙ্গনে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দেখতে পেয়েছিল। এমনকি বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসমূহের মধ্যেও। [এমতাবস্থায়] পাশ্চাত্য, মানুষ থেকে এমন এক স্বাধীন অস্তিত্বসত্তা তৈরী করতে চাইল, যে যখনই কোন কাজ করতে চাইবে তা করতে পারবে এবং অন্যের নয় বরং নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করতে সক্ষম হবে।
>
> - এ পর্যন্ত কথা ঠিকই ছিল। কিন্তু ভ্রান্তিটা ছিল এই যে এ সিদ্ধান্তটি ছিল অনুভূমিক। মানুষের থেকে শিকল ভাঙ্গা অর্থে যে স্বাধীনতা তা মূল্যবান এবং মূল্যবোধসমূহের বিচারে উত্তীর্ণ। কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতা কখনো একাকীভাবে মানুষকে নির্মাণ করতে পারে না। এটা হয় না যে মানুষের শিকলগুলো খুলে দিয়ে তাকে শুধু বলা হবে যে, তুমি যা খুশি তাই কর। শাসক কিম্বা পুরোহিত কারোরই তোমার উপর কর্তৃত্ব নেই। অর্থ ও মর্মকথা বাদ দিয়ে শিকল ভেঙ্গে ফেলা মানবের বিকাশ ও উন্নয়নের যোগ্য ও যথার্থ কাঠামোকে বিকলগ্রস্ত করে দেয়। আর ঠিক এটাই সেই জিনিস, যে ব্যাপারে ইউরোপীয় মানুষ অবহেলা প্রদর্শন করেছে। স্বাধীনতা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও আঙ্গিক ছাড়া হতে পারে না। কিন্তু ইউরোপীয় মানুষ স্বাধীনতাকেই চূড়ান্ত মূল্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ধরে নিয়েছে। কিন্তু কাঠামো যদি সারবস্তু বিহীন থাকে তাহলে অরাজকতায় পর্যবসিত হয়। যা আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[৫০]

বাকের সদর জোরালোভাবে দাবি করেন যে, একত্ববাদ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে : প্রথমত, স্বাধীনতা এটা নয় যে মানুষকে বলবে তোমার পথ খোলা রয়েছে। বরং সত্যিকার স্বাধীনতা হল এটা যে মানুষ চিন্তা দ্বারা তার পথ নির্ধারণ এবং তার চিহ্নাবলি ও প্রবণতাসমূহ চিত্রায়িত করার মাধ্যমে তার মনুষ্যত্বকে রক্ষা করতে পারবে। আর এটা নির্ভর করে অন্য সবকিছুর আগে তার কামনা-বাসনার দাসত্ব থেকে স্বাধীন হওয়ার উপর। এক্ষেত্রে একত্ববাদ সামাজিক, রাজনৈতিক, চৈন্তিক ও ব্যক্তিগত পরিসরে স্বাধীনতাকে সত্যিকার সার্থকতা প্রদান করে।[৫১] এজন্যই বাকের সদর বস্তুবাদী জীবনে উপরোক্ত চার ধরনের স্বাধীনতাকে দেখেন ক্রুটিপূর্ণ, কিন্তু ধর্মীয় জীবনে পরিপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, একত্ববাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা। ইসলাম তার একত্ববাদী বৈশিষ্ট্যের কারণে জুলুম, নিপীড়ণ, খোদাদ্রোহিতা ও বিভিন্ন প্রকার দাসত্বের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক বিপ্লব হিসাবে পরিগণিত হয়। কিন্তু এই বিপ্লব ধরনগত দিক থেকে অপরাপর সামাজিক বিপ্লবের থেকে ভিন্ন। কেননা, এই বিপ্লব মানুষকে ভেতর থেকে স্বাধীন করে দেয় এবং ঐ একই সময়ে অস্তিত্বকে বাহির থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করে ফেলে। প্রথম স্বাধীনতাটি হচ্ছে 'আল-জিহাদ আল-আকবার' (الجهاد الاكبر) তথা বৃহত্তর প্রচেষ্টা। আর দ্বিতীয় স্বাধীনতাটি হচ্ছে 'আল-জিহাদ আল-আসগার' (الجهاد الاصغر) তথা ক্ষুদ্রতর প্রচেষ্টা।[৫২]

---

৪৯. C√¸ ³, রূম : ৩০।

৫০. বাকের সদর, A√j-g√'iv√m√Zj KiA√w√bq¨√, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

৫১. C√¸ ³, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

৫২. দ্র.বাকের সদর, A√j-Bmj√g Bq√K' A√j-n√q√Z, তেহরান : World Organization for Islamic Services, তা. নে. পৃ. ২৭ ।

ইতিহাসের সাক্ষ্য মতে, বিপ্লবের দুইটি প্রধান ভিত্তি রয়েছে। একটি হচ্ছে হীনবল নিপীড়িত জনগণের হৃদয়সমূহ, যেগুলো জুলুম নিপীড়নে জর্জরিত হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আবেগের দ্রোহ ও বিস্ফোরণ, যা দাসত্বের গুমট অবস্থা থেকে উৎপত্তি লাভ করে। দ্বিতীয় ভিত্তিটি বিপ্লব সংঘটিত করে। যেহেতু মানুষ ন্যায়পরতা, সত্য এবং আল্লাহ্‌র দাসত্বের ন্যায় মূল্যবোধসমূহের অনুসন্ধান করে ফেরে, যাতে সে অন্য কারও দাসত্ব থেকে নিস্তার লাভ করে এবং মর্যাদা অর্জন করতে পারে। এ পর্যায়ে ওয়াহি ও নবুওয়াতের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃত বিপ্লব কখনোই ওয়াহি ও নবুওয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। যেমনভাবে খোদায়ী নবুওয়াত ও রেসালাত কখনোই অযাচিত দাসত্বপনা ও খোদাদ্রোহিতার বিরুদ্ধে সামাজিক বিপ্লব হতে বিচ্ছিন্ন থাকেনি।[৫৩]

তাই বাকের সদরের বিশ্বাস, একারণেই মহামহীম আল্লাহ্ ধর্ম দিয়েছেন। যে ধর্মের মধ্যে নবিগণ প্রেরিত হয়েছেন এবং ঐশীগ্রন্থসমূহও অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ ধর্মের নামকরণ করেছেন 'ইসলাম', যার অর্থ দাঁড়ায় 'আত্ম-সমর্পণ'। এখানে আত্ম-সমর্পণ বলতে মানুষের নফ্‌স্ তথা প্রবৃত্তিকে ঐসব জিনিসের উপর আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করা বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর উপর আনুগত্যশীল থাকা উচিত। 'আত্ম-সমর্পণ'- এজন্য নয় যে মানব প্রবৃত্তি একত্ববাদ থেকে পলায়ন করতে চায়, তাই তাকে একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসে বাধ্য করতে হবে। কারণ একত্ববাদ হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগত উপলব্ধি এবং মানবচিত্ত এর সাথে একান্ত আপন। বরং ধর্মের মধ্যে এমন একটি জিনিস বিদ্যমান থাকার প্রতি ইশারা করার জন্যই 'আত্ম-সমর্পণ' নামকরণ করা হয়েছে, যে জিনিস থেকে মানব প্রবৃত্তি ঠিকই পলায়নপর থাকে। তাই আত্ম-সমর্পণ (ইসলাম) হচ্ছে ঐ জিনিসটির প্রতিই আনুগত্যশীল থাকা। আর সেটা হল একত্ববাদের সামাজিক প্রেক্ষিত তথা সামাজিক দিকটি। এখানে নফ্‌স্‌কে পরিশুদ্ধ ও প্রস্তুত করতে হবে যাতে মানবসেবা ও সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে আত্ম-নিয়োগ করতে পারে, কোন সীমা লঙ্ঘন না করে এবং অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চলে। নফ্‌স্‌কে যদি তার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে যা ইচ্ছা সেটাই পেতে চায়; কিন্তু সেটা তার প্রাপ্য নাকি অন্যের প্রাপ্য কিছু যায় আসে না। এখানে নফ্‌সের বাধ্য ও পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, যেটা ইসলামের কাঠামোর মধ্যে বিহীত করা হয়ে থাকে এবং যা বন্দেগি ও একত্ববাদের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে একত্ববাদ একটি নিরঙ্কুশ মূল্যবোধ হেতু মানুষের উপর কর্তৃত্ব করার প্রাকৃতিক অধিকার রাখে। আবার ইসলামি সভ্যতার পূর্ণতার একমাত্র উৎস হেতু এটাই স্বাভাবিক যে মানুষদের মধ্যে পার্থক্য করবে না এবং নির্দিষ্ট কোন মানবগোষ্ঠী ও অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র হবে না।

সুতরাং পৃথিবীর উপর একত্ববাদের কর্তৃত্ব পূর্ণ ও সর্বব্যাপী হওয়া উচিত এবং ইসলাম আরব উপদ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কোন অর্থই হয় না। তাই জিহাদ ও দেশ জয় কোন জুলুম ও সাম্রাজ্যবাদী কাজ নয়। বরং এটা হচ্ছে একত্ববাদ ও তার কর্তৃত্বকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর একটি উপায়মাত্র। অমুসলমানদের উপর মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বজগতের উপর একত্ববাদের বাণীকে সমুন্নত করা এবং এর কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটানো। সুতরাং একত্ববাদের অন্তর্নিহিত দাবিই হচ্ছে জিহাদ ও দেশ জয়। অন্যথায় একত্ববাদের মর্মসারই ত্রুটিপূর্ণ রয়ে যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্য নিরঙ্কুশ মূল্যবোধের অনুসরণ করে না। পাশ্চাত্য মানুষের তার নিজের উপর প্রভুত্বকে চর্চা করে এবং এটাই তাদের চিন্তার ভিত্তি। সাম্রাজ্যবাদ এই চিন্তাকে লালন করে। তাই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার সবসময় পাশ্চাত্য চিন্তায় অসততার কাহিনী বর্ণনা করে। এটাই হচ্ছে ইসলামি জিহাদ আর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য।[৫৪]

---

[৫৩]. দ্র.cv¸ ³, পৃ. ১৫৭-১৬০।

[৫৪]. দ্র.Avj-gvRgAvZ Avj-Kvwgjvn (ev‡Ki m'i iPbv mgM), বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল-মাতবুআত, ১৯৮০, খ. ১৩, শেষ পৃষ্ঠা।

7. b¨vqciZv

সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদরের আর্থ-সামাজিক দর্শনে 'ন্যায়পরতা' প্রসঙ্গটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মুসলিম চিন্তাবিদদের অনেকেই ন্যায়পরতার ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন ঠিকই। তবে এক্ষেত্রে বাকের সদরের বিশেষ অবদান হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ন্যায়পরতার ব্যাপারে তিনি একটি তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর তা নিয়ে ব্যাপক ও প্রয়োগিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। বাকের সদরের যে সকল গ্রন্থে সামাজিক ন্যায়পরতা সংক্রান্ত তত্ত্ব ও বিশ্লেষণগুলো বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে Avj dvZvDwq Avj Iqvw'nv, dvjmvdvZbv এবং Avj-gv'ivmvZj KiAwbq¨v বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।একইভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়পরতা সংক্রান্ত তাঁর দার্শনিক বিশ্লেষণগুলো এসেছে তাঁর dvjmvdvZbv, wLjvdvZj Bbmvb Iqv kvnv'vZj Awm¤qv, BKwZmv'bv, Avj-e¨vsK Avj-jv-ivevex wd Avj-Bmjvg ইত্যাদি গ্রন্থে। সামাজিক আদর্শের আলোচনায় 'ন্যায়পরতা'র আলোচনা একান্তই অপরিহার্য এবং এর প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে।

b¨vqciZvÕi A_©

'ন্যায়পরতা' কথাটির নানারকম অর্থ করা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, ন্যায়পরতা হল শক্তিমানের ক্ষমতা। প্লেটোর মতে, ন্যায়পরতা হল যার যা প্রাপ্য তাকে তাই প্রদান করা। আইনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরতা হল পক্ষপাতশূন্যতা। সমাজ-জীবনে যদি কোন ব্যক্তি মনে করে অপরে তার স্বার্থ এবং অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে, তাহলে আইনের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতশূন্য বিচারের দ্বারা তার দাবিকে বিচার করে দেখেন এবং তাঁকে তার অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ন্যায়পরতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ শাসন করেন। প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রের শাসকবর্গের লক্ষ্য কী? রাষ্ট্রের শাসকবর্গের লক্ষ্য হল ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয়- প্রথমত, রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারে, এরূপ সর্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা কি? দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন পরিবর্তনের মাঝেও এই ব্যবস্থাকে কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে? এবং তৃতীয়ত, এই সমাজব্যবস্থা ব্যাহত হলে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কীভাবে সম্ভব?

অ্যারিস্টটলের মতে, প্রথম প্রশ্নটির সাথে যুক্ত রয়েছে বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নদ্বয়ের সাথে যুক্ত রয়েছে সংশোধনমুলক ন্যায়পায়নতা।

eÈbgjK b¨vqciZv (Distributive Justice)

এই ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সামর্থ, মানসিক প্রবণতা এবং শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা ও ক্ষমতানুযায়ী নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তি যাতে তার নিজ নিজ স্থানে সামর্থ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার পথে বিদ্যমান যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হতে পারে। শিক্ষার সাহায্যে তার শক্তিকে বিকশিত করা এবং তার কাজের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা সম্ভব, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ স্থানে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য চেষ্টাশীল হয়। কাজ করার জন্য যে সব উপকরণের প্রয়োজন, রাষ্ট্রের উচিত সেগুলোর ব্যবস্থা করা।

ms‡kvabgjK b¨vqciZv (Corrective Justice)

ন্যায়পরতার যেমন একটা সদর্থক্ দিক আছে, তদ্রূপ এর একটা নঞর্থক্ দিকও রয়েছে। যদিও রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তিকে তার নিজ নিজ কাজে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তবু নানা কারণে সেই ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। হয়ত ব্যক্তিরা তাদের নিজ নিজ কাজ মনোযোগ সহকারে নাও করতে পারে বা ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিতে পারে। হয়ত কোন ব্যক্তি অপরের কাজে অবাঞ্ছিতভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে বা কোন ব্যক্তি আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত হতে পারে- এই সবকিছুই জনকল্যাণের আদর্শকে ব্যাহত করতে পারে। এই অবস্থায় উচিত একটি শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করা, যে সংগঠন এই সকল জনকল্যাণের আদর্শকে অব্যাহত রাখতে পারে। সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা সম্পর্কীয় এমন কতকগুলো সার্বভৌম নীতি রচনা করা যেতে পারে, যেগুলো সামাজিক নীতিগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

ev‡Ki m'i-Gi e¨vL¨v

বাকের সদর ন্যায়পরতার দার্শনিক ব্যাখ্যায় একে 'সত্য'র সমার্থক বলে মনে করেন। তিনি বলেন :

> "সকলেই আমরা সহজাত ও সর্বজনবিদিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আচরণের জন্য একটি সর্বসাধারণ মানদণ্ডের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করি। তা হচ্ছে ঐ মানদণ্ড, যা জোর দিয়ে বলে 'ন্যায়বিচার হচ্ছে সত্য ও শুভ। আর অত্যাচার হচ্ছে মিথ্যা ও অশুভ।' আর যে ব্যক্তি তার জীবনে ন্যায়পরতার চর্চা করে তাকে আমরা সম্মান ও পুরস্কারের পাত্র বলে মানি। অপরদিকে যে ব্যক্তি অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করে তাকে আমরা শাস্তি ও দমনযোগ্য বলে মনে করি।"[৫৫]

বাকের সদর কোন কোন স্থানে 'ন্যায়পরতা'র অর্থ করেছেন 'মধ্যম অবস্থা' বা কোন ব্যাপারে 'মধ্যম পন্থা' হিসাবে।[৫৬] আর ফিকাহ্শাস্ত্রের আলোচনায় তিনি 'ন্যায়পরতা'কে একটি 'আত্মিক শক্তিমত্তা' হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যবিশেষ এবং যা প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে নিষ্ঠার সাথে প্রবৃত্ত হয় এবং এ পথে দৃঢ়চিত্তের পরিচয় দেয়।[৫৭]

বাকের সদর ন্যায়পরতা সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে প্রধানত চারটি মানদণ্ডে স্থাপন করেন এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির বিবরণ প্রদান করেন-

b¨vqciZvi welqe¯‘ wnmv‡e ÔgvblÕ

ন্যায়পরতার বিষয়বস্তু হিসাবে মানুষই হচ্ছে প্রধান মানদণ্ড। এ প্রসঙ্গে বাকের সদরের অন্যতম শিষ্য সদরুদ্দিন কাবাঞ্চী বলেন :

> 'অবস্তুগত এবং অ-একত্ববাদী দৃষ্টিতে দুনিয়া হচ্ছে মানুষের [গতি]পথ, যার এক প্রান্ত দুর্নীতি, কলুষতা, ব্যক্তিত্বে অসামঞ্জস্যতা এবং দিক্-ভ্রষ্টতা দ্বারা গঠিত, আর অপর প্রান্তটি সৌভাগ্য, প্রীতিকর ও মঙ্গলময় পরিণতি দ্বারা গঠিত। এ কারণে মানুষের জন্য দরকার বাস্তব রূপ লাভ করার পথে চলা, সরল ও যৌক্তিক পথ ও পন্থা অবলম্বন করা। বাকের সদরের দৃষ্টিতে, ন্যায়পরতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অর্থাৎ ন্যায়পরতা হচ্ছে মানবের অস্তিত্বসত্তার কাঠামোর উপর ভিত্তিশীল সরল পথ।'[৫৮]

---

[৫৫]. বাকের সদর, Avj dvZvDwq Avj-Iqvwn`vn, বৈরুতঃ দায়িরাতুল মাআরিফ লিল মাতবুয়াত, ১৯৯৪, পৃ. ৫৩।
[৫৬]. cÖv¸³, ৫৪।
[৫৭]. cÖv¸³, ১২০।
[৫৮]. সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন আল-কাবাঞ্চি, Avj-wdKi Avj-wmqvmx wjj Bgvg Avj-kvnx` mv`i, তেহরান : মাজলিস আল-আ'লা, ১৯৯৩, পৃ. ১১।

b¨vqciZvi welqe¯‘ wnmv‡e ÔwekRMZÕ

বাকের সদরের দৃষ্টিতে গোটা বিশ্বজগতই সৃষ্টি, সংঘটন ও পূর্ণতা লাভ, সম্ভাব্যতা থেকে বাস্তবতায় পরিণত হওয়া এবং সামাজিক ও ব্যক্তিক দিকসমূহের প্রতিভা থেকে কার্যে পরিণত হওয়া -এ সমস্ত ব্যাপারই ন্যায়পরতার বিষয়বস্তু স্বরূপ। সৃষ্টিতে যা কিছু 'অস্তিত্বশীল' তা সবই এক প্রকার ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যের অধিকারী। বিশ্বজগতের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকার বিষয়টি নিজেই ন্যায়পরতার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তার চতুর্পাশও তদ্রূপ ন্যায়পরতার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং মানুষের সাথে মানুষের ও মানুষের সাথে বিশ্বজগতের সম্পর্কের ভেতর একপ্রকার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।[৫৯]

b¨vqciZvi welqe¯‘ wnmv‡e ag© I agxq weavbvewj

বাকের সদরের মতে মানবের প্রয়োজনীয় বিধানাবলি, তা বুদ্ধিবৃত্তিকই হোক আর ধর্মপ্রবর্তিতই হোক, ন্যায় ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে হতে হবে। সামগ্রিকভাবে যা কিছুই সৌভাগ্য ও পূর্ণতার পথে মানুষের জীবনের গতিপথকে নির্ধারণ করে এবং এ পথে মতাদর্শ, আইন, রাজনৈতিক ও সামাজিক পদ্ধতি, ধর্মীয় বিধানাবলি নির্বিশেষে যা কিছুই মানুষের কাজে আসে, তা ন্যায়পরতার প্রধানতম ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির উপর নির্মিত হতে হবে।[৬০]

b¨vqciZvi welqe¯‘ wnmv‡e ÔmgvRÕ

ন্যায়পরতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হচ্ছে মানব সমাজ ও মানব সংস্থাসমূহ। কেননা, মানবের মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটিত হয় মানব সমষ্টি ও সমাজের মধ্যেই। সমাজে ন্যায়বিচার বিদ্যমান থাকা মানুষদের গড়ে ওঠার ও তাদের অন্তঃকরণে ন্যায়পরতা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ঠিক তদ্রূপভাবে মানুষের অন্তঃকরণে ন্যায়পরতাও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে থাকে। প্রত্যেক সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং সামাজিক পরিবর্তনের গতির কেন্দ্র হচ্ছে ন্যায়বিচার। ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষা এবং সর্বজনীন মঙ্গলকে অগ্রগণ্য করার মধ্যেই ন্যায়বিচার নিহিত রয়েছে বলে বাকের সদর দাবি করেন।[৬১]

8. mvgvwRK b¨vqwePvi wK?

সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার হচ্ছে সমাজের মধ্যে এবং মানব ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপলক্ষের মধ্যে সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়নতার মূর্ত প্রকাশ। এর দৃষ্টান্তসমূহ সামাজিক ও দলীয় কর্মে এবং আইন অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। আর যেহেতু বাকের সদরের মতে ন্যায়পরতা নিছক বিমূর্ত ও আদর্শিক ধারণা নয়, একারণে সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারও একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার একটি অস্তিত্বশীল আলোচনাযোগ্য ধারণা, আবার একই সাথে তা বাস্তব দৃষ্টান্তসমূহের অবয়বে মূর্তভাবেও প্রতিভাত হয় এবং স্বয়ং বিদ্যমান।

বাকের সদর সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়পরতাকে সত্যিকার ন্যায্যতা ও সাম্যতা বলে মনে করেন যা সমাজের অভ্যন্তরে ভারসাম্যতার উপর ভিত্তিশীল। এ ভারসাম্যের ভিত্তি দুই দিক থেকে- ঐশ্বরিক ন্যায়পরতা এবং সহজাত

---

[৫৯]. দ্র.বাকের সদর, dvjmvdvZbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮।
[৬০]. মুহাম্মদ হোসাইন জামশিদী, C'vjvZ Avh w' 'Mv‡n dviwe, সাদর ওয়া ইমাম খোমেইনি, তেহরান : মুআসসেসে-এ নাশ্‌র, ২০০১, পৃ. ৫৫৯।
[৬১]. দ্র. বাকের সদর, Avj-gv'ivmvZj KiAwbq¨v, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

ন্যায়পরতা। এখানে ব্যক্তি মানবের মধ্যে এবং রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে সত্যিকার সাম্যতা বলতে বুঝানো হয়েছে যা যোগ্যতা ও প্রাপ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাকের সদর প্রদত্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়পরতার এই যে ব্যাখ্যা, তা অধিকন্ত এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্তসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করে থাকে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে দুইটি মৌলিক অক্ষের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞায়ন করে। একটি হচ্ছে ঐশ্বরিক ন্যায়পরায়নতা এবং অপরটি সহজাত ন্যায়পরায়নতা। এ উভয় অক্ষের আবার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, সূচক ও মানদণ্ড রয়েছে। বাকের সদরের ব্যাখ্যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের তিনটি প্রধান স্তম্ভ রয়েছে। যথা :

১. সামাজিক দায়িত্বশীলতা।
২. সামাজিক ভারসাম্যতা এবং
৩. সামাজিক নিরাপত্তা।

mvgwRK ‘wqZkxjZv

আরবি 'তাকাফুল' (تكافل) কথাটির অর্থ একে অপরের ভার নেওয়া কিংবা পৃষ্ঠপোষক হওয়া। আর বাকের সদরের প্রয়োগে এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক প্রকার পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ও পরার্থপরতা, যার ভিত্তি হল একান্ত ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষা করা এবং সর্বজনীন স্বার্থ ও মঙ্গল নিয়ে চিন্তা করা এবং সেদিকেই মনোনিবেশ করা।[৬২]

বাকের সদরের দৃষ্টিতে সামাজিক এ পারস্পরিক দায়ভার দুই ধরনের : (১) আত্মিক এবং (২) আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ সব মানুষই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তিনি এ নীতিবোধকে ইসলামের 'আল-উখুওয়াত' (الأخوة) তথা ভ্রাতৃত্বের মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেন। ফলে তা মানবের সহজাত ও আত্মিক শিকড়ে গেঁথে যায়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নির্বাহী দায়বদ্ধতা যা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির উপর বর্তায়। সুতরাং সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়ভার সর্বসাকূল্যে ব্যক্তিক, দলীয় তথা সামষ্টিক এবং রাজনৈতিক শক্তির দায়বদ্ধতা রূপে থাকে।

mvgwRK fvimvg¨

এখানে ভারসাম্যতা বলতে উদ্দেশ্য জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা, আয়-উপার্জনের পর্যায়ে নয়। সামাজিক ভারসাম্যতার মূলনীতিটি ব্যাপক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যপ্তিসম্পন্ন। এর তাত্ত্বিক ভিত্তিসমূহকে নিম্নোক্ত ধারায় তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে :

১. সমাজের ব্যক্তিবর্গের স্বাভাবিক তথা প্রাকৃতিক পার্থক্যসমূহ।
২. সামাজিক বা রাজনৈতিক কর্মের উপর মালিকানার ভিত্তি নির্ধারণ।
৩. চাহিদা ও তা পূরণের উপর কর্মের ভিত্তি নির্ধারণ।
৪. সমাজ টিকে থাকা এবং সঠিকভাবে রাজনৈতিক জীবন অব্যাহত রাখার মূলনীতি।
৫. পরার্থপরতা ও সমাজের ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তার মূলনীতি।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত ধারাগুলোর মধ্যে কতেক নিছক অর্থনৈতিক, কতেক নিছক সাংস্কৃতিক এবং কতেক নিছক রাজনৈতিক ক্ষেত্রবিশিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ সমাজের ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক অঙ্গনে সামাজিক ভারসাম্যতা হচ্ছে

---

[৬২] .__________ , BKwZmv ‘bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৮।

জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে সাম্যতা, উপার্জনের পর্যায়ে সাম্যতা নয়। জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে সাম্যতা কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে সমাজের সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধাগুলো এমনভাবে সকলের নাগালের মধ্যে রাখা, যাতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সাধারণ পর্যায়ে অন্যদের সাথে সমানভাবে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সমাজে সকল ব্যক্তির জন্য একই পর্যারের অর্থনৈতিক জীবন জীবিকার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকবে। অবশ্য এই ভারসাম্যশীল ও সুষম পর্যায়ের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তর গোচরীভূত হবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবন-জীবিকার পর্যায়ের অভ্যন্তরে আবার স্তরগত পার্থক্য থাকা একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়।

অনুরূপভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনেও ভারসাম্যতার অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের দিক থেকে একসমান সুযোগ সুবিধা বজায় থাকা এবং আইনগতভাবে কোন প্রতিবন্ধকতাই তাদের সামনে বিদ্যমান না থাকা। আর সামাজিক অঙ্গনে ন্যায়বিচার হচ্ছে ব্যক্তিবর্গ পারিবারিক অধিকার, প্রতিনিধি রাখার অধিকার ইত্যাদি সামাজিক বিষয়ে একসমান অধিকার থাকবে। অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গন হবে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ সৃষ্টির ময়দান। তবে এ সুযোগের সঠিক সদ্ব্যবহার করা বা না করার ব্যাপারে নাগরিকগণ ও তাদের ইচ্ছা মূল ভূমিকা পালন করবে।

mvgvwRK I ivR‰bwZK wbivcËv

সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা বলতে উদ্দেশ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি ও নিরাপত্তা বিধানে ক্ষমতার রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার ও দায়িত্ব। বাকের সদরের দৃষ্টিতে, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা রাজনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ন্যাস্ত।[৬৩] বলা যেতে পারে যে, সমাজ ও সামাজিক শক্তির স্তরে সাধারণ ও সর্বজনীন দায়িত্ব হিসাবে তাকাফুল (তথা পারস্পরিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা) যেমন, ঠিক তার বিপরীত হচ্ছে রাজনৈতিক কাঠামো ও রাজনৈতিক ক্ষমতার স্তরে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা।

রাজনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপকতর দিক রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যেমন নিরাপত্তা, বাসস্থান, কর্ম-সংস্থান ইত্যাদি। আর সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. এটা মানবের প্রাকৃতিক ও সহজাত অধিকার।
২. এটা সমাজে ভ্রাতৃত্বসুলভ সহমর্মিতার উপর ভিত্তিশীল। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধের কাঠামোর মধ্যে মানুষদের একে অপরের প্রতি মমত্ববোধ ও হিতৈষী স্বভাব থেকে উৎসারিত।
৩. ইহা সাধারণ এবং সর্বজনীন। বিশেষ কোন রাজনৈতিক সমাজের ব্যক্তি, দল কিম্বা গোষ্ঠীর মধ্যে স্বতন্ত্র নয়।

পরিশেষে বাকের সদর সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের কতেক সূচক রয়েছে বলে মনে করেন, যেগুলো সংঘটিত হলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বাকের সদরে দৃষ্টিতে এসকল সূচক ও মাপকাঠিগুলো[৬৪] নিম্নরূপ -

১. সমাজে আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের নৈতিকতা ভিত্তিক এক সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকা।
২. ব্যক্তির মধ্যে ‘তাকওয়া’ ভিত্তিক এক আত্মিক শক্তি থাকা, যা টেকসই এবং স্থায়ীভাবে বিরাজমান থাকবে।
৩. সামাজিক নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ যেমন ঘুষ, সুদ, চুরি, খেয়ানত, কপটতা, মিথ্যাচার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা।

---

৬৩. Cv¸ 3, পৃ. ৬৯৫।
৬৪. ________, wimvjvZbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৪. নিছক পার্থিব আকর্ষণ ও বস্তুগত চাকচিক্যের প্রতি আসক্তি বা নির্ভরতা না থাকা।

৫. সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভেদ না থাকা।

৬. সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি থাকা।

৭. সমাজের সকল ব্যক্তির প্রতিভাসমূহের সর্বাত্মক প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটা।

৮. সমাজে যোগ্যবানদের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

৯. জনমুখী সরকার ব্যবস্থা এবং ব্যাপক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ।

১০. রাজনৈতিক দলসমূহের বিশ্বাস ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

১১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সমানাধিকার বজায় থাকা।

১২. সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস থাকা।

PZ_ Aa¨vq

mvgwRK mgm¨vewj Ges a‡g cZ¨veZ‡bi WvK

PZ_ Aa¨vq

mvgvwRK mgm¨vewj Ges a‡g cZ¨veZ‡bi WvK

1. mvgvwRK mgm¨v ej‡Z wK eSvq?

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, সামাজিক সমস্যা হল এমন একটি পরিস্থিতি যেটা সমাজের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্যকে অস্বীকার করে বা অস্বীকার করার ভয় দেখায়। যার ফলে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা আয়ত্তে আনার আবশ্যকতা দেখা দেয়।

সমস্যা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে- সামাজিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং শারীরিক। তবে অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে সামাজিক সমস্যার পার্থক্য আছে। নিস্‌বেট (Nisbet) এবং মার্টন (Merton)-এর মতে, সামাজিক সমস্যার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, সামাজিক সমস্যা নৈতিক মূল্য এবং সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার জন্য নিজেই একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। তারা সামাজিক এই অর্থে যে, মানুষের সম্পর্কের সঙ্গে এবং মানুষের সম্পর্কের অস্তিত্ব রয়েছে যে সব আদর্শমূলক প্রসঙ্গের সঙ্গে তারা সম্বন্ধযুক্ত। তারা সমস্যা এই অর্থে যে, প্রত্যাশিত ও বাঞ্ছিত বিষয়ের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তারা বাধার সৃষ্টি করে। তারা সমস্যা এই অর্থে যে, যা যথার্থ বা সঠিক এবং সমাজ যেভাবে এই সঠিক-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করে, সামাজিক সমস্যা তা লঙ্ঘন করে এবং সমাজের অভিপ্রেত সামাজিক আদর্শের ও সম্পর্কের স্থানচ্যুতি ঘটায়।[১]

সামাজিক আদর্শভ্রষ্টতা অনেক সামাজিক সমস্যার তাত্ত্বিক ভিত্তি। আদর্শভ্রষ্ট আচরণ শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না, তা নয়, তাদের বিরোধিতা করে। যে ব্যক্তি সামাজিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে, সে, সামাজিক দিক থেকে স্বাভাবিক এবং সে নিজেকে স্বাভাবিকও গণ্য করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সামাজিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই না বরং তাকে লঙ্ঘন করে তাকেই আদর্শভ্রষ্ট বলা হয়। সেই ব্যক্তি, গোষ্ঠীর সভ্যই হোক বা গোষ্ঠী বহিষ্কৃত কোন একক ব্যক্তিই হোক, সে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। এ কারণে, সামাজিক সমস্যা নানা কারণে উদ্ভূত হলেও সমাজ-দার্শনিকের চোখে সামাজিক আদর্শপ্রিয়তা ও মূল্যবোধের হ্রাসই সামাজিক সমন্বয়কে ব্যাহত করে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। ব্যক্তির পরম কল্যাণ নিহিত তার পূর্ণতা লাভের প্রচেষ্টায়। এই ব্যক্তি যখন তার পরম-কল্যাণকে বিস্মৃত হয়ে জাগতিক কল্যাণকেই বড় করে দেখে, তখনই পরম মূল্যগুলোর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা দেয়। ব্যক্তির নিজের আচরণে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যার ফলে সমাজের সম্পর্কগত আচরণেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এরই অনিবার্য পরিণতি হল নানাধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটা।

সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাগুলো আমাদের বর্তমান জটিল সমাজের দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের পরিণাম, সাংস্কৃতিক জটিলতা, তীব্র গভীরতা এবং সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিকে প্রকাশ করে। সামাজিক সমস্যার বর্তমান যুগে নাগরিক সংস্কৃতি, প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত প্রগতি এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। সমাজের মধ্যে সমস্যার দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব এইসব সমস্যার সমাধানে সমাজের ব্যর্থতারই পরিচায়ক। এই ব্যর্থতাই সামাজিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু।

---

[১]. উৎ. অধ্যাপক প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত, mgvR ‘kb, কলিকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ. ২১৩।

2. ev‡Ki m‘‡ii ‘wó‡Z mvgwRK mgm¨vi ¯i/c

বাকের সদরের মতে, সমসাময়িক মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে মানুষের জীবন ও সৌভাগ্যের জন্য আদর্শতম সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। এটি এমন এক প্রশ্ন যার সরাসরি কোন উত্তর প্রদানে আধুনিক বিজ্ঞান সক্ষম নয়। একইভাবে পাশ্চাত্য বিভিন্ন মতাদর্শও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে সমসাময়িক মানুষের সমস্যাবলির ভাল কোন সুরাহা নিশ্চিত করতে পারেনি। এমতাবস্থায় মানুষের কল্যাণের পথ হিসাবে যে জিনিসটির কথা বেশি বেশি আলোচিত হয় তা হচ্ছে মানুষের জন্য ধর্মের আশ্রয়। কেননা, ধর্ম মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রেরণাসমূহকে সামাজিক জীবনের সাথে সমন্বয় করার মাধ্যমে গণমানুষকে ব্যবহারিক মানদণ্ড ও সামাজিক শৃঙ্খলার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারে এবং সুসমন্বিত কাঠামোর আওতায় মানব জীবনের চাহিদাসমূহ ও সামাজিক কল্যাণসমূহকে সু-সংরক্ষণ ও সুপরিচালিত করতে পারে।

বিগত এক শতাব্দীকালেরও অধিক সময় ধরে গোটা বিশ্বে পণ্ডিতগণ অনুধাবন করতে পেরেছেন যে সমসাময়িক মানুষের জীবনে বড় ধরনের সমস্যা উদ্ভুত হয়েছে। যা মানুষের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হতাশা এবং শেষ পরিণতিতে তার সামাজিক জীবনের ভিত্তি নস্যাৎ করে ফেলার কারণ হতে পারে। তবে এসব সমস্যার স্বরূপ ও উৎপত্তির কারণ এবং তা নিরসনের উপায় সম্পর্কে দার্শনিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নানান বিশ্লেষণ ও অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। এসব বিশ্লেষণ ও মত-অভিমতের মধ্যে আবার বৈপিরীত্যও চোখে পড়ে। অথচ মতভেদসমূহ সমসাময়িক মানুষের জীবনের সমস্যাবলির লাঘব তো করেইনি, বরং আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

শীর্ষ মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে যারা এ মর্মে উল্লেখযোগ্য মতামত প্রকাশ করেছেন সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি স্বীয় জ্ঞান-গবেষণার একটি বড় অংশ জুড়ে সমসাময়িক মানুষকে চেনা এবং আধুনিক বিশ্বের সমস্যাবলি উদ্ঘাটনে ব্যয় করেন এবং এ সম্পর্কিত তাঁর গবেষণাকর্ম Avj-Bbmvb Avj-gAwmi Iqv Avj-gkwKjvZ Avj-BRwZgwqq¨v[2] শিরোনামে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। যে যুগে ইসলামি ও আরব রাষ্ট্রগুলোতে যুব সমাজ বাম বৈপ্লবিক চিন্তা ও শ্লোগানের স্রোতে ভেসে চলছিল, আবার অন্যদিকে আরেক দল উদারনৈতিক মতবাদের হৃদয় হরণকারী বাহ্যিক আকর্ষণে আসক্ত হয়ে পড়েছিল, তখন সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর বুদ্ধিবৃত্তিক ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্য বিশেষ করে মার্কস্‌বাদ ও উদারনৈতিক মতবাদের চুলচেরা যাচাই করেন এবং মানুষের সংকট ও সমস্যাবলি নিরসনে এগুলোর অপারগতার কারণসমূহ তুলে ধরেন। অতঃপর তিনি একটি নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণা এবং ইসলামি শিক্ষার আলোকে মানুষের এহেন শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির পথ বের করার প্রয়াস চালান।

বাকের সদরের উপস্থাপিত তত্ত্ব ও মতামতসমূহ অর্ধ-শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আজও অবধি মুসলিম চিন্তা ও মানসে বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। সমসাময়িক বিশ্বকে বুঝা, আধুনিক বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গভীরভাবে অনুধাবন এবং আধুনিক মানবের সমস্যাবলির নৃ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী চিন্তাপদ্ধতি অন্যদের জন্য দিশারীর ভূমিকা পালন করছে। অনুরূপভাবে তা মুসলিম সমাজ গঠনের এবং ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান উদ্ভাবনে একটি সমাজতাত্ত্বিক বুনিয়াদ হিসাবেও পরিগণিত হতে পারে।

বাকের সদর সমসাময়িক মানুষের জীবনে সমস্যা সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণে খ্রিষ্ট ধর্মের ইতিহাস এবং পশ্চিমা মানুষের জীবনে চার্চের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি মনে করেন, চার্চের ভুলের কারণে এবং খ্রিষ্ট ধর্মের বিকৃতি আর মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বভাবের পরিপন্থী নীতি অনুসরণ করার কারণে পশ্চিমা দুনিয়া এবং নতুন সভ্যতা ধর্মের প্রকৃত

---

[২]. Baqir Sadr, *Contemporary Man and The Social Problem*

সত্য থেকে দূরে সরে গেছে। ইত্যবসারে তারা মানুষের কামনা বাসনার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে বেপরোয়া পন্থাকেই বেছে নিয়েছে। অবস্থার এতদূর পর্যন্ত অবনতি ঘটে যে এমনকি তাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের মধ্যেও 'মানুষ পশুর সমান' বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হল।[৩] বাকের সদর লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, আধুনিক মানুষ খ্রিষ্টবাদের প্রত্যাখ্যান ও বিতাড়নের মুখে শিকলবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিকে মুক্ত করল এবং একেই তারা ধর্মের স্থলাভিষিক্ত 'মোড়ল' হিসাবে গ্রহণ করল। কিন্তু বুদ্ধির আধিপত্যও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেল এবং তদস্থলে ইন্দ্রিয়বাদী পণ্ডিতরা আধিপত্য বিস্তার করতঃ বুদ্ধিকে তার মসনদ থেকে টেনে নামাল। তারা প্রকৃতিকে জানার এবং প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হিসাবে ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির নাম ঘোষণা করল। পরিশেষে তারা বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বস্তুর এক প্রতিফলন হিসাবেই পরিচয় দিল। ফলাফল দাঁড়াল এটা যে, মানুষ হল বস্তুসর্বস্ব, তার অবনমন ঘটলো এক পশুর স্তরে। আর যেসব মূল্যবান তাৎপর্যের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল মানবসত্তা, সেসব আভরণ খসে গিয়ে এক বিবস্ত্র সত্তায় পরিণত হল মানুষ।[৪]

তাই বাকের সদরের মূল্যায়ন হচ্ছে- এরূপ পরিস্থিতিতে পশ্চিমা মানুষ খ্রিষ্টবাদের স্থলে যে চিন্তাধারার গোড়াপত্তন করলো, সেটাও খ্রিষ্টবাদের মতোই ছিল অমানবিক।[৫] কারণ তা মানুষের কেবল বস্তুগত দিকটাকেই গ্রহণ করেছে, কিন্তু মানুষের আত্মিক দিকটাকে অস্বীকার করেছে।[৬]

বাকের সদর মনে করেন, আধুনিক সভ্যতায় মানুষ হচ্ছে একটি 'স্বাধীন ক্ষমতাহীন' সত্তা। এ মানুষ একটি বিশেষ পথে চলতে বাধ্য যা সে লঙ্ঘন করে না, কিংবা লঙ্ঘন করতে পারে না। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিতর্কসমূহ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিসরে এ মতবাদকেই মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে।[৭] কারণ, যদি মানুষ অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাকে একটি বস্তুগত জাতক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাখ্যা না করা হয়, তাহলে মানুষের মনুষ্যত্ব বলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। একারণে তার স্বাধীনতাকে যেমন হরণ করা হল, তার দায়িত্বকেও তদ্রুপ নাকচ করা হল। আর যখন দায়িত্ব ও কর্তব্য নাকচ হয়, তখন নীতি-নৈতিকতাও উবে যায়। এসব দৃষ্টিভঙ্গিই অধুনা যুগের জাতিসমূহের ব্যধির কারণ হয়েছে যা অতীব ন্যক্করজনক ও বেপরোয়াভাবে নিকৃষ্ট ভোগবাদ এবং যৌন ও মানসিক বিকৃতির পরিণতি লাভ করেছে। ফলে স্নায়বিক ব্যধিসমূহ ভয়নকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সর্বত্র।

বাকের সদর মনে করেন, মানুষ মনোলোভা সব বাসনা পূরণে ও বড় বড় কামনা নিবৃত্তির লক্ষ্যে যে বিদ্যার প্রতি ভরসা করেছিল তা তার আশাগুলোকে পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। কেননা, আধুনিক বিজ্ঞান যতই মানুষের সুখ ও ভোগের উপকরণাদি উদ্ভাবনে ও পার্থিব জীবনের সমৃদ্ধি বিধানের কাজে ব্যস্ত হয়েছে, ততই তা মানুষের আত্মিক স্থিতিশীলতা বিধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। তা না পেরেছে মানুষের সামাজিক জটিলতাসমূহ দূর করতে আর না পেরেছে তার মনের জন্য একটি আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করতে। এরূপ পরিস্থিতিতে সমসাময়িক মানুষের জন্য প্রয়োজন উত্তম আদর্শের, যা মানুষের মনুষ্যত্বের জন্য যথাযোগ্য হয়। যাতে সে উক্ত আদর্শের ছায়াতলে একটি উপযুক্ত ও সঠিক লক্ষ্য নির্বাচন করে এবং তার সৌভাগ্য ও স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। যাতে যেসব কষ্ট

৩. দ্র. বাকের সদর, fImvjvZbv, (ফা. অনু. মুহাম্মদ তাকি রাহবার), তেহরান : রুযবেহ্, তা. নে, পৃ. ৭২।

৪. দ্র. Cv¸ ³, পৃ. ৭৫-৭৬।

৫. বাকের সদরের মতে, যে ধর্ম তার পবিত্র গ্রন্থে কেবল ইয়াহুদী ও ইসরাঈলী জাতি ছাড়া সকল মানুষকে কুকুর বলে মনে করে থাকে, সে ধর্ম কখনই মানবিক ছিল না, হতেও পারে না। - দ্র. Cv¸ ³, পৃ. ৮২।

৬. দ্র. Cv¸ ³, পৃ. ৭৬।

৭. দ্র. Cv¸ ³, পৃ. ৭৭-৭৮।

ও বেদনা তাকে আপদমস্তক নিমজ্জিত করে রেখেছে তা থেকে সে মুক্তি পায় এবং তার ব্যক্তিসত্তার সমুদয় অস্তিত্ব ও দিকসমূহের সাথে পূর্ণমাত্রায় সঠিক ও টেকসই সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়।[৮]

কাজেই সমসাময়িক মানুষের সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা হচ্ছে কোন্ সে আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা, যা মানুষের জন্য সর্বাঙ্গীন উপকারী হবে এবং তার জন্য সৌভাগ্য ও কল্যাণ বয়ে আনবে?

বাকের সদরের দৃষ্টিতে অতীতের দিনগুলোতে মানুষ বেশি বেশি ব্যস্ত থেকেছে উপরোক্ত প্রশ্নটিকে ঘিরে। কারণ আজ মানুষরা ভাল করেই বুঝতে পেরেছে যে মানুষের সমস্যাবলি খোদ্ মানুষেরই হাতে সৃষ্ট। রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কোন প্রাকৃতিক নিয়মের মত নয় যে তা সংঘটনের জন্য ঊর্ধ্বলোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে এবং কেবল আত্ম-সমর্পণ ও পথপানে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। এভাবে নিরাশাজনক মানসিকতা, জিজ্ঞাসু ও সংস্কারকামী মানসিকতায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা একটি উৎকৃষ্ট ও কার্যকর ব্যবস্থার সন্ধানে রয়েছে। অপরদিকে, সমসাময়িক মানুষ প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুবাদে বিশাল একগুচ্ছ কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা মানুষের অবস্থা কঠিনতর ও জটিলতর হওয়ার এবং সামাজিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হয়েছে।[৯] আর অবশেষে এ মৌলিক ও জটিল প্রয়োজনকে মেটানোর নিমিত্তে বিভিন্ন মতাদর্শের উদ্ভব ঘটেছে, যেগুলো মানুষের কল্যাণ ও সৌভাগ্য বয়ে আনার দাবিদার বটে।[১০]

3. mvgwRK m¤ú‡Ki mv‡_ gvbl I cKwZi m¤ú‡Ki cv_K¨

বাকের সদরের চিন্তায় মানব সমাজ শুধুই একটি বস্তুগত প্রপঞ্চ নয়। বরং আধ্যাত্মিকতার প্রস্ফুটনও বটে। সমাজ হচ্ছে একদল মানুষের জীবনের বিশ্বাসগত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা গঠিত, যা তাদের অভিন্ন বিশ্বাসের রূপকাঠামোর মধ্যে স্থান পেয়েছে।[১১] একারণে সমাজ ইতিহাসের পথপরিক্রমায় তিনটি উপাদান দ্বারা গঠিত হয়েছে। যথা- মানুষ, প্রকৃতি এবং সামাজিক সম্পর্ক তথা আন্তঃবন্ধন। এরূপ এক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জন্য দু-শ্রেণির অভিজ্ঞতা কল্পনীয় -

(১) প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ এবং

(২) মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ।

এ দুটি যোগাযোগ একে অপর থেকে ভিন্ন এবং অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।[১২] বাকের সদরের দৃষ্টিতে মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও জিজ্ঞাসাসমূহের মুখোমুখী হওয়া, প্রাকৃতিক সমস্যাবলির সাথে মুখোমুখী হওয়া ও এর রহস্যাবলি জ্ঞাত হওয়ার চাইতেও বেশি কঠিন ব্যাপার। কারণ এদুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

---

৮. দ্র. cv¸ 3, পৃ. ১১১-১১২।

৯. বাকের সদর, Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAwbj Kwig, (ফা. অনু. সাইয়্যেদ জামাল উদ্দিন মুসাভি ইসফাহানি), তেহরান : তাফাহুম, ১৩৮১ সৌ. সন, পৃ. ২৩১।

১০. দ্র.__________ , Avj-gv'ivmvZj Bmjwgq¨vn, কোম : মারকাযুল আবহাছ ওয়া আল-দিরাসাতু লিল-শাহীদ আল-সাদর, ১৪২৯ হি., পৃ. ১৬-১৭।

১১. __________ , wimvjvZbv, (ফা. অনু. মুহাম্মদ তাকি রাহবার), তেহরান : রুযবেহ্, তা. নে., পৃ. ৮৮।

১২. দ্র.__________ , Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

cKwZi mv‡_ gvb‡li m¤ú‡Ki ˆewkó¨

মানুষ প্রকৃতির মুখোমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে স্বীয় বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাসমূহকে কাজে লাগাতে পারে। সে প্রকৃতির উপর নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে বিস্তৃত করতে এবং প্রকৃতিকে ব্যবহার করে এ প্রকৃতির রহস্যাবলি উদঘাটনে অব্যাহতভাবে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতাসমূহের বেলায় এবং প্রকৃতিকে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মানুষ একাকী ও ব্যক্তিগতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতির রহস্যাবলি ও এর নিয়মাবলিকে অবগত হতে পারে এবং সেগুলো কাজে লাগাতে পারে। প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষণসমূহ সামাজিক বিষয়াবলির তুলনায় অধিকতর স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতার অধিকারী। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য কেবল সত্যকে আবিষ্কার করা এবং বাস্তবতাকে উদ্‌ঘাটন করা। একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী নিজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বুঝটি সত্য হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং অন্যদেরকে তা প্রদর্শন করাতেও পারেন। আর এভাবে তিনি সকল মানবের জন্য একটি সাধারণ ও সর্বজনীন সূত্র তথা নিয়মকে বিবৃত করতে পারেন, যা বিশেষ কোন সমাজের জন্য স্বতন্ত্র নয়।[১৩]

অবশ্য বাকের সদর বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে কিছু সমস্যা ও বৈপরীত্য বিদ্যমান রয়েছে যা প্রকৃতির অবাধ্যতা ও বৈরিতা এবং মানুষের আনুগত্যের প্রতি অস্বীকৃতি থেকে জন্ম নেয়। কিন্তু এ বৈপরীত্য ও বিরোধের স্পষ্ট সমাধানের উপায় রয়েছে। আর তা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মকে জানা এবং চেনা। প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা যতই কমিয়ে আনতে পারবে এবং প্রকৃতির ভাষার সাথে যতই পরিচিত হতে পারবে, ততই প্রকৃতির উপর তার কর্তৃত্ব এবং নিজের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনার ক্ষমতা অর্জন করবে। এ পরিচয় অর্জনের জন্য আবশ্যক হল পরীক্ষণ, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে এবং প্রকৃতির উপর বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতিকে জানার অধিকতর ক্ষমতা অর্জন করে। অনুশীলন যতই বৃদ্ধি পাবে এবং বহির্জগতে যতই ব্যবহারিক পরীক্ষণ চালানো যাবে ততই প্রকৃতির সাথে বৈপরীত্যের সমস্যারও সমাধান আবিষ্কার হবে। বাকের সদর KiAv‡bi '...এবং তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তা তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করলে এর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না'[১৪]-এ বাণীটির ব্যাখ্যা করেছেন এ অর্থেই। অর্থাৎ যে জিনিস থেকেই তোমরা খোদায়ী নেয়ামত অন্বেষা করবে ও প্রার্থনা করবে এবং কার্যকর আবেদন করবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করবেন। এটাকে বাকের সদর 'অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের সূত্র'[১৫] হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, যা প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল।[১৬]

বাকের সদর মনে করেন, যেহেতু প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণাসমূহ রয়েছে, যা সর্বজনীন স্বার্থ ও কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, একারণে আল্লাহ 'বুদ্ধিবৃত্তি'র এ বিশাল শক্তিকে মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন যাতে সে প্রকৃতিকে জয় করে স্বীয় অধীনে আনতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ, যক্ষ্মার প্রতিষেধক যেহেতু সকল মানুষের জন্য উপকারী, একারণে তা আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীরা উদ্দীপিত হয়। কাজেই অভ্যন্তরীণ প্রেরণা ও উদ্দীপনা বিদ্যমান থাকার কারণে এবং প্রাকৃতিক স্বার্থের সাথে এর সামঞ্জস্য থাকার কারণে প্রতিদিনই জগতে বিদ্যমান প্রকৃতির অঙ্গনে নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটে চলেছে, যা স্বয়ং সর্বজনীন মানুষের স্বার্থের সাথেও সামঞ্জস্যশীল। এ কারণে প্রাকৃতিক বিষয়াবলি যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি অঙ্গনে ধর্ম

---

[১৩]. দ্র. _________, Avj-gv'ivmvZj Bmjwgq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৮।
[১৪]. Avj-KiAvb, ইবরাহীম : ৩৪।
[১৫]. বাকের সদর, Avj-gv'ivmvZj KiAwbq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।
[১৬]. _________, Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২১২।

বিশেষ কোন ঐশী নির্দেশ বা নিয়ম উল্লেখ করেনি। বরং এসব বিষয়কে مطقة الفراغ (মান্তাকাতুল ফারাগ তথা মুক্ত অঞ্চল)[১৭]-এর সুবিধার আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর এসব ব্যাপারে মানুষের বুদ্ধিশক্তি ও তার পরীক্ষণ ও অনুশীলনীর পথকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।[১৮] এপ্রসঙ্গে বাকের সদর লিখেন :

> 'মানুষ বিশেষ এক আত্মিক ও চৈন্তিক সামর্থ সহকারে সৃষ্ট, যা তাকে প্রাকৃতিক স্বার্থকে পূরণে সক্ষম করে তোলে এবং জীবন ও প্রকৃতির উপর তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজ জীবনের এ [কল্যাণের] দিকটিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে।'[১৯]

সুতরাং প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রকৃতিকে জানা ও চেনা এবং এ প্রকৃতি থেকে উপকার গ্রহণের উপায় উপকরণের উন্নতি ঘটার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণতর হয়।

gvb‡li mvgvwRK m¤ú‡Ki ˆewkó¨mgn

তবে প্রাকৃতিক বিষয়াদি এবং প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতাসমূহে ও মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেই। আর একারণেই ব্যাপারটা সমস্যাজনক হয়ে পড়েছে। বাকের সদর লিখেন :

> 'প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতাসমূহ সময়ের পরিক্রমায় কখনো কখনো মানুষকে পূর্ণতর চিন্তা প্রদান করতে সক্ষম হয়, যে চিন্তা প্রাকৃতিক বিষয়াবলি ও নিয়মসমূহ থেকে উপকার গ্রহণের কাজে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু সামাজিক অভিজ্ঞতাসমূহ মানুষকে সামাজিক বিষয়-ব্যাপারে এরূপ পূর্ণতর চিন্তা প্রদান করতে পারে না।'[২০]

বাকের সদরের দৃষ্টিতে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক এবং সামাজিক অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে, যা গভীর বৈপরীত্য ও বিরুদ্ধতার জন্ম দিয়েছে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে ঢুকে পড়েছে-

১. সামাজিক বিষয়াবলিকে একক বা ব্যক্তিগতভাবে জানা ও সমাধানা করা যায় না। সামাজিক বিষয়সমূহ একজন ব্যক্তির ইচ্ছা বা স্বাধীনতার এমনকি ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের উর্দ্ধে। একারণে মানুষের সমুদয় অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কিম্বা প্রত্যক্ষণগত উপকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

২. তদ্রূপ মানবিক ও সামাজিক বিষয়-ব্যাপারে ভূমিকা রাখা মানুষগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ মৌলিক অবদান রাখে। এমনটা নয় যে চিন্তাবিদরা সত্যিকার অর্থেই সত্য ও বাস্তবতাকে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় থাকবে। বরং এ ধরনের অভিজ্ঞতায় অন্যদেরকে শোষণ ও ব্যবহার করার অভিসন্ধি কাজ করে। একারণে অনেক সময় মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রেরণাসমূহ সামষ্টিক ও সামাজিক কল্যাণ তথা স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

৩. যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, সামাজিক বিষয়-ব্যাপারগুলোও জানা ও চেনা সম্ভব, কিন্তু তা সাধারণীকরণ ও সার্বিকীকরণ সঠিক হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয় থেকে যায়।

---

[১৭]. 'মান্তাকাতুল-ফারাগ' সুবিধা বলতে আর্থ-সামাজিক অঙ্গনে ধর্মীয় বিধি-বিধানের আওতাধীন বিশেষ এক মুক্ত তথা ছাড়ের অঞ্চলকে বুঝায়। যেখানে রাষ্ট্রের কর্ণধার সার্বিক ও সর্বজনীন মঙ্গল ও কল্যাণ বিবেচনায় বিধি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্তিয়ার লাভ করে থাকেন। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্যাবলি এই মুক্ত অঞ্চলের প্রধানতম বিষয়। আমরা যথাসময়ে এ তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা উত্থাপন করব।

[১৮]. ________ , BKwZmv'bv, (ফা. অনু. মুহাম্মদ কাযিম মুসাভি), তেহরান : ইন্তেশারাতে ইসলামি, ১৩৫০ সৌ. সন, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫।

[১৯]. cv¸ ³, কোম : মারকাযুল আবহাছ ওয়া আল-দিরাসাতু লি আল-শাহীদ আল-সাদর, ১৪২৯ হি., পৃ. ৩৫০।

[২০]. ______,Avj-gv'ivmvZj Bmjvwgq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৪. সামাজিক অভিজ্ঞতাসমূহ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত চৈন্তিক পদ্ধতিসমূহ উক্ত সমাজের পরিকল্পণাকারীদের দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরে এবং তাদের সক্ষমতা ও মনোবৃত্তিরই প্রতিফলন ঘটায়। তারা মানুষকে ঐ যতটুকু বলেছে, তার চেয়ে বেশি উন্নত করতে পারে না।[২১]

মানুষের জীবনে প্রধানতম বিরোধ ও মূল সমস্যা প্রকৃতির সাথে সমস্যা নয়, বরং সামাজিক অঙ্গনসমূহে মানুষের মাঝে সামাজিক বিরোধ ও বৈপরিত্যসমূহই হচ্ছে আসল সমস্যা, যা বিভিন্ন ভাষায় ও রঙে প্রকাশ পায়। সবল ও দুর্বলের মধ্যে এ বিরোধ কখনো 'ফেরাউন'[২২] নামে প্রকাশ লাভ করে। আবার কখনো তা 'বর্ণবাদ' নামে এবং কখনো বা 'জাতি' বা 'সম্প্রদায়' নামে প্রকাশ পায়। এ সবই আসলে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সবল কর্তৃক দুর্বলকে শোষণ ও নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার কথাই প্রতিধ্বনিত করে থাকে।[২৩]

mvgwRK mgm¨vewj i gj KviY

বাকের সদরের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের সমস্যাসমূহ অনেক গভীর। কেবল মানুষের জীবনের একটি দিকের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়। কেননা, সামাজিক বিরুদ্ধতাসমূহের শিকড় প্রোথিত আরো গভীরে, অর্থাৎ মানুষের অন্তঃপুরের বিরুদ্ধতার মধ্যে। মানুষের বাইরের দ্বন্দ্ব তার অন্তঃপুরের দ্বন্দ্বেরই আভাষ মাত্র।[২৪] মানুষের অন্তঃপুরের দ্বন্দ্বের মূল কারণ জন্ম নেয় মানুষের স্বভাবগত আত্মপ্রেম ও স্বার্থবাদ থেকে। যা তাকে ব্যক্তিস্বার্থের দিকে চালিত করে এবং নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তেই সবকিছুকে ব্যবহার করার উদ্দীপনা জাগায়। মানুষের এই 'আত্মপ্রেম'এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বাকের সদর বলেন :

> 'আত্মপ্রেম হচ্ছে সেই স্বভাব, যা আমরা স্বভাব বলে জানি তার চেয়েও ব্যাপকার্থক ও আদি ব্যাপার। কেননা, অন্য সব স্বভাব হচ্ছে এ স্বভাবের শাখা-প্রশাখাস্বরূপ। যার মধ্যে জীবন-জীবিকার স্বভাবও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই মানুষের নিজের প্রতি ভালবাসা, এর অর্থ হচ্ছে নিজের সুখ ও সৌভাগ্যের প্রতি তার ভালবাসা আর নিজের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তিকে ঘৃণা করা। যে প্রেম মানুষকে জীবন-জীবিকার দিকে এবং খাদ্যসংস্থান ও বস্তুগত চাহিদাসমূহ পূরণে প্রবৃত্ত করে।'[২৫]

কাজেই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধের পিছনে মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষণকামিতা ও অন্যদেরকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রবণতা। আর এ প্রবণতা জন্ম নেয় মানুষের আত্মপ্রেম তথা আত্ম-স্বার্থবাদিতা এবং এ নেশাকে দমন না করা থেকে। এরূপ এক পরিস্থিতিতে যখন মানুষের আত্মপ্রেম তার অন্য সব ঝোঁক-প্রবণতা ও চিন্তা-চেতনার উপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে, সেক্ষেত্রে মানুষের প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনা ও জয় করা, যা প্রকৃতপক্ষে কোন দোষের কাজ নয়, কিন্তু তখন এ কাজটিও মানুষের মাঝে শোষণ ও নিজ-স্বার্থ পূরণের প্রবণতাকে প্রবলতর করে থাকে। অর্থাৎ এটা তখন পরিণত হবে অধিক থেকে অধিকতর স্বার্থবাদিতা ও শোষণের হাতিয়ারে।

---

২১. দ্র. cÖv¸³, c. ২৫-৩২।

২২. 'ফেরাউন' ইতিহাসের কুখ্যাত নাস্তিক ও খোদাদ্রোহী শাসকের নাম। প্রাচীন মিশরের এ অহঙ্কারী শাসকের ব্যাপারে কুরআনে কয়েকটি স্থানে বর্ণনা এসেছে। বাকের সদরের সামাজিক দর্শনে 'ফেরাউন' নামটি একটি অভিধা তথা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থার বিপরীত মেরুতে যে খোদাদ্রোহী ও স্বৈরশক্তির শাসন ও কর্তৃত্বের দৌরাত্ম্য, সেটা বুঝাতেই তিনি 'ফেরাউনি শাসন তথা ফেরাউনি সমাজব্যবস্থা' শিরোনামে আখায়িত করেছেন।

২৩. বাকের সদর,Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

২৪. cÖv¸³, পৃ. ২১৪।

২৫. ________, Avj-gv'ivmvZj Bmjwgq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

বাকের সদর বলেন :

> ‘যতই প্রকৃতির উপর মানুষের শক্তি বিস্তার লাভ করবে এবং তার কর্তৃত্ব যতই বৃদ্ধি পাবে, আর প্রকৃতির সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডার যতই মানুষের হস্তগত হবে এবং উৎপাদনের উপকরণ যতবেশি করায়ত্ত হতে থাকবে, ততই মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের রেখায় শোষণ ও স্বার্থবাদিতার সুবিধা সমানুপাতে বৃদ্ধি পাবে।’[২৬]

বাকের সদরের দৃষ্টিতে Avj-KiAvb যখন বলে, ‘বস্তুত মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে, যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত দেখতে পায়..’[২৭] -এ ভাষ্যটি মূলত মানুষের এ অবস্থার প্রতিই ইশারা করে থাকে। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতি থেকে উপকার গ্রহণের শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দুর্বলদের শোষণ করা ও আত্ম-স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করার কারণ হয়।

এ কথার ভিত্তিতে, প্রকৃতিকে জানা ও চেনা এবং উৎপাদন উপকরণের উন্নয়ন, নিজে সমস্যাজনক নয় কিংবা শোষণের মূল কারণ নয়। বরং প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উপকরণাদি, সম্ভাবনা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যম ছাড়া আর কিছু নয়। সমস্যা তো খোদ্ মানুষই, যে তার অভ্যন্তরীণ সারসত্তা ও আদর্শের ভিত্তিতে উক্ত সম্ভাবনা ও ক্ষমতা থেকে উপকার গ্রহণ করে এবং তার অভ্যন্তরীণ বিষয়-সার ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পথে তা কাজে লাগায়। তাই, যদি এ প্রকৃতির জ্ঞান ও পরিচিতি এবং প্রকৃতিকে ব্যবহার করার হাতিয়ারকে ন্যায়পরতা ও সুষম সামাজিক সম্পর্কের পথে ব্যবহার করা হয় তাহলে তা প্রকৃতির আরও বিকাশের এবং একটি নিরাপদ, ন্যায্যতাপূর্ণ ও উত্তম সমাজ প্রতিষ্ঠার কারণ হবে।[২৮]

mvgwRK mgm¨vewj mgvav‡b AvawbK weÁv‡bi AcviMZv

বিজ্ঞানের সোপানুক্রম[২৯] (Hierarchy of Science) তত্ত্বে কোঁত বলেন, বিজ্ঞান কোন অভিযান নয়। এটা হল অসীম ও অনির্দ্দিষ্ট তৃষ্ণা। আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূলকথা হল সূত্র বা তত্ত্ব আবিষ্কার করা। চূড়ান্ত সত্য আবিষ্কার করা বিজ্ঞানের লক্ষ্য নয় এবং কোন বিজ্ঞান এটা মনেও করে না। বিজ্ঞানে শেষ বলে কোন কথা নেই। তবে সমাজবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব হল নিয়মতান্ত্রিকভাবে সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। নিখিল বিশ্ব নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা মনে করেন যে, আজকে যেটা চিরসত্য আগামীকাল সেটার পরিবর্তন হতে পারে। এটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সত্য।

বাকের সদর লিখেন :

> ‘অনেক লোক মনে করে থাকে, যেহেতু বিজ্ঞান বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছে, সেহেতু তা জটিল সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে সক্ষম। কারণ যে মানুষ পরমাণু ভেঙ্গে অমিত শক্তি নির্গত করতে সক্ষম হয়েছে, যে

---

২৬. ________ , Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

২৭. Avj KiAvb, আলাক্ব : ৬-৭।

২৮. বাকের সদর, Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

২৯. কোঁত-এর বিজ্ঞানের সোপানুক্রম তত্ত্বের মধ্যে গুরুত্ববিচারে বিজ্ঞাননসমূহকে ক্রমানুসারে সাজানো হয়। এই ক্রমের সর্ব উপরে স্থান পায় গণিত। এটা হল সকল বিজ্ঞানের জননী। এরপর যন্ত্রকৌশল তথা জ্যোতির্বিদ্যা, তারপর পদার্থবিদ্যা, তারপর রসায়ন বিদ্যা, তারপর জীববিজ্ঞান এবং সর্বশেষে স্থান হয় সমাজবিজ্ঞানের। সমস্ত বিজ্ঞানই সমাজবিজ্ঞানের বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। তবে সকল বিজ্ঞান অবশ্যই সমাজবিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করছে না। এ প্রসঙ্গে কলিন্স (Collins) বলেন, *‘Comte wished, instead, to stress that sociology was the most impotant science because its application would correct all social evils and create a perfect society’*-(Collins, 1994:186)- উৎ. ড. কে. এম. রেজাউল করিম, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব, ঢাকা : এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০০৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ: ৩৮-৩৯।

মানুষ মহাকাশ বিজয় করতে পেরেছে, নিশ্চিতভাবে সে বিজ্ঞানের সূত্রাবলি ব্যবহার করে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সৌভাগ্যবান করতে সক্ষম হবে!’[৩০]

অর্থাৎ বিজ্ঞান মানুষের সামাজিক কল্যাণকে পরিপূরণ করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে আর অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন পড়বে না। তিনি এ দাবির জবাবে বলেন :

‘এহেন দাবি প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কেননা, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে বহির্জাগতিক বিভিন্ন বাস্তব সত্যকে নিরপেক্ষভাবে আবিষ্কার করা। কিন্তু কেবল জানা ও বিজ্ঞানই যথেষ্ট নয়। কারণ বিজ্ঞান একাকীভাবে জগতে কোন পরিবর্তনই সৃষ্টি করতে পারে না। এখানে যেটা আবশ্যক তা হল মানুষের আপন প্রেরণা যা গতি ও পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। আপন প্রেরণা হচ্ছে সেই কেন্দ্রবিন্দু, যা আত্মপ্রেম থেকেই উৎস লাভ করে এবং সামাজিক জটিলতার মূল।’[৩১]

4. mvgwRK mgm¨vewj mgvav‡b cwðgv gZev‘mg‡ni e¨_Zv

সামাজিক জীবন ও মানুষের মানবিক সম্পর্কের প্রধানতম সমস্যাবলিকে চিহ্নিত করার পর এবং এর অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ শনাক্ত করার পর বাকের সদর মনে করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এমন কোন শক্তি দ্বারা বলীয়ান না হবে যা অভ্যন্তরীণ প্রবণতাসমূহ ও সামাজিক স্বার্থের মাঝে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করবে, ততক্ষণ অবধি সামাজিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকবে। এমর্মে তিনি লিখেন :

‘মানুষের সাথে মানুষের আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে বিরাজমান এ সমস্যাকে কেবল একটি দায়িত্বই পারে সমাধান দিতে। যে দায়িত্ব একই সময়ে দুইটি স্তরে ক্রিয়া করে থাকে। যে দায়িত্ব ঐতিহাসিক ময়দানে সামাজিক দ্বন্দ্বসমূহ দূরীকরণে চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ একই সময়ে এবং এর পূর্বে ও পরে মানুষের অন্তঃপুরের দ্বন্দ্বকে সমাধান করতে চায় এবং সামাজিক বিরুদ্ধতাগুলোকে শিকড় থেকেই শুকিয়ে মারতে চায়।’[৩২]

যখনই অন্তঃস্থ দ্বন্দ্ব ও বিরোধসমূহের উৎসের ব্যাপারে উদাসীন থেকে কেবল মানুষের বহিঃস্থ সামাজিক বৈপরীত্যগুলোর দিকে লক্ষ্য করা হবে এবং মানুষের প্রণয়নকৃত প্রণালী ও সূত্রাবলির মাধ্যমে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হবে, তখন দায়িত্ব ও কর্তব্যের কেবল একটি অংশই সম্পন্ন হবে, কিন্তু মূল অংশটি উপেক্ষিত থেকে যাবে। কিছু কাল পরে ঐ সামাজিক সমস্যা ও বৈপরীত্যই পুনরায় একই কিংবা ভিন্ন কোন রূপে মাথাচাড়া দিবে।

এ বক্তব্যের ভিত্তিতে বাকের সদর পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদ ও সমভোগবাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এ দুই মতাদর্শ সমসাময়িক মানুষের সমস্যাবলিকে সমাধান করতে পারে না। তাই তাদের নির্দেশিত ব্যবস্থাপত্র যে শুধু ত্রুটিপূর্ণ, তা নয়, বরং তা অরও মানুষের সমস্যাবলির বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।

বাকের সদরের দৃষ্টিতে, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ যতটা না প্রকৃতির আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের ফসল, তার চেয়ে বেশি পশ্চিমা সমাজসমূহে কর্তৃত্বশীল মতাদর্শ ও বিশ্ববীক্ষার ফসল। যে বিশ্ববীক্ষা পশ্চিমা জনগণের আদর্শ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে নির্মাণ করেছে। বাকের সদরের মতে, পাশ্চাত্যের অধুনা সভ্যতা একটা একতরফা ও একমুখী ধারা, যা মানুষের বিবিধ দিকের মধ্যে থেকে কেবল বস্তুগত দিকটিকেই তুলে ধরেছে। আর এই সীমাবদ্ধ

---

[৩০]. ________ , BKwZmv‘bv, cv¸ ³, পৃ. ৩৯২।

[৩১]. cv¸ ³, পৃ. ৩৯৫।

[৩২]. ________,Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

দৃষ্টির পরিধির আলোকেই পার্থিব সসীম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শকে মানুষের জন্য উপস্থাপন করেছে। এ প্রসঙ্গে বাকের সদর লিখেন :

> "রেনেসাঁ'র প্রথমভাগে ইউরোপীয় মানুষ 'আদর্শ মুক্তি'কে চার্চের শিকলের বিপরীতে ও চার্চ কর্তৃক বিজ্ঞান ও ধর্মীয় বিশ্বাসাবলির উপর কড়াকড়ি আরোপের বিপরীতেই বেছে নিল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে নিজেকে চার্চ ও সামন্তবাদের শিকল হতে মুক্ত করবে এবং মানুষ থেকে এমন এক মুক্ত অস্তিত্বসত্তা নির্মাণ করবে যে, যখনই তার মন চাইবে তখনই সে স্বীয় চিন্তা ও বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করবে, আপন ইচ্ছায় নির্বাচন করবে এবং তা সম্পাদন করতে পারবে।"[৩৩]

বাকের সদরের দৃষ্টিতে, এ চিন্তা সঠিকই ছিল। তবে এর ভ্রান্তিটা ছিল মানুষের অস্তিত্বের সমগ্র দিকে ও সামাজিক জীবনের সমগ্র পরিসরে একে বিস্তৃতি দেওয়া ও সামগ্রিকীকরণের মধ্যে। কারণ মুক্তি ও স্বাধীনতা হচ্ছে মানব জীবনের একটি অন্যতম মূল্যবোধ ও ভিত্তি। কিন্তু সবটকুই তা নয় এবং একাকী তা মানুষ গড়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বন্ধন ও শৃঙ্খল হতে মুক্তি কেবল মানবের অগ্রগতি ও পূর্ণতার পথে একটি ভিত্ তৈরি করে দিতে পারে। কিন্তু এছাড়া আরও প্রয়োজন উন্নত বিষয়সার ও মর্মবস্তু। যদি মর্মবস্তু ও আদর্শ উন্নত না হয়, তাহলে এই স্বাধীনতাই তখন আরও বড় ও বিপজ্জনক দুর্দশা ডেকে আনে। যেমনভাবে আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা নানা দুর্দশার কবলে পতিত হয়েছে, যা স্বাধীনতার সামগ্রিকীকরনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।[৩৪]

5. mgmvgwqK gvb‡li mgm¨vewj mgvav‡b a‡g cZ¨veZ‡bi Avek¨KZv

বাকের সদরের মতে, ধর্মই হচ্ছে সেই জিনিস, যা মানবিক সমস্যাবলির মোকাবিলায় এবং সামাজিক উপাদানসমূহ ও সমাজের প্রতিবন্ধকতাসমূহের ব্যাখ্যার কাজে সামাজিক জটিলতাগুলোকে সমাধান করে দিতে পারে। তাঁর দৃষ্টিতে, ধর্মের শিকড় যেহেতু মানুষের ফিতরত তথা সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে প্রোথিত, কাজেই মানুষের আত্মিক শক্তিই আত্মগত এবং সমষ্টিগত কল্যাণ তথা স্বার্থের অভিন্ন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, যা তাকে স্বীয় সুখ ও স্বার্থকে উপক্ষো করে চলতে প্রবৃত্ত করে। তদ্রুপ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামাজিক তথা সামষ্টিক স্বার্থের একই ধারায় প্রবাহিত করতে অনুপ্রাণিত করে থাকে।[৩৫]

ইসলাম মানুষের সহজাত মতপার্থক্যসমূহের মধ্যে সমঝোতা এবং মানব জীবনের বিভিন্ন কল্যাণ ও বিষয়-ব্যাপারে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। কাজেই মানবের সহজাত প্রবৃত্তি এবং সামাজিক জীবনের সকল ব্যাপারে ঐক্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ ধর্ম, গোটা বিশ্বচরাচরে একত্ববাদের সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীনে সমসাময়িক মানবের সামাজিক জীবনের প্রধান সমস্যাগুলোকে নিরসন করতে পারবে।

সমসাময়িক মানবের সমস্যাবলি সমাধানে ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ গুণ নিহিত রয়েছে এর নির্ধারণকৃত 'আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা'র মধ্যে, যা ইসলাম পেশ করেছে। সে আদর্শ হল নিরঙ্কুশ ও অসীম, অর্থাৎ আল্লাহ্। একত্ববাদের অবদান হল আমাদেরকে 'সুস্পষ্ট চৈন্তিক দৃষ্টি ও আদর্শ' (Ideology) দান করে। একত্ববাদ মানুষের সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষাকে একটি উৎকৃষ্ট আদর্শের মধ্যে একীভূত করে ফেলে।'[৩৬] বাকের সদর মনে করেন,

---

[৩৩]. c¨, 3, পৃ. ১৭০-১৭৫।

[৩৪]. c¨, 3|

[৩৫].দ্র. __________ ,BKwZmv'bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬।

[৩৬].দ্র. __________ ,Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

একটি নিরঙ্কুশ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই মানুষকে নিরন্তর গতিবান করে তুলতে এবং শক্তি যোগাতে পারে।'[৩৭] কেননা মানুষের গতির পথ একটি উন্মুক্ত ও নিরঙ্কুশ অসীম আদর্শ (তথা আল্লাহ্)'র অভিমুখে চলমান। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মানুষের আত্মগঠন, পূর্ণতা অর্জন ও উন্নতি সাধনের সুযোগ সর্বদা বিদ্যমান রয়েছে এবং অবিরামভাবে সে নিকৃষ্ট ও পুনরাবৃত্তিপূর্ণ 'উপাস্য' তথা আদর্শসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত।[৩৮]

পাশাপাশি নিরঙ্কুশ আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাবে মানুষের মধ্যে এক গভীর ও অনাবিল দায়িত্ববোধ জন্ম নেয়। এ দায়িত্ববোধই মানুষ ও তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিরুদ্ধতার সমাধান এনে দেয়।[৩৯]

বাকের সদরের মতে, যে মানুষ 'আল্লাহ্'কে লক্ষ্য হিসাবে এবং নিজের জীবন চলার পথের পরম গন্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করে, সে আল্লাহ্র গুণাবলিকে এ বৃহৎ লক্ষ্যপথের লক্ষ্যবস্তুস্বরূপ গণ্য করে থাকে। ন্যায়পরতা, জ্ঞান, সক্ষমতা, শক্তিশালিতা, দয়া ও ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি গুণগুলো একযোগে সে যে লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলেছে সেই পথকে তৈরি করে দেয়। সে যতই উক্ত লক্ষ্যপানের দিকে একধাপ করে নিকটবর্তী হয়, ততই তার দৃষ্টিভঙ্গি উক্ত লক্ষ্যের প্রতি উন্মুক্ততর হয়ে যায় এবং তার আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ ও [এ পথে] অবিচল থাকার প্রত্যয় আরও বেড়ে যায়। কারণ, 'সসীম' হয়ে মানুষ কখনো 'অসীম' ও 'নিরঙ্কুশ' আল্লাহ্য় পৌঁছতে পারে না। তবে নিজের পথ ধরে যতই তাঁর অভিমুখে এগিয়ে যেতে পারবে, ততই নতুন নতুন স্থানে পথনির্দেশিত হবে এবং পথই তাকে স্বীয় প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করতে প্রবৃত্ত করবে।[৪০] নিম্নোক্ত কুরআনিক ভাষ্যের মধ্যে সে কথাই প্রতিধ্বনিত হয়-

> 'যারা আমার পথে সংগ্রাম করে, আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো।'[৪১]

বাকের সদরের মতে, নিরঙ্কুশ আদর্শের পথে চলা নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর।[৪২] যথা :

১. নিরঙ্কুশ আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট চৈন্তিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ একত্ববাদকে সঠিকভাবে বুঝা এবং এর প্রতি বিশ্বাস পোষণ। আর কার্যক্ষেত্রে খোদায়ী গুণে গুণান্বিত হওয়া।

২. একত্ববাদে বিশ্বাস থেকে অর্জিত আত্মিক শক্তির সাহায্যে ইচ্ছাকে চালিত করা। এ শক্তিই হচ্ছে অফুরান জ্বালানীর ন্যায়।

৩. নবি'র মাধ্যমে নিরঙ্কুশ আদর্শের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখা।

৪. সমাজের নেতার নেতৃত্বে নিকৃষ্ট আদর্শসমূহ ও বানোয়াট উপাস্যসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও লড়াই চালিয়ে যাওয়া।

৫. উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদ পোষণ করা যদ্বারা চূড়ান্ত পরিণতিতে নিরঙ্কুশ পূর্ণতা ও আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন সাধন হবে।

সুতরাং, সমসাময়িক বিশ্বে ইসলামই নিরঙ্কুশ ও অসীম আদর্শের পথে চলার সমস্ত অনুষঙ্গের অধিকারী থাকার সুবাদে মানুষকে যেসব শিকল তার ধ্বংসের কারণ হয়, সেসব শিকল থেকে তাকে মুক্ত করতে সক্ষম হয় এবং তাকে সকল চৈন্তিক, সামাজিক ও বস্তুগত দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে।

---

[৩৭]. দ্র. ________ , Avj Bmjvg BqvK' Avj nvqvZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।
[৩৮].দ্র.__________ ,Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।
[৩৯]. দ্র. cv¸ ³, পৃ. ১৯২, ১৯৪।
[৪০].দ্র.________ ,Avj Bmjvg BqvK' Avj nvqvr, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।
[৪১]. Avj-KiAvb, আঙ্কাবুত : ৬৯।
[৪২].দ্র._________ , Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০৬।

এ মর্মে বাকের সদর লিখেন :

> '... ইসলামের উৎকৃষ্ট মতাদর্শ, যার মূলভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্র সম্মুখে ও খোদায়ী নিয়মনীতির সম্মুখে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, এটা এমন এক মতাদর্শ, যা মানুষ হতে এক সৃজনী শক্তি, একটি অপরাজেয় উপাদান এবং একটি সক্রিয় অস্তিত্বসত্তা বিনির্মাণ করে থাকে। যে মানুষ ব্যর্থতা ও সফলতার মধ্যেও পূর্ণ কর্তৃত্ববান থাকে এবং সুখ ও সুবিধাকে এক উত্তম ভবিষ্যতের অভিমুখে একটি মঙ্গলময় জীবনে পৌঁছুবার জন্য কাজে লাগায়।'[৪৩]

এ কারণে বাকের সদরের প্রধানতম আকাঙ্ক্ষা ছিল মানুষের ব্যক্তি জীবনে ও তার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ইসলামের বাস্তব ও কার্যকর বাস্তবায়ন সাধন করা। তিনি মনে করেন, ইসলাম ধর্মের শিকড় প্রোথিত রয়েছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে। এ ধর্মের আবেদন বিশ্বব্যাপী বিশ্ব মানবের জন্য। বিশেষ কোন দল বা ভূ-খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা মানুষের মনুষ্যত্বকে তার বস্তুগত, দৈহিক, আত্মিক, সামাজিক ইত্যাদি সকল পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে এবং মানব জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনার অধিকারী।[৪৪]

বাকের সদরের দৃষ্টিতে ধর্মের পরিধি অতিশয় ব্যাপক। মানব জীবনের সকল দিকই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে এর আওতায় পড়ে। তাঁর মতে, মানুষ ও সমাজের জন্যধর্ম হচ্ছে একটি খোদায়ী নিয়ম এবং মানব জীবনের এক অন্যতম গঠন উপাদান। কোন আপতিক তথা আরোপিত উপাদান নয় যে একে বাদ দেওয়া যাবে কিংবা উপেক্ষা করা যাবে। তিনি লিখেন :

> 'ধর্ম সভ্যতাগত কোন বিষয় নয় যে ইতিহাসের পরিক্রমায় মানুষ এটাকে অর্জন করে থাকবে। আর যে কাউকে তা প্রদান করা যাবে অথবা যে কেউ এর প্রয়োজন মনে করবে না তার নিকট থেকে একে প্রত্যাহার করা যাবে। কেননা, সেক্ষেত্রে ধর্ম খোদায়ী সহজাত প্রবৃত্তি থাকবে না।'[৪৫]

এখন মানুষের সমস্যাবলি আর ধর্মের চিরন্তনতা ও সর্বব্যাপিতার প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হল, মানুষের জীবন যা কখনোই নিশ্চল বা স্থবির হওয়ার নয় এবং যা বস্তুগত, চিন্তাগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্ববিষয়ে সর্বদা বিবর্তন ও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসরমান, তার সাথে ঐরূপ ধর্ম কীভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল হতে পারে?

তবে এ প্রশ্নের উত্তরে এবং মানব জীবনে ধর্মের ভূমিকা প্রসঙ্গে বাকের সদরের তত্ত্ব হচ্ছে 'ধর্ম একটি ডকট্রিন; বিজ্ঞান নয়।'[৪৬] এ তত্ত্বের প্রেক্ষিতে বহির্জাগতিক ও বাস্তবিক প্রপঞ্চসমূহ এবং সেগুলোর মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ককে উদ্ঘাটন করা ধর্মের কাজ নয় যে সর্বদা তার রদবদল ও পরিবর্তনের দরকার হবে। বরং একটি ধর্ম হিসাবে ইসলামের কাজ হচ্ছে মানব জীবনের মৌলিক ভিত্তি ও কাঠামোকে পরিকল্পনা করা এবং মৌলিক ঔচিত্য ও অনৌচিত্যসমূহের ব্যাখ্যা করা, যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ চলবে। এ বিচারে ইসলাম ধর্ম হচ্ছে একটি 'ডকট্রিন, বিজ্ঞান নয়'।[৪৭]

---

[৪৩]. ________, wimvjvZbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

[৪৪].দ্র. cÖv¸³, পৃ. ৫৮।

[৪৫]. ________, Avj-gv'ivmvZj KiAvwbq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

[৪৬].দ্র.________, BKwZmv'bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬।

[৪৭]. দ্র. cÖv¸³, পৃ. ৪০৪।

6. WKwUb wnmv‡e Bmjvg

বাকের সদরের চিন্তায় ডকট্রিন বলতে বুঝায় একগুচ্ছ ঔচিত্য ও অনৌচিত্য এবং সমীচীন ও অসমীচীনের সমাহার, যা পরস্পর সংযুক্ত একটি সমগ্র হিসাবে একটি বৃহৎ আদর্শকে ঘিরে রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং যা সকল বিধি-বিধান এবং মানব জীবনের সকল গঠনকাঠামো ও সামাজিক দিকসমূহের বুনিয়াদস্বরূপ। একারণে সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে সামগ্রিক আদর্শের সাথে ও সমাজে কর্তৃত্বশীল ডকট্রিনের সাথে মেপে দেখা উচিত। বাকের সদরের দৃষ্টিতে, ইসলাম হচ্ছে একটি শক্তিশালী, উৎকৃষ্ট ও উন্নত ডকট্রিন, যা বিশ্বাসগত নেতৃত্ব প্রদান করার ও উম্মাহ্কে সবচেয়ে উৎকৃষ্টতর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিকে পরিচালিত করার দায়িত্ব বহন করে।

বাকের সদর এ কারণে ইসলামকে একটি ডকট্রিন বলে মনে করেন কেননা তাঁর বিশ্বাস মতে ইসলাম ধর্ম যে বিষয়টিকে ঘিরে আবর্তিত হয় সেটা হল মানুষদের হেদায়াত তথা সুপথে পরিচালনা, একত্ববাদ ও আল্লাহ্র বন্দেগির আলোকে জীবনের সঠিক পথ ও পন্থাকে প্রদর্শন করা এবং পবিত্র জীবন ও সত্যিকার সৌভাগ্য লাভ।[৪৮] কাজেই বিরাজমান বিচ্ছিন্ন বাস্তবতার উদ্ঘাটন কিম্বা নিছক আবেগের উদ্রেক[৪৯] ঘটানোই ইসলামের কাজ নয়। বরং ইসলাম মানুষের প্রাণের গভীরে ও মনুষ্য সমাজের উপলব্ধির অন্তঃপুরে তুমুল আলোড়ন তোলার প্রতিই মনোযোগ দিয়ে থাকে। ইসলাম নিছক একশ্রেণীর বিচ্ছিন্ন শিক্ষা ও মানুষের জন্য স্রেফ একটি বৈতরণী নয়, যা মানুষ ও সমাজের বিভিন্ন দিকের মধ্যে হতে কেবল একটি দিকের প্রতিই লক্ষ্য রাখবে। বরং ইসলাম যেহেতু একটি ডকট্রিন, সেহেতু একটি সমগ্র ও সিস্টেম হিসাবে গোটা ব্যক্তিক ও সামাজিক পরিসরে আলোকপাত করেছে। একারণে যারা বিশ্বাস করে যে, 'ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রদান করে, কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক তথা ব্যাপক পরিসরে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে ইসলামের কোন কর্মপরিকল্পনা নেই'- তাদের এ ধারণা নিতান্তই অমূলক, যা ইসলামের প্রতি তাদের যথাযথ জ্ঞানের অভাব প্রসূত।

ইসলামি ডকট্রিনের কেন্দ্রীয় তাৎপর্য ও মহান আদর্শ হচ্ছে সেই নিরঙ্কুশ আদর্শ, যা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কেউ হতে পারে না।[৫০] আর এই কেন্দ্রীয় তাৎপর্যের ভিত্তিতেই সকল সামাজিক সিস্টেম গড়ে ওঠে। তিনি লিখেন :

> 'একত্ববাদই হচ্ছে ইসলামি আকীদা-বিশ্বাসের মজ্জাকথা। ইসলামে একত্ববাদ দ্বারা মানুষ আল্লাহ ভিন্ন অপরের দাসত্ব হতে মুক্ত হয়। আল্লাহ্ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই- এ মর্মবাণী স্বীকার করার মাধ্যমে মানবেতিহাসের চলার পথ হতে যত ভ্রষ্ট উপাস্যের অপনোদন ঘটে এবং মানুষকে ভেতর থেকে মুক্ত করে ফেলে। অতঃপর এ মুক্তির স্বাভাবিক ফলাফল হিসাবে মানুষ বিশ্বের সম্পদরাজি ও এর সমুদয় সঞ্চয় ভাণ্ডারকে আল্লাহ্ ভিন্ন অপরের মালিকানা হতে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ মুক্তি, মানুষকে বাইরেও আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও প্রতি নির্ভরতা থেকেও মুক্তি এনে দেয়।'[৫১]

বাকের সদরের দৃষ্টিতে একত্ববাদের কেন্দ্রীয় তাৎপর্য এবং একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষাই হল ইসলাম ধর্মের আসল বুনিয়াদ। ইসলামের সকল মানবিক ও সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ এবং ইসলামি সমাজ ও জ্ঞানের বিনির্মাণেরও ভিত্তি হচ্ছে এই একত্ববাদ। এ দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য বিশ্ববীক্ষা ও সেখানে কর্তৃত্বশীল মতাদর্শসমূহের পরিপন্থী, যে সব মতাদর্শ গড়ে উঠেছে বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষা এবং দৃষ্টবাদ তথা জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে। আর এ কারণেই সেগুলো

---

[৪৮].দ্র. __________ , fimvjvZbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৮২।
[৪৯].দ্র. __________ , BKwZmv'bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬ ও ৪০৪।
[৪৯]. দ্র. cv¸ 3, পৃ. ৩৬৬।
[৫০].দ্র.__________ , Avj-mbvb Avj-ZwiwLq¨v wd Avj-KiAvb Avj-Kwig, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।
[৫১]. __________ , Avj Bmjvg BqvK' Avj nvqvr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

মানবের জন্য উপযুক্ত সমাধানের উপায় বাৎলে দিতে ও সর্বব্যাপী সৌভাগ্যময় জীবনের উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়নি। বাকের সদর সমসাময়িক মানুষের প্রশিক্ষণগত এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধানে বিজ্ঞানের ভূমিকার ব্যাপারে দৃষ্টবাদী ও জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির পথে না হেঁটে বরং বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম ধর্ম একটি সংকট মোচনকারী এবং কর্ম ও জীবনের জন্য একটি উপকারী ধর্ম হিসাবে আজকের সমাজে সক্রিয়, পরিপক্ব ও ভাগ্য নির্ধারণী উপস্থিতি বজায় রাখতে সক্ষম। ইসলাম শুধুই মুসলিম উম্মাহ্ বিনির্মাণের কাজেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং মুসলমানদের মধ্য থেকে এক সুদক্ষ শক্তি নির্মাণের প্রয়াস চালায়, যা গোটা বিশ্বকে বিনির্মাণ করবে।[৫২]

বাকের সদর দাবি করেন যে এভাবে ইসলামের চৈন্তিক আদর্শে BRwZnw' অনুপ্রেরণা এবং একত্ববাদের ছত্রছায়ায় ইসলামি ব্যবস্থাসমূহের বাস্তবায়নই হবে একত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় জ্ঞান ও নব্য ইসলামি সভ্যতা গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপ।[৫৩]

7. ev‡Ki m'‡ii Z‡Ëi ^ewkó¨mgn

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বাকের সদরের চিন্তা ও অভিমতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন-

১. সমসাময়িক মানুষের সমস্যাসমূহ অধ্যয়ন ও চিহ্নিতকরণে বাকের সদরের প্রয়াস আজকের বিশ্বের জন্য একটি সঠিক ও মৌলিক প্রয়াস। এটা সভ্যতা সম্পর্কিত ও সভ্যতা বিনির্মাণ সম্পর্কিত আলোচনার অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি কেউ বর্তমান সভ্যতাকে জানতে ও ভবিষ্যৎ সভ্যতার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাকে প্রথমে সমসাময়িক মানুষের সমস্যাবলিকে ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে, যে সমস্যাগুলোর সিংহভাগই পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। অতঃপর উক্ত সমস্যাবলির নিরসনকল্পে যথাযথ সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কেননা, ভবিষ্যৎ সভ্যতা তাদেরই সম্পদ হবে, যারা সমসাময়িক মানুষদের সমস্যাবলির জন্য উপযুক্ত ও সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে পারবে। বাকের সদর যথার্থই এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করেছেন এবং এর মাধ্যমে ইসলামের বিশ্বব্যাপী আবেদন ও নতুন ইসলামি সভ্যতাকে উপস্থাপনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন।

২. মুসলিম বিশ্বের অনেক চিন্তাবিদ যারা পাশ্চাত্য থেকে প্রাপ্ত সূত্রাবলি ও মূলনীতির ভিত্তিতে আজকের মানুষ ও তার সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক বিচার ও বিশ্লেষণে লিপ্ত হন, তাদের বিপরীতে বাকের সদর ইসলামি নৃ-তত্ত্বের ভিত্তিতে সমসামিয়ক মানুষ সম্পর্কে বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন এবং চেষ্টা করেছেন নৃ-তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য একটি তাত্ত্বিক নমুনা (Theoretical Model) উপস্থাপন করতে যা খোদ্ ইসলামি চিন্তা ও দর্শন হতে উৎসারিত। এ কারণে তিনি KiAv‡bi ভাষ্যসমূহের ও ধর্মীয় অন্যান্য সূত্রের সাহায্য নিয়ে প্রকৃতির সাথে মানুষের বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও সামাজিক সম্পর্কসমূহের বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন। আর এভাবে তিনি সমসাময়িক মানুষের জীবনে প্রধানতম বৈপরীত্য ও মূল সমস্যাগুলো উদ্‌ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

---

[৫২].দ্র. _________ , Avj-dvZvIqv Avj-Iqvw'nv, বৈরুত: দারুত তাআরুফ লিল-মাতবুআত, তা. নে., পৃ. ৭৭-৮১

[৫৩]. দ্র. আলী সার্লেক ও সাইয়্যেদ মাহদি মুসাভি, "ফালসাফায়ে তা'লিম ওয়া তারবিয়াতে ইসলামি আয মানযারে সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের সদর", Ô‰ÎgwmK gZv‡jqv‡Z gv‡idvZÕ, তেহরান : দনেশগাহে ইসলামি, ১৩৯৩ সৌ. সন, সংখ্যা ৫৯, (গ্রীষ্মকাল)।

৩. যদিও বাকের সদর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি সমালোচনামুলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, তথাপি এ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ফোরণ সম্পর্কে কোন অতিরঞ্জন ও পুরোপুরি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জালে আটকে ফেলে না। বরং তাঁর চিন্তা ও দর্শনে এক ধরনের ভারসাম্যতা কাজ করে। তাঁর মতে, প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সুবাদে যেসমস্ত বৈজ্ঞানিক অর্জন যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও উৎপাদন হাতিয়ার সমূহের উন্নয়ন, স্বয়ং এতে কোন সমস্যা নেই। বরং এই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রকৃতিকে জানা এবং প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর হাতিয়ারসমূহ যদি ন্যায়পরতা ও সামাজিক সুষম সম্পর্কের পথে থাকে, তাহলে প্রকৃতির বিকাশের ও একটি নিরাপদ, সুবিচারপূর্ণ ও উত্তম সমাজ প্রতিষ্ঠার কারণ হয়। বাকের সদরের দৃষ্টিতে, যে জিনিসটি এ বিজ্ঞানকে দিক-নির্দেশনা ও মূল্য প্রদান করে থাকে তা হচ্ছে আদর্শসমূহ ও মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যদি আদর্শসমূহ সংশোধন হয় তাহলে এ বিজ্ঞান থেকে আরও ভাল উপকৃত হওয়া সম্ভব।

৪. বাকের সদরের চিন্তা ও দর্শনের শিকড় তার চিন্তা-পদ্ধতির মধ্যে প্রোথিত। এছাড়াও ব্যবহারিক সামাজিক ও মানবিক বাস্তবতার মুখোমুখী হওয়া থেকেও তাঁর চিন্তা ও দর্শন গড়ে উঠেছে। তিনি সমাজের বাস্তবতাকে অধ্যয়ন করার মাধ্যমে সমসাময়িক মানুষের চৈন্তিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলির হেতু খুঁজে বের করতে প্রয়াস চালান এবং সঠিক পরিচিতির ভিত্তিতে এসব সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। সুতরাং তাঁর চিন্তা কেবলই বিবৃতিমূলক নয়। বরং সমসাময়িক মানুষের সমস্যাবলির বাস্তবতাকে সঠিকভাবে বিবৃত করা ছাড়াও তা জাগরণ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী বটে। একারণে অচিরেই তাঁর চিন্তা ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাজাফ নগরীসহ গোটা ইরাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও চিন্তাগত দলের উদ্ভব ঘটতে দেখা যায়।

৫. বাকের সদরের দর্শনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর সভ্যতাগত ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর চোখে, ইসলাম হচ্ছে জীবনের কর্মসূচি এবং সকল মানুষ ও সমাজের পূর্ণতা ও অগ্রগতির সনদ। ইসলাম একটি সৌভাগ্যময় সামাজিক জীবনের জন্য আবশ্যক সমস্ত কিছুকেই একত্ববাদের ছায়াতলে একটি মৌলিক ধর্মাদর্শ ও বিজ্ঞতাপূর্ণ বিধি-বিধানের আদলে উপস্থাপন করেছে। যা মানব জীবনের সকল বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সম্পর্কে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করার সক্ষমতা রাখে। আর একত্ববাদ ও সহজাত প্রবৃত্তির অধীনে মানুষের বিভিন্ন বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক চাহিদাসমূহের দাবি পূরণে সক্ষম। অতএব, ইসলামই হচ্ছে ভবিষ্যৎ বিশ্ব মানবের ধর্ম।

৬. বাকের সদরের তত্ত্বের সর্বশেষ যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে তা হল ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে BR॥Zn\' চর্চাকে পুনরায় চালু করার প্রতি তাঁর একাগ্র মনোভাব। পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতিতে উদ্ভুত যুগ-জিজ্ঞাসার সামনে ইসলামি শিক্ষার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা অতীব জরুরী, যা ইজতিহাদের চর্চার মাধ্যমে সম্ভব। তিনি মনে করেন, এটা প্রত্যাশা করা যায় না যে অতীত মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের মাধ্যমে ইসলামের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে, সেটাই মানুষের নতুনতর প্রয়োজনগুলো নিরসনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং ইসলামের জাজ্বল্যমান সারসত্যকে তা দিয়েই মানুষের সামনে পরিচিত করা যাবে। বরং পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামের মূল শিক্ষাকে সমুন্নত রেখে ধর্মের বাস্তব সত্যকে মানুষের বর্তমান জীবনের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে এবং ধর্মকে জীবনের কর্মপরিকল্পনা রূপে সমাজের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। আর এ ধর্মের মহান শিক্ষাসমূহকে এবং এর গঠনমূলক ও জীবনসঞ্চারী বিধানসমূহকে একটি উত্তম আদর্শ রূপে এবং একটি সুসমন্বিত ও সুসমঞ্জস চিন্তা-দর্শন হিসাবে পরিগঠিত করে সমাজের কাছে তুলে ধরতে হবে। যাতে এর অভ্যন্তর থেকেই সমসাময়িক মানুষের সমস্যাবলির উপযুক্ত সমাধানের উপায়সমূহ বের করা যায়। তিনি মনে করেন, এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কেবল BR॥Zn\' চর্চার মাধ্যমে ও ইসলামের নির্দেশিত সূক্ষ্ম পদ্ধতি অনুসরণ করেই সাধন করা সম্ভবপর।

8. mf¨Zv wewbgv©Y I jvjb c×wZ

সভ্যতা বিনির্মাণ হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন। মানুষকে সংস্কৃতিবান ও সভ্যতার নির্মাতা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। যে মানুষ বুদ্ধি ও স্বাধীনতার অধিকারী থাকার কারণে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাকে স্বীয় সার্বভৌম কর্তৃত্ব আর বিশ্বজগতে ক্রিয়াশীল প্রাকৃতিক ও সহজাত নিয়মের ভিত্তিতে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারেন।

বাকের সদর এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌বাদিতা, একত্ববাদ ও সামগ্রিক ন্যায়পরতার প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেগুলো হল :

১. বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব।

২. বিশ্বজগতে বিরাজমান নিয়ম ও রীতিসমূহ এবং

৩. (একটি বুদ্ধিমান অস্তিত্বসত্তা হিসাবে) মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা।

এ কথার ফল দাঁড়ায় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মানুষের জন্য 'প্রতিনিধি' হওয়ার বিষয়টি সৃষ্টিগত এবং বিধানগত (শরীয়ত) উভয়ভাবেই সত্যয়িত করা। সে সূত্রে নগরায়ন ও সভ্যতা গড়ে তোলা হচ্ছে মানুষের সাংস্কৃতিক সত্তারই পরিচায়ক।

পৃথিবীতে মানব জীবনের একটি প্রধানতম তাৎপর্য হচ্ছে সভ্যতা ও নগরায়ন। যার সাথে অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক বিষয়াবলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীর বুকে সভ্যতার উন্মেষ ঘটানো এক অর্থে পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রতিনিধিত্বেরই বাস্তবায়ন। তাছাড়া এটাই মাটির ধরায় মানুষের জন্য জীবন-মরণের প্রশ্ন, চিরকালব্যাপী। এ থেকে পলায়নের কোন সুযোগ নেই। সভ্যতা হচ্ছে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুসমঞ্জস্যের পরিচায়ক। এ ব্যতীত উন্নতিও অর্থহীন। বরং মানবের উন্নতি ও পূর্ণতার জন্য এটা প্রকৃত ও অবশ্যম্ভাবী একটি পূর্ব-শর্ত। উইল ড্যুরাণ্ট বলেন :

> 'সভ্যতা হচ্ছে সামাজিক শৃঙ্খলা, যা সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতার উদ্ভব ঘটায়।'[৫৪]

যদিও সভ্যতা মূলত সমাজসমূহের সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এর স্বরূপ ও প্রকৃতি, প্রকারভেদ, কাঠামো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য বেশ গভীর। সভ্যতা সম্পর্কীয় আলোচনায় এসব মতপার্থক্যের ফলেই এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

ms¯‹wZ I mf¨Zv

'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা'- শব্দ দুটিকে অনেক সময় সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়। যদিও তাদের সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করা চলে না। নৃ-তত্ত্ববিদরা 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার এবং সমাজের সভ্য হিসাবে মানুষের অর্জিত অভ্যাস ও কর্মদক্ষতা সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে 'সভ্যতা' বলতে তাঁরা বোঝেন মনুষ্য সমাজের উন্নত স্তরে, শহরে এবং রাষ্ট্রে মানুষের যে কর্মকুশলতার আবির্ভাব ঘটেছে তার সমষ্টি।

---

[৫৪]. "*Civilization is social order promoting cultural creation*"- Will Durant, *Our Oriental Heritage*, p. 1.

কোন কোন লেখক মনে করেন, মানুষের আচরণের দুটি দিক রয়েছে– বাইরের দিক এবং ভেতরের দিক। আচরণের বাইরের দিকটি হল সভ্যতা, আর ভেতরের দিকটি হল সংস্কৃতি। এ সকল লেখকদের মতে সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমাদের প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম, শিল্পকলা, নীতিবোধ, ধর্ম, আমোদ-প্রমোদ সব কিছুর মাধ্যমেই আমাদের সংস্কৃতির প্রকাশ। বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণ ও মূল্য হল লক্ষ্য। আর বস্তু ও ক্রিয়া হল এই লক্ষ্য লাভ করার উপায়। আর মানুষ যত রকম যন্ত্র বা উপায় নির্ধারণ করেছে সেগুলো সব মিলিয়ে হল মানুষের সভ্যতা। পার্থিব ও শিল্প-সংক্রান্ত যত রকম ব্যবস্থা বা কৌশল এবং মানুষের জীবনকে পরিচালিত করার জন্য যত আর্থিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, সবই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত।

অনেক সময় 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা'র মধ্যে প্রভেদ করা হয়ে থাকে। কাণ্ট-এর মতে নৈতিকতা সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় উপাদান, সংস্কৃতি মনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তির বাহ্য আচরণের সম্পর্ক। ম্যাথু অ্যারনল্ড (Matthew Arnold)ও মনে করেন যে, সংস্কৃতি হল অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, যেহেতু মানুষের সমগ্র পূর্ণত্বেই সংস্কৃতি নিহিত, আর সভ্যতা বাইরের ব্যাপার, যা বাহ্য ঘটনার উপর নির্ভর। ম্যাকাইভার এর মতে সংস্কৃতি হল লক্ষ্য, সভ্যতা হল সেই লক্ষ্য লাভের উপায়। তাঁর ভাষায়, সভ্যতা হল সংস্কৃতির যন্ত্র, শরীর বা পরিচ্ছদস্বরূপ। সভ্যতা রাজনীতি, অর্থনীতি এবং যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করে, আর সংস্কৃতি নিজেকে প্রকাশ করে শিল্পকলা, সাহিত্য, ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্য দিয়ে। আমাদের সংস্কৃতি হল আমরা যা তাই, আমাদের সভ্যতা হল আমরা যা ব্যবহার করি সেটাই।[৫৫]

গিসবার্ট (Gisbert)[৫৬] বলেন :

> 'সভ্যতা হল বাহ্যিক ও যান্ত্রিক, জনকল্যাণকর এবং উপায়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক। কিন্তু সংস্কৃতির কাজ যেহেতু লক্ষ্য নিয়ে, সেহেতু এ হল অভ্যন্তরীণ, অর্জিত এবং সম্পূর্ণ।'

তিনি আরও বলেন :

> 'সভ্যতা হল যা আমাদের আছে, সংস্কৃতি হল আমরা যা তাই।'[৫৭]

ev‡Ki m'‡ii AwfgZ

বাকের সদর হলেন এমন একজন চিন্তাবিদ যিনি গভীর মনোযোগ ও অনুধ্যান সহকারে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি (তথা ফিতরাত) এর ওপর ভিত্তি করে সভ্যতার প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। তিনি সভ্যতাকে মানব জীবন ও মনুষ্য সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন, যা মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। সভ্যতার গঠন কিম্বা মুসলিম সমাজসমূহে সভ্যতার পুনরুজ্জীবন মৌলিকভাবে আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, যা বাকের সদরের বক্তব্য মতে, ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ঘটে থাকে।[৫৮]

---

[৫৫]. উৎ. অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, mgvR‘kb, কোলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ. ১৪০-১৪০।

[৫৬]. '*Thus civilisation is external and mechanical, utiliarian and concerned only with means, while culture as dealing exilusively with ends, is internal organic and final.*' – Gisbert: *Fundementals of Sociology*, p. 286.

[৫৭]. '*Civilisation is what we have, culture is what we are.*' – *Ibid*.

[৫৮]. দ্র. বাকের সদর, dv‘vK wd Avj-ZwiL, বৈরুত : ইন্তিশারাতে আল-গাদীর, ২০০১, (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৭৮।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সভ্যতার গুরুত্ব এবং ইসলামি সভ্যতার পুনরুজ্জীবন, বিশেষ করে ইসলামি ডকট্রিনের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সমসাময়িক কালে সভ্যতার প্রসঙ্গে চিন্তাবিদদের মাঝে বাকের সদরের যে স্থান রয়েছে, সে বিবেচনায় এ মর্মে তাঁর চিন্তা ও ধারণাসমূহ অবগত হওয়ার মাধ্যমে আজকের সমাজের ভাগ্য নির্ধারণে সহায়ক প্রভাব ফেলতে পারে। একারণে এ বরেণ্য চিন্তাবিদের দৃষ্টিতে ইসলামি সভ্যতা ও এর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

সভ্যতা'র তত্ত্বেও বাকের সদরের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হচ্ছে একত্ববাদ। সভ্যতার গোটা চক্রটাই আবর্তিত হয় আল্লাহ্‌কে কেন্দ্র করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, বিশ্বজগত সম্পূর্ণটাই সৃষ্টি হয়েছে ন্যায়পরতার ভিত্তিতে। আল্লাহ্‌র জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থেকেই তা উৎসারিত হয়েছে এবং তাঁরই নির্বাহ অধীন, তাঁরই চিরন্তন পরিচালনা দ্বারা পরিচালিত। অতএব, জগত ও মানুষের অস্তিত্বশীলতা কোন অযথা বা অনর্থক বিষয় নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা, সবচেয়ে সম্পূর্ণতম সৃষ্টি। 'বুদ্ধি' ও 'স্বাধীনতা' - এ দ্বিবিধ গঠন উপাদান দ্বারা সে সমৃদ্ধ। সে কোন ছতিছন্ন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন নয়। কিম্বা প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের কাছে সে আত্মসমর্পিত তথা বাধ্যবাধকও নয়। একারণে সে নিজের পূর্ণতার যাত্রা পথে এগিয়ে চলতে পারে। কেননা, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এক অস্তিত্বসত্তা হিসাবে মৌলিক ও সহজাত মর্যাদার অধিকারী।[৫৯] সুতরাং সে নিজের ভাগ্য নিজের হাতেই গড়তে সক্ষম।

প্রাকৃতিকভাবে মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণ হচ্ছে তার বুদ্ধি ও স্বাধীনতা। অর্থাৎ তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনির্মাণের সামর্থ রয়েছে। এখানে যে জিনিসটি মানুষকে মর্যাদা প্রদান করে তা হচ্ছে তার চিন্তা ও উপলব্ধির সক্ষমতা। কারণ এটা তাকে অবগতি ও নিরূপণ ক্ষমতা প্রদান করে। এভাবে প্রকৃতি মানুষকে তার নিজের ভাগ্য পরিচালনার ভার তার নিজের হাতে তুলে দিয়েছে এবং তাকে একটি মুক্ত ও স্বাধীন অস্তিত্বসত্তায় পরিণত করেছে।

জগতটাও পরিচালিত হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও খোদায়ী নিয়মনীতির অধীনে। আর এ খোদায়ী নিয়ম ও রীতিকাঠামোর মধ্যে মানুষ হল স্বাধীন সত্তা। খোদায়ী নিয়ম ও রীতিসমূহ যখন মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তখন তা মনুষ্য মাত্রা লাভ করে এবং মানুষের মাধ্যমে উদ্ভাবন ও পর্যালোচনাযোগ্য হয় এবং মানুষের হাতের নীচ দিয়ে অতিক্রম করে। একারণে মানুষের 'বুদ্ধি' ও 'স্বাধীনতা' আর তার সভ্যতা বিনির্মাণের মাঝে কোন বিরোধ ঘটে না।

সুতরাং একত্ববাদ হতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উৎসারিত হয়। তা হল বুদ্ধি ও ধর্মীয় বিধানের ছায়াতলে মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনির্মাণের মূলনীতি। এই মূলনীতির আলোকে মানুষকে একটি সংস্কৃতিবান ও সভ্যতা নির্মাণকারী সত্তা হিসাবে গণ্য করা যায়। মানুষ বুদ্ধি ও স্বাধীনতাসম্পন্ন হওয়ার সুবাদে আল্লাহ্ আপন নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্বজগতের ওপর কর্তৃত্বশীল সহজাত ও প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে মানুষকে স্বীয় প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছেন। এভাবে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়েছে যাতে সে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে, মানুষ পৃথিবীতে স্বীয় সাধারণ (সর্বজনীন) প্রতিনিধিত্ব বাস্তবায়নের দায়ভার স্কন্ধে নিয়েছে। এজন্য মানবের দিক হতে এ প্রতিনিধিত্ব 'আমানত' নাম পরিগ্রহ করেছে। (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এ আমানতের) পরিবেশনা আর (মানুষের পক্ষ হতে এ আমানত) বহনের দায়ভার গ্রহণ উভয়ই সৃষ্টিগত ও সহজাত (تکوینی) ব্যাপার; ধর্মীয় বিধানগত (تشریعی) ব্যাপার নয়।[৬০]

---

[৫৯]. 'আমি অবশ্যই আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি... এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর ওদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' দ্র. Avj-KiAvb, বনি ইস্‌রাঈল : ৭০।

[৬০]. দ্র. বাকের সদর, wLvjvdvZj Bbmvb Iqv kvnv'vZj Awm¤qv, তেহরান : জিহাদুল বান্না, ১৩৯৯ হি. পৃ. ৮।

ivRbxwZ I mf¨Zvi mgvRe¨e¯'v

মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও তার সভ্যতা বিনির্মাণের সুনির্দিষ্টতম দিকটি প্রতিফলিত হয় 'রাজনীতি'র মাধ্যমে। রাজনীতি হচ্ছে মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনধারণের প্রতি সহজাত ঝোঁক ছাড়াও একটি মানবিক মর্যাদা, যা তার চিন্তা, স্বাধীনতা ও ইচ্ছা থেকে অর্জিত। অর্থাৎ অপরাপর মানুষদের সমাগমে জীবন যাপন করার জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনারও দরকার হয়, যা একটি নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে, মানুষের সৌভাগ্যে উপণীত হওয়ার জন্য যা অত্যাবশ্যক। বাকের সদর সামাজিক আবশ্যকতা হিসাবে নগর রাষ্ট্রের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন। যে রাষ্ট্র মানবের সহজাত প্রবৃত্তি ও সৃষ্টিগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যেহেতু মানুষ হচ্ছে একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টিসত্তা অর্থাৎ মানুষ স্বীয় সহজাত প্রবৃত্তির ভিত্তিতে বুদ্ধিসম্পন্ন, নাগরিক ও রাজনৈতিক। আর এ বৈশিষ্ট্যই নগর রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করে।[৬১] কাজেই এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে-

c_gZ, রাজনীতি হচ্ছে একজন মানুষের অন্যতম মর্যাদা, যার শিকড় প্রোথিত রয়েছে তার সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে। অর্থাৎ মানুষ স্বভাবতই একটি রাজনৈতিক কিংবা নাগরিক প্রাণী, সামাজিক নয়। এই যে আমরা বলি, রাজনীতি হচ্ছে মানুষেরই একটি মর্যাদা, অর্থাৎ মানুষ সত্তাগতভাবে এমন এক সৃষ্টিসত্তা যে 'বুদ্ধি' এবং 'স্বাধীনতা' -এ দ্বিবিধ শক্তির ভিত্তিতে নগর তথা শহরের জীবনকে বেছে নেয়। আর এ নগর জীবনকে 'নির্দেশ প্রদান' ও 'নির্দেশ পালন'- এ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে থাকে।

wØZxqZ, রাজনীতি হচ্ছে সভ্যতা তথা মানুষকে উৎকর্ষ, বিকাশ, উন্নয়ন ও পূর্ণতার অভিমুখে পরিচালিত করার পথ। সুতরাং স্রেফ বিষয়াদির দেখভাল করা কিংবা ক্ষমতার প্রয়োগ ও অন্যদের ওপর শাসন অথবা রাজনৈতিক দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করার নামই রাজনীতি নয়। বরং রাজনীতি হচ্ছে সভ্যতার পথে ও সভ্যতা বিনির্মাণের পথে অগ্রযাত্রা।

ZZxqZ, এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী রাজনীতি হল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও অভিমুখ সম্বলিত একটি প্রক্রিয়া। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে উৎকর্ষে পৌঁছানো এবং তাকে সত্যিকার সৌভাগ্যে উপনীত করা। কাজেই মূলগতভাবে রাজনীতি হচ্ছে সর্বপ্রকার মিথ্যাচার, অপবাদ, কলুষতা ও ধোঁকাবাজি থেকে বিমুক্ত থাকা। অর্থাৎ রাজনীতি হল সভ্য ও সুশীল মানুষের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে বাকের সদর বলেন :

> "এখানে মানুষের 'দায়িত্ব' বলতে বুঝানো হয়েছে এটা যে মানুষ একটি মুক্ত স্বাধীন অস্তিত্বসত্তা। আর স্বাধীনতা ছাড়া দায়িত্বের কোন অর্থ হয় না। একারণে মানুষকে পৃথিবীতে 'আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি' নির্ধারণ- এ শিরোনামটি থেকে একথা বলা যায় যে আল্লাহ্‌ এক মুক্ত স্বাধীন সৃষ্টিসত্তাকেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, যাতে সে স্বীয় স্বাধীনতা দ্বারা পৃথিবীতে 'সংস্কারক' অথবা 'গোলোযোগ সৃষ্টিকারী' হয়। আর এক্ষেত্রে সে নিজের স্বাধীনতা প্রয়োগ করেই তার পথকে বেছে নেয়।"[৬২]

বাকের সদরের দৃষ্টিতে এ প্রক্রিয়াটি যখন সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত অভিমুখে থাকবে, তখন রাজনীতি মানুষের সহজাত দায়িত্বের বাস্তবায়ন ঘটাবে। একারণে তিনি দাবি করেন :

---

[৬১]. উৎ. মোহাম্মদ হোসাইন জামশিদী, Awš'‡k‡q wmqwm‡q ev‡Ki m'i, তেহরান : পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশনা, ১৯৯৮, পৃ. ২৩৫।

[৬২]. বাকের সদর, wLjvdvZj Bbmvb Iqv kvnv'vZj Awš¤qv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

> 'মানব সমাজ অন্য কোন কিছুর প্রতি নির্ভরশীল তথা অন্য কোন কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকার আগে তার নির্ভরশীলতা একটি কেন্দ্রের সাথে। আর সেটা হল তার প্রতিনিধিত্ব'র কেন্দ্রিকতা। অর্থাৎ সেই মহান আল্লাহ্, যিনি তাকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি বানিয়েছেন।'[৬৩]

মানুষের এ খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের অর্থ হল একটি নির্ভর স্থলের প্রতি বিশ্বাস থাকা। এমন এক সত্তার প্রতি বিশ্বাস, যিনি তার মণিব এবং তার ও এ জগতের এবং যা কিছু জগত মাঝে বিদ্যমান সে সবকিছুর স্বাধীনতার মালিক।[৬৪] এভাবে তাঁর দৃষ্টিতে 'রাজনীতি' ও 'সভ্যতা' হয়ে ওঠে এক খোদায়ী রঙ যা মানবসত্তায় রাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ মর্মে তিনি KiAv‡bi নিম্নোক্ত এ আয়াতটির উদ্ধৃতি দেন-

> 'আল্লাহর রঙ, রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর! এবং আমরা তাঁরই উপাসনাকারী।'[৬৫]

পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব, যার গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে রাজনীতি এবং বিশ্বজগতে মানুষের শাসনের ভিত্তি[৬৬], এটাকে বাকের সদর একটি খোদায়ী বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। যে বৈশিষ্ট্যের শিকড় নিহিত রয়েছে মানবের স্বভাব ও সত্তার মধ্যে। আর এর সুফল হল এটাই যে সমাজে মানুষ একটি সঠিক, উপযুক্ত ও কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। আর এভাবে সে সভ্যতার দিকে যাত্রা করবে। অর্থাৎ, মানুষরা নিজের সভ্যতা ও অভিন্ন ভাগ্য পরিচালনার ব্যাপারে অন্যদের সাথে একযোগে দায়িত্বশীল ও প্রতিশ্রুতিশীল। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিপরীতে তারা অপারগতা বা দুর্বলতা অনুভব করতে পারে না কিংবা দায়িত্বহীনতা বা 'জানিনা-বুঝিনা' ধরনের কথা বলে পাশ কাটাতে পারে না। এটা খুবই স্বাভাবিক যে যতক্ষণ মানুষের প্রতিনিধিত্বের এ দিকটি অর্থাৎ পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও সভ্যতাগত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত না হবে এবং সমাজের ভেতরে ক্ষমতা কার্যকর, গ্রহণীয় ও বৈধরূপ পরিগ্রহ না করবে, ততক্ষণ এর অন্যান্য দিকগুলোও বাস্তবায়িত হবে না।

mf¨Zv wewbgv‡Yi Dcvq

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বাকের সদর মনে করেন, মানুষ হচ্ছে একটি পূর্ণতাকামী ও সভ্যতা নির্মাণকারী অস্তিত্বসত্তা। কাজেই সমাজের অঙ্গনে ও সাধারণ জনজীবনে পরিবর্তন সাধনের সম্ভাব্যতা ও সক্ষমতা দুটোই তার রয়েছে। সমাজে যে পরিবর্তন ও পূর্ণতা সাধিত হয় তার দুটি প্রধান দিক হল-

১. উন্নততর জীবন ধারণ, সময়োপযোগী হওয়া, উন্নয়ন ও উপযোগের দিকে যাত্রা।
২. আত্ম-শুদ্ধি, চিত্তের নির্মলতা এবং চিন্তা ও বীক্ষার উৎকর্ষের দিকে যাত্রা।

এ দুইটি দিক ইসলামি সূত্রসমূহে (অর্থাৎ হাদীসের মধ্যে) যথাক্রমে 'বৃহত্তর সংগ্রাম' (الجهاد الاكبر) এবং 'ক্ষুদ্রতর সংগ্রাম' (الجهاد الاصغر) শিরোনামে উত্থাপিত হয়েছে।

বাকের সদরের সভ্যতা ও উন্নয়ন মতবাদে একটি প্রধান তাৎপর্য হচ্ছে 'সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়মনীতি' কিংবা 'ঐতিহাসিক নিয়মনীতি'র তাৎপর্যটি। অর্থাৎ এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সামাজিক জীবন রাজনীতি ও ইতিহাস সম্বলিত,

---

[৬৩]. cv¸³, পৃ. ১৩৫।
[৬৪]. cv¸³।
[৬৫]. Avj-KiAvb, বাকারা : ১৩৮।
[৬৬]. দ্র. বাকের সদর, wLjvdvZj Bbmvb I qv kvnv'vZj Aww¤qv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

যার মধ্যে অনেক সংখ্যক নিয়ম-রীতি রয়েছে। এসব নিয়মাবলি মানব জীবনের সমস্ত অঙ্গন জুড়ে ব্যাপৃত। বিশেষ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে অর্থাৎ সকলের ও সর্বজনীন ভাগ্য পরিণতির অঙ্গনে।

একারণে বাকের সদর মনে করেন, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে এসব নিয়মগুলোকে উদ্‌ঘাটন করা এবং সভ্যতা বিনির্মাণে এগুলোকে ব্যবহার করা। এ নিয়মগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা এবং কর্ম-স্বাধীনতার সাথে এর সম্পর্ক। কাজেই এক অর্থে এ সব নিয়মগুলোকে 'প্রাকৃতিক ও মানবিক' বলা যায়। বাকের সদরের দৃষ্টিতে ঐশী ধর্মসমূহে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে পর্যালোচনার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে এসকল নিয়মগুলোকেই উদ্‌ঘাটন করা। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে, ইসলামের মূল ভাষ্য হিসাবে KiAvb মানবীয় বিষয়সমূহ যেমন সভ্যতা, বিপ্লব, সংস্কার, রাজনীতি ইত্যাদির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টিপাত করেছে। তিনি বলেন :

> '.. KiAv‡bi সাথে ইতিহাসের নিয়মনীতি সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনার এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, KiAvb হল সুপথ প্রদর্শনের গ্রন্থ, এমন এক গ্রন্থ যা মানুষকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার হতে আলোর দিকে পরিচালিত করে। কারণ, এ কাজের ব্যবহারিক দিক্‌টি কিম্বা মানবীয় দিক্‌টি ইতিহাসের নিয়মনীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত।'[৬৭]

এ সকল সামাজিক ও ঐতিহাসিক নিয়মসমূহ KiAv‡bi ভাষায় 'সুন্নাতুল্লাহ'[৬৮] তথা 'আল্লাহ্‌র রীতিসমূহ' নামে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র নিয়ম একটাই, যা পূর্ব থেকেই বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কখনোই আল্লাহ্‌র নিয়মে পরিবর্তন দেখা যাবে না:

> '... সুতরাং আল্লাহ্‌র কালেমা (বাণী) সমূহ পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ ইতিহাসের পরিক্রমায় তাঁর অঙ্গীকারসমূহের চিহ্নগুলো পরিবর্তনশীল নয়।'[৬৯]

mf¨Zv wewbgv‡Yi m¤¢ve¨Zv I Avek¨KZv

উপরে বাকের সদরের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি মৌলিক আলোচনা উপস্থাপিত হল। একটি হল বিশ্বজগত ও মানুষের ইচ্ছাশক্তির ওপর কর্তৃত্বশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়মনীতিসমূহের স্বরূপ। অপরটি হল ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণতা ও উন্নয়ন তথা সভ্যতার অভিমুখে পরিবর্তন ও বিবর্তন কেবল সম্ভবপরই নয়, বরং এটা অত্যাবশকীয় ও ভাগ্যনির্ধারণীও বটে।

জগতে পরিবর্তন ও পূর্ণতার যাত্রা হচ্ছে একটি প্রগতিশীল ও নিরন্তর যাত্রা। অনেক চড়াই উৎরাই পার করে এ যাত্রা এগিয়ে চলে। তাছাড়া মানবের উন্নয়ন ও পূর্ণতার এ অগ্রযাত্রা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল দিককেই অন্তর্ভূক্ত করে থাকে। অপরদিকে ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন ও পূর্ণতার যাত্রা কেবল বস্তুগত ও অভিজ্ঞতার দিকেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আধ্যাত্মিক দিক তথা নৈতিক পূর্ণতা এবং আত্মিক ও চৈন্তিক বিকাশের বিষয়টি এর মধ্যে পড়ে। যদিও এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যে কোন সমাজ এসব দিকগুলোর মধ্যে কেবল একটি দিকেই উন্নতি ও বিকাশের পথে অগ্রসর হল। কিন্তু অপরাপর দিকে উন্নতি তো নয়ই, বরং অধঃপতনের দিকে এগিয়ে গেল।

---

[৬৭]. _________, Avj gv'ivmvZj KiAwbq¨vn, বৈরুত : দারুত তাআরুফ লিল মাতবুআত, তা. নে. পৃ. ৫১-৫২।

[৬৮]. سنت الله (সুন্নাতুল্লাহ) যেমন : সূরা ফাত্‌হ : ২৩ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا- এটাই আল্লাহর নিয়ম, প্রাচীনকাল হতেই চলে আসছে। তুমি আল্লাহ্‌র এ নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না।'

[৬৯]. বাকের সদর, Avj gv'ivmvZj KiAwbq¨vn,প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

এ মর্মে বাকের সদর বলেন :

> 'মানুষের জীবন স্থবির ও নিশ্চল অবস্থায় থাকবে না। বরং পূর্ণতা ও বিবর্তনের দিকে অগ্রসরমান। আর এ পূর্ণতার যাত্রা সকল মানুষের বস্তুগত ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহাবস্থানের ক্ষেত্রে যেমন প্রবাহমান, তদ্রুপ তার চিন্তা ও দর্শনেও প্রবাহমান। আর এ বিবর্তন ও অগ্রযাত্রাই জীবন ও তার প্রতিফলনগুলোকে কখনো কখনো উন্নত জীবনের দিকে আবার কখনো কখনো পশ্চাৎপদতা ও অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়।'[৭০]

mf¨Zv wewbgv©‡Yi wfwË

বাকের সদরের ব্যাখ্যায়, 'সভ্যতা' হচ্ছে বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতিতে আবশ্যকীয় পরিবর্তন। তবে সভ্যতা বিনির্মাণ ও পূর্ণতার পথে যাত্রার কিছু ভিত্তি ও মূলনীতি রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. মানবিক আদর্শ, যা মানুষের সহজাত আকাঙ্ক্ষাসমূহের সঠিকভাবে পূরণের ব্যবস্থা নির্দেশ করবে এবং যা বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।
২. যথাযথ সুযোগ-সুবিধা ও দাবি বর্তমান থাকা।
৩. মানুষের স্বাধীন থাকা, এমনভাবে যে সে নির্বাচন করতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।
৪. নিজের চারপাশের পরিবেশে পরিবর্তন ও বিবর্তন সৃষ্টির দিকে মানুষের সক্রিয়তার সাথে অগ্রসর হওয়া।[৭১]

তাঁর দৃষ্টিতে 'আইডোলজি' তথা আদর্শ বলতে তাঁর যুগে ইসলামের ন্যায় এক শক্তিমান আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে। যদিও আইডোলজি-কে সঠিক ও মৌলিকভাবে জানা ও বুঝার অবকাশ রয়েছে এবং এর প্রতি বিশ্বাস থাকাও অত্যাবশ্যক। খোদায়ী নিয়মসমূহ হচ্ছে অবস্থা-পরিস্থিতি আর দাবি ও আবশ্যকতাসমূহের ব্যাখ্যাকারী। এগুলো জানার মাধ্যমে মানুষ ও সমাজ সুবিধা ও দাবিসমূহকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। অতঃপর তা সম্পাদনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে ইসলামি আদর্শে দীক্ষিত একজন স্বাধীন মানুষ নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অমিত সক্ষমতার অধিকারী হবে। একারণে সমাজের স্তম্ভচতুষ্টয় যদি বর্তমান থাকে, তাহলে 'সভ্যতা বিনির্মাণের সম্ভাবনা' একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে পরিণত হবে। আর তা বাস্তবায়িত করার জন্য মানুষকে আপন অস্তিত্বের তিনটি বিভাগের প্রতি নির্ভর করতে হবে। যথা :

১. বুদ্ধি ও অবগতি, যা আদর্শ, নিয়মসমূহ ও সুবিধাগুলোকে ব্যাখ্যা করে।
২. উচ্ছ্বসিত আবেগ ও গভীর আত্মিক নেশা। কেননা, প্রত্যেক আচরণের জন্য মানুষের প্রাণের গভীরে একটি শিকড় থাকতে হবে।
৩. কর্ম ও গতিশীলতা। যা মানবিক শক্তিসমূহের চৈন্তিক ও জ্ঞানগত সুসংহতি রূপে প্রতিফলিত হবে।

এ তিনটি বিভাগের সমষ্টিকে 'সভ্যতার ত্রিভূজ' নামে আখ্যায়িত করা যায়। বাকের সদরের দৃষ্টিতে, ইসলামি আইডোলজি স্বীয় উদরের মধ্যে এ তিনটি স্তম্ভের সবকয়টিকে ধারণ করে এবং এগুলোর উপর দৃষ্টি রাখে। এদের চলার পথে ইসলাম হচ্ছে এক দীপ্যমান প্রদীপ।[৭২]

সুতরাং এ তিনটি স্তম্ভ (বুদ্ধি, আবেগ ও কর্ম), মনুষ্য ইচ্ছাশক্তি, আদর্শের উপস্থিতি ও সঠিক বীক্ষার সমন্বয়ের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সম্মুখপানে ও পূর্ণতার পথে পরিবর্তন ঘটায়। তথা সমাজে সভ্যতা বিনির্মাণ করে।

---

[৭০]. __________, wimvjvZbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
[৭১]. দ্র. cv¸ ³, পৃ. ৪৪-৪৫।
[৭২].দ্র. cv¸ ³, পৃ, ২৯, ৩০।

mf¨Zvi wbqvgKmgn

সভ্যতা মানবের পূর্ণতার প্রকাশ। জীবনাচারের যে সমস্ত বিষয়গুলো সভ্যতার উত্থান-পতনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে সেগুলোকে সভ্যতার নিয়ামক হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। সামগ্রিকভাবে নিম্নলিখিত নিয়ামকগুলো সভ্যতার উন্মেষ ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয় :

WKwUb

বাকের সদরের দৃষ্টিতে যে কোন সভ্যতার উন্মেষ ঘটার প্রধানতম নিয়মাক হচ্ছে একটি 'ডকট্রিন' তথা মতাদর্শ থাকা। যে মতাদর্শ হবে যথোপযুক্ত ও যথাযোগ্য এবং যা মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে আলোকিত করবে। আর সভ্যতার পানে যাত্রার জন্য উৎকৃষ্ট নমুনা উপস্থাপন করবে। এছাড়াও উক্ত ডকট্রিন হবে মানবিক ও বৈশ্বিক। আর জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেন :

> 'একটি জাতির আন্দোলিত হওয়ার প্রধান নিয়ামক হচ্ছে তার একটি সমৃদ্ধ ডকট্রিন এবং এমন একটি উৎস, যার মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলোকে পরিমাপ করা যাবে এবং তদানুযায়ী উৎকৃষ্ট নমুনাসমূহকে উপস্থাপন করা যাবে। আর জাতির জীবনকে অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখী করা যাবে এবং তারই ছায়ায় পূর্ণ আস্থার সাথে একটি ইতিবাচক আইডোলজি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয় তার আলোকে বিপ্লবের পথে আগুয়ান হবে।'[৭৩]

বাকের সদর 'ডকট্রিন' ও এর বৈশিষ্ট্যাবলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন :

> 'এখানে যথাপোযুক্ত ও যথাযোগ্য ডকট্রিন বলতে আমি বুঝিয়েছি -প্রথমত, একটি সঠিক ডকট্রিন ও উৎস বিদ্যমান থাকা। দ্বিতীয়ত, জাতি কর্তৃক ঐ ডকট্রিনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা ও অনুপ্রেরণা লাভ করা এবং তৃতীয়ত, ঐ ডকট্রিনের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা।
>
> যখনই এ তিনটি মূলনীতি কোন জাতির মধ্যে একত্রিত হবে এবং জাতি এমন এক ডকট্রিন ও উৎসের অধিকারী হবে যা তারা সঠিকভাবে অনুধাবন করবে ও তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তখনই তারা একটি প্রকৃত আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবং ঐ ডকট্রিনের ভিত্তিতে জীবনযাত্রায় নানা পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হবে।'[৭৪]

বাকের সদরের দৃষ্টিতে মুসলমানরা প্রথম মূলনীতিটির অধিকারী একটি সুপ্ত তথা সম্ভাব্য শক্তি হিসাবে। কিন্তু দ্বিতীয় মূলনীতিটি অর্থাৎ জাতি কর্তৃক উক্ত ডকট্রিনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা ও অনুপ্রেরণা লাভ করা, এক্ষেত্রে তারা তা লাভ করেনি। আর তৃতীয় তথা শেষোক্ত মূলনীতিটি অর্থাৎ ঐ ডকট্রিনের প্রতি জাতির অগাধ বিশ্বাস থাকার বিষয়টিও তাদের অনেকের মধ্যে দুর্বল। এর কারণ হচ্ছে তারা এ ডকট্রিনকে যথার্থভাবে জানে না। তাই এ ব্যাপারে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন-

> '...সুতরাং জাতির জন্য ইসলামের ডকট্রিন ও মূলনীতিসমূহকে যথার্থভাবে জানা একটি আশু প্রয়োজন, যার পথে ধরে আন্দোলনের প্রধান পূর্ব-শর্তাবলী পূরণ হবে।'[৭৫]

---

৭৩. দ্র. cv¸ 3, c. ১৭, ১৮।

৭৪.________ , dvjmvdvZbv,প্রাগুক্ত,পৃ. ১৭।

৭৫. cv¸ 3|

Ae¯v-cwiw¯wZ I m‡hvM-mweav

সভ্যতা গড়ে ওঠার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো অবস্থা-পরিস্থিতি, সুযোগ-সুবিধা, সক্ষমতা ও আবশ্যকতা। তবে এগুলো অনেকটাই বিরাজমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণের মধ্যে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার এবং পরিবর্তন আনয়নের ইচ্ছা না জন্মাবে, ততক্ষণ সভ্যতার দিকে অগ্রযাত্রার কোন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত জনগণ বিদ্যমান পরিস্থিতিকে ভালভাবে উপলব্ধি না করবে এবং এরূপ অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ না করবে, ততদিন সভ্যতা বিনির্মাণ সম্ভবপর হবে না।

সুযোগ ও সক্ষমতার বিষয়টিও গণ-ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। সামগ্রিকভাবে, বাকের সদর মনে করেন, যে কোন বিপ্লবের ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিজয় নির্ভর করে একশ্রেণির বাস্তব ও বাহ্যিক অবস্থা এবং পরিস্থিতির উপর।[৭৬] তাছাড়া বাকের সদর জোরারোপ করেন যে সভ্যতা বিনির্মাণের বিষয়কে আল্লাহ্র ইচ্ছা, আকস্মিকতা কিংবা ভাগ্য বা কপালের সাথে জুড়ে দেওয়ার কোন অবকাশ নেই। কারণ এসবই হচ্ছে খোদায়ী নিয়মের পরিপন্থী এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে নাকচ কারী। তিনি একথাও বলেন :

> 'অবশ্য যদি আল্লাহ্র ইচ্ছা যুক্ত হয়, তাহলে তা অসাধারণভাবে উপযুক্ত পরিমণ্ডল এবং সামাজিক প্রস্তুতিও সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এটা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির নিয়মের পরিপন্থী হবে। কেননা, মানবসৃষ্টির ভিত্তি হচ্ছে তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা। কারণ মানুষের পূর্ণতার ধারা নির্ভর করে এহেন পরীক্ষার উপর। আর এ পরীক্ষার কর্মসূচি বাস্তবায়নের দাবি হচ্ছে পরিবর্তন ও বিবর্তন লাভ করার জন্য জনমানুষের যে প্রস্তুতি, তা হতে হবে তার স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত, ঐশ্বরিক বাধ্যবাধকতা জনিত নয়...।'[৭৭]

তবে তাই বলে বাকের সদর 'আল্লাহর সাহায্য', 'খোদায়ী মদদ' এবং 'আল্লাহ্ সমীপে প্রার্থনা ও অনুনয়-বিনয়ের' প্রভাবকে অস্বীকার করেন না।

e¨e¯vcbv I †bZZ

সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য তৃতীয় নিয়ামকটি হচ্ছে নিবিড় ব্যবস্থাপনা (তথা নীতিমালা) ও নেতৃত্ব। বাকের সদরের দৃষ্টিতে সমাজে পরিবর্তন আনতে হলে বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব ও উচ্চমান ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। যে নেতা হবে ত্যাগী, আত্মোৎসর্গী, শক্তিমান চিন্তা আর আত্মবলের অধিকারী। যে সমাজে সে পরিবর্তন সৃষ্টি করতে চায় সে সমাজের উপর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সক্ষমতা তার থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, শেষ যুগে ইমাম মাহদি'র বিশ্ব-বিপ্লব সম্পর্কে তিনি লিখেন :

> 'বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে মহান চিন্তা মানব বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিবর্তন সাধন করার প্রয়াসী হবে তাঁর পরিধি, ঐ বিশ্বজাহানের পরিধির চাইতেও বৃহত্তর হওয়া বাঞ্ছনীয়, যে বিশ্বজাহানকে সে পরিবর্তন করতে চায়।[৭৮]

B"Qv I MwZ

সভ্যতার উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকটি হচ্ছে 'মানুষদের ইচ্ছা' এবং 'তাদের সংকল্প ও জাগরণ'। কেননা, সভ্যতা যেহেতু 'ইচ্ছাক্রিয়া'র ফসল, একারণে তা অবশ্যই কোন ইচ্ছাসম্পন্ন সত্তার 'ইচ্ছা' ও

৭৬.দ্র. প্রাগুক্ত।
৭৭. cv¸³|
৭৮. cv¸³, পৃ. ৫১।

‘কর্মের’ মাধ্যমে সংঘঠিত হতে হবে।[৭৯] সুতরাং সভ্যতার অভিমুখে অভিযাত্রার জন্য একটি সমাজের মানুষদের ইচ্ছা এবং ইচ্ছাপ্রসূত গতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

DcKiY I gva¨g

উপকরণ এবং হাতিয়ারও সভ্যতা বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় মৌলিক ভূমিকা রাখে। এ নিয়ামকটির ‘মনুষ্য’ ও ‘অ-মনুষ্য’ -এ দুইটি দিক রয়েছে। মনুষ্য দিকে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হচ্ছে বুদ্ধি, প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ, অভিজ্ঞতা, ভাবাবেগের সঠিক ব্যবহার, উন্নয়ন ও বিবর্তনের প্রতি বিশ্বাস, আশা, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা, চৈন্তিক বিকাশ, সামাজিক চেতনাবোধ ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে অ-মনুষ্য দিকে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবে সেটাই বিবেচ্য যা নির্ধারিত হয় মূলতঃ স্থান ও কাল-পাত্রের দাবি অনুযায়ী।

বাকের সদরের একটি বড় মনঃকষ্ট ছিল সমকালীন যুগে সভ্যতার দিক থেকে মুসলমানদের দুর্বল অবস্থান। একারণে তিনি মুসলমানদেরকে এ সংকটের প্রতি মনোযোগী করে তোলার জন্য এবং মুসলিম সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ও বিনির্মাণের লক্ষ্যে এ মর্মে স্বীয় অভিমত ও তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তিনি একটি উন্নত ও বিকশিত সভ্যতা গড়ে তোলার নিমিত্তে ইসলামের আদর্শের উপর ভিত্তি করে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়াকে আজকের সকল মুসলমানের জন্য একটি দায়িত্ব বলে মনে করেন। তিনি সভ্যতার বিষয়টিকে কোন ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং দর্শনের একটি বিষয় হিসাবে দৃষ্টিপাত করেন। আর এ দৃষ্টির ভিত্তিতে তিনি সভ্যতা বিনির্মাণকে একটি অত্যাবশ্যকীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক ব্যাপার বলে মনে করেন। যা মানুষদের ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে এবং একটি ডকট্রিন, আইডোলজি, অবগতি, বুদ্ধিমত্তা, ব্যবস্থাপনা ও সঠিক নীতিপন্থার উপর ভিত্তি করে এবং যথাযথ হাতিয়ার ও মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

এ অর্থে সভ্যতা কোন ইতিহাস বা পরিস্থিতির ফসল নয়। বরং তা মানুষদেরই ইচ্ছা থেকে প্রসূত এবং তাদেরই বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রয়োগিক প্রচেষ্টার ফসল। যা বাস্তবায়নের জন্য কিছু উপাদান তথা পূর্ব-শর্তের প্রয়োজন হয়। যথা : অবগতি, ডকট্রিন এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও বিশ্বাস, ব্যাপকভিত্তিক শক্তিমান নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা। তবে ইচ্ছা ও ক্ষমতা এখানে মূল স্তম্ভ সমতুল্য, যা এসব নিয়ামকের মাঝে বন্ধন সৃষ্টিকারী হিসাবে পরিদৃষ্ট হয়।

ইসলামি ডকট্রিনে এ অর্থেই সভ্যতাকে দেখা হয়েছে এবং এর আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতার বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। অর্থাৎ একদিকে সভ্যতা বিনির্মাণে জ্ঞাতসারে অগ্রযাত্রা যেমন আবশ্যক বলে গণ্য করেছে, অপরদিকে তদ্রূপ তা বাস্তবায়নের উপায় পদ্ধতি সম্পর্কে উৎকৃষ্ট ও যথার্থ রূপরেখা উপস্থাপন করেছে।

9. gj¨vqb

এ পর্যন্ত চারটি অধ্যায়ে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর-এর সামাজিক চিন্তা ও দর্শন উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হল। দেখা যাচ্ছে যে বিষয়বস্তু অনুসন্ধান, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং মেথডলজি- এ তিনটি প্রক্রিয়া হচ্ছে বাকের সদরের সামাজিক দর্শন পরিচিতির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দুঃখজনকভাবে এগুলো নিয়ে কাজ হয়েছে কম। বাকের সদর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করতেন মেথডলজি’র উপরে।

---

[৭৯]. দ্র. সাইয়্যেদ কাযেম হোসাইনি হায়েরি, gwewnmj Dmj, কোম : দাফতারে তাবলিগাতে ইসলামি, ১৪০৭ হি. পৃ. ১৫১-১৫৩।

বাকের সদরের দার্শনিক কর্ম-প্রয়াসের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল তৎকালীন সমাজের প্রয়োজনকে সামনে রেখে। আর তৎকালে মার্কস্বাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের যে তুমুল প্রভাব বিরাজমান ছিল, সে তুলনায় আজকের প্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত আলোচনার তাগিদ হয়ত অনেক কমে গেছে। মার্কস্বাদী আলোচনার একটি ভর ছিল অর্থনীতির উপরে। সে সময়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও মার্কস্বাদ মানব জীবনে চলার পথে দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আলোচনার শিরোনামে ছিল। একারণে তিনি সামাজিক চিন্তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক চিন্তা-দর্শনের অঙ্গনেও গভীরভাবে প্রবেশ করেন এবং এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন। সেখানে তিনি এমন কিছু মৌলিক বিষয় সংযুক্ত করেছেন যা আর্থ-সামাজিক অঙ্গনের বাইরেও বিভিন্ন সমস্যাবলি নিরসনে সমাধানসূত্র প্রদান করতে পারে। তাঁর চিন্তাধারার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ইসলামি ফিকাহ্ শাস্ত্রের আলোকে সামাজিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। মুসলিম জনপদে সচরাচর সমষ্টির চেয়ে ব্যক্তি জীবনাচার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বেশি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। বাকের সদর এই রীতি ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগ নেন এবং একটি ব্যাপকভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন, যার মূল নির্যাস হচ্ছে একত্ববাদ। এটা এমন এক শক্তিশালী আন্তঃবন্ধনের নাম, যেখানে কোন ব্যক্তিই একা একা চলার বা একাকী ভাববার অবসর পায় না। অবশ্য বাকের সদর বিশ্বাস করতেন, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের পরিসীমানায় ইসলামি ব্যবস্থার বিনির্মাণ, অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়াবলিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে না করা ব্যতীত সম্ভব নয়।

সামাজিক বিজ্ঞানের দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানে পন্থা কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতই? এই প্রশ্নটাই যদি বাকের সদরের কাছে করা হয় তাহলে আমরা কি উত্তর পাব?

-প্রথম দ্বিত্বতা যেটা আমাদের মস্তিষ্কে উদিত হবে তাহল 'বিজ্ঞান' ও 'ডকট্রিন' প্রসঙ্গ। বিজ্ঞান বর্ণনা দেয় যা বিরাজমান, তা নিয়ে। কিন্তু ডকট্রিন কথা বলে যা হওয়া উচিত, তা নিয়ে। বিজ্ঞান বাস্তবতাকে ব্যাখ্যার দায়িত্ব বহন করে। আর ডকট্রিন যা হওয়া উচিত, সেটাই দৃষ্টিতে রাখে। বাকের সদর গুরুত্বারোপ করেন এবং মত প্রকাশ করেন যে, 'বিজ্ঞান' ও 'ডকট্রিন'-এর পন্থা একই হলেও এরা আসলে দুটি ভিন্ন বিষয়। তবে কি বাকের সদরকে প্রকৃতিবাদী বলার অবকাশ রয়েছে? আমাদের উচিত বাকের সদরকে মূল্যায়নে আমরা যেন এরূপ ভুল-বুঝাবুঝির মধ্যে নিপতিত না হই। বাকের সদরের কিছু দ্বি-চারিতা রয়েছে যেগুলো ভাল করে বুঝতে হবে। তার এরূপ একটি দ্বি-চারিতার উদাহরণ হচ্ছে অভিজ্ঞতাকে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা -এদুভাগে বিভক্ত করা। তিনি এ দুয়ের মধ্যে চমৎকার এক পার্থক্য দাঁড় করিয়েছেন। বাকের সদরের ভাষায়, আমরা যদি সমাজে পুঁজিতন্ত্রের প্রভাবকে দেখতে চাই, এ অভিজ্ঞতা একজন ব্যক্তি তথা একজন প্রত্যক্ষকারীর জন্য উপস্থিত থাকতে পারে না। এ অভিজ্ঞতা রূপ লাভ করে ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায়, সামাজিক জীবনে। বাকের সদর মনে করেন সামাজিক অভিজ্ঞতায় আপনি হলেন সুবিধার অধিকারী।

বাকের সদর বিজ্ঞানে বিধানসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। প্রাকৃতিক বিধানাবলি এবং যেসব বিধান বিশেষ কোন ডকট্রিনের পরিসীমায় প্রণীত হয়। আমাদের এমন কিছু বিধানাবলি রয়েছে যেগুলো আমাদের ইচ্ছার সাথে কোনই সাংঘর্ষিক নয়। উদাহরণস্বরূপ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার বিধান, যা বলে আমাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত ভূমিকা রাখে।

দ্বিতীয়ত এমন বিধানও রয়েছে যা মানবের ইচ্ছার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা বিশেষ এক ডকট্রিনের কাঠামো গ্রহণ করার পর উপস্থাপিত হয়ে থাকে। যেমন 'চাহিদা ও সরবরাহ'র সূত্র। এখানে বিশেষ এক ডকট্রিন গ্রহণ করা এবং এসবের মধ্যে যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ, তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে 'ইচ্ছা'র হস্তক্ষেপ রয়েছে।

এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাকের সদরের সামাজিক চিন্তা ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ পর্ব সমাপ্ত করা হল। অভিসন্দর্ভের দাবি মোতাবিক এর পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বাকের সদরের অর্থনৈতিক দর্শন বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে চলবে।

সমাজ এবং অর্থনীতি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত, এমনভাবে যে একটি সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি সুষ্ঠ অর্থনীতি। যে অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত থাকবে ঐ সমাজের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ও অনুপ্রেরণার উপর আর পরনির্ভরতা ও দোষত্রুটি বিবর্জিত। সমাজের একটি সুষ্ঠ অর্থনীতির অধিকারী থাকতে হবে অর্থাৎ উক্ত সমাজ যেন অর্থনৈতিক রক্তশূন্যতায় না ভোগে। অন্যথায় সে সমাজব্যবস্থার অবস্থা দাঁড়াবে ঐ রোগীর মত, যে রক্তস্বল্পতায় ভুগছে কিংবা তার রক্ত সংবহনতন্ত্র ঠিকঠাক কাজ করছে না। ফলে সর্বক্ষণ জরাগ্রস্থ অবস্থায় থাকে। একারণে কোন জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই পাওয়া যাবে না যে সমাজের জন্য সুষ্ঠ অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তার কথাকে অস্বীকার করবে।

এক্ষেত্রে বাকের সদরের অভিমত হচ্ছে একত্ববাদী সমাজব্যবস্থাও কখনো একটি সুষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যতীত তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হবে না। যে জাতি অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে অন্যের কাছে হাত পাতে তারা ঐ জাতির গোলাম ও ক্রীতদাসে পরিণত হয়। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু'র ভাষায়, 'সেই জাতিই স্বাধীন, যাদের অর্থনৈতিক উল্লম্ফন থাকে।'[৮০]

কাজেই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাতীয় ও সামাজিক জীবনে একটি সুষ্ঠু স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব কত বেশি! তাই তো দেখা যায় ম্যাক্স ভেবার ১৯২০ সালে তাঁর মৃত্যুর আগ দিয়ে এই সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ের পারস্পরিক গুরুত্বের উপরেই লেখালেখি করে গেছেন, যে লেখাগুলো তাঁর মৃত্যু পরবর্তীকালে একত্রে সংকলিত করে *Economy and Society* শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

বাকের সদর একত্ববাদী সমাজব্যবস্থার আলোকে ইসলামি অর্থনীতির রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে ইসলাম অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার পক্ষে। তবে এ হিসাবে নয় যে খোদ্ অর্থনীতিই হবে এখানে উদ্দেশ্য, অথবা একমাত্র লক্ষ্য। বরং ইসলামি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ সুষ্ঠ অর্থনীতি এবং স্বাধীন অর্থনৈতিক শক্তি ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে ইসলাম অর্থনীতিকে সামাজিক জীবনের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম স্তম্ভ বলে মনে করে থাকে। এজন্যে অর্থনীতির কারণে ইসলাম তার অন্যান্য স্তম্ভে আঘাত তথা ক্ষতি সাধন করে না। 'আয়ের উৎস হচ্ছে চাহিদা ও কামনা'- এধরনের মতবাদকে ইসলাম সমর্থন করে না। বরং ইসলাম বিশ্বাস করে, মানুষের চাওয়া ও কামনাসমূহ মানবজাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও কল্যাণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। আর একারণেই ইসলামি ফিকাহ্ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আছে Avj-gvKvme Avj-gnvi¿vgv (المكاسب المحرمة) তথা 'অবৈধ আয়-উপার্জনসমূহ' শিরোনামে। অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ উপার্জন সেটাই যা একদিক থেকে ব্যক্তির কর্মতৎপরতার ফল হবে, আর নয়ত অন্ততপক্ষে কোন শোষণের ব্যাপার তার মধ্যে থাকবে না এবং অপরদিকে ব্যবহার তথা ভোগের প্রশ্নে তা ভোগ করা বৈধ ও উপকারী থাকে। ইলমে ফিকাহ্'র পরিভাষায় যাকে বলা হয় gvbdvAvZ gnvjøvjvZb gvKm'vZb (منفعة محللة مقصودة)। আর সমাজতন্ত্রীদের ভাষায় 'লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে হবে সামাজিক স্বার্থ, ব্যক্তির পকেট ভরা নয়।'[৮১]

---

[৮০]. উৎ. মূর্তাজা মেতাহ্হারি, bvhwi †e †bhv‡g GK‡Zmw'-G Bmjvg, কোমঃ ইন্তেশারাতে সাদরা, ১৩৮০ সৌ. সন, খ. ১, পৃ. ২২ [http://lib.eshia.ir/50014/1/22#_ftnref1].

[৮১]. cÖv¸³|

cÂg Aa¨vq

mgvR Ges A_©bxwZK ‘kb

cÂg Aa¨vq

mgvR Ges A_©‰bwZK ‘kb

মানুষের নিজের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয়। যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি। এগুলোকে বলা হয় তার জীবনোপকরণ। এসব জিনিস ছাড়াও মানুষের আরও কিছু জিনিসের প্রয়োজন থাকে। যেমন পারিবারিক অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক, বিচারিক ইত্যাদি। মানুষের এতসব প্রয়োজনের মাঝে যদি উদাহরণস্বরূপ মনে করি যে, এমন একটা সময় ছিল যখন সে একাকী জীবনযাপন করত, অর্থাৎ একে অপরের সাথে যৌথভাবে কোন কার্য বা প্রয়াসই বিদ্যমান ছিল না, এমনকি পশুপালের মতোও না যারা একসাথে চরে বটে, কিন্তু যার প্রয়োজনটা সে নিজে মেটায়, তাহলে ঐ সময়ে অর্থনীতি বলতে কোন কিছুর প্রাসঙ্গিকতাই ছিল না। যেমনভাবে একদল হরিণের পাল একসাথে চরে বেড়ায় ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক তথা যোগাযোগের বিষয়ই নেই যেটাকে সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করা যায়। অথচ যে সময় থেকে মানব ব্যক্তিদের মধ্যে যৌথ প্রচেষ্টা এবং কাজকর্ম বণ্টনের ব্যাপারটি চালু হল, হোক সেটা অত্যন্ত সরল পরিসরে যেমন পারিবারিক পরিমণ্ডলে যেখানে পরিবারের কর্তা, এই ক্ষুদ্র সমাজটির পরিচালনার দায়িত্ব বহন করতে শুরু করল, সেদিন থেকেই চাউক আর না চাউক, ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক উপলক্ষ প্রতিষ্ঠিত হল এবং অপরিহার্যভাবে জীবনোপকরণও ভাগ বণ্টনের বিষয়টি সামনে আসলো। অর্থাৎ ব্যক্তিদের মাঝে সরল অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হল। হোক ঐ জীবনোপকরণ কাজ ও শ্রমের মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করে থাকুক অর্থাৎ 'উৎপন্ন' হয়ে থাকুক। আর হোক তা প্রকৃতি থেকে প্রস্তুত অবস্থায় স্রেফ নিজ দখলে নিয়ে থাকুক। উদাহরণস্বরূপ পানি থেকে মাছ ধরে নিল। অথবা গাছ থেকে ফল পেড়ে নিল। আর হোক ঐ বণ্টন সমানভাবে করা হয়ে থাকুক অথবা কম-বেশি করে করা হয়ে থাকুক, অর্থাৎ যার গায়ে জোর বেশি সে ভাগে বেশি করে নিয়ে থাকুক।

অতএব অর্থনৈতিক সম্পর্ক তখনই উৎপত্তি লাভ করে যখন ব্যক্তিদের মাঝে সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ যৌথ কর্ম-প্রচেষ্টা এবং দায়িত্ব ভাগাভাগি করা হয়। আর জীবনোপকরণ সীমাবদ্ধ হেতু তা ভাগ-বণ্টন করে নিয়ে চলতে হয়। অর্থাৎ আমরা যদি ধরে নিই যে, মানুষরা পারিবারিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের স্বার্থে সামাজিক জীবনযাপনে বাধ্য হয়, কিন্তু জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এতটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে যে সবকিছু বাতাস যেমন জীবনের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিরাজমান থাকার কারণে সকলের চাহিদা পূরণ হয়ে যাচ্ছে, জীবনোপকরণও তদ্রূপ সকলের চাহিদা পূরণ করে, সেক্ষেত্রে ভাগ-বণ্টনেরও আর কোন প্রসঙ্গ আসতো না। ফলে বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ যেমন ব্যক্তিগত কিংবা যৌথ মালিকানা, অধিকার, অগ্রাধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদের মধ্যে উত্থাপিত হত না। অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ অপরাপর সামাজিক সম্পর্কগুলোর মতই চুক্তিগত বিষয়। সামাজিক সম্পর্কসমূহের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বামী-স্ত্রী, আবশ্যিক মান্য করে চলা ইত্যাদি তাৎপর্যগুলো উত্থাপিত হয়। আর বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের মধ্যে মালিকানা, অধীনস্ততা, অধিকার, বিনিময় ইত্যাদি তাৎপর্যগুলো উত্থাপিত হয়। অর্থাৎ যখনই যৌথ-প্রচেষ্টা ও কর্ম-বণ্টনের আবশ্যকতা দেখা দিল, অমনি একশ্রেণির আপতিক ও আইনী তাৎপর্যও আবশ্যক হয়ে পড়ল। এগুলোর মধ্যে যে একগুচ্ছ তাৎপর্য উৎপাদন এবং সম্পদের ও জীবনোপকরণের বণ্টন ও বিতরণের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোকেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলা হয়।

মানব সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে অর্থনীতির যাত্রা সূচিত হয়েছে। তবে তার কোন স্বতন্ত্র- সংহত রূপে অস্তিত্ব ছিল না। জীবন ধারণের প্রয়োজনেই মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছে। সভ্যতা ও শিক্ষা বিকাশের সাথে সাথে এক সময় অর্থনীতির স্বতন্ত্র ও শাস্ত্রীয় যাত্রা শুরু হয়। এরপর নানা প্রেক্ষাপট ও পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমানের সংহত, শাস্ত্রীয় ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রূপ লাভ করে। ইংরেজি Economics শব্দটি অর্থনীতির প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, গ্রিক শব্দ (oikos) ও (nemein) এর সন্ধি (Oikonomia) থেকে (Economics) শব্দটি এসেছে। গ্রিক ভাষায় (oikos) হল গৃহ আর (nemein) অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা। এ হিসাবে (Oikonomia) শব্দটিকে প্রথম ব্যবহার করেন দার্শনিক অ্যারিস্টটল।[১]

পরবর্তীকালে অর্থনীতি একটি অর্থ-সম্পদ ঘনিষ্ঠ সামাজিক বিজ্ঞানে পরিণত হয়ে ওঠে। কেননা সামাজিক বিজ্ঞান হলেও এ শাস্ত্র মানুষের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, মানবিক আচরণ, পারস্পরিক অধিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কোন বক্তব্য উপস্থাপন করে না। বরং সামাজিক জীব হিসাবে এবং সমাজের সচেতন সদস্য হিসাবে মানুষ যে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পাদন করে, অর্থনীতি সে সকল কাজের বিশ্লেষণ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এ সকল কাজের ফলাফল বিবেচনা করে। অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে এমন কাজ বুঝায় যার সাথে মানুষের অর্থ-উপার্জন ও অর্থ ব্যয়ের সম্পর্ক থাকে। মানুষের যে সকল কাজ অর্থ-সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের সাথে জড়িত, অর্থনীতি সে সকল কাজ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু যে সকল কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না তা অর্থনীতির আলোচনায় স্থান পায় না। যেমন সন্তানের জন্য মাতা-পিতার স্নেহ ও সেবাযত্ন। এই একই কাজ যদি অর্থের বিনিময়ে কোন সেবিকার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, তাহলে তা অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তা অর্থনীতির পরিধিভুক্ত বলে গণ্য হবে।

অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। এটি সমাজবদ্ধ মানুষের কার্যাবলি আলোচনা করে। সমাজ-বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তির কার্যাবলি অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। এজন্য যে বা যারা সমাজহীনভাবে বসবাস করে, ধ্যানমগ্ন থাকে বা জনবিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করে, এমন লোকের কার্যাবলি অর্থনীতির আওতাভুক্ত নয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের বিভিন্ন কাজই অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয়। অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall) বলেন :

> 'অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া বিষয়টি ব্যক্তি ও সমাজের সে সকল কার্যক্রমও পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে, যেসকল কাজের মাধ্যমে গুণ ও কল্যাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীটি পাওয়া যায় ও ব্যবহার করা সম্ভব হয়।'[২]

'একটি সমাজের দেহে একটি সুষ্ঠু অর্থনীতির প্রবাহ একজন মানুষের শরীরে রক্তের প্রবাহের ন্যায়'- মানব সমাজে অর্থনৈতিক বিষয়াবলির ভূমিকার সম্ভবত সবচেয়ে সুস্পষ্টতম ব্যাখ্যা হচ্ছে এ ব্যাক্যটি। একথা ঠিক যে, অর্থনীতর

---

[১]. উৎ. ড. ইব্রাহীম খলিল, Bmj\‡g A_©e¨¯'v,ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ৩৪।

[২]. *'Political Economy or Economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of individual and social ation, which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisities of well-being'*- Prof. Alfred Marshall, *Principals of Economics* 1890.

সঠিক সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণের মতামতের অন্ত নেই। ড. জে এম কেইন্স (John Maynard Keynes) যথার্থই বলেছেন– ‘সংজ্ঞার ভারে অর্থনীতি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।’[৩]

তবে প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতির ইতিহাস মানবসভ্যতার মতই প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। কেননা, পৃথিবীতে প্রথম মানব-মানবীর আগমনকালীন দিন থেকে মানুষ খাদ্যগ্রহণ করেছে, পরিধেয় সংগ্রহ করেছে, থাকার জন্য নিরাপদ ঘর তৈরি করেছে এবং এ সকল সুখ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই তার এ সকল কাজ অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে গণ্য হয়েছে। মানব সভ্যতার সূচনা থেকেই মূলত অর্থনীতির যাত্রা শুরু। তবে সে যাত্রা স্বতন্ত্র শাস্ত্রীয় যাত্রা নয়। অর্থনীতির শাস্ত্রীয় যাত্রা আধুনিক অর্থে আরও অনেক পরে এসে। এ প্রসঙ্গে ড. আকবর আলি খান লিখেছেন :

> ‘সভ্যতার ইতিহাসে সুদীর্ঘ পটভূমিতে অর্থনীতি একটি অর্বাচীন শাস্ত্র। গণিত, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্র কমপক্ষে অর্থনীতির দু'হাজার বছর আগে জন্ম নিয়েছে। অ্যাডাম স্মিথের *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* বইটির প্রকাশনার তারিখ ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দকে সাধারণত অর্থনীতির জন্মলগ্ন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।’[৪]

মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহ ইতিহাস কাল জুড়ে, তাকে সমাজের অর্থনৈতিক ময়দানে টেনে এনেছে। চাহিদাসমূহ পূরণে প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন রকমের পণ্য ও ফসল উৎপাদনে পদক্ষেপ গ্রহণই অর্থনীতির বিকাশের মূলকথা। মানব চিন্তার পরিসর সুবিস্তৃত ও ব্যাপক এবং যেখানেই মানুষের প্রয়োজনের বিষয়টি সামনে এসেছে, সেখানেই ঐ প্রয়োজন পূরণকল্পে মানব মনে বিশেষ চিন্তা-চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষের এসব প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে যেসব উপায় খুঁজে পেয়েছে তার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান উপায় ছিল বিদ্যমান সম্পদরাজিকে কাজে লাগানো। আর এই মূলনীতিটিই অর্থনীতির বিষয়বস্তু তথা অর্থ-শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে।

অর্থনৈতিক মতবাদের বিবর্তন প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ ও বাস্তবতাসমূহ মানুষের চিন্তা-চেতনায় প্রভাব ফেলে এবং কোন সমস্যার ব্যাখ্যা কিম্বা সমাধানে তার চিন্তাকে জাগ্রত করে। অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহের মাঝে অমোঘ ও নিরঙ্কুশ সম্পর্ক ব্যাখ্যার নিমিত্তে মানব চিন্তার প্রয়াস থেকেই বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক তত্ত্ব জন্ম নেয়, যা একই পর্যালোচনা পন্থার অধিকারী ও একই মূলনীতির চক্রে আবর্তিত হয় এবং একটি অর্থনৈতিক মতবাদের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক অর্থনৈতিক মতবাদই সমাজে প্রচলিত একশ্রেণির মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং বিশেষ একগুচ্ছ কারণ ও নিয়ামকের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। একারণে অর্থনৈতিক মতবাদ তথা ধারাসমূহের বিচার বিশ্লেষণ করতে হলে ঐ মতবাদের উৎপত্তির নেপথ্য কারণ ও নিয়ামকগুলোর পর্যালোচনা না করে গত্যন্তর নেই। প্রত্যেক মতবাদই মানুষের প্রয়োজনসমূহ এবং সামাজিক বিশ্বাসসমূহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, যা কাল-পাত্রের পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং সময়ের পরিক্রমায় এর গুরুত্ব ও মূল্য লোপ পায়। অর্থনৈতিক মতবাদের উৎপত্তি, প্রসার এবং যুগ যুগ ধরে টিকে থাকা নির্ভর করে মতবাদটি চলমান সামাজিক সমস্যাবলির কতটুকু পরিমাণে সমাধান করতে পেরেছে, তার উপর। অ্যাডাম স্মিথ হলেন এমন একজন অর্থনীতিবিশারদ, যিনি অর্থ শাস্ত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। স্মিথের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির কারণ হচ্ছে তাঁর তত্ত্ব ও বিশ্বাসসমূহ তৎকালীন প্রয়োজনসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, যা ঐ যুগের সমস্যাবলি সমাধানে অনেক সাহায্য করেছে।

---

৩. *‘Political economy is said to have stragled itself with definitions’*- Dr. J. M. Keynes, *The General Theory of Employment and Money*, London: 1936.

৪. ড. আকবর আলি খান, ci_ciZ\i A_b\Z, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৫ (দ্বাদশ মুদ্রণ), পৃ. ৩৬।

কেইনস্ এর পরিস্থিতিও প্রায় স্মিথের মতই একই রূপ ছিল। তাঁর গ্রন্থাদি ও রচনাবলি তৎকালীন সমস্যাবলির সমাধানে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যখন ১৯৩৬ সনে তাঁর ‘¨ †Rbv‡ij w_Iix Ae Bgcøq‡g›U, B›Uv‡i÷ GÛ gwb (*The General Theory of Employment, Interest and Money*) প্রকাশিত হয়, তখন তৎকালীন শিল্পোন্নত বিশ্ব সবে এক মহা সংকটের মধ্যে দিয়ে পার হয়েছিল। কেইন্স এর গ্রন্থে সন্নিবেশিত সূত্রসমূহ শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের সেই বিপর্যস্ত অবস্থার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরতে সক্ষম হন।

1. A_bxwZ‡Z Av_-mvgwRK wPšÍvi wg_w¯'qv

মানবের সামাজিক জীবনে অর্থনীতি স্বাভাবিক যাত্রা শুরু করলেও প্রাচীন কাল থেকে ইতিহাসের পরিক্রমায় কয়েকটি অধ্যায় অতিক্রম করে আজকের উত্তরাধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল :[৫]

1. আদিম অর্থনীতি : আদিম অর্থনীতি শুরু হয় শিকারভিত্তিক অর্থনীতি দিয়ে। পরবর্তীকালে যা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে উন্নীত হয়।

২. মিশরীয় সভ্যতায় অর্থনীতি : খ্রিষ্টপূর্ব ১০,০০০ অব্দে নীলনদের তীরে এ অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। ধর্ম, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, বিজ্ঞান, কারুশিল্প এবং লিখন পদ্ধতি ছিল এ অর্থনীতির মূল উপজীব্য।

৩. মেসোপটেমীয় সভ্যতায় অর্থনীতি : খ্রিষ্টপূর্ব ৫,০০০ অব্দে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। মেসোপটেমীয় সভ্যতায় পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রকৃত বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪. সিন্ধু সভ্যতায় অর্থনীতি : মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষে সিন্ধু নদের তীরে গড়ে ওঠে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগর সভ্যতা। এখানকার নগর ও জীবনযাপনের ধারাবাহিকতা থেকে সিন্ধু সভ্যতায় একটি উড়ন্ত অর্থনীতির বিকাশের কথা কল্পনা করা হয়।

৫. গ্রিক সভ্যতায় অর্থনীতি : খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে উজিয়ান সভ্যতার পতনের পর গ্রিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও বিকাশের আধুনিক ধারা শুরু হয়। গ্রিকরাই প্রথম অর্থনীতিকে একটি শাস্ত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। যদিও প্রথমদিকে এটা (Oikonomia) গার্হস্থ্য পরিচালনা বিজ্ঞান নামেই পরিচিত ছিল সমধিক।

৬. ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাডাম স্মিথের *The Wealth of Nations* গ্রন্থটি প্রকাশের পর আধুনিক অর্থনীতির শাস্ত্রীয় পথ চলা শুরু হয়। এ সময়ে ইকোনোমিক্স কে বলা হত পলিটিক্যাল ইকোনোমিক্স। ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থনীতির নতুন নামকরণের চেষ্টা চলতে থাকে। হোয়াট্লে (Whately) অর্থনীতিকে ক্যাটালাক্টিস্ (Catallacties) তথা বিনিময়ের বিজ্ঞান, হার্ণ অর্থনীতিকে প্লাটোলজি তথা সম্পদের বিজ্ঞান এবং ইনাগরাম অর্থনীতিকে ক্রিমাটিস্টিক্স বা মুদ্রা তৈরির বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন। এসব নামকরণের চেষ্টা সত্ত্বেও পলিটিক্যাল ইকোনমি শব্দটি উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বহাল থাকে। এ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে পলিটিক্যাল ইকোনমি শব্দটির রূপ বদল হয় এবং এটি ইকোনোমিক্স নামেই সর্বজনগ্রাহ্যতা পায়।[৬]

---

[৫]. দ্র. ড. ইব্রাহীম খলিল, Bmjv‡g A_e¨e¯'v, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৬।

[৬]. দ্র. cv¸³, পৃ. ৩৫।

৭. ক্লাসিক্যাল তথা ধ্রুপদী অর্থনীতি : ক্ল্যাসিক্যাল শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন র্কাল মার্কস্। ডেভিড রিকার্ডো, জেমস্ মিল ও তাদের পূর্বসূরীদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে মার্কস্ ক্লাসিক্যাল বলে অভিহিত করেন। কেইন্সের হাতে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির আওতা প্রসারিত হয়।

৮. কেইন্সীয় অর্থনীত : কেইন্সীয় অর্থনীতির প্রতিষ্ঠাতা লর্ডজে এন কেইন্স হলেও তাঁর *General Theory of Employment, Interest and Money* শীর্ষক বিশ্বখ্যাত গ্রন্থখানা প্রকাশের পর বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ একে সম্বল করে অনেক নিবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাদের সমন্বিত চিন্তাধারায় কেইন্সীয় অর্থনীতির বিশাল সৌধ নির্মিত হয়।

৯. নব্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি ও যৌক্তিক প্রত্যাশাবাদ : ঊনিশ শতকের আশির দশকের (১৯৭১) গোড়া থেকে নিও-ক্ল্যাসিক্যাল রূপে একটি চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। এর নেতৃত্ব দেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট লুকাস এবং মিনেসোটা বিশ্বদ্যিালয়ের টমাস সার্জেন্ট। তাঁদের মতে, ব্যক্তি যুক্তিশীল এবং সে যুক্তিশীলতার মাধ্যমে বাজারে প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে। তার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান হতে পারে। তাদের তত্ত্ব যৌক্তিক প্রত্যাশার উপর নির্ভরশীল।

2. AvaywbK A_bxwZ‡Z BD‡iv‡ci Dìvb : †cÖÿvcU 15 †_‡K 18 kZK

অর্থনৈতিক ডকট্রিন ও মতবাদসমূহের ইতিহাস এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর এর প্রভাবের বিষয়টি অর্থনৈতিক চিন্তা ও দর্শনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক আচরণ এবং এগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণতি কি দাঁড়ায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদ বিকাশের যুগের একই সময়ে ইউরোপীয়দের উপনিবেশবাদী প্রচেষ্টার পথ ধরে তাদের উপনিবেশগুলোতে মার্কেন্টাইলিজম তথা বণিকবাদ-এর প্রকাশ ঘটে। এটা তাদের অনেক উপকারও করেছিল। এমনকি তাদের বিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নেও অনেক প্রভাব ফেলেছে। আজকের যুগে যেসব অর্থনৈতিক নীতিমালা পরিদৃষ্ট হয় সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই এ মতাদর্শ থেকেই উদ্ভুত।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে এবং ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে যখন মধ্যযুগের অবসান ঘটতে চলেছে তখন ইউরোপে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে যায়। এ পরিবর্তন একদিকে যেমন ছিল ক্রিস্টফার কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা মহাদেশ আবিস্কারের (১৪৯২ খ্রি.) এবং ভাস্কো-দা-গামা কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকা হতে হিন্দুস্থান অবধি নতুন জলপথ আবিষ্কারের (১৪৯৭ খ্রি.) প্রত্যক্ষ ফল, অপরদিকে তদ্রুপ ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ন্যায় বৃহৎ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক একতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফল। যারা সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন নতুন সম্রাজ্য করায়ত্ব করা এবং স্বীয় শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বরূপে প্রকাশ পেল এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নবতর রূপ দৃশ্যমান হয়ে উঠল। আটলান্টিক মহাসাগর জয় হওয়া এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের অভিমুখে জলপথ খুলে যাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নতুন মাত্রা লাভ করে। এসব অঞ্চল থেকে অনেক মূল্যবান সম্পদ ও ধাতব পদার্থ ইউরোপীয় দেশগুলোতে পাচার করা হয়। এ নতুন পরিস্থিতি এবং বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর পরস্পর অর্থনৈতিক স্বার্থের মধ্যে অসঙ্গতি ইত্যাদির কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন মতবাদ ও ধারণার উদ্ভব ঘটে। এগুলোকেই মার্কেন্টাইলিজম বলা হয়। এসব পরিবর্তন কেবল বাণিজ্য ও শিল্পেই শুধু নয়, বরং বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলে।

একারণে যেসব দেশ পশ্চিম সাগরের সাথে সংযুক্ত ছিল, যেমন স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ইত্যাদির অনুপ্রবেশ শক্তি বৃদ্ধি পেল। অপরদিকে ভূ-মধ্যসাগরের পতনের পর ইতালীয় প্রদেশসমূহের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে এবং বাণিজ্য ও সমর-অনুকূল সমুদ্র পথের মালিক থাকাটা তখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতার প্রধানতম নিয়ামকে পরিণত হয়। ফলে আর্মস্টার্ডাম, লন্ডন, লিসবন প্রভৃতির ন্যায় বন্দরনগরীগুলো এসময় আস্তে আস্তে জেনেভা, ভেনিস, আলেকজান্দ্রিয়া কিম্বা কনস্টান্টিনেপলের ন্যায় বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন বন্দর নগরীগুলোর স্থান দখল করে নেয়। আর ভূ-মধ্যসাগরের পরিবর্তে আটলান্টিক মহাসাগরই হয়ে উঠলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল রুট। একইভাবে বস্তুগত ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিগন্ত সম্প্রসারণ লাভ করে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির ভরবিন্দু স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এসব ঘটনাপ্রবাহ সামাজিক পুঁজিসমূহ ও ক্রমধারাকে অদল-বদল করে ফেলে এবং দুঃসাহিসকতা ও সওদাগারিত্বের আগুন উস্কে দেয়। যে দুনিয়া একদিন কৃষিকাজ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশাভিত্তিক জীবন জীবিকার উপর দণ্ডায়মান ছিল, সেখানে স্থান করে নিল বাণিজ্যিক কারবার ও শিল্প। এভাবে মনস্তাত্ত্বিক জগতে এবং রাজনৈতিক ও নৈতিকতার জগতেও ঘটে যায় গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক রদবদল। অর্থাৎ নতুন রাষ্ট্রগুলোর একক দৌরাত্ম্যপূর্ণ পরিকাঠামো সামন্তবাদের ধ্বংসস্তূপ থেকেই মাথা তুললো। আর এ নবতর জন্ম এতটা পরিমাণে মন-মানসিকতাকে কাঁপিয়ে দেয় যে লোকেরা অর্থনীতিকে নৈতিকতা থেকে আলাদা করে ফেললো এবং ন্যায় ইনসাফপূর্ণ মুনাফার মধ্যযুগীয় পন্থাকে দূরে ঠেলে দিল।

এসব কারণে ইউরোপে বণিকবাদের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। অর্থাৎ পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝে ইউরোপের শাসকরা এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। দামি দামি ধাতব পদার্থ স্তুপীকৃত করার মাধ্যমে জাতির সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধির বুনিয়াদের ওপরই এসব চিন্তা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ষোড়শ শতক অবধি অর্থনীতির স্বরূপ ছিল নৈতিকতা ও ধর্মাচার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু তখন থেকে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হল যে 'কীভাবে সম্রাটের সম্পদকে বৃদ্ধি করা যায়?' এ চিন্তা উৎপত্তি লাভ করলো যে সম্রাটের সম্পদশালী হওয়ার কেবলমাত্র জাতির সম্পদশালী হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। কাজেই পূর্বোক্ত প্রশ্নকে সংশোধন করা হল এভাবে- 'কীভাবে জাতিকে সম্পদশালী করা যাবে?'

অপরদিকে ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহের বদৌলতে প্রভূত সুযোগ ও সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেল। নতুন আবিষ্কৃত ভূমি অভ্যন্তরে মহামূল্য সম্পদরাজির প্রাপ্তি ইউরোপীয়দের অর্থনৈতিক জীবনের চেহারা পাল্টে দেয়। এ যুগে অনেক মানুষই অতীতের মানুষদের ন্যায় সমাজের পুরাতন রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন হতে নিজেকে মুক্ত করে ফেলে। তারা নৈতিকতাবাদীদের ভর্ৎসনা সত্ত্বেও বাড়াবাড়ির পথ অবলম্বন করে এবং অর্থ-সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা ও আসক্তিতে জড়ায়। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার অঙ্গনেও এ নতুন পরিস্থিতির প্রভাবে পরিবর্তন ঘটে যায় এবং রেনেসাঁ আমলের চিন্তার ভিত্তিতে সমাজে ব্যক্তির মৌলিকতা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিক অধিকার ও সংস্কৃতির বিস্তারের মাধ্যমে তাকে উচ্চতর করা পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে থাকে। এ কারণে এবং বিদ্যমান অবস্থার মূল্যায়নের প্রেরণা হতে ইউটোপিয়া তথা কল্পরাজ্য সম্পর্কে লেখার রীতি গড়ে ওঠে। অপরদিকে, তা সমাজের ব্যক্তিদের মাঝে ধর্মীয় সংস্কার, স্বাধীনতা ও মুক্তির চিন্তা এবং ব্যক্তিক দায়িত্বপরায়নতাকেও বিস্তৃত করল। সাধারণ প্রবণতাই এমন দাঁড়িয়েছিল যে, মনুষ্য বিবেক অর্থ-সম্পদ ও মুনাফাকামিতা হতে কোন ভয় করবে না। এরূপ চিন্তা সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে বণিক স্বভাব ও সওদাগরী প্রবণতাকেই পৃষ্ঠপোষকতা করতো।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্সে চিন্তাগত দিক থেকে উদারনৈতিক রাজনীতির প্রতি ঝোঁক প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়। ফলে তা একদিকে নতুন নতুন চিন্তা দর্শনের আবির্ভাবের এবং অপরদিকে সওদাগর সুলভ বিশ্বাসগুলো লোপ পাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

কয়েকটি কারণে ইউরোপে বণিকবাদের পতন ত্বরান্বিত হয়। যেমন চিন্তাবিদদের কর্তৃক এ মতবাদের কঠোর সমালোচনা, সওদাগরদের কর্তৃক সৃষ্ট চরম অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক ও মুক্তিকামী প্রবণতাসম্পন্ন চিন্তাধারার আবির্ভাব ইত্যাদি। এসব কারণ বণিকবাদের ক্রমপতন আর ফিজিওক্রাট নামক নতুন মতবাদের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করে। সওদাগরদের বিশ্বাসগুলো বিংশ শতকের অনেক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব রেখেছে এবং এ যুগের অনেক নীতিমালার ভিত্তি হিসাবে রূপান্তর লাভ করে। আর যেসব দেশ নিজেদের দেশে সম্পদ কুক্ষিগত করেছে এটাই অর্থনৈতিক সমস্যাবলির কারণ হয়েছে। মার্কেন্টালাইস্টদের ডকট্রিনকে স্বর্ণ ও রৌপ্য হস্তগত করার লক্ষ্যে টাকা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি ডকট্রিন বলে আখ্যায়িত করা যায়।

3. Bmjwg A_bxwZi BwZK_v

ইসলামি অর্থনীতির শিকড় প্রোথিত ইসলামের আবির্ভাবের প্রাথমিক যুগেই। হিজরি প্রথম শতক (খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক) এর শুরু থেকেই আমরা ধারাবাহিকভাবে এক দল মুসলিম মনীষীর সন্ধান পাই যারা সরকারি রাজস্ব, ব্যয়, ভূমি ব্যবস্থাপনা, বাজার, মুদ্রা ও মূল্য সঞ্চালনা ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিষয়াবলি নিয়ে কাজ করেছেন।

ইসলামি অর্থনীতির ইতিহাস সম্পর্কে যারা গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তা ও দর্শন প্রথম উত্থাপিত হয় ইবনে খালদুন কর্তৃক। তারা বলেন ইসলামি অর্থনীতির জ্ঞান ইবনে খালদুনের ন্যায় পণ্ডিতবৃন্দের থেকে কিংবা আরও পূর্বের চিন্তাবিদদের কাছ থেকে এসেছে। তারা এমনকি তুলনা করে বলেন যে অ্যাডাম স্মিথকে যে 'অর্থনীতির জনক' আখ্যা দেওয়া হয়, এটা ভুল। কারণ, তাঁর বহুকাল পূর্বে ইবনে খালদুন অর্থনীতি বিষয়ে মৌলিক চিন্তা ও দর্শনের অধিকারী ছিলেন। আমরা যদি ইসলামি প্রেক্ষিত থেকে অর্থনীতি শাস্ত্রের দিকে তাকাই তাহলে হয়ত এর অতীত ইতিহাসকে ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগের সাথে যুক্ত করতে সক্ষম হব। যে চিন্তা ও দর্শন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণীমালায় ও খোলাফায়ে রাশেদার অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতিমালায় বিদ্যমান ছিল। যদিও পরবর্তীকালে এসব নীতিমালার উপর আধুনিক রূপে যথাযথভাবে গবেষণা হয়নি।

খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নেজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকি[৭] ইসলামি অর্থনীতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসকে মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যথা :

১. ফাউন্ডেশন অধ্যায় : (প্রাথমিক যুগ থেকে ১০৫৮ খ্রি. পর্যন্ত) এ অধ্যায়ে ফকীহ্গণ, সুফিগণ এবং দার্শনিকগণ অর্থনৈতিক চিন্তা ও দর্শনে অবদান রাখেন।

২. দ্বিতীয় অধ্যায় : (১০৫৮-১৪৪৬ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় চার শতাব্দীরও অধিক কাল প্রলম্বিত) এ অধ্যায়ে মুসলিম পণ্ডিতগণ KiAvb এবং সুন্নাহর পাশাপাশি সমৃদ্ধশালী অর্থনৈতিক চিন্তা ও দর্শনের স্বাক্ষর রেখে যান।

---

[৭]. অধ্যাপক ড. এম. এন. সিদ্দিকি, বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ, ১৯৩১ সনে ভারতের গোরাখপুরে জন্ম। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি, বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং কিং ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার প্রাপ্ত।

৩. তৃতীয় অধ্যায় : (১৪৪৬-১৯৩২ খ্রি. পর্যন্ত বিস্তৃত)। এ অধ্যায়টি শুরু হয় যখন মুসলিম মানস অর্থনৈতিক চিন্তা ও দর্শনের অঙ্গনে স্থবিরতার কবলে পড়ে।

৪. চতুর্থ অধ্যায় : ১৯৩২ খ্রি. থেকে - চলমান[৮]

তবে এ অধ্যায়গুলোকে আরেকটু বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করলে ইসলামি অর্থনীতির ক্রমবিবর্তনের চিত্র নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

১. প্রথম অধ্যায় - গঠন যুগ (৬৩২ -৭১৮ খ্রিষ্টাব্দ) : এ অধ্যায়ে অর্থনীতির ধারণা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের অভ্যন্তরীণ উৎসাবলি অর্থাৎ KiA\b ও সুন্নাহ্ নির্ভর ছিল।

২. দ্বিতীয় অধ্যায় - অনুবাদ যুগ (খ্রিষ্টীয় ৮ -১১ শতক) : এ অধ্যায়ে পরদেশীয় অর্থনৈতিক চিন্তাদর্শনসমূহ আরবি ভাষায় অনুদিত হয় এবং মুসলিম মনীষীগণ অন্যান্য জাতির বুদ্ধি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে উপকার লাভ করার সুযোগ পান।

৩. তৃতীয় অধ্যায় - পুনঃঅনুবাদ ও স্থানান্তর যুগ (খ্রিষ্টীয় ১২-১৫ শতক) : যখন গ্রীকো-অ্যারাবিয়ান ইসলামি ধারণাসমূহ অনুবাদ এবং অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছায়।

৪. চতুর্থ অধ্যায় -অনুসরণ ও স্থবিরতা যুগ (খ্রিষ্টীয় ১৬ - ১৭ শতক) : এ যুগে নতুন অর্থনৈতিক ধারণার জন্ম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

৫. পঞ্চম অধ্যায় - জাগরণ ও গতি সঞ্চারণের যুগ (খ্রিষ্টীয় ১৮ - ১৯ শতক) : এ যুগে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে নতুন নতুন অর্থনৈতিক আবিষ্কার ও চিন্তার প্রতিধ্বনি উঠতে থাকে।

৬. ষষ্ঠ অধ্যায় - আধুনিক ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তা ও দর্শনের যুগ (খ্রিষ্টীয় ২০ শতক - চলমান)।

আধুনিক যুগকে আবার চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। যথা :

১. বিংশ শতকের প্রথম এক-চতুর্থাংশ কাল : এ সময়কালকে ‘pre-take off’ তথা উড্ডয়ন-পূর্ব কাল হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়, যখন আধুনিক ইনস্টিটিউশনসমূহের স্থাপন এগিয়ে যায়, ক্লাসিক্যাল মুসলিম আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলির উপর সম্পাদনা ও প্রকাশনার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয় এবং অনেক শীর্ষ নেতার আবির্ভাব ঘটে যারা সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ডাক দেন।

২. বিংশ শতকের দ্বিতীয় এক-চতুর্থাংশ কাল : এ সময়কালকে ‘take off’ তথা উড্ডয়নকাল বলা যেতে পারে। এ সময়ে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামের অর্থনৈতিক চিন্তা-দর্শন এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলির উপর লেখালেখি শুরু হয়।

৩. বিংশ শতকের তৃতীয় এক-চতুর্থাংশ কাল : এ সময়কালে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগই ইসলামি অর্থনীতির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটাকে বলা যেতে পারে ‘big-push’.

৪. বিংশ শতকের শেষ এক-চতুর্থাংশ কাল : এটা ছিল ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তা ও দর্শনের পুনর্গঠন এবং স্বীকৃতির যুগ।

---

৮. M.N. Siddiqi, *Islamic Economic Thought : Foundation, Evolution and Needed Direction*, in Abul Hasan M. Sadeq and Aidit Ghazali (eds.), Reading in Islamic Thought, Kuala Lulmpur, Longman, Malaysia, pp. 14-32.

সূচনাকাল থেকে আধুনিক সময়কাল অবধি বিভিন্ন অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সাথে ইসলামি অর্থনীতির মিথস্ক্রিয়া ও প্রভাব নিচের চিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করা যায় :[৯]

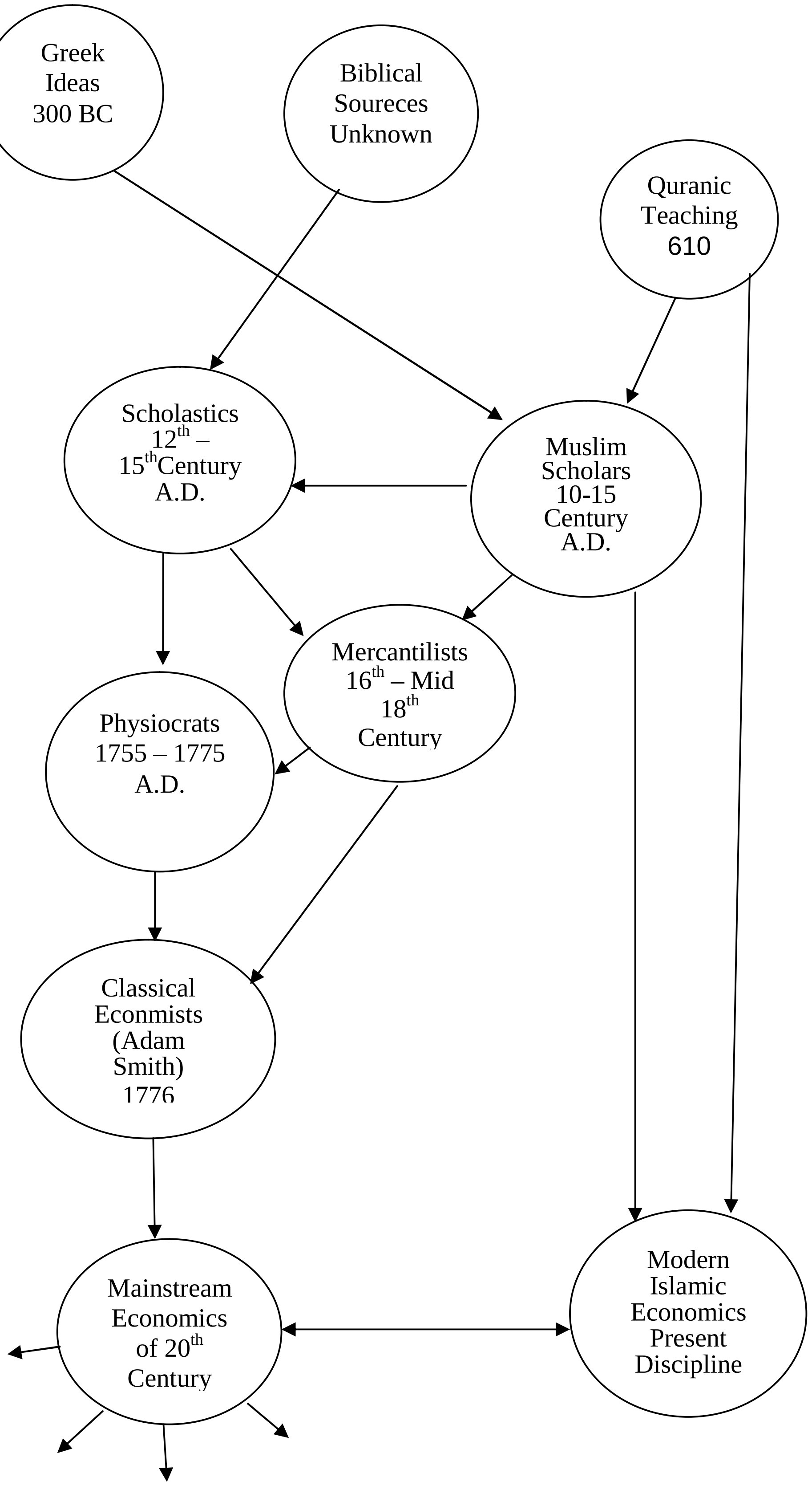

৯. সূত্র : Lowry (1987) *Pre Classical Economic Thought* Lowry (পৃ.৭৭)|

মজার ব্যাপার হল Joseph Schumpeter তাঁর *History of Economic Analysis* নামক এনসাইক্লোপেডিয়ার মধ্যে যে যুগটিকে অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার বিবর্তনের ক্ষেত্রে মহা শূন্যতা (Great Gap) বলে অভিহিত করেছেন, মুসলিম মনীষীদের অবদানের যুগটি ঠিক সেই যুগের সাথেই সম্পৃক্ত। যদিও বাস্তবতা হচ্ছে অর্থনীতিতে মুসলিমদের অবদান সাধারণভাবে অর্থনৈতিক চিন্তা-দর্শনের ইতিহাস সংক্রান্ত পশ্চিমা রেফারেন্সে পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতাই অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে গ্রীকদের অবদান থেকে স্কলাটিক্সদের অবদান কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচশ বছরের সময়কালকে মহা শূন্যতা হিসাবে ধারণা সৃষ্টির কারণ হয়।

এস এম গযনফার[১০] তাঁর *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করে বলেন : 'জোসেফ শুম্পেটার অযথাই ধরে নিয়েছেন যে এই অন্তবর্তীকালীন সময়কালটি ছিল নির্বীজন ও অনুৎপাদনশীল। বাস্তবতা হল মুসলিম সভ্যতা আর্থ-সামাজিক চিন্তাসহ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখতে সক্ষম হয় এবং ইউরোপের জ্ঞানালোক আন্দোলনের শিখাকে জোরদার করার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছিল। এমনকি স্বয়ং স্কলাস্টিক্সগণও মুসলিম মনীষীদের অবদান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হন। ইবনে সিনা (মৃ. ১০৩৭), ইবনে রূশদ্ (মৃ. ১১৯৮) এবং মাইমোনিড্স (Maimonides মৃ. ১২০৪) প্রমুখ মনীষীদের নাম ত্রয়োদশ শতকের সামা (summae)[১১] গ্রন্থাবলির পাতায় পাতায় শোভা পেত।[১২] বরং Todd Lowry এবইয়ের রিভিউ লিখতে গিয়ে মুখবন্ধের মধ্যে যথার্থই নির্দেশ করেছেন যে, অর্থনীতি বিষয়ে আরবীয় লেখনীসমূহের চরিত্র ও পরিশীলতা 'সাধারণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।'[১৩]

এটাও ঠিক যে মুসলমানরা নিজেরাও নিজেদের অবদানকে যথাযথভাবে প্রকাশ করার ব্যর্থতার জন্য দায়ী। যদিও পরবর্তীকালে কিছু কিছু মুসলিম লেখক স্বতন্ত্র লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম মনীষীদের অবদানকে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়েছেন।[১৪] এসব লেখনীর মধ্যে যাদের নাম চোখে পড়ে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু ইউসুফ (মৃ. ৭৯৮ খ্রি.), আবু হামিদ আল-গাযালি (মৃ. ১১১১ খ্রি.), ইবনে তাইমিয়্যা (মৃ. ১৩২৮ খ্রি.) ইবনে কাইয়্যেম (মৃ. ১৩৫০ খ্রি.) ইবনে হাম্বাল (মৃ. ৮৫৫ খ্রি.) আল-কিন্দি (মৃ. ৮৭৩ খ্রি.), আল-ফারাবি (মৃ. ৯৫০ খ্রি.), ইবনে হায্ম (মৃ. ১০৬৪ খ্রি.), আল-বিরুণি (মৃ. ১০৪৮ খ্রি.), কায়কাউস (মৃ. ১০৮২ খ্রি.), নিজাম-উল মুল্ক (মৃ. ১০৯২ খ্রি.), আবুল ফযল দিমাশকি (মৃ. ১১৭৫ খ্রি.), নাসির উদ্দিন আল-তুসি (মৃ. ১২৭৪ খ্রি.), ইবনে খালদুন (মৃ. ১৪০৬ খ্রি.), জালাল উদ্দিন দাভানি (মৃ. ১৫০১ খ্রি.) প্রমুখ।

---

[১০]. S.M. Ghazanfar, editor, *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*. London: Routledge/Curzon, 2003. xv + 284 pp. ISBN: 0-415-29778-8.

[১১]. স্কলাটিক্স দার্শনিকদের রচিত গ্রন্থাবলী।

[১২]. Josef Pifer, 'Scholasticism' in *Encyclopedia Britannica*, 1978, Vol. 16, pp. 356.

[১৩]. cÿ¸ ³, p. xi.

[১৪]. উদাহরণস্বরূপ অধ্যাপক গযনফার *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics* গ্রন্থে, আব্দুল আযিম ইসলাহি তাঁর *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (Feb 26, 2015)* গ্রন্থে, প্রফেসর হামিদ হোসাইনী তাঁর *Contributions of Medieval Muslim Scholars to the History of Economics and their Impact: A Refutation of the Schumpeterian Great Gap* গ্রন্থে এবং প্রফেসর এম নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে আর্থ-সামাজিক চিন্তা দর্শনের ক্ষেত্রে কতিপয় মুসলিম মনীষীর অবদানের বিবরণ উল্লেখ করেছেন।

3.1. Bmjvwg A_bxwZi AvawbK Kvj

ইসলামি অর্থনীতির আধুনিক যুগ শুরু হয় বিংশ শতকের আবর্তনের সাথে সাথে। যদিও দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করা হত যে আধুনিক ইসলামি অর্থনীতির উন্নয়ন শুরু হয় খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে। তবে ১৯০৪ সালে আলজেরিয়ার আব্দুল কাদির আল-মীযাবি এবং উমার বুরাইহিমাত রচিত ‘আল-মিরসাদ ফি মাসায়িল আল-ইক্‌তিসাদ’ (المرصاد فى مسايل الاقتصاد) শিরোনামে একটি গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে ইসলামি অর্থনীতির উন্নয়নের ইতিহাস দীর্ঘ কাল আগের সাথে যুক্ত।[১৫]

তারই ধারাবাহিকতায় কতিপয় মুসলিম গবেষক ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের উপর গবেষণা শুরু করেন অনেক পরে এসে, ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। যেমন ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সালিহ আরবি ভাষায় ‘আল ফিক্‌র আল ইক্‌তিসাদি আল আরাবি ফি কারনি আল খামিস আশার’ (الفكر الاقتصادى العربى فى قرن الخامس العشر) শিরোনামে রচিত তাঁর প্রবন্ধে ইবনে খালদুন (মৃ. ১৪০৬ খ্রি.), আল- দুলাজি (মৃ. ১৪৩৫ খ্রি.) এবং আল-মাকরিজি (মৃ. ১৪৪২ খ্রি.)-এর অর্থনৈতিক চিন্তাদর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আল-হাশিমি আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধটিও ছিল আরবি ভাষায় ‘আল আরা আল ইক্‌তিসাদিয়্যা লি আল বিরুনি’ শিরোনামে। ঐ একই বছরে (১৯৩৭ খ্রি.) সাইয়্যেদ মুবারিয আল-দ্বীন রিফাত উর্দু ভাষায় ‘মাআশিয়াত পার ইবনে খালদুন কি খেয়ালাত’ শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করেন। আর ইংরেজিতে সর্বপ্রথম “The Social and Political Ideas of Ibn Khaldun” শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন আব্দুল কাদির (১৯৪১ খ্রি.)। তদ্রূপ এ বিষয়ে সর্বপ্রথম মিশরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি প্রদান করা হয় নাশ’আত নাম্মী জনৈক গবেষককে ‘আল ফিক্‌র আল ইক্‌তিসাদি ফি আল মুকাদ্দিমা লি ইবনি খালদুন’ (الفكر الاقتصادى العربى فى المقدمة لابن خلدون) শিরোনামে তাঁর আরবি ভাষায় রচিত অভিসন্দর্ভের জন্য, ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনসমূহ গোটা মুসলিম বিশ্বে ইসলামি চিন্তাধারায় একটি স্বতন্ত্র রূপ প্রদান করে। তৎকালে এ যুক্তি উপস্থাপন আবশ্যক ছিল যে ইসলাম চেয়েছে মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে। আর সেটাই বরং পশ্চিমা পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা শাসিত হওয়ার চেয়ে উত্তম। ইসলামি অর্থনীতির কথা বিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রবলভাবে আলোড়িত হতে থাকে এবং ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ে। এর পেছনে কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ নিহিত ছিল। যেমন :

১. সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে মুসলিম দেশগুলোর একের পর এক স্বাধীন হওয়া। উদাহরণস্বরূপ ১৯৪৫ সালে ইন্দোনেশিয়া, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান এবং ক্রমান্বয়ে আলজেরিয়া, তিউনেসিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো, যারা ঐ সময়ে কয়েক দশকের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং স্ব স্ব অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোর কাজে মনোনিবেশ করে।

২. এ অধ্যায়েই বিশ্ব প্রচণ্ডভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য -এ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রাচ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে কার্ল মার্কসের শিক্ষাকে প্রচার ও প্রসার ঘটাতে থাকে। ধর্মীয় পণ্ডিতরা মার্কসীয় চিন্তা দর্শন ঘেঁটে দেখতে পান যে মার্কসের ধারণাগুলো ইসলামের পরিপন্থী। আর কমিউনিস্ট আদর্শকে গ্রহণ করতে হলে ধর্ম ও ইসলামকে ছেড়ে দিতে হয়।

---

[১৫]. Abdul A. Islahi, (2008). ‘Thirty Years of Research in the History of Islamic Economic Thought: Assesment and Future Directions.’ *Journal of Economic Theories*, 7(2) p 124.

৩. অপরদিকে পশ্চিমা যেসব দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু ছিল, তারা ১৯২৯-১৯৩৩ সময়কালের মহা সংকটের কবলে পড়ে, বেকারত্বের হার ভয়নক ভাবে বৃদ্ধি পায়, কারখানসমূহ দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এমন এক মহামন্দার শিকার হয় যা ব্যাখ্যা করার কিংবা যা থেকে উত্তরণের সাধ্য তার ছিল না। ধর্মীয় পণ্ডিতবর্গ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতেও রাজি ছিল না। কারণ এর মধ্যে সংকট বিদ্যমান থাকা ছাড়াও একটা সুদ নির্ভর ব্যবস্থা নিহিত, যা ইসলামে পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

৪. আরেকটি যে বিষয় মুসলমানদের কাছে চরম পীড়াদায়ক ছিল সেটা হল শ্রমিকশ্রেণির প্রতি সীমাহীন শোষণ ও বঞ্চনা। ইসলাম ন্যায়-ন্যায্যতা ও ইনসাফের ধর্ম। শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে ইসলামে কঠোর নির্দেশ রয়েছে। এমনকি শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অথচ পুঁজিবাদই হোক আর সমাজতন্ত্রই হোক - উভয় ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হল যে মালিকপক্ষ তথা বর্জুয়া শ্রেণি শ্রমিকদের হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের বিনিময়ে নিজেরা অঢেল সম্পদের মালিক বনে গেলেও শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধে অনীহা প্রদর্শন করে থাকে। তারা নানা ছলে বলে এবং বিভিন্ন আইনের ফাঁক ফোকর কাজে লাগিয়ে প্রকারান্তরে শ্রমিকদের প্রতি শোষণ ও বঞ্চনার নীতিই অনুসরণ করে থাকে। এটা মুসলমানদের নিকট ছিল নিতান্তই অসহনীয় যাতনার একটি বিষয়।

উপরোক্ত চারটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের নিজ শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এক ইতিবাচক অর্থব্যবস্থার প্রতি মুসলিম চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। বিশেষ করে ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম শতকগুলোতে ইসলামি সভ্যতার অভাবনীয় সাফল্যকে তারা এ অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ার সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ দেখতে পান।

উপনিবেশবাদ উত্তরকালে ৬০ ও ৭০ এর দশকের দিকে যখন পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা, বিশেষ করে পাশ্চাত্য অর্থনীতি বিস্তার লাভ করতে থাকে, তখন মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে হতে কয়েকজন ইসলামি চিন্তাবিদ সমসাময়িক অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সমাধানকল্পে ইসলামের একটি নিজস্ব দর্শনের আলোকে স্বতন্ত্র ইসলামি অর্থনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালান। তাদের রচিত ইসলামি অর্থনীতির উপর কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ খুবই প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। যেমন মুহাম্মদ তালেকানী রচিত Bmjvg Iqv wgjwKq¨vZ (XKÂt ! 3ãbi), আবুল হাসান বনি সদর রচিত BKwZmv‘-B ZvIwnw‘ (â ΘxDžğ,ä Kjü) এবং সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের সদর রচিত BKwZmv‘bv (ΰäbä Kjü)। তবে তাদের মধ্যে বাকের সদর বলতে গেলে এক হাতেই ইসলামি অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গতর ডকট্রিন উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। অবশ্য তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের রচনায় ইসলামকে এমন একটি ধর্ম হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যে ধর্ম সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং বঞ্চিত অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিশীল।

3.2. ev‡Ki m‘i I Zvi BKwZmv`bv

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের সদর BKwZmv‘bv গ্রন্থটি রচনা করেন প্রায় ৭০ বছর পূর্বে, ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে। তৎকালীন বিশ্ব দ্বি-মেরু বিভাজনের চরম পর্যায়ে বিরাজ করছিল। একদিকে ছিল পুঁজিবাদী শিবির। আর অপরদিকে ছিল কমিউনিজম তথা সমাজতান্ত্রিক শিবির। প্রতীয়মান হয় যে তিনি সেদিনকার প্রতাপশালী দুই অর্থ-ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামি অর্থনীতিকে তৃতীয় পথ হিসাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। বাকের সদর উক্ত অর্থ-ব্যবস্থাদ্বয়ের নিরপেক্ষ সমালোচনা উপস্থাপন করেছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর মূল চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল অর্থনীতির প্রশ্নে

পূর্ববর্তী মুসলিম ফকীহ্দের রায় ও অভিমতগুলোকে যাচাই বাছাই করা এবং নিজ মতামতের সাথে সন্নিবেশিত করে সুনিদ্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি অর্থনৈতিক ডকট্রিন উপস্থাপন করা।

বাকের সদরের পর্যালোচনাসমূহ যথার্থভাবে হৃদয়াঙ্গম করার জন্য স্বভাবতই যে কাজটি প্রয়োজন তা হল আজ থেকে কমপক্ষে ৭০ বছর পেছনে ফিরে যাওয়া। নিঃসন্দেহে আজকের মধ্যপ্রাচ্য তথা গোটা বিশ্বব্যবস্থা আর অর্ধশতক কাল আগের বিশ্বব্যবস্থা একরকম নয়। সেদিনকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছিল যে বিশেষ করে মুসলিম যুব-শ্রেণী প্রতাপশালী দুই বিশ্বব্যবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যকার চৈন্তিক দ্বন্দ্বের কবলে পড়ে অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কেননা, ধর্ম হিসাবে ইসলাম তাদের নিকট ছিল একটি বর্তমান কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিংবা ঐতিহ্যগত অথবা কিছুটা জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ধর্ম। অথচ এ ধর্ম তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম হচ্ছিল না।

পক্ষান্তরে, পুঁজিবাদ উদারনৈতিকতার পাদপীঠে দাঁড়িয়ে কার্যত দেখিয়ে দিয়েছিল যে তার কাছে প্রধানতম ও আকর্ষণীয় অনেক অর্জন রয়েছে। আবার তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের বিশাল এলাকায় জুড়ে বসতে সক্ষম হয়েছিল, কতিপয় অমুসলিম দেশেই শুধু নয়, অনেক মুসলিম দেশেও দল গঠন করে এবং কোথাও কোথাও ক্ষমতার স্বাদও আস্বাদন করতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ আফগানিস্তান ও ইয়েমেনের ঘটনাবলির দিকে ইশারা করা যায়।

মুসলিম দেশসমূহের যুবকরা পুঁজিবাদের ঐ কার্যত সফল ও চমকপ্রদ অর্থব্যবস্থা আর এই ক্রমবিস্তরণশীল সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, যা শ্রমজীবীদেরকে ন্যায় ও ইনসাফের দিকে আহ্বান জানায়, এদুয়ের মাঝে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। একদিকে উদারনৈতিকতাবাদ তাদের জন্য স্বাধীনতার বারতা প্রদান করছিল, যদিও ন্যায় আর ইনসাফের প্রশ্নে সে ছিল নীরব। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাদেরকে ন্যায় ও ইনসাফের দিকে আহ্বান করছিল। যদিও স্বাধীনতার ব্যাপারে সে ছিল নীরব কিংবা যৎসামান্যই মনোযোগী। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এরূপ পরিস্থিতিতে যে সকল যুবক স্বাধীনতার অন্বেষণ করে ফিরছিল, তারা পুঁজিবাদের দিকে আর যারা ন্যায় ও ইনসাফের অন্বেষণে ছিল, তারা সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়লো।

এরূপ এক পিচ্ছিল সামাজিক পরিস্থিতিতে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর একজন ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক হিসাবে পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ BKwZmv ‘bv রচনায় ব্রতী হন। তিনি চেষ্টা করেছেন যেন এ গ্রন্থটি তাঁর পাঠককে বলে যে প্রকৃতই সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে কি বয়ে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে তিনি উক্ত অর্থ-ব্যবস্থাদ্বয়ের সমালোচনা ও পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

বাকের সদর এ কাজকে সম্পন্ন করেছেন কোনরূপ বিদ্বেষ থেকে মুক্ত মানসিকতা থেকে। সমাজতন্ত্রীরাও একটি শ্রেণিহীন সমাজ ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে আহ্বান জানাচ্ছিল। পুঁজিবাদীরাও আহ্বান জানাচ্ছিল কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিকে। আবার এ দুটোই মানবের নিত্য প্রয়োজনের অংশ ছিল এবং মানুষ মাত্রই সহজাতভাবে এগুলোর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। একারণেই বাকের সদর তাঁর রচনায় সিংহভাগ জুড়ে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের চুলচেরা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। পুঁজিবাদের উপর তিনি অপেক্ষাকৃত কম এবং প্রয়োজন মাফিক সমালোচনা করেছেন।

বাকের সদরের আর্থ-সামাজিক দর্শনে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক দর্শনচিন্তার মধ্যকার আন্তঃসমালোচনা গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। তিনি ইসলামি অর্থনৈতিক মতাদর্শকে সামনে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু একই বিষয়ে অন্যদের পথ অনুসরণ করেননি। কারণ, প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়, যারাই ইসলামি অর্থনীতির উপর রচনাকর্মে অবতীর্ণ হন,

তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে অন্যদের সমালোচনার প্রতিই মনোনিবেশ করেন বেশি। তাদের রচনার শিরোনামে ইসলামি অর্থনীতি কথাটা শোভা পায় ঠিকই, অথচ অচিরেই পরিলক্ষিত হবে যে সেখানে কেবল অন্যদের সমস্যাগুলোই চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু ধর্ম আসলে কী বলেছে অর্থনীতি সম্পর্কে অর্থাৎ নেতিবাচক অবস্থান পরিহার করে অর্থনীতির উপর ইতিবাচক কথা বলার ক্ষেত্রে সেখানে তেমন ইশারা মেলে না। অধিকাংশ রচনার মধ্যে এই ধারাটি যেন একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাকের সদরের ক্ষেত্রে এটা ভিন্ন। বরং তিনি তাঁর চিন্তা গবেষণায় যখন অন্য মতাদর্শের সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন, সেখানে ধর্ম নিয়ে কথা বলেননি। এসব মতবাদে যে সমস্ত গ্রন্থাদি রয়েছে, সেগুলোই তিনি পাঠ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং ঐসমস্ত উৎসাবলির মধ্য থেকেই সমালোচনা করেছেন। এটা হল বাকের সদর এর BKwZmv‘bv গ্রন্থটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যা আজ বহু বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও অতুলনীয়।

বাকের সদর প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। আর একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। তিনি মনে করেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান ও নির্দেশনাসমূহ মানব কল্যাণে অগ্রগতি সাধন করবে। আর পশ্চিমা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় শ্রেয়তার পরিচয় দিবে, কারণ পশ্চিমা ব্যবস্থা কেবল বস্তুগত কল্যাণে নিয়োজিত।

4. Bmjvwg A_bxwZi cwiPq

ইসলামি অর্থনীতি বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিচয়ের অধিকারী। তবে এর মধ্যে প্রধানত চার ধরনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এ মর্মে বাকের সদরের বিশ্লেষণ জানার চেষ্টা করব। মুসলিম পণ্ডিতবৃন্দ ইসলামি অর্থনীতির যে চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিয়ে থাকেন সেগুলো হচ্ছে -

প্রথমত: ইসলামি অর্থনীতির দার্শনিক পরিচয় তথা ভিত্তিগত তাৎপর্য।

দ্বিতীয়ত: ইসলামি অর্থনীতির ফিকাহ্গত উৎসসমূহ।

তৃতীয়ত: ইসলাম অর্থনীতির আইনগত পরিচয়।

চতুর্থত: ইসলামি অর্থনীতির বিশ্লেষণাত্মক পরিচয়।

এ চার ধরনের পরিচয়ের প্রত্যেকটি বিবেচনায় নিলে ইসলামি অর্থনীতির অন্যান্য অর্থনৈতিক মতবাদের সাথে মৌলিক ও মজ্জাগত পার্থক্য ফুটে উঠবে। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হল।

Bmjvwg A_bxwZi ‘vkwbK (Z_v wfwËMZ) Zvrch

এ প্রসঙ্গে ভূমিকা হিসাবে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে অর্থনৈতিক সমস্যাবলি বিশ্ববীক্ষা ও আইডোলজিসমূহের ভিত্তিগত তাৎপর্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। যদিও অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক সমস্যাবলিকে বিশ্ববীক্ষা ও আইডোলজিসমূহের দার্শনিক ভিত্তি হতে পৃথক একটি বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের মতের বিপরীতে ক্রমান্বয়ে এ বাস্তবতা উপলব্ধ হয়েছে যে সমাজ ও মানুষরা যে বিশ্ববীক্ষা, আকীদা-বিশ্বাস ও তাৎপর্যে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে তা অর্থনৈতিক বিষয়াবলির উপর প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অর্থনীতিতে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা আকীদা-বিশ্বাসগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তিশীল। কিম্বা একশ্রেণির বিশ্বাসগত পূর্ব-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ

যখন অর্থনৈতিক মানুষের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তখন মানুষকে লাভ-লোকসান ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট তাৎপর্যের অধিকারী হিসাবে ধরা হয়। অতঃপর এ পূর্ব-ধারণার উপর ভিত্তি করে বহুল অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়, যেগুলো শুধু মানুষ সম্পর্কে একটি মতাদর্শের বিশ্ববীক্ষার সাথে সম্পর্কিত। বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিসমূহে এ বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট। সেখানে অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সাথে দার্শনিক সমস্যাবলির সম্পর্ক স্পষ্টভাবে উত্থাপন করা হয়েছে। অবশ্য যে রূপে তারা এগুলোকে উত্থাপন করেছে তা ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের সমালোচনার পাত্র হয়েছে। কিন্তু মূল সম্পর্কের ব্যাপারটি সঠিক। অর্থনৈতিক সমস্যাবলিকে দার্শনিক ভিত্তিসমূহ হতে পৃথক ভাবা যায় না এবং অর্থনৈতিক বিষয়-ব্যাপারে এমনকি অর্থনৈতিক ম্যাকানিজমসমূহে আকীদা-বিশ্বাসের কোন ভূমিকা নেই এটাও বলা যায় না। সকল অর্থনৈতিক সমস্যা আকীদা-বিশ্বাস ও আইডোলজিভিত্তিক তাৎপর্যের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত থাকে। সেসূত্রে ইসলামি অর্থনীতির দার্শনিক পরিচিতি তথা ভিত্তিগত প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয়ে যায়। অনিবার্যতই প্রত্যেক অর্থনীতিরই ভিত্তিগত ও দার্শনিক সূচক থাকে এবং দার্শনিক ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান থাকে। এমনকি যেসব অর্থনীতি নিজেদেরকে আইডোলজি বিযুক্ত হিসাবে উত্থাপন করতে চায় (যেমন পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা) সেগুলোও একশ্রেণির ভিত্তিগত তাৎপর্যের উপর দণ্ডায়মান রয়েছে, যেগুলো সর্বসম্মত পূর্ব-ধারণা হিসাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। পুঁজিবাদ স্বাধীনতা ও প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে যেসব কথা বলে থাকে, সেগুলো আসলে তাদের বিশ্ববীক্ষা, নৃ-বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ভিত্তিগত তাৎপর্যসমূহ, এমনকি অর্থনৈতিক গবেষণাসমূহেও যেখানে অর্থনৈতিক প্রকৌশল ও অর্থনৈতিক বিজ্ঞান হিসাবে দার্শনিক ভিত্তি হতে পৃথক রূপে উত্থাপন করার চেষ্টা করা হয়, সেখানেও নিহিত থাকে। অবশ্য একথার অর্থ এটা নয় যে, অর্থনৈতিক গবেষণার কথা যেটা তারা বলে থাকে, সেটা কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা নয়। খোদ্ ঐ গবেষণাটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ঠিকই, কিন্তু সেটা দার্শনিক ও বিশ্ববীক্ষাগত পূর্ব-ধারণা ও তাৎপর্যসমূহের উপর দণ্ডায়মান। আর এসব তাৎপর্য উক্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কার্যকারিতা ও শুদ্ধতা-অশুদ্ধতায় প্রভাব ফেলে।

সুতরাং এসব ভিত্তিগত তাৎপর্যসমূহ হচ্ছে যে কোন অর্থব্যবস্থার সূচকস্বরূপ। কোন অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের সময় এগুলোকে উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের ভেতরকার সমস্যাবলি যেন এ সূচক থেকে পৃথক করে দেখা না হয়। বিশেষ করে যখন দেখব যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে এসব তাৎপর্য, আকীদা-বিশ্বাস ও বিশ্ববীক্ষার প্রভাব অর্থনৈতিক ম্যাকানিজম, অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাসমূহ ও অর্থনৈতিক কার্যকারণ সম্পর্কসমূহের প্রভাবের তুলনায় অনেক বেশি।

উপরের পর্যালোচনাটুকু উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য এটা বলা যে ইসলামি অর্থনীতির দার্শনিক তথা তাৎপর্যগত পরিচিতি অর্থনৈতিক তাৎপর্যের বহির্ভূত কোন আলোচনা নয়। বরং এটা হল ইসলামি অর্থনীতির পরিচয়সত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য স্তম্ভ এবং অন্য যে কোন অর্থনৈতিক মতবাদ হতে একে পার্থক্যকারী। ইসলামি অর্থনীতির দার্শনিক পরিচয়ের তিনটি প্রধান সূচক হচ্ছে-

১. ইসলামি অর্থনীতি একত্ববাদী বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনীতি হচ্ছে মানব সমাজে ও ইতিহাসে স্বাধীনতা ও চলাচলের অংশবিশেষ। অর্থাৎ অর্থনীতি, মানুষের সেবায় নিয়োজিত। মানুষ অর্থনীতির সেবায় নয়।

৩. ইসলামি অর্থনীতি একদিকে যেমন বাস্তবমুখী, অপরদিকে তেমনি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও নৈতিক নিয়মাবলি সমৃদ্ধ।

অবশ্য ইসলামি অর্থনীতির দার্শনিক পরিচিতিটা এ তিনটি সূচকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও হতে পারে। অধিকতর চিন্তা ও অনুধ্যান করলে হয়ত আরও কিছু সূচক চিহ্নিত করা সম্ভবপর হবে। আপাতত উল্লিখিত তিনটি সূচকের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল :

প্রথম সূচকটি হল ইসলামি অর্থনীতি একত্ববাদী বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা বাকের সদরের সামাজিক চিন্তা বিশ্লেষণের সময় পর্যবেক্ষণ করেছি যে তিনি কতটা একত্ববাদী সমাজব্যবস্থার উপর জোরারোপ করেছেন। তিনি মনে করেন, একজন মুসলমানের একত্ববাদ এবং এ থেকে উৎসারিত মূলনীতিসমূহের প্রতি বিশ্বাসই হচ্ছে তার বিশ্ববীক্ষা। অন্যকথায় বলা যায়, তার একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষা অর্থনৈতিক বিষয় ব্যাপারে অসামান্য প্রভাব ফেলে থাকে এবং মানুষদের ও মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষার অর্থনৈতিক ভূমিকা রয়েছে এবং তা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর প্রত্যক্ষভাবে ছায়াপাত করে থাকে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিজের পথে চালিত করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষার অধিকারী মানুষ হিসাবে একজন মুসলমানের আল্লাহ্ ও সমাজের সামনে জবাবদিহিতা রয়েছে। মানুষ যে আল্লাহ্র সামনে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করবে, এটা তার সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন উৎপাদন, বিতরণ ও ভোগের সময় নিজের দায়িত্বের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিবে। ফলে তার এ জাতীয় কর্মতৎপরতা তার দায়িত্বের জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে। অথচ একটি নাস্তিক্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেখানে মানুষ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না, সেখানে মানুষ বিশ্বাস করে যে শুধু সে নিজেই আছে। তার কাছে এ গোটা দুনিয়া ও তার সমস্ত অস্তিত্বজুড়ে কেবল ভরে আছে বস্তুবাদ ও জড়বাদিতা। এরূপ ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টিভঙ্গি হবে অন্যরকম। অথচ এই মানুষটাই যদি একত্ববাদী হয় এবং আল্লাহ্ ও সমাজের সামনে তার জবাবদিহিতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করে, তাহলে অবধারিতভাবে তার জীবনধারা বদলে যাবে। তখন এ আকিদা-বিশ্বাসের প্রভাব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর এবং সম্পদ উপার্জন ও ভোগের ধরন-পদ্ধতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর খুবই দৃশ্যমান হবে। সামাজিক ন্যায়বিচার, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক বীমা, দান-অনুদান ইত্যাদি আলোচনাগুলো এ মূলনীতির ওপরেই গড়ে ওঠে।

ciKv‡j wekvm

একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষায় একটি অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস। পরজগত, যা ইহ্জগতের চেয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ এবং যে জগত চিরন্তন। এরূপ বিশ্বাস অনেকগুলো সামাজিক বিষয় ও সমস্যা সমাধানে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরজগতে বিশ্বাস করা ইসলামের একটি মৌলিক আকিদা। এ আকিদার কারণে মানুষের নিকট লাভ, লোকসান, ব্যবসা, উৎকর্ষতা, মুনাফা ইত্যাদি পরিভাষাগুলোর অর্থই বদলে যায় এবং এগুলোর দৃষ্টান্তের আওতা বৃদ্ধি পায়। তখন এরূপ মানুষের কাছে কেবল পার্থিব লাভ-লোকসানই বড় হয়ে দেখা দেয় না। কেননা, তার দৃষ্টিতে ইহজগতের সাথে আরেকটি জগতের কথা ভেসে ওঠে যার প্রতি তার প্রগাঢ় বিশ্বাস রয়েছে। সে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে যে পার্থিব জীবনে সে যা কিছু দান করবে, পারলৌকিক জীবনে তার দশগুণ বেশি সে লাভ করবে। এটা এমন একটি বিষয় যা সম্পর্কে KiAv‡bi মধ্যে একাধিক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ যখন বান্দাদের সাথে সামাজিক ন্যায়বিচার, সামাজিক নিরাপত্তা, যাকাত, সেবা, অনুদান, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলতে চান তখন সবসময় এ সূত্রটি স্মরণ করিয়ে দেন। অতঃপর ঘোষণা করেন ‘এটাই হল উৎকৃষ্টতর ব্যবসা’। যদিও এ পৃথিবীতে কিছু সে হারায়,

কিন্তু পরজগতে এর বিনিময়ে যা সে পাবে, তা অনেক বেশি। আর এ লাভ হবে প্রকৃত মুনাফা, যা বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার ধারণার মত নয় যে মুনাফা বলতে কেবল পার্থিব ও ইহজাগতিক মুনাফাকেই জানবে।

অনুরূপভাবে কোন জিনিস কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত হওয়ার বিষয়টিও একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষায় বদলে যায়। একটি বিশ্বাসী সমাজে কাম্যতা বলতে অনর্থক ক্রীড়া ও ফূর্তিবাজি আর মুনাফা কামিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এরূপ সমাজে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দৃষ্টান্ত অতিশয় মূল্যমান ও উৎকৃষ্টতা সম্পন্ন হয়, যা সবই পরজগতে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। লাভ-লোকসানের উদাহরণ ও তাৎপর্য কেবল পরকালের প্রতি বিশ্বাসের জায়গা থেকে নিরূপিত হয়।

একত্ববাদ এবং এর মূলনীতি হতে যা কিছু শাখা-প্রশাখা বের হয় এবং ধন-সম্পদ সম্পর্কে একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষা যে শিক্ষা আমাদের জন্য উপস্থাপন করে, তা সম্পদের সাথে মানুষের সম্পর্ক সংজ্ঞায়নে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন আমরা সম্পদের প্রতি কোন্ চোখ দিয়ে তাকাব এবং সম্পদের মুনাফার সীমা কতদূর পর্যন্ত হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়গুলো নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। অন্যান্য বিশ্ববীক্ষা মানুষের সাথে সম্পদের সম্পর্ক এবং সম্পদের মুনাফার সীমা-পরিসীমার ব্যাপারে যে সব সংজ্ঞা উপস্থাপন করে তার সাথে ইসলামি বিশ্ববীক্ষার সংজ্ঞায় ঢের পার্থক্য রয়েছে।

ab-m¤ú‘ Rx‡bi D‡Ïk¨ bq, DcKiY

ইসলাম ধন-সম্পদকে مل الله তথা আল্লাহ্র মাল বলে মনে করে। তাই ইসলাম মানুষের মনের মধ্যে এ মৌলিক শিক্ষাকে গেঁথে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা চালায় যে ধন-সম্পদ তোমাদের নয়, সবই আল্লাহ্র। তিনিই এটা তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন আপন করুণায়।[16] 'মালুল্লাহ' (مل الله : আল্লাহ্র সম্পদ), রিযকুল্লাহ্ (رزق الله : আল্লাহ্র রিযিক) ইত্যাদি পরিভাষাগুলো মানুষদের ধন-সম্পদের প্রসঙ্গে A\j-KiA\‡b ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ KiA\b চায় ধন-সম্পদের প্রতি মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গিটা উপকরণ সর্বস্ব হবে। কখনই যেন ধন-সম্পদ তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না হয়। একজন একত্ববাদী মানুষের নিকট ধন-সম্পদের অর্থ প্রতিভাত হয় একটি উপকরণসামগ্রী তথা মাধ্যম হিসাবে। এমন এক উপকরণ যা স্বয়ং আল্লাহ্ তার হাতে অর্পণ করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে যার সত্ত্বাধিকারী হচ্ছেন স্বয়ং তিনিই। ধন-সম্পদ প্রশ্নে তাই একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষার অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে মনেপ্রাণে এ বিশ্বাস লালন করা যে সম্পদ সবই আল্লাহ্র, রিযিক-রুযিও সবই আল্লাহ্র। আর আমাদের প্রতি এগুলো তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ মাত্র।

ধন-সম্পদের প্রতি এরূপ বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে নিজেই ইসলামি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে উচ্চতর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা প্রদানকারী অর্থনীতি গড়ে তুলতে জোরালো অবদান রাখে। ইসলাম সম্পদ ভোগ করার বিষয়টিকে এমনভাবে আলোকপাত করে, যার মধ্যে আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, যাকাতের ক্ষেত্রে ইসলামের ভাষ্য হচ্ছে : 'ওদের সম্পদ হতে সদ্কা গ্রহণ করবে, এর দ্বারা ওদের পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।'[17] এখানে সদ্কাকে সম্পদ ও মানুষকে পবিত্র ও পরিশোধন করার মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অথচ আমরা যদি বস্তুবাদী দর্শনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি যে যাকাত মানে কি? কিম্বা পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা কি? নিশ্চয় কোন উত্তর নেই। বরং যখন সম্পদের এক-চল্লিশাংশ কর্তন করা হবে তখন সেখানে এর পুরোটাই

---

১৬. 'আর তাদেরকে দান কর আল্লাহর সম্পদ থেকে, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন।' ÑA\j KiA\b, নূর: ৩৩।

১৭. خذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -A\j-KiA\b, তাওবাহ্ : ১০৩।

ক্ষতি বলে বিবেচিত হবে। এর মধ্যে পবিত্রতার কি রয়েছে? কারণ, সেখানে অর্থনীতি যে মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা দান-খয়রাতের অনুকূল নয়। দান-খয়রাতের জন্য প্রয়োজন স্বার্থহীন মানসিকতা। কিন্তু বস্তুবাদী অর্থনীতির পূর্বানুমান হচ্ছে 'সকল মানুষই স্বার্থপর'। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু রেখেছে। অ্যাডাম স্মিথের ভাষায় :

> 'আমরা কসাই, শুঁড়ি বা রুটিওয়ালার বদান্যতা হেতু আমাদের আহার প্রত্যাশা করি না, তারা তাদের স্বার্থেই খাদ্য সরবরাহ করে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি না, বরং তাদের স্বার্থপরতার উপর নির্ভর করি, কখনও আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বরং তাদের সুবিধার কথা বলি।'[১৮]

এ ধরনের স্বার্থপর অর্থব্যবস্থায় দান-খয়রাত হচ্ছে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আচরণ। পরকালের ভয়কেই তাই এক পর্যায়ে দান-খয়রাতের একমাত্র কারণ গণ্য করা হত। কিন্তু ইসলাম এসব শিক্ষা ও ইঙ্গিত দ্বারা অর্থনৈতিক বিষয়াবলির ওপর আকিদা-বিশ্বাসের প্রভাবকে মানুষের মনে সংরক্ষণ করতে চায়।

b¨vq-Bbmvd

ইসলামের আরেকটি মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে 'ন্যায়-ইনসাফ।' কেবল দর্শনের দিক দিয়ে ইসলামে এ ন্যায়-ইনসাফ গুরুত্বপূর্ণ তা নয় যে বলব আল্লাহ ন্যায়পর। বরং এ দর্শনের প্রেক্ষিতের একটি সামাজিক নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্‌র ন্যায়পরতায় বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ন্যায়পরতার স্থান ও মূল্য এবং মানুষের সর্ববিষয়ে ন্যায়বিচার বজায় থাকা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আসলে মানুষ এ বিশ্বাসের ছায়াতলে সঠিক দীক্ষা লাভ করতে পারে। ন্যায়পরতা একটি পবিত্র লক্ষ্য ও একটি নিরঙ্কুশ মূল্যবোধ হিসাবে সৃষ্টির নিয়মের একটি অকৃত্রিম পরিচয় তুলে ধরে, যে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। এ নিয়ম অনুসারে মানুষদেরও উচিত ব্যক্তি ও সমাজ জীবনাচারে বিশেষ করে স্বীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ন্যায়নীতিকে বজায় রাখা।

অর্থনীতির ওপর একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষার আরেকটি মৌলিক প্রভাব হচ্ছে ক্ষমতা ও সম্পদের মহলসমূহের মধ্যে কোন বিশেষত্বকে নাকচ করা। সেটা ব্যক্তি পর্যায়েই হোক আর সামাজিক পর্যায়েই হোক। যে কোন স্বেচ্ছাচারী ও ক্ষমতাশালী মহলের দাসত্বকে নাকচ করা প্রত্যেক বিশ্বাসী মানুষের একটি অন্যতম মূলনীতি। একত্ববাদের মূলনীতি থেকেই তা উৎসারিত হয়। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসম্পন্ন শাসনের পথ ধরেই সমাজের শাসন ও নেতৃত্ব সুযোগ্য লোকদের হাতে পৌঁছায়, যে লোক নিজের মধ্যে এই মূল্যবোধগুলোকে সর্বাধিক লালন ও বাস্তবায়ন করে থাকবে। এই বৈপরীত্য বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান। এখন আমরা এ মর্মে বাকের সদরের পর্যালোচনা জানার চেষ্টা করা যাক।

5. ev‡Ki m'‡ii chv‡jvPbv

বাকের সদর তাঁর কিছু কিছু অর্থনৈতিক আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষা ব্যতীত কোনক্রমেই সামাজিক বিরোধসমূহ সমাধানের সক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।

---

[১৮]. *'It is not from the benevolence of he butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from the regard of their own interest. We address ourselves not to their humanity but to their self-love and never talk to them of our necessities but of their advantage.'* – Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*- a selected Edition, Sutherland, Kathryn, ed., (Oxford University Press, 1993) Book-I, Chapter II, p. 22.

সামাজিক বিরোধসমূহের সমাধান একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কখনো আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে একটি বিশ্ববীক্ষার মৌলিকতার প্রসঙ্গটি। অর্থাৎ বিশ্ববীক্ষাটি কি সঠিক নাকি সঠিক নয়? এটা যে একটি মূল্যবান 'আলোচনার বিষয়' -তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ আলোচনার জায়গা অর্থনীতিতে নয়। আবার কখনো আলোচনার বিষয়বস্তু হয় বিশ্ববীক্ষার 'কার্যকারিতা' নিয়ে। তিনি দাবি করেন, সামাজিক বিরোধসমূহ সমাধানে একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষাই সর্বাধিক কার্যকর। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাসী না হবে, যুক্তিগত দিক দিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক বিরোধসমূহের সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। যে মানুষের বিশ্বাস বস্তু ও পার্থিবজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তার কাছে সমাজ ও অন্য মানুষদের জন্য নিজের স্বার্থ বিলিয়ে দেওয়ার মতো কাজের কোন অর্থ থাকে না। সামাজিক সমস্যাবলি সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তিস্বার্থ ও পরের স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ দ্বন্দ্ব ও বিরোধ প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতাজনিত কারণে সৃষ্টি হোক, অথবা বিদ্যমান সামাজিক সুবিধাসমূহের অপ্রতুলতাজনিত কারণে অথবা অন্য কোন কারণে হোক- তাতে কোন পার্থক্য নেই। আমরা চাই আর না চাই- এসব সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। একজন ব্যক্তি যার ক্ষমতা বা অর্থ-সম্পদ রয়েছে সে নিজের জন্য অধিক থেকে অধিকতর সুবিধা ও স্বার্থ আদায় নিশ্চিত করবে। অনিবার্যত তার এ স্বার্থ নিশ্চিত করার নিমিত্তে তাকে অন্যদের স্বার্থের বিপরীতে দাঁড়াতে হবে এবং অন্যের সুবিধা ও স্বার্থকে হরণ করে তবেই তার নিজের স্বার্থের সাথে যোগ করতে পারবে। এভাবে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাকের সদর মনে করেন, যখন ব্যক্তি স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ থাকবে এবং যে কাজই ইচ্ছা সেটাই করতে পারবে, তখন এ সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে সে তার সমুদয় বস্তুগত সুযোগ কাজে লাগিয়ে বেশি বেশি সম্পদ সংগ্রহ ও জমা করতে প্রয়াসী হবে। এর ফলে আধিপত্যবাদের জন্ম হয়। অর্থনৈতিক শোষণ আর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদসহ শ্রেণিবৈষম্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং পেশিশক্তির বড়াই ইত্যাদি সবকিছুই তখন একের পর এক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়। কিন্তু বাকের সদরের প্রশ্ন হচ্ছে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে কীভাবে?

কারণ তিনি দেখেছেন, পুঁজিবাদী ব্যাখ্যায় এ বিরোধের জন্য দায়ী করা হয় সম্পদের অপ্রতুলতাকে। অথচ সত্যিই যদি এ সমস্যা সম্পদের ঘাটতিজনিত কারণে উদ্ভূত হয়ে থাকে তাহলে তো উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজে নিজে তা দূর হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। একারণে তিনি এটাকে একটি কল্পনাপ্রসূত ও অবাস্তব ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করেন। কেননা এটা প্রমাণিত যে, মানুষের ক্ষমতার মোহ ও চাহিদার কোন শেষ নেই এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ আকাঙ্ক্ষা কখনই মিটবে না। বরং যতই উৎপাদনের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে ততই মানুষের সম্পদ জড়ো করার স্পৃহাও বেড়ে যাবে। আর মুনাফা ও ক্ষমতার লিপ্সা এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ততই বৃদ্ধি পাবে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান তো হবেই না, উপরুন্ত সমস্যা আরো বেড়ে যাবে। ফলে অর্থনীতি তার প্রথম অবস্থা থেকে বের হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের চরিত্র ধারণ করবে।

অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চেষ্টা করেছে উৎপাদন সামগ্রীর উপর থেকে ব্যক্তি মালিকানা উঠিয়ে দিয়ে এবং সবর্জনীন অর্থব্যবস্থা প্রর্বতনের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করতে। তারা মনে করেছে মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার ছায়াতলে কোন এক উপায়ে মানুষদেরকে স্বার্থবাদিতা ও মুনাফা লিপ্সার প্রবণতা থেকে ফিরিয়ে এনে এমন সব ব্যক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হবে যারা ব্যক্তিস্বার্থ নয়, বরং সামষ্টিক স্বার্থের পেছনে ছুটবে। তাদের মতে, মার্কস্‌বাদী বিশ্ববীক্ষার মাধ্যমে মানুষ এমনভাবে দীক্ষিত হবে যাতে সে সামষ্টিকপ্রবণ হয়, ব্যক্তিপ্রবণ নয়। এর ফলে প্রত্যেক মানুষই ক্রমান্বয়ে নিজের অস্তিত্বকে সমাজের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন করে দিবে। কিন্তু বাকের

সদরের মতে, এ দাবিটি বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার কাঠামো অনুযায়ী যেমন অবাস্তব, তদ্রূপ অযৌক্তিকও বটে। মানুষ যখন আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী না হবে, তখন মানুষ নিজেকে সমষ্টির মধ্যে বিলীন করে দিবে অথবা পরের জন্য নিজের স্বার্থকে বিলিয়ে দিবে- এহেন দাবি যুক্তির দৃষ্টিতে নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য ও অমূলক।

বরং মানুষ যখন বিশ্বাস করবে যে তার জীবন এই বস্তুগত জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তখন আরেক ধরনের মূল্যবোধ, সুখানুভূতি, কামনা ও চাহিদা তার সামনে খুলে যাবে এবং ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যাবে। আর তখনই কেবল ব্যক্তিস্বার্থ ও সামষ্টিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব দূর হওয়া সম্ভব। কেননা, তখন ব্যক্তি বৃহত্তর সামষ্টিক স্বার্থের কারণে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে ছেড়ে দিতে রাজি হবে। আর সে এ কাজটি করবে পরজগতে আরও বৃহত্তর স্বার্থ ও মুনাফা অর্জনের খাতিরে। অর্থাৎ সে এখানে ত্যাগ স্বীকার করবে বিনিময়ে আরও বেশি পাওয়ার আশায়। এটাই এক ধরনের স্বার্থবাদী চিন্তা বটে। কাজেই কার্যত এর মধ্যে তার ব্যক্তিস্বার্থের কোন বিসর্জনের প্রশ্নও নেই। তাই যুক্তির মাপকাঠিতে এটা ব্যাখ্যাযোগ্য হয়। কেননা সে জানে যে, আজ যদি সে দান করে, কাল এর দশগুণ পাবে। এমন এক 'কাল', যা তার বিশ্ববীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, কোন কাল্পনিক 'কাল' নয়। ফলে সে তার সীমিত বস্তুগত ও দৈহিক স্বার্থ ও সুখকে এক উচ্চতর স্বার্থ ও সুখের সাথে তুলনা করে নেয় এবং দেখতে পায় যে ঐ মুনাফা এই মুনাফার ওপর অগ্রগণ্য ও শ্রেয়তর। অনিবার্যতই এটা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তি-মুনাফা লিপ্সার মূলনীতি, যা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগত মূলনীতিও বটে এবং যা অবদমনযোগ্য নয়। কিন্তু মানুষ এক্ষেত্রে নশ্বর পার্থিব মুনাফার ওপর অবিনশ্বর পারলৌকিক মুনাফাকে অগ্রগণ্য করে থাকে। তখন অনায়াসেই সে সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের ওপর প্রাধান্য দিতে পারে।

বাকের সদর দাবি করেন, এভাবে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ চুকে যায়। অন্যকথায় বলা যায়, ব্যক্তির জন্য সামাজিক স্বার্থ ও কল্যাণ মেনে চলা আসলে তার পারলৌকিক মহাপ্রাপ্তি এবং সেখানে অধিকতর লাভবান হওয়ার ভূমিকাস্বরূপ। অন্যান্য মতাদর্শ ও জীবনব্যবস্থার দুনিয়াকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষায় এরূপ হিসাব নিকাশের সুযোগ নেই। একারণে সেখানে সর্বদা ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ থাকে। অথচ এ বিরোধ একত্ববাদী বিশ্ববীক্ষায় সহজে নিরসনযোগ্য। আর ইসলামি সমাজের ইতিহাসের বহির্জাগতিক বাস্তবতায় এ সত্য প্রমাণিত।

6. e¯ev‘x wekexÿvi mv‡_ Bmjwg wekexÿvi cv_K¨

মানুষ ও ইতিহাসে তার গতির ব্যাখ্যায় অন্যান্য বিশ্ববীক্ষার সাথে ইসলামি বিশ্ববীক্ষার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক মতাদর্শগুলো চেষ্টা করেছে মানুষ থেকে এমন এক প্রাণীসত্তা তৈরী করতে যে হবে ইতিহাস ও সমাজের গতির ফসল। বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষাগুলো এক্ষেত্রে ইতিহাসের বাধ্যবাধকতাবাদের অবতারণা করেছে এবং ইতিহাসের গতিকে উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিণতি হিসাবে পরিচয় করাবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এভাবে তারা মানুষকে ইতিহাসের গতি আর উৎপাদন সম্পর্কের অনুগামী হিসাবে প্রতিপন্ন করে থাকে। পুঁজিবাদী মতাদর্শসমূহ যদিও প্রথমে মানুষের জন্য মৌলিকতা, স্বাধীনতা ও নির্বাচনক্ষম হওয়ার কথা বলে, কিন্তু যখন তাদের অর্থনৈতিক আলোচনাসমূহে মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করা হয় তখন স্পষ্টতই ধরা পড়ে যে তারাও মনের অজান্তে মানুষকে এক প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করে দেখেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মুক্ত অর্থনীতিকে অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারা তাদের বই-পুস্তকে এভাবে

বর্ণনা দিয়েছেন যে মুক্ত অর্থনীতির ব্যবস্থা হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। অর্থনীতির প্রাকৃতিক ব্যবস্থা অনুসারে মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থনৈতিক বিকাশের কারণ হবে।

তাদের এরূপ দাবিকে বাকের সদর গ্রহণ করেননি। কারণ, সত্যি কথা বলতে কি, এরাও মানুষের জন্য কোন কর্মময় ভূমিকা প্রদান করেনি। বরং সমাজের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় এরা মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করেছে। এরা এরূপ ধারণা করেছে যে, অর্থনীতির ম্যাকানিজমগুলো হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় এবং নিজে নিজে সমাজকে ন্যায়বিচার, সুখ... ইত্যাদির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ কথার অর্থ দাঁড়ায়, মানুষ যেমনভাবে পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মের অধীন, অর্থনীতিতেও তদ্রুপ প্রাকৃতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোতে মানুষকে খুবই স্পষ্টভাবে ইতিহাসের গতি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের অনুবর্তী বলে মনে করা হয়েছে। অবশ্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় এই স্পষ্টতা তুলনামূলকভাবে কম এবং কোন কোন পুঁজিবাদী চিন্তাবিদ ‘দার্শনিক স্বাধীনতা’র প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করেছেন। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও এ দার্শনিক আলোচনাগুলোতেও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বস্তু ও অর্থনীতিকেই মৌলিকতা প্রদান করা হয়েছে।

বাকের সদরের উপলব্ধি হচ্ছে, ইসলাম মূল এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দ্বিমত পোষণ করে। ইসলামের চোখে মানুষ হচ্ছে একটি সজ্ঞাত ও স্বাধীন সত্তা। তার সমস্ত চাল-চলনই জ্ঞাতসারে ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে ঘটে থাকে। অবশ্য এ দার্শনিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হতে ভিন্ন কিছু। এদুটি যেন এক সাথে ঘুলিয়ে না যায়। দার্শনিক দৃষ্টিকাণ থেকে মানুষ হচ্ছে একটি সজ্ঞাত সত্তা। একইভাবে মানুষ ভাল-মন্দ বিচারে সক্ষম এবং এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার ইচ্ছাশক্তি ও সক্ষমতার অধিকারী। অপরদিকে মানুষ যেহেতু স্বাধীনতা ও স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার অধিকারী, একারণে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। মানুষের জন্য জবাবদিহিতা ও দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার প্রথম শর্তই হল সে স্বাধীন ও সচেতন হবে। যে সত্তা স্বাধীন ও সজ্ঞাত নয়, অনিবার্যতই সে দায়িত্ব বহন কিংবা জবাবদিহিতার যোগ্যতা রাখে না। অতঃপর মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে মানুষের জন্য মৌলিকতায় বিশ্বাসী। আর প্রকৃতিকে ‘কর্ম’ রূপে দেখে, ‘কর্তা’ রূপে নয়। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভাব ফেলে এবং নিজের সজ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা একটা পর্যায় পর্যন্ত প্রকৃতিকে পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

অবশ্য সজ্ঞানতা, ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এর নিরঙ্কুশ স্তরটি আল্লাহ্‌র। অবশিষ্ট স্তরগুলো বাদবাকি সৃষ্টির মধ্যে সেই মাত্রায় প্রদান করা হয়েছে, যে মাত্রা তাদের জীবনের পূর্ণতায় পৌঁছুনোর পথে আবশ্যক। মানুষও সজ্ঞানতা ও ইচ্ছাশক্তির হাতিয়ার ব্যবহার করে প্রকৃতির অবস্থা কে পরিবর্তন করতে এবং প্রকৃতির ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম। এখানে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উল্টা হয়ে যায় এবং অন্যান্য মতাদর্শে যা বলা হয়েছে ঠিক তার বিপরীতক্রমে মানুষ ‘কর্তা’ ও ‘প্রভাব সৃষ্টিকারী’র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে প্রকৃতি, ইতিহাস এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-নিয়মগুলো ‘কার্য’র পর্যায়ে নেমে আসে। এ দাবির পক্ষে বাকের সদরের উৎকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে ঐসব সামাজিক বিপ্লব ও বিবর্তনগুলো, যেগুলো মানবেতিহাসে সবসময় ঘটেছে এবং অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। এ বিবর্তন একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ (বিশেষ করে নবী রাসুলগণ) কর্তৃক সূত্রপাত হয়। পরে তা গোটা সমাজে মানুষের সজ্ঞানতা ও ইচ্ছার বিস্তার ঘটার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে একটি সজ্ঞাত ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সমাজের উদ্ভব ঘটায় এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন করে ফেলে।

তাই বাকের সদর দাবি করেন, সকল বস্তুবাদী অর্থনৈতিক মতাদর্শে একটি মহা ভ্রান্তি হল এটা যে, তারা মানুষকে এবং প্রকৃতি ও সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ককে স্পষ্টভাবেই হোক আর ইশারা-ইঙ্গিতেই হোক, এমনভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে যেখানে মানুষের কর্তৃত্ব বা গতির চালকের আসনটি হয় পুরোপুরি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, আর নয়ত দুর্বল করে ফেলা হয়। অথচ ইসলামের দর্শন এর বিপরীত। এখানে মানুষের ব্যক্তিগত ও

সামাজিক- এ উভয় স্তরে স্বাধীনতা ও অবগতির ওপর নির্ভর করে স্বয়ং মানুষকেই মূল (চালক) হিসাবে ধরা হয়। আর যে কোন ধরনের পরিবর্তন ও বিবর্তনকে খোদ্ মানুষ থেকেই সূচনা করে এবং তাকেই দায়বদ্ধ বলে গণ্য করে থাকে। ইসলাম মানুষের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, এরপরে আর ইতিহাসের বাধ্যবাধকতার এবং বাধ্যগত প্রভাব ফেলার অবকাশই থাকে না। বরং ইতিহাস ও অর্থনৈতিক উপকরণের বিপরীতে মানুষকে মৌলিকত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। মানুষ যেহেতু জ্ঞান রাখে এবং স্বাধীনভাবে নির্বাচনক্ষম, কাজেই সে নিজেই দায়বদ্ধ। আর এভাবে মানুষের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্থনীতির অঙ্গনে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার উপাদানের পাশাপাশি অন্যদের সম্মুখে এবং সমাজ ও আল্লাহ্র অধিকারের সম্মুখে ব্যক্তির দায়িত্ব নামক আরেকটি উপাদানের উৎপত্তি ঘটে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আমরা একজন ব্যক্তিকে এ কথা বলতে পারি না যে তুমি কেন সমাজে প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন সাধন করতে পার নি- এজন্য তুমি দায়ী? সে উত্তরে বলবে আমি আপনাদের দর্শন অনুযায়ী সামাজিক পরিস্থিতির ফল মাত্র এবং ইতিহাসের বাধ্যবাধকতাপূর্ণ গতির অধীন। কিন্তু ইসলামি অর্থনৈতিক দর্শনে আমরা মানুষকে বলব, যদি সমাজে তোমার পাশে ক্ষুধার্ত ও অভাবী লোকজন থাকে, তাহলে তোমাকে আল্লাহ্র সম্মুখে এবং একইভাবে অন্যদের অধিকারের বিপরীতে জবাবদিহি করতে হবে। এ দায়িত্বের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতা আর খোদাদ্রোহী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

বাকের সদরের মতে, ইসলামি অর্থনীতির দার্শনিক পরিচিতির তৃতীয় অংশটি হল এটা যে, এ অর্থনীতি একাধারে যেমন বাস্তবসম্মত, তেমনি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও নৈতিক বিধি-নিয়মের অধিকারী। বাকের সদর এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, ইসলামি অর্থনীতি তার ভিত্তিগত তাৎপর্য এবং অর্থনৈতিক অধিকারের দিক দিয়ে বাস্তবতসম্মত। ইসলামি বিশ্ববীক্ষা থেকে 'মানুষ'-এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়ে থাকে তা বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা। কারণ তা একপেশে নয়, বরং মানুষের সকল দিকগুলোই এ সংজ্ঞায় বিবেচনায় নেওয়া হয়। সুতরাং ইসলামি অর্থনীতির এই যে দার্শনিক পরিচিতিগুলো বর্ণনা করা হল, এগুলো নিছক মনস্তাত্ত্বিক ও খোয়াব সর্বস্ব তাৎপর্য নয়, যেমনটা কোন কোন মতবাদে পরিলক্ষিত হয়। বরং এগুলো হচ্ছে এমন তাৎপর্য যার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রয়েছে এবং যা মানব জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি ও বাস্তবতাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বাকের সদর দাবি করেন যে ইসলামের অর্থনৈতিক পরিসরেও এরূপ বাস্তবমুখিতা বিদ্যমান। ইসলাম এজন্য আসেনি যে কেবল এই সব চেতনা আর কতেক দার্শনিক, নৈতিক ও আকীদাগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে এবং সমাজকে শুধুমাত্র এসব তাৎপর্যের ভিত্তিতেই পরিচালনা করবে। বরং ইসলাম একদিকে যেমন মানুষকে এসব বিশ্ববীক্ষা ও ভিত্তিগত তাৎপর্য দ্বারা গড়ে তোলে এবং তাকে বিশেষ সব আকীদা ও বিশ্বাস দান করে যা তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আচরণে ভূমিকা রাখে। অপরদিকে তেমনি অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার জন্য আইনগত কাঠামো তৈরী করে দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক অধিকারের নিরিখে একটি সুনিদ্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এ ব্যবস্থায় স্পষ্ট করে দিয়েছে মালিকানা কোন্ ভিত্তিতে সঠিক আর কোন্ ভিত্তিতে সঠিক নয়। কিম্বা ব্যক্তির জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সীমা কতদূর? আর সমাজের ও বঞ্চিত শ্রেণির অধিকারই বা কতুটুকু? এটাই হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতির বাস্তবসম্মত হওয়ার অর্থ। অন্যকথায় বলা যায়, ইসলাম শুধু কেবল নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক উপদেশ দাতা নয় যে কেবল 'এটা কর আর ঐটা কর না' বলেই ক্ষ্যান্ত থাকবে। বরং অধিকার ও আইনগত কাঠামোকেও নিদ্দিষ্ট করে দিয়েছে।

A_bxwZ‡Z gj¨‡eva

বাকের সদর ইসলামি অর্থনীতিতে নৈতিকতার দিকটি ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, ইসলামি অর্থনীতির মূল্যবোধসমৃদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও খুবই স্পষ্ট। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। অন্যকথায়, সামজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তাই এ অর্থনীতির বিস্তর অংশ জুড়ে রয়েছে সামজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি। ন্যায়বিচার হচ্ছে একটি মূলনীতি এবং একটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যখনই সমাজের অর্থনৈতিক নীতি-পন্থাসমূহ ন্যায়বিচারের সাথে পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়াবে, সেক্ষেত্রে ন্যায়বিচারই অগ্রগণ্য হবে। মূল্যবোধ কেবল ন্যায় ও ইনসাফ নয়। অন্যান্য ইসলামি মূল্যবোধও এখানে আলোচনায় আসে। সেগুলোকেও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির ভিত্তি হিসাবে বিবেচনায় নিতে হবে। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক নীতিসমূহ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসমূহের পরম্পরায় ধরে নিতে হবে। ইসলামি অর্থনীতি অর্থনৈতিক ব্যাপারের প্রতি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে।

ইসলাম যখন ব্যক্তিদের জন্য অর্থনৈতিক কর্তব্য নির্ধারণ করতে চায়, তখন সমাজে যে কর্তব্যটি উৎপাদন কিংবা বিতরণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবদান রাখে, সেই কর্তব্যকে একটি নৈতিক ও ইবাদতগত মূল্যবোধ সহযোগে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে। যেমন 'দান', যার আবেদন সম্পূর্ণভাবে একটি অর্থনৈতিক আবেদন এবং যা সম্পদের পুনর্বণ্টন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অতিশয় কার্যকর বটে, তা এতটাই ইবাদতগত ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলির সাথে মিশে রয়েছে যে এর অথনৈতিক দিকটি বিবর্ণ হয়ে যায়। দানের ক্ষেত্রে একটি শর্ত হল যাকাত ও খুমসের ন্যায় 'কুরবাত' (তথা আল্লাহ্‌র নৈকট্য) অর্জনের সংকল্প (নিয়্যাত) থাকতে হবে এবং কাজটি করতে হবে একটি ইবাদত হিসাবে। কোন অনুগ্রহ প্রদর্শনের বাসনা তাতে নিহিত থাকবে না।

ইসলাম সকল সদ্‌কা, যাকাত ও অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে ইবাদত, আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে এবং চেষ্টা করেছে যাতে মানুষ যেন এসব কাজকে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক শিক্ষার আলোকে সম্পাদন করে। স্রেফ বস্তুগত ও অর্থনৈতিক দিকসম্পন্ন যেন না হয়।

এ বিষয়টি দুই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল ইসলাম মানুষের জীবনে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক দিক দুটিকে একসাথে আবদ্ধ করতে চেয়েছে। ইসলামের চোখে, 'বস্তু' ও তার 'মর্ম' একে অপর থেকে পৃথক নয়। ইহকাল ও পরকাল দুইটা ভিন্ন জিনিস নয়। ইসলামের চোখে ব্যক্তি-মানব ও আল্লাহ্‌ আলাদা নয়। সকলেই একই রেখায় বিরাজমান। অর্থনৈতিক আচরণগুলোর নৈতিক ও মূল্যবোধগত মোড়ক, অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সংরক্ষণে এবং সমাজে সম্পদের উত্তম বিতরণ ও সঞ্চালনে অসাধারণ প্রভাব ফেলে।

আরেকটি বিষয় হল, ইসলাম এসব শিক্ষার মাধ্যমে বিশেষ চেতনার বিকাশ ঘটায়। ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, সমঝোতা, ত্যাগ, লেনদেনে ছাড় দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো এমন কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার যে হয়ত সহজেই এসবের পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় এবং মনে হতে পারে যে এগুলোর কোন প্রভাব ও কার্যকারিতা নেই। অথচ বাস্তবে এগুলোর সামাজিক প্রভাব অকল্পণীয়। এসব ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর মাঝ থেকেই ইসলামি অর্থনীতির আধ্যাত্মিক কলা-কৌশল আবিষ্কার করা যায়। এই আধ্যাত্মিক কলা-কৌশল অন্যান্য অর্থনৈতিক মতাদর্শে যেসব পূর্ব-ধারণা ও সূচকসমূহ মূলনীতি ও সর্বস্বীকৃত পূর্ব-ধারণা হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে, এমন অনেক পূর্ব-ধারণা ও সূচককে বদলে দেয়। অর্থাৎ ঐ বিশেষ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যার কারণে দেউলিয়াপনা, সংঘাত, দলাদলি ও শত্রুতা সৃষ্টির কারণ হয়। তদ্‌পরিবর্তে বরং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আনে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ত্যাগ ও পরার্থপরতার শিক্ষা। ইসলামের ইতিহাসে এবং ইসলামি বাজারসমূহে সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কে এরূপ

আধ্যাত্মিক নিয়ামক তথা কারণের প্রভূত প্রভাবের অসংখ্য নমুনা আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্র ওপর বিশ্বাসমূলক বিশ্ববীক্ষা অর্থনৈতিক জীবনে কতই না অসাধারণ ও সূক্ষ্মতর অবদান রাখে এবং কীভাবে ব্যক্তির চেতনা, মানসিকতা ও নৈতিকতাকে বদলে দেয়। আর পুঁজিবাদী বিশ্বে যে ধরনের স্বার্থবাদিতা ও মুনাফাকামিতা সর্বত্র বিরাজ করে, ইসলাম সেটাকে কীভাবে পরস্পর সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব আর ত্যাগের মানসিকতায় পরিবর্তন করে ফেলে।

Bmjwg ivR‰bwZK-A_©‰bwZK wPš—vi wfwËmgn

ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে যে ধারণা ও উপলব্ধি, তা ভিন্ন ভিন্ন ছিল এবং সর্বদা যুগ ও কালের উপর ক্রিয়াশীল বস্তুগত ও সামাজিক পরিবেশ থেকে উৎসারিত ছিল। মানুষ ও প্রকৃতির সারসত্তা কথাটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপ্লবের পূর্বে ও পরে একসমান নয়। জ্ঞানের বিপ্লবের আগের মানুষ হচ্ছে এমন এক মানুষ যে সৃষ্টিরাজির মধ্যে প্রাণহীন প্রকৃতির চেয়ে এক অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও কারণ ঘোটক মর্যাদার অধিকারী।[১৯] গ্রীক দর্শনে এবং ধর্মীয় বাণীতেও মানুষ ও তার আশা আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ জগতে নেই। মানুষই জগতের সব। কিন্তু আধুনিক চিন্তাবিদদের অধিকাংশের নিকট মানুষ ও তার চারপাশ সম্পর্কে উপলব্ধিতে পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং প্রকৃতিই মানুষের চাইতে অধিকতর স্বাধীন, কারণ ঘোটক ও স্থায়ী হয়ে গেছে।[২০]

মহান আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজির মধ্যে মানুষের উচ্চতর মর্যাদার বিষয়টি ঐ যুগের দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর কর্তৃত্বশীল একটি পূর্বতন চিন্তা ছিল। ইসলামি শিক্ষাসমূহ একটি চৈন্তিক ও নৈতিক ধারা হিসাবে এই ঐতিহাসিক যুগের সাথেই সম্পৃক্ত। যদিও এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে ইসলাম ধর্মে মানুষ ও আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে উপলব্ধি গ্রীক দর্শন ও অন্যান্য ধর্মের তুলনায় পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির ধরণ এবং মহামহীম আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজির মধ্যে মানুষের উচ্চতম মর্যাদার কাঠামো থেকে মানব ও প্রাকৃতিক জগতসমূহের ব্যাখ্যা পেশ করা যায়। এ দিক দুটি ভালভাবে না বুঝলে এ যুগের সাথে সম্পৃক্ত দার্শনিক, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাসমূহ বুঝা ও উপলব্ধি করাটা হবে ভাসা ভাসা। বাকের সদর মনে করেন, আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজির মধ্যে মানুষের উচ্চতর মর্যাদার পর্যালোচনা ব্যতীত ইসলামের অর্থনীতির সত্যিকার উপলব্ধি অর্জিত হবে না। একারণে তিনি ইসলামি শিক্ষায় এ দিক দুটিকে দেখতে KiA\‡bi কতিপয় আয়াতের শরণাপন্ন হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ :

> ‘তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।’[২১]
>
> ‘তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন!’[২২]
>
> ‘তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য ওতে শীতবস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক।’[২৩]

---

[১৯]. Edwin Arthur Burtt,*The Metaphysical Foundations of Modern Science*, (ফা. অনু. আব্দুল করিম সুরুশ), তেহরান : ইলমি-ফারাঙ্গি পাবলিকেশন্স কোং, সৌ. সন. ১৩৭৮, ৩য় মুদ্রণ, পৃ. ৮।

[২০]. cÖv¸³|

[২১]. Avj-KziAvb, বাকারা : ২৯।

[২২]. cÖv¸³, লোকমান : ২০।

[২৩]. cÖv¸³, নাহ্ল : ৫।

আল-কুরআনের এসমস্ত ভাষ্য অনুযায়ী সৃষ্টিকূলে মানুষের উচ্চতর মর্যাদা আর স্রষ্টা আল্লাহ্‌র অসীম মহিমা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এখানে উত্থাপিত হয় তা হল মহান আল্লাহ্‌র ও তাঁর প্রতিনিধির মাঝে সম্পর্কের রূপটি কেমন? অর্থাৎ কোন্ মানদণ্ডের ভিত্তিতে মহামহীম আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতাকে তাঁর প্রতিনিধির হাতে হস্তান্তর করবেন, যাতে প্রতিনিধি হওয়ার সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিকটাও যেমন রক্ষা হয়, অপরদিকে তদ্রুপ প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত অর্থও বজায় থাকে। এর মর্মার্থ হচ্ছে খোদায়ী পুঁজিসমূহকে মানুষের স্বার্থে ব্যবহারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ও তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

বাকের সদর বিশ্বাস করেন, আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অধিপতি। আর আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ক রূপ নেয় কর্ম যোগে। কর্ম শ্রম হিসাবে অর্থনৈতিক তৎপরতার পরিসরে প্রতিফলন লাভ করে। কাজেই আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর প্রতিনিধির অর্থনৈতিক ও মালিকানা সম্পর্ক কর্ম তথা শ্রমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব ইসলামে শ্রম নিছক এক দৈহিক কিম্বা মানসিক তৎপরতাই নয়, বরং সৃষ্টি ও আল্লাহ্‌র মাঝে অর্থনৈতিক ও মালিকানার সম্পর্ক বটে। আর সম্পদের প্রকৃতি ও প্রকারভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক তাৎপর্য গ্রহণ করে।[২৪]

বাকের সদর বিশ্লেষণ করে দেখান যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত অ-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন একসমান নয়, বিভিন্ন প্রকার শ্রমও তদ্রূপ অর্থনৈতিক কর্ম হিসাবে একসমান বলে গণ্য হয় না। ইসলামে কাজ দু'ধরনের। এক ধরনের কাজ রয়েছে যা উপকারী। আরেক ধরনের কাজ রয়েছে মজুতদারী মূলক, ইসলামের দৃষ্টিতে যার ফলাফল হচ্ছে সমাজের ওপর ব্যক্তির প্রাধান্য লাভ। প্রথম প্রকারের কাজ ব্যক্তি-অধিকার সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের কাজ যেহেতু বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এবং ভ্রান্ত সামাজিক সম্পর্কের পথ ধরে জন্ম নিয়েছে এবং যেহেতু এটা প্রাকৃতিক পুঁজিসমূহের উপর সঠিক অর্থনৈতিক প্রয়াস নয়, একারণে তা মূল্যহীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[২৫]

সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিকের কারণে কর্ম ও শ্রমকে সর্বদা ইসলামের পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই তো হযরত মুহাম্মদ (সা.) শ্রমিকের হাতে চুম্বন দিতেন এবং তাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে আল্লাহ্ কখনও তাকে শাস্তি দিবেন না। আর স্বীয় বেহেশতের দরজা তার প্রতি খুলে দিবেন।[২৬]

বাকের সদর কুরআনিক ভাষ্যসমূহের আলোকে ইসলামি অর্থনীতির তত্ত্বসমূহের চিন্তাগত ভিত্তিগুলোর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপে তুলে ধরেছেন। যথা :

- মানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। সৃষ্টিকূল ও বিশ্বজগত তারই জন্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এটাই হচ্ছে মানুষদের জন্য সামাজিক প্রতিনিধিত্ব।
- আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান, সবকিছুর আদি ও অন্ত তিনি। তিনিই সবকিছুর নিরঙ্কুশ মালিক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। মানুষের যে কোন রকমের পুরষ্কার ও প্রতিদান কর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যে কর্ম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে 'শ্রম' নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। তাই ইসলামের অর্থনৈতিক বিধি-বিধানকে সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য এরূপ পূর্বতন চিন্তাধারাগুলো পরস্পরের পাশে রাখা বাঞ্ছনীয়।
- আল্লাহ্ নিরঙ্কুশ মালিক এবং তিনি কোন অংশীদার গ্রহণ করেন না। কাজেই মানুষ নিরঙ্কুশ মালিক হতে পারে না।[২৭]

---

[২৪]. দ্র. বাকের সদর, BKZmv'bv, কোম : ইন্তেশারাতে ইসলামি, ১৩৪৮ সৌ. সন,, খ. ২, পৃ. ৭২।
[২৫]. দ্র. C\, 3, পৃ. ১৪৩।
[২৬]. দ্র. C\, 3, পৃ. ২৪৯।
[২৭]. দ্র. C\, 3, পৃ. ৯৪।

তবে মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধি। সুতরাং তাকে বিধি অনুযায়ী সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে। মালিকানার বিষয়ে প্রতিনিধির তাৎপর্য দাঁড়ায় এক প্রকার ওকালাতনামার অনুমতিস্বরূপ। অর্থাৎ সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ্। কিন্তু প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ আমানত স্বরূপ তা নিজের এক্তিয়ারে গ্রহণ করেছে। কাজেই তার কর্তব্য হচ্ছে বিধি অনুযায়ী উক্ত সম্পদ কাজে লাগানো।[২৮]

কিন্তু মানুষের জন্য এ প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে সামাজিক প্রতিনিধিত্ব। সম্পদ ভোগদখল করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার আল্লাহ্র সম্মুখেও দায়বদ্ধ। কেননা, আল্লাহ্ই হলেন সমস্ত সহায়-সম্পদের মালিক। একইভাবে ব্যক্তি সমাজের সম্মুখেও দায়বদ্ধ। কেননা, তারাই হল আল্লাহ্র আসল প্রতিনিধি।[২৯]

অতএব প্রাকৃতিক নদী কিংবা সাগর ব্যক্তি মালিকানার অধীন হবে না। সর্ব-সাধারণ সৃষ্টিকূল তা ব্যবহার করার অধিকার রাখে। সুতরাং প্রাকৃতিক মুক্ত জলরাশি সর্বজনীন মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩০]

KiA‡bi আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী সকল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ নিজ প্রয়োজন মাফিক তা ব্যবহার করতে পারবে। মহান আল্লাহ্ হচ্ছেন নিরঙ্কুশ মালিক। তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন উৎস ও সম্পদ ভোগ করার সুবিধা কোন পারিবারিক বা বংশগত কিংবা বিশেষ কোন ধর্ম বা মাযহাবের খাতিরে কাউকে প্রদান করেন না। বরং এখানে শ্রম বা কর্মই হচ্ছে সেই মানদণ্ড, যার ভিত্তিতে কেউ এসব সম্পদ ও সুবিধা ভোগ করার অনুমোদন লাভ করে। এ কারণে ইসলামে 'হিমা'কে স্বীকৃতি দেয় হয়নি। 'হিমা' হচ্ছে জাহেলী আরব যুগের একটি প্রথা। তারা যখন কোন পাহাড়ী বা মরু এলাকায় কোন সবুজ শ্যামলা ভূমিতে পৌঁছুত, তখন রীতি অনুযায়ী সেখানে তাঁবু স্থাপন করতো। অতঃপর সেখানকার চারপাশে যতদূর অবধি কুকুরের আওয়াজ পৌঁছুত ততদূর এলাকাকে তাদের নিজেদের এলাকা বলে মনে করতো। কুকুরের আওয়াজের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে এরূপ দখলী ভূমিকে 'হিমা' বলা হয়ে থাকে।[৩১] ইসলামে এটাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণ হল এখানে যে ব্যক্তি-মালিকানার দাবি করা হয় তা কর্ম বা শ্রমের ভিত্তিতে নয়, বরং দখল ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে আসে।[৩২]

- শ্রম তথা কর্মই হচ্ছে দখলে নেওয়া পানিসমূহের মালিক হওয়ার ভিত্তি।[৩৩]
- শিকারের ক্ষেত্রে স্রেফ কোন ব্যক্তির জমিতে কাদার মধ্যে ডুবে যাওয়া, কিংবা প্রাণীর খোয়াড়ে ঘাস রাখা কিম্বা কোন ব্যক্তির নৌকায় মাছ লাফিয়ে পড়লেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য তা ধরা ও হস্তগত করা আবশ্যক।[৩৪]
- ঋণের ক্ষেত্রে সুদ অবৈধ। কারণ তা কোন শ্রম বা কর্ম সূত্রে আসে না। প্রত্যক্ষ কর্মসূত্রেও না, যেমন শ্রমিকের শ্রম; বিচ্ছিন্ন শ্রমসূত্রেও না, যেমন উৎপাদন সামগ্রীর মধ্যে সঞ্চিত শ্রম ইত্যাদি।[৩৫]
- ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে উদ্দেশ্য, মানুষই লক্ষ্য, মাধ্যম নয়। উৎপাদন যা কিছু সবই তারই জন্য এবং তারই চাহিদাসমূহ পূরণ করার নিমিত্তে সম্পন্ন হয়ে থাকে। উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোও শুধু এই মনঃসংকল্প

---

২৮. দ্র. C¨, ³, পৃ. ১৬৭।
২৯. দ্র. C¨, ³, পৃ. ১৭৩।
৩০. দ্র. C¨, ³, পৃ. ১২৭।
৩১. দ্র. C¨, ³, পৃ. ১২৫।
৩২. দ্র. C¨, ³|
৩৩. দ্র. C¨, ³, পৃ. ১২৭।
৩৪. দ্র.C¨, ³, পৃ. ১৩৩।
৩৫.দ্র. C¨, ³, পৃ. ২০৭ ও ২২৪।

থেকেই কাজে লাগানো হয়। একারণে মানুষ অন্যান্য কারণ তথা নিয়ামকের সারিতে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং উৎপাদন হতে তার হিস্যা অন্যান্য কারণ তথা নিয়ামকের অধিকারীদের হিস্যা থেকে তাত্ত্বিকভাবে পার্থক্য থাকে।

সুতরাং যদি কেউ অন্য কারও ব্যক্তিগত কর্মের হাতিয়ারকে উৎপাদনে ব্যবহার করে, তাহলে যা ফসল উৎপাদিত হবে সেটা সম্পূর্ণরূপে তারই প্রাপ্য হবে। এমনটা নয় যে হাতিয়ারের মালিকের সাথে সে অংশীদার হবে। তবে হাতিয়ার ব্যবহার বাবদ উক্ত হাতিয়ারের মালিকদের যথোপযুক্ত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।[৩৬]

ইসলাম উৎপাদিত সমুদয় ফসলকেই কর্ম তথা শ্রমের মালিকের (অর্থাৎ শ্রমিকের) প্রাপ্য বলে মনে করে। তবে বিপরীতক্রমে জমি ও কাজের হাতিয়ারসমূহ উৎপাদন কর্মে যে সেবা দিয়ে থাকে তার বিনিময়ে উক্ত জিনিসগুলোর মালিক যারা তাদের এবাবদ ভাড়া গ্রহণ করার অধিকার আছে বলে মনে করে।[৩৭]

বাকের সদর মনে করেন, ইসলামি অর্থনীতির হুকুম বিধান তখনই হৃদয়াঙ্গম করা সম্ভব হবে যখন এর চিন্তাগত ভিত্তিসমূহের সাথে পর্যালোচনা করা হবে। এর ভিত্তিসমূহ সঠিকভাবে বুঝা ও উপলব্ধি করা ব্যতীত কিংবা ভিন্ন চিন্তাগত ভিত্তিসমূহের সাথে ইসলামি অর্থনীতির হুকুম বিধানসমূহের ব্যাখ্যা অনুধাবন ব্যতীত ইসলামের অর্থনৈতিক হুকুম বিধানসমূহ সেই সামঞ্জস্যতা ও আবশ্যকতা হারিয়ে ফেলবে। অধিকাংশই যারা ইসলামি অর্থনীতির হুকুম বিধানের সমালোচনা করে থাকেন তারা কেবল পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্বধারণা নিয়ে ইসলামের বিধানসমূহের বাহ্যিক দিকের প্রতি প্রশ্ন তোলেন। এখানে যেটা সন্দেহাতীত বিষয় তা হল পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ববর্তী চিন্তাধারার সাথে ইসলামের এসব বিধি-বিধানের অসঙ্গতি ও অযৌক্তিক হওয়া। অথচ সমালোচনাকারীরা এ দিকটির প্রতি খেয়াল না করেই নির্দ্বিধায় পথকে বিপথে চালিত করেন।

djvdj

এতক্ষণ অর্থনীতির দর্শন এবং এ সংক্রান্ত বাকের সদরের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল। এ পর্যালোচনা থেকে কয়েকটি বিষয়কে ফলাফল হিসাবে তালিকাবদ্ধ করতে পারি। যথা :

এক. অর্থনৈতিক মতাদর্শসমূহ গড়ে ওঠার পেছনে দার্শনিক ও নৈতিক চিন্তা-চেতনা ভূমিকা রাখে। একারণে কোন অর্থনৈতিক মতাদর্শকে তার দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তিসমূহকে থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অর্থনৈতিক বিজ্ঞান হচ্ছে নৈতিক বিজ্ঞানেরই একটা অংশ এবং নৈতিক পূর্ব-ধারণাসমূহ ব্যতীত তা টিকে থাকতে পারে না। ঠিক যেমন কেউ যদি তার সংস্কৃতি ও পিতামাতার পরিচিতিকে ঝেড়ে ফেলে বাঁচতে চায়, তা পারে না। কখনো কখনো অর্থনীতিও তার দর্শনগত উৎসকে অস্বীকার করতে চায়। যদিও তারা তাদের দার্শনিক সত্তাকে সংশোধন কিংবা উন্নত করতে পারে, কিন্তু তা থেকে পলায়ন করতে পারে না। দর্শন থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য তাদের চেষ্টা বরং তাদের তত্ত্বগুলোকে অন্তঃসারশূন্য হিসাবে প্রতিপন্ন করবে।[৩৮]

---

[৩৬]. cÖv¸³, পৃ. ১৮৮।

[৩৭]. cÖv¸³, পৃ. ১৮৭।

[৩৮]. Danil M.Hausman, and Michael S. McPherson *Economic Analysis and Moral Philosophy*. (2004). P-45.(http:// philosophy.Wis. edu/ hausman/ paper.htm, The Journal of Economic Literature, vol. XXXI, No.2, 671-732).

যেমনটা ইতোপূর্বে ইশারা করা হয়েছে, ইসলামি অর্থনীতি এমন এক চিন্তাগত ভিত্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে যা বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টির কেন্দ্রীয় অক্ষ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং ইসলামের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহও এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তদ্রুপ উদারনৈতিক অর্থনীতিও একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থার ভিত্তিতে (যা একটি দার্শনিক তাৎপর্য বটে, তবে বাস্তব ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য নয়) এবং একটি সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্জস পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিপুষ্টি লাভ করেছে, যা তৎকালীন প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

অপরদিকে, মার্কসীয় অর্থনীতি এমন এক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা বিদ্যমান সম্পর্কসমূহকে গভীরভাবে এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী। পাশাপাশি এক নৈতিকতার আকাঙ্ক্ষী যার ফলে বিদ্যমান সকল শোষণমূলক সম্পর্ক স্বয়ং মানুষদেরই হাতে ধ্বংস হয়ে যায়। তাই, যদি সিদ্ধান্ত হয় যে মার্কসীয় কিংবা ইসলামি অর্থনীতিকে এদের দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তির কারণে প্রশ্নের সম্মুখীন করা হবে, তাহলে কেন উদারনৈতিক অর্থনীতির সাথেও এই একই কাজ করা যাবে না?

দুই. প্রত্যেক অর্থনৈতিক মতবাদই নিজের দার্শনিক ও চিন্তাগত ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তার ইতিবাচক কার্যকারিতা ও কর্মতৎপরতার দাবিকে সংরক্ষণ করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি উদারনৈতিক অর্থনীতির চিন্তাগত ভিত্তিগুলোকে খোঁজ না করে সমাজে অ্যাডাম স্মিথের ব্যক্তি-স্বার্থ কর্মতত্ত্বকে অধ্যয়ন করতে চাই তাহলে স্মিথের থেকে ভিন্ন এক ফলাফলে উপনীত হব। স্মিথের অর্থনৈতিক দর্শনে ব্যক্তি-স্বার্থের ইতিবাচক কর্মের পূর্বশর্ত হচ্ছে জন লকের বুদ্ধির ভিত্তিতে প্রকৃতির রাজ্যের একই কথা। আমরা যদি প্রকৃতির রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করি কিম্বা হব্সের প্রকৃতির রাজ্যকে লকের প্রকৃতির রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে দেখি সেক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থের সুসমঞ্জস ও ইতিবাচক কর্ম নস্যাৎ হয়ে যাবে। অর্থাৎ স্মিথের চিন্তার ভিত্তিসমূহ অনুধাবন ব্যতীত তার ব্যক্তি-স্বার্থের ইতিবাচক কর্মতত্ত্বকে অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। এই একই কারণে মার্কসের সমাজতান্ত্রিক সমাজের 'প্রত্যেকে দেবে তার যোগ্যতা অনুযায়ী এবং প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী' (from each according to his ability, to each according to his needs) -এ নীতিটি অনুধাবন একটি কাল্পণিক ও অন্তসারশূন্য অনুধাবনে পরিণত হবে। কেননা আমরা মার্কসের চিন্তায় মানুষের ও শ্রমের তাৎপর্যের সমজাত হওয়ার বিষয়ে উপলব্ধি করতে পারি। যদি মানুষের সমজাত হওয়ার স্থলে স্বার্থপর মানুষ দ্বারা রদবদল করি তাহলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এরূপ নীতি কার্যকরী হওয়ার ধারণা অলীক কল্পনা বৈ নয়। অনুরূপভাবে মার্কসের মুদ্রা ও মালিকানা মতবাদটি নিজের কাছে পর হওয়া এবং ঐতিহাসিক সারসত্য অনুধাবন ব্যতীত অর্থহীন হয়ে পড়বে। উদারনৈতিক অর্থনীতিতে ব্যক্তিস্বার্থকে সর্বোচ্চ করার বিষয়টি ব্যাখ্যাযোগ্য হলেও ইসলামি অর্থনীতিতে এর কোন স্থান নেই। কেননা, ইসলাম বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া হতে ততটুকু সম্পদ বৈধ করেছেন এবং তাদের হাতে দিয়েছেন যতটুকু তাদের জন্য যথেষ্ট হয়। আর আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন তা কেউ নিষিদ্ধ করতে পারে না।[৩৯]

তিন. যারা উদারনৈতিক অর্থব্যবস্থার সমর্থক, তাদের জন্য এই অর্থনৈতিক মতাদর্শকে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। তদ্রুপ অন্যান্য অর্থনৈতিক মতাদর্শসমূহ যেমন মার্কসীয় ও ইসলামি অর্থনীতিকে আজকের দুনিয়ায় অচল ও অকার্যকর অজুহাতে বিতাড়ণ করা উচিত নয়। যে জিনিসটি একটি অর্থনৈতিক মতাদর্শের শ্রেষ্ঠতা নির্দেশ করে তা হল উক্ত মতাদর্শের দার্শনিক ও চিন্তাগত ভিত্তিসমূহের ঐতিহাসিক ও সামাজিক

---

[৩৯]. দ্র. বাকের সদর, BKwZmv' bv, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৭।

বাস্তবতাসমূহের সাথে সঙ্গতিশীল হওয়া। পাশাপাশি মানবের মর্যাদা বৃদ্ধি ও মানুষের প্রকৃত ও ঐতিহাসিক চাহিদাসমূহ পূরণে এর সক্ষমতা থাকা। উপরোক্ত আলোচনার দিকে লক্ষ্য রেখে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমন কোন মানদণ্ড কি রয়েছে যার ভিত্তিতে এসব অর্থনৈতিক মতাদর্শসমূহের মধ্যে কোন একটিকে আরেকটি থেকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে নির্ধারণ করার সুযোগ থাকে?

যারা উৎপাদনের হাতিয়ারপন্থী তারা হয়ত এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে, যে মতাদর্শ মানুষকে শক্তিশালী করবে কিংবা মানুষের সুখ ও স্বাধীনতাকে উন্নত করবে সে মতাদর্শই শ্রেয়তর। কিন্তু এরূপ উত্তর পুনরায় আরেক প্রশ্নের জন্ম দিবে। তা হচ্ছে এখানে শক্তিমান হওয়া কিংবা সুখ ও স্বাধীনতা উন্নত হওয়া বলতে উদ্দেশ্য কী? যেহেতু প্রত্যেক মতাদর্শই এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবে একেক ভাবে, সেহেতু এর অর্থ দাঁড়াবে সেই প্রথম বিন্দুতে ফিরে যাওয়া। আর যদি আমরা ইতিহাসকাল জুড়ে এই তিনটি মতাদর্শের ক্রিয়ার ভিত্তিতে উত্তর দিতে চাই, তাহলে মানতে হবে যে একমাত্র উদারনৈতিক অর্থনীতি ব্যতীত মার্কসীয় ও ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদগুলো সমাজে আজ অবধি পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়নি। ইসলামি অর্থনীতি শুধু কেবল ইসলামের প্রাথমিক যুগে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়িত হতে পেরেছিল। কিন্তু এ অর্থনীতি তার ক্রিয়াকাল সংক্ষিপ্ত হওয়া এবং ঐ যুগের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সরল প্রকৃতির হওয়ার কারণে তা অন্যান্য মতাদর্শের ক্রিয়ার সাথে তুলনার কোন মানদণ্ড হতে পারে না।

7. gvKmev‡`i mgv‡jvPbv

বাকের সদর তাঁর বিখ্যাত BKwZmv`bv গ্রন্থে ইসলামি অর্থনীতির রূপরেখা বর্ণনার আগে মার্কস্‌বাদের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পেশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি পুঁজিবাদের সাথে এর তুলনাও উপস্থাপন করেছেন। তবে এক্ষেত্রে যে সূত্রটিকে তিনি মূল উপজীব্য ধরে নিয়ে উক্ত সমালোচনাকে একটি পরিণতির দিকে চালিত করেছেন তা হচ্ছে 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব'র সূত্র। এ পর্যায়ে মূল্যের শ্রমতত্ত্ব সম্পর্কে বাকের সদরের বিস্তারিত পর্যালোচনা তুলে ধরা হল।

g‡j¨i kgZË (Labor theory of value)-Gi BwZK_v

ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের সম্পর্কে একটি প্রধানতম 'ধারণা' হচ্ছে মূল্যের শ্রমতত্ত্ব। যদিও এ তত্ত্বটির পদচিহ্ন ধ্রুপদী অর্থনীতির যুগের আগেও অর্থাৎ অ্যারিস্টটল[৪০] থেকে জন লক্ পর্যন্ত সময়েও চোখে পড়ে। ইংল্যান্ডের ডেভিড রিকার্ডো হলেন সর্বপ্রথম অর্থনীতিবিদ, যিনি এ তত্ত্বটির স্বতন্ত্র রূপকাঠামো দাঁড় করাবার প্রয়াস চালান। যদিও দাবি করা হয়[৪১] যে, রিকার্ডোর সেই তত্ত্বের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। রিকোর্ডো কেবল দেখিয়েছিলেন যে, শ্রমিকের দৈহিক শ্রমই একমাত্র সৃজনী শক্তি এবং কেবলমাত্র শ্রমিকের দৈহিক শ্রমই পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু তিনি তাঁর শ্রমতত্ত্বের দ্বারা পুঁজিপতিদের মুনাফা প্রভৃতির উৎস বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। সুতরাং শ্রমতত্ত্বটি ছিল অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ।

মার্কস্ তাঁর মূল্যের শ্রমতত্ত্বের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কেবল এক বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থাতেই 'শ্রম', 'মূল্য'র রূপ গ্রহণ করে। তিনি পণ্যের নাম দিয়েছেন 'বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক একক' (Economic Unit of

---

[৪০]. Charles Gide and Charles Rist, *A History of Economic Doctrines, from the time of the physiocrats to the present day*(ফা. অনু. ড. করিম সানজাবি), তেহরান : তেহরান ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৩৮০ সৌ. সন, খ. ২, পৃ.।

[৪১]. দ্র.সুপ্রকাশ রায়, gvK‡mi K¨wcUvj, কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, চতুর্থ প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ১৩-১৫।

the Bourgeois Society)। এই পণ্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে তা হল এর 'ব্যবহারিক-মূল্য' ও 'মূল্য'- এই দুইয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মার্কস্ আবিষ্কার করেছেন যে, পণ্যের মধ্যে যে শ্রম নিহিত রয়েছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দুইটি। মার্কসের এই আবিষ্কারটির তাৎপর্য অসাধারণ। মার্কস্ নিজেই বলেছেন, 'ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আসল ব্যাপারটি বুঝবার এ হল একমাত্র উপায়।'[৪২]

মার্কসের উদ্ভাবিত 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব' দিয়ে পণ্যের উৎসটি বুঝা যায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পণ্যের মূল্য কীভাবে সৃষ্টি হয় তা মার্কস্ তাঁর নতুন করে গড়া 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব' দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তারপর তিনি শ্রমতত্ত্ব দিয়েই পণ্যের এই মূল্য সৃষ্টির ভিত্তিতে সমগ্র ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার রহস্য ভেদ করলেন। মার্কস্ এই শোষণ ব্যবস্থার যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তার সার-সংক্ষেপ হল নির্দিষ্ট মজুরীতে পুঁজিপতির কাছে শ্রমিক তার শ্রম-শক্তি বিক্রয় করে। শ্রমিকের দেহের এই শ্রম-শক্তিই কলকারখানায় যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রমে পরিণত হয়। অর্থাৎ পণ্যের রূপ ধারণ করে। একটি পণ্য তৈরি করতে যতখানি সময় আবশ্যক হয় সেই সময় দিয়েই পণ্যের মধ্যকার শ্রমের পরিমাণ স্থির করা হয়। সমাজে পণ্য উৎপাদনের চলতি ব্যবস্থা অনুসারে কোন পণ্যের উৎপাদনের জন্য যত সময়ের প্রয়োজন হয় তত সময়ের শ্রমই হল ঐ পণ্যের মূল্যের মাপকাঠিস্বরূপ। কোন পণ্যের মূল্য কখনো নিজে নিজে প্রকাশিত হতে পারে না। যখন ভিন্ন প্রকারের এক বা একাধিক পণ্যের সঙ্গে ঐ পণ্যের বিনিময় ঘটে, কেবল তখনই প্রথম পণ্যটির মূল্য ঐ ভিন্ন প্রকারের এক বা একাধিক পণ্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ বিনিময় হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম পণ্যটির অন্তর্নিহিত মূল্যও প্রকাশিত হবে না। ঐ ভিন্ন প্রকারের এক বা একাধিক পণ্যকে বলা হয় প্রথম পণ্যটির মূল্যের (বা আপেক্ষিক মূল্যের) রূপ। মূল্যের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে এসে মুদ্রারূপ মূল্য দাঁড়িয়েছে। মুদ্রাই এখন সকল পণ্যের মূল্যের সর্বসম্মত রূপ। পুঁজিপতিরা তাদের পণ্য বাজারে নিয়ে গিয়ে তার অন্তর্নিহিত শ্রম বা মূল্যকে টাকার সঙ্গে বিনিময় অর্থাৎ বিক্রয় করে টাকায় পরিণত করে। তা থেকেই তারা লাভ করে টাকার আকারে উদ্বৃত্ত মূল্য। সেই উদ্বৃত্ত মূল্যকে খাজনা, সুদ ও মুনাফা হিসাবে ভাগ করে জমিদার, ব্যাংক মালিক ও শিল্পপতি নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং শ্রমিক তার শ্রমের দ্বারা যে মূল্য সৃষ্টি করে, তারই একটা ক্ষুদ্র অংশ মজুরি হিসাবে শ্রমিককে দিয়ে বাকি সমস্ত অংশ বিভিন্ন নামের পুঁজিপতিরা ভাগ করে নেয়। মার্কস্ তার বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ করে দেখালেন যে এই উদ্বৃত্তমূল্য আত্মস্যাৎ করার জন্যই পুঁজিপতিরা কল-কারখানায় পণ্য উৎপাদন করে এবং এরই নাম 'পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিক শোষণ।' আর এই শোষণই হল ধনতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি। সংক্ষেপে এই হল মার্কসের 'মূল্যের শ্রমতত্ত্বের' মূলকথা।

কার্ল মার্কস এ তত্ত্বকে গ্রহণ করেন রিকার্ডো ও সমসাময়িক অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের চিন্তা থেকে এবং নিজ ব্যাখ্যা সহকারে ধ্রুপদী চিন্তাধারায় ভিন্নরূপে এর একচেটিয়া ব্যবহার করেন।[৪৩] এ ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা শুধু যে পুঁজিবাদ থেকে নিজের স্বাতন্ত্রকে স্পষ্ট করে ফেলেছিল, তা নয়, বরং নিঃসন্দেহে ঐ সময়কাল পর্যন্ত নব আবির্ভূত পুঁজিবাদের বিপরীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মার্কস্-পূর্ব সমাজতন্ত্র যদিও মার্কস্বাদে নিহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেই নকশা করেছিল, কিন্তু কোনক্রমেই মার্কস্বাদের শক্তি ও সামর্থকে ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। এই দৃঢ়তা অনেকাংশেই মার্কসীয় মূল্যের শ্রমতত্ত্বের দৃঢ়তা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কাছে ঋণী ছিল।

---

[৪২]. উৎ.C\/¸ ³, পৃ. ১৩।

[৪৩]. Charles Gide and Charles Rist, *A History of Economic Doctrines, from the time of the physiocrats to the present day*, প্রাগুক্ত।

ev‡Ki m‘‡ii mgv‡jvPbv

সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর এমন এক যুগে চৈন্তিক ও বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা পরিচালনা করেন যখন মার্কস্‌বাদ একটি অগ্রবর্তী চিন্তাদর্শন হিসাবে বিশ্বের প্রায় অর্ধেকাংশ জুড়ে নেয়। এমন একটা সময়, যখন মার্কস্‌বাদের মূলনীতিসমূহের উপর এমনকি সংশয়টুকু প্রকাশ করাও ততটাই অযৌক্তিক বলে মনে হত, যতটা আজ গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহে উপর সংশয় প্রকাশ করা অযৌক্তিক মনে হয়।

মার্কস্‌বাদ ছিল বিশ্বের মুক্তিকামীদের মতাদর্শ। আর এর মূলনীতি তথা ভিত্তিসমূহ অনেক মার্কস্‌বাদী চিন্তাবিদদের চিন্তা ও তাত্ত্বিকতার মাধ্যমে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে অবস্থান নিয়েছিল। এটা এমন এক যুগে ঘটেছিল যখন ছিল প্রত্যক্ষবাদের উৎকর্ষের যুগ। তখনও মার্কস্‌বাদের সমান্তরালে অন্য কোন মতবাদ নিয়ে আলোচনার অবতারণা হয়নি। একারণে তৎকালীন চিন্তাধারার ধরণকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে তখন মার্কস্‌বাদ ও এর ভিত্তিসমূহকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগই ছিল না। অথচ এমনই এক যুগে এবং এরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও বাকের সদর মার্কস্‌বাদ ও এর মূলনীতিসমূহের মুখোমুখী হন সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তবে মুসলিম চিন্তাবিদরা ঢালাওভাবে যে পদ্ধতিতে মার্কস্‌বাদের সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বাকের সদর সে পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হননি। বাকের সদরের অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতির গুরুত্বটি তখনই বেশি বেশি ফুটে উঠবে যখন জানব যে, তৎকালীন যুগে অধিকাংশ সামাজিক চিন্তাবিদই হয় কট্টরভাবে মার্কস্‌বাদের সমর্থক ছিলেন। আর নয়ত কট্টরভাবে মার্কস্‌বাদের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু বাকের সদর ইসলামের ইজ্‌তিহাদ ও দায়িত্বপরায়ণতার প্রেক্ষিত থেকে এ মতবাদের মুখোমুখী হওয়ার কৃতিত্ব দেখান।

বাকের সদর কর্তৃক মার্কস্‌বাদের সাথে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ামূলক অবস্থান গ্রহণ করার ফলে স্বভাবতই তাঁর চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছিল। এর অনেক সামাজিক প্রভাব পড়েছিল এবং মুসলমানদেরকে নির্বিবাদে মার্কস্‌বাদের কোলে লুটিয়ে পড়ার হাত থেকেও রক্ষা করেছিল। মূল্যের শ্রমতত্ত্ব, যা মার্কস্‌বাদের একটি প্রধানতম মূলনীতি বটে, এ তত্ত্বের সামনেও বাকের সদরের অবস্থান ছিল পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও সমালোচনামূলক। যা চূড়ান্ত পরিণতিতে তাঁর চিন্তায় এ তত্ত্বটির বিশেষ এক প্রকার পুনর্গঠনের কারণ হয়। এর অনিবার্য প্রভাব তখনই আরও বেশি দৃশ্যমান হয় যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে তাঁর সামগ্রিক অবস্থানকে তুলে ধরা হয়। অন্যকথায় বলা যায়, আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে তাঁর অবস্থান অনেকটাই মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে গ্রহণ করেই তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

g‡j¨i kgZË m¤ú‡K ev‡Ki m‘‡ii wPšÍv Ges cwRev‡‘i †ÿ‡Î Gi cfve

বাকের সদর তাঁর BKwZmv‘bv গ্রন্থে বিশদভাবে প্রথমে ডেভিড রিকার্ডোর চিন্তার আলোকে এবং পরে কার্ল মার্কসের চিন্তার আলোকে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন।[৪৪] তিনি তাঁর সমালোচনাকে ব্যক্তি পর্যায়ের উৎপাদন থেকে আরম্ভ করেন। যেমন শিল্পকর্মজাতীয় পণ্যসামগ্রী।[৪৫] তিনি লিখেন :

> 'একটি প্রত্নতাত্ত্বিক হস্তলিখনের কি কোন বিনিময় মূল্য নেই? এটাকে কি বাজারে নিয়ে মুদ্রা কিংবা বই অথবা অন্য কোন জিনিসের সাথে বিনিময় করা সম্ভব নয়? সুতরাং যদি উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক হস্তলিখনটি এক সেট ছাপানো

[৪৪]. দ্র.বাকের সদর, BKwZmv‘bv, পৃ. ১৮৭-১৯৫।

[৪৫]. মার্কস্ বিনিময় মূল্য এবং শ্রমের প্রতি এর নির্ভরতার ব্যাখ্যায় সামাজিক পণ্য ও ব্যক্তিগত পণ্যকে একে অপর থেকে আলাদা করে থাকেন।

ইতিহাসের বইয়ের সাথে বিনিময় করি তাহলে এর অর্থ হবে এটা যে এক পৃষ্ঠা প্রত্নতাত্ত্বিক হস্ত লিখনের মূল্য এক সেট ছাপানো ইতিহাসের বইয়ের সমান।'[৪৬]

এভাবে বাকের সদর দেখাতে চেয়েছেন যে, মার্কসের ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে কার্যকর নয়। যেহেতু মার্কসের মতে, দুটি পণ্যের মধ্যে অভিন্ন গুণবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকার ফলেই ঐ দুটি বিনিময় সম্ভবপর হয়। আর মার্কসের দৃষ্টিতে সেই অভিন্ন গুণটি হচ্ছে শ্রম, যা ঐ পণ্য উৎপাদনে ব্যয় হয়েছে। অন্যকথায় বলা যায়, বাকের সদরের দৃষ্টিতে বিনিময় প্রক্রিয়ায় পণ্যসমূহের মধ্যে ব্যয়িত শ্রম ব্যতিরেকে অন্য কোন অভিন্ন দিক সন্ধান করতে হবে। এমন এক অভিন্ন দিক, যা মার্কসের ধারণার চেয়েও অধিকতর সর্বজনীন ও সাধারণ হবে।[৪৭]

বাকের সদর মূল্যের শ্রমতত্ত্বের উপর অন্য আরেকটি যে আপত্তি তুলেছেন তা হচ্ছে গমের ন্যায় পণ্যসামগ্রী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎকৃষ্ট ও অনুৎকৃষ্ট কৃষি জমির অবদানের প্রসঙ্গ। এটাইতো হওয়া উচিত যে উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জমিতে একসমান পরিমাণ শ্রম ব্যয় করার সূত্রে লব্ধ গমের বিনিময় মূল্যও ভিন্ন ভিন্ন হবে? অতএব বাকের সদর দেখিয়ে দেন যে উৎকৃষ্টতর জমিও শ্রমশক্তির সাথে সমানতালে বিনিময় মূল্যে অবদান রাখতে পারে।[৪৮]

উল্লেখ্য, বাকের সদর স্বয়ং এ বিষয়ে ইশারা করেছেন[৪৯] যে কার্ল মার্কস্ মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে একটি পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবস্থার (Perfect Competition) অধীনে এবং একটি বিমূর্ত ধারণার স্থান থেকে উপস্থাপন করেছেন।

বাকের সদরের দৃষ্টিতে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের উপর আরেকটি আপত্তি হচ্ছে কোন বিশেষ একটি পণ্যের বিনিময় মূল্যের মাত্রায় তার সামাজিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত তথা কাম্য হওয়া কিংবা রুচিবোধের সাথে সঙ্গতিশীল হওয়ার জায়গাটি উপেক্ষা করা। একইভাবে বাকের সদরের মতে, যখন গম দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে (শ্রমশক্তির কম ব্যবহারের কারণে হোক কিম্বা খরা ও মঙ্গার ন্যায় কোন বাইরের কারণেই হোক) তখন কাম্যতা তথা চাহিদা চরমে পৌঁছায় এবং এর ফলে গমের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আসলে দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ঘটনাটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাযোগ্য। আর মূল্যের শ্রমতত্ত্ব হচ্ছে এক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্বসমূহের মধ্যে একটি তত্ত্ব মাত্র।[৫০]

বাকের সদর শ্রমশক্তির অসদৃশ্যতার বিষয়টির উপরেও আলোকপাত করেন। কারণ, শ্রমিকদের শ্রেণি ও বৈচিত্র্য রয়েছে। অনেকের শ্রম তার সত্তাগত গুণ (অদক্ষ শ্রম)। আবার অনেকের শ্রম মানব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ (দক্ষ শ্রম)। কিন্তু এ ব্যাপারে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের কোন মনোযোগ নেই এবং এ অমনোযোগিতাকে তিনি এ তত্ত্বের একটি দুর্বল দিক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচনায় তিনি লিখেন :

'একারণে এটা ভুল যে শ্রমের পরিমাপ করার মানদণ্ড কেবলমাত্র তার পরিমাণের (quantity) ভিত্তিতেই হবে এবং সংখ্যার সাহায্যে তা প্রদর্শন করা হবে। বরং শ্রমের পরিমাপ করার জন্য এর গুণ ও বৈশিষ্ট্যগত (quality) মানদণ্ডের দরকার। যাতে এর মাধ্যমে যে শ্রম পরিমাপ করা হল তার ধরণ এবং তদ্বারা যে পরিমাণ প্রভাব পড়েছে

---

৪৬. C׀¸ ³, পৃ. ১৯৬।

৪৭. অবশ্য বাকের সদর এই সমালোচনাটি উত্থাপনের কিছু পূর্বেই এ বিষয়টির প্রতি ইশারা করেছেন যে, মার্কস্ স্বয়ং বিশ্বাস করতেন যে, মূল্যের শ্রমতত্ত্বটি শুধুমাত্র সামাজিক পণ্যসমূহের বেলায় অর্থবহ হতে পারে। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর সমালোচনাকে ব্যক্তিগত পণ্যের পরিসরের উপর দাঁড় করিয়েছেন। কেননা, মূল্যের শ্রমতত্ত্বের বিমূর্ত ও সামগ্রিকতাপূর্ণ দৃষ্টি এখানে উপেক্ষা করা হয়েছে। - দ্র.C׀¸ ³, পৃ. ১৯৪।

৪৮. C׀¸ ³, পৃ. ১৯৯।

৪৯. C׀¸ ³|

৫০. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০৩।

তা নিরূপণ হয়ে যায়...। তাই যদি হয় তাহলে মার্কস্‌বাদ কিভাবে নিজেকে এ উভয়-সংকট থেকে মুক্ত করতে চায়- একদিকে শ্রমের কারিগরী দক্ষতা ও অদক্ষতার পরিমাণের সাধারণ পরিমাপ। অপরদিকে শ্রমের প্রকার অনুসারে আত্মিক, দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব অনুযায়ী এর কার্যকারিতা পরিমাপ, যা প্রত্যেক শ্রমিকের মধ্যে বিশেষ রূপে প্রতিভাত হয়।'[৫১]

gvKmev'x‡'i c‡ki DË‡i ev‡Ki m'i

বাকের সদর অতঃপর মার্কস্‌বাদীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতঃ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমকে সরল ও জটিল এ দু'ভাগে বিভক্ত করা এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও দক্ষতা অর্জন.. ইত্যাদির ভিত্তিতে পারিশ্রমিকের পার্থক্য হওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা অভিজ্ঞতার পরীক্ষা হতে বেরিয়ে আসতে পারে না। কেননা, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ কর্মীর পারিশ্রমিক আর সাধারণ শ্রমিকের পারিশ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য এতই বেশি যে তা এসব ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝানো যাবে না। একইভাবে বাকের সদরের দৃষ্টিতে মার্কস্‌বাদীদের পক্ষ থেকে সামাজিক কাজের গড় বের করার ন্যায় সমাধানের পথগুলো উদ্দেশ্য পূরণ করতে যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে মার্কস্‌বাদ যে ভুলটি করে তাহল সবসময় বিষয়টিকে পরিমাণগত (quantity) দিক থেকে পর্যালোচনা করে থাকে। একারণে মার্কস্‌বাদের দৃষ্টি থেকে শ্রমিকের জন্য যে উৎকৃষ্ট পরিবেশ, তা বুঝায় সেসব কারণ ও নিয়ামককে যা একজন শ্রমিককে স্বল্পতর সময়ে বেশি উৎপাদনে সাহায্য করবে। এজন্য এই শ্রমিক এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যে 'পরিমাণ' উৎপাদন করবে, তা এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সামাজিক কাজের গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি হবে এবং টাকার মূল্যে এর দাম ঐটার চেয়ে বেশি। কিন্তু যে বিষয়টির দিকে মনোযোগ প্রদান করতে হবে তা হচ্ছে মানসিক, দৈহিক ও আত্মিক অবস্থা, যা একজন মাঝারি শ্রমিকের মধ্যে নেই। একজন শ্রমিক যে ঐ অবস্থার অধিকারী নয় তার উৎপাদনকৃত পণ্যের পরিমাণ অধিকতর হবে- সবসময় এ অর্থে চলে না। বরং সম্ভাবনা রয়েছে উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে মানগত (quality) বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে... কাজেই এখানে সৃজনশীলতার বিষয়টি প্রাসঙ্গিকতা রাখে।[৫২]

বাকের সদর মনে করেন, নয়া-ধ্রুপদীদের পক্ষ থেকে যে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ পেশ করা হয়েছে সেটা মূল্যের শ্রমতত্ত্বের জন্য একটি সত্যিকার বিকল্পস্বরূপ উত্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর মতে, মূল্যের শ্রমতত্ত্বটি অন্য যেসব সমস্যার সম্মুখীন রয়েছে, সেগুলোও এ মতবাদের মাধ্যমে অপসারিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরপ, এখানে পণ্যের ব্যবহারিক মূল্যও বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং পণ্যসমূহের বিনিময় মূল্য নির্ধারণে এর প্রভাব ফেলার ধরণ ব্যাখ্যা করা হয়। তবে ইতোপূর্বে যেমনটা বলা হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা করতে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের অপারগতা, এর গুরুত্বের পরিপন্থী নয়। যেমন পণ্যের মূল্য ও ব্যবহারগত মূল্যের মধ্যকার অনুপাত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ তত্ত্বের অপারগতা। প্রকৃতপক্ষে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের একটি অন্তর্নিহিত ধারণা হচ্ছে, যে পণ্যই দীর্ঘ মেয়াদে বাজারে উৎপন্ন হবে, অবশ্যই তার ক্রেতা ও চাহিদা রয়েছে। ক্রেতাসাধারণের রুচি, মূল্যের সূচকে উৎপাদনকারীর নিকট পৌঁছে যায়। পণ্যের বাজারে খুচরা ভোক্তা ও উৎপাদকরা কোন পণ্যেরই মূল্যের উপর প্রভাব ফেলার সক্ষমতা রাখে না।

[৫১]. দ্র. সাইয়্যেদ আকিল হোসাইনি, bvhwi‡q-G Avi‡hk Iqv †KBgvZ, তেহরান : পার্লামেন্টারি রিসার্চ সেন্টার পাবলিকেশন্স, ১৩৯৩ সৌ. সন, পৃ. ২০৪-২০৫।

[৫২]. cv¸3, পৃ. ২০৮।

gj¨ wbaviYKvix wbqvgK¸‡jv wK wK?

এ জিজ্ঞাসাটি অর্থনীতিতে একটি মৌলিকতম সমস্যা? এ প্রসঙ্গে দুইটি মূল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়-

একটি হল- মূল্য কিসের সাথে সম্পৃক্ত? দ্রব্যের বস্তুসত্তার সাথে, নাকি কিছু মনস্তাত্ত্বিক নিয়ামক যেমন চাহিদা, সুবিধাবাদিতা, কাম্যতা ইত্যাদি। নাকি কিছু বাস্তব নিয়ামক যেমন উৎপাদন খরচ, কর্মঘণ্টার পরিমাণ ইত্যাদি। নাকি মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক- এ উভয়ের মিলিত কোন নিয়ামক?

আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল- দ্রব্যের মানের সাথে বাজারের মূল্যের কি সম্পর্ক রয়েছে?

মূল্য তত্ত্বের ঐতিহাসিক বিবর্তন নির্দেশ করে যে প্রথমে অ্যারিস্টটলীয় ও স্কলাস্টিকা রীতিতে (জীবিকার অর্থনীতিতে) মনস্তাত্ত্বিক কারণটাই যেমন প্রয়োজনকে মূল্য নির্ধারণে প্রধান নিয়ামক হিসাবে জোর দেয়া হত। পরের পর্যায়গুলোতে ক্রমে ক্রমে আধুনিক বিনিময় অর্থনীতি[৫৩] গড়ে ওঠার মাধ্যমে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদগণ ও মার্কসের মাঝে শ্রমভিত্তিক মূল্যের মতবাদের উদ্ভব ঘটে। এ মতবাদে বাস্তব কারণগুলো, যেমন পণ্যে মূর্ত শ্রমঘণ্টার পরিমাণকে মূল্যের উৎস হিসাবে জোরারোপ করা হয়। শেষ পর্যন্ত নয়া-ধ্রুপদী বিপ্লব ও গাণিতিক পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে মূল্যতত্ত্ব গুরুত্ব পায়।

নয়া ধ্রু-পদীদের মতে বাজার মূল্য চাহিদা সৃষ্টিকারীদের মনস্তাত্ত্বিক মূল্য আরোপেরও প্রতিফলন ঘটায়, আবার উৎপাদন খরচেরও সমান হয়। এক্ষেত্রে আমরা যে মতবাদেই বিশ্বাসী হই না কেন, মূল্য হচ্ছে বাজারের মূল্যের সমান। কাজেই মূল্যের বিষয়টির কোনই স্থান নেই। বর্তমানে প্রচলিত অর্থনীতিতে নয়া-ধ্রুপদীদের দৌরাত্ম্যের কারণে মান ও মূল্যারোপ তত্ত্বটি মূল্যের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের সূত্র না টেনেই বিচার বিবেচনা করা হয়। ফলে প্রকারান্তরে মানের বিষয়টি মূল্যের বিষয়ে নেমে এল। এ শক্তিশালী মতের বিপরীতে কতিপয় দুর্বল কাল্পনিক (Heterodox) মত যেমন মার্কস্‌বাদী ও নিও-রিকার্ডীয় ধারা মূল্যমানের বিষয়টি নতুন করে উপস্থাপনের প্রয়াস চালায়।[৫৪]

gvKmev‡`i mgv‡jvPbvi A_ cwRev‡`i ˆeaZv bq

বাকের সদর মার্কস্‌বাদের মূল্যের শ্রমতত্ত্বের বিশদ সমালোচনা উপস্থাপন করার পর এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতি ইশারা করেন যে, মার্কস্‌বাদের সমালোচনা যেন পুঁজিবাদের বৈধতা প্রদানের পথ হিসাবে গণ্য না হয়।[৫৫] অন্যকথায় বলা যায়, তাঁর মতে, উৎপাদনের হাতিয়ারের ব্যক্তি-মালিকানার বৈধতা প্রদান, যেন মার্কস্‌বাদের বিপরীতে, আবশ্যিকভাবে পুঁজিবাদের বৈধতায় পর্যবসিত হয় না। এতদসত্ত্বেও ইসলাম যে ব্যবসার লভ্যাংশকে বৈধ ঘোষণা করেছে, এ থেকে স্পষ্ট হয় যে মূল্য, উদ্বৃত্ত মূল্য এবং পুঁজিবাদের মুনাফাসমূহের বিশেষ যেসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সেগুলোর সম্পর্কে মার্কস্‌বাদের তাৎপর্যের সাথে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।[৫৬]

---

৫৩. বিনিময় অর্থনীতি : এ পর্যায়ে পণ্য উৎপাদন করা হয় লাভ করার উদ্দেশ্যে।

৫৪. দ্র.cv¸ ³|

৫৫. বলা বাহুল্য, যেহেতু মার্কসবাদ অকাট্টভাবে ব্যক্তি-মালিকানার সাথে বিরোধিতা করেছে, একারণে কোন কোন মুসলিম পণ্ডিত এ যুগে ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানার বৈধতার সুস্পষ্ট অবস্থানের কথা বিবেচনায় এতদসংক্রান্ত মার্কস্‌বাদের বক্তব্যের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে কোন কোন পণ্ডিত মার্কস্‌বাদের বিপরীতে ইসলামকে প্রতিরক্ষার্থে ভেতরে ভেতরে পুঁজিবাদের পক্ষে ঝুঁকে পড়ার কারণ হবে। - দ্র. cv¸ ³, পৃ. ২১৩।

৫৬. cv¸ ³, পৃ. ৪০৪।

তিনি তুলনামূলক এক বিস্তারিত আলোচনার পর পুঁজিবাদের মূল বৈপরীত্য অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য ও পুঁজিপতিদের কর্তৃক তা হরণ করা সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি উত্তমভাবে উপস্থাপন করেছেন।[৫৭] তিনি দেখিয়েছেন যে, উদ্বৃত্ত মূল্যের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মূল্যের শ্রমতত্ত্ব হতে উৎসারিত। সুতরাং যেহেতু মূল্যের শ্রমতত্ত্ব বাকের সদরের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাহলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মার্কসের নকশাটিও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। অন্যকথায় বলা যায়, দ্রব্যের বিনিময় মূল্য নির্ধরাণকারী নিয়ামক হিসাবে সামাজিক কাম্যতাকে বিবেচনায় নেওয়া, উদ্বৃত্ত মূল্য নামে কোন কিছুকে স্বীকৃতি প্রদানের পথে প্রতিবন্ধক হয়। তদুপরি প্রাকৃতিক সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাকে দ্রব্যের বিনিময় মূল্য নির্ধারণে প্রভাব ফেলার একটি মাপকাঠি হিসাবে দেখলে উদ্বৃত্ত মূল্যকে স্বীকার করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।[৫৮] লক্ষণীয় যে, পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপনা ও ঠিকাদারের তত্ত্বাবধানের অংশও যা অনেক সময় পণ্যের বিনিময় মূল্যের পরিমাত্রা নির্ধারণে প্রভাব সৃষ্টিকারী ভূমিকা রেখে থাকে, সেটাকেও দৃষ্টি থেকে দূরে রাখলে চলবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিক ও ঠিকাদারের স্বার্থের মধ্যে যে বিরোধ (যদিও তা সামাজিক দিক বিবেচনায়) বিদ্যমান, তা মার্কসের পক্ষ থেকে যেভাবে (অর্থাৎ একটি বৈজ্ঞানিক স্বরূপে) উপস্থাপন করা হয়েছে সেভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।[৫৯] অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে যে, উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব আবশ্যিকভাবে ব্যবস্থাপনা ও সৃজনশীলতার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পরিশোধ করার ক্ষেত্রে বাধা নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটা যে ঠিকাদার শ্রমিকদের পারিশ্রমিককে নিজের খরচাদির খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এমনকি হয়ত এক্ষেত্রে নিজের সময়গুলোকেও এর মধ্যে হিসাব করে নেয়। অর্থাৎ শ্রমশক্তি পণ্য হয়ে গেছে। অপরদিকে বাজারে পণ্য বিনিময় করে যা কিছু হস্তগত করে থাকে সেটাকে নিজের আয় স্বরূপ মনে করে থাকে।

সমস্যা হল এটা যে উৎপাদনের হাতিয়ারের দখলের কারণে এর মধ্যে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা সবই কেন পুঁজির মালিকের পাওনা হবে, যে পুঁজি হচ্ছে খোদ্ শ্রমশক্তির প্রকাশ এবং পুঁজির মালিকের পক্ষ থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে?

বাকের সদর এ বিষয়ে মার্কসের অভিমতের সাথে দ্বিমত করেন নি। তিনি শ্রমশক্তির পণ্যকরণের বিপরীতে বিশ্বাস করেন, মালিক, শ্রমিকের কাছ থেকে তার শ্রমকে ক্রয় করে মাত্র, শ্রমের মালিক হয়ে যায় না। একারণে শ্রমও নয়, শ্রমশক্তিও নয়- কোনটাই পণ্য কিম্বা সম্পদ নয় যে মালিক পারিশ্রমিক শোধ করার বিনিময়ে শ্রমিকের কাছ থেকে তা ক্রয় করবে। অর্থাৎ সেই বস্তুগত প্রভাব, যা শ্রমকে প্রাকৃতিক বস্তুতে সৃষ্টি করে... প্রকৃতপক্ষে এই পারিশ্রমিক হচ্ছে সেই ফায়দার মূল্য, যে ফায়দা এই নতুন রূপ মালিকের প্রাপ্য হয়... শ্রমের ফায়দা হল এমন এক জিনিস, যা শ্রম ও শ্রমশক্তির ভিন্ন কিছু। তদ্রূপ তা মানুষের অস্তিত্বের কোন অংশ নয়। বরং তা হল এমন এক পণ্য, যা মূল্যের সাধারণ মনস্তত্ত্বের মাপকাঠি অনুযায়ী অথবা সামাজিক কাম্যতার মাপকাঠি অনুযায়ী উক্ত ফায়দা যে পরিমাণ গুরুত্ব রাখে, তদ্পরিমাণে মূল্যের অধিকারী হয়।[৬০]

বাকের সদর মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের ফলাফল ব্যাখ্যায় মার্কস্‌বাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখতে পান এবং এ পার্থক্যের কথা উল্লেখ করার পর তিনি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

---

[৫৭]. দ্র.CV¸ [3], পৃ. ২১৩-২১৮।
[৫৮]. দ্র. CV¸ [3], খ. ১, পৃ. ২১৮।
[৫৯]. দ্র. CV¸ [3], পৃ. ২২১-১১১।
[৬০]. দ্র.বাকের সদর, BKwZmv'bv, কোম : ইন্তেশারাতে ইসলামি, ১৩৪৮ সৌ. সন, খ. ১, পৃ. ২২৪-২২৫।

> ‘কমিউনিজম ব্যক্তির শ্রম ও শ্রমলব্ধ জিনিসের মধ্যকার সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়। তিনি জোরারোপ করেন যে সমাজ একাকীভাবেই সকল ব্যক্তির শ্রমলব্ধ জিনিসের মালিক। কিন্তু ইসলাম এরূপ নয়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে একটি মহা অস্তিত্বের স্থানে ধরা যায় না, যা সকল ব্যক্তির পশ্চাতে অবস্থান করবে...। সত্যিকার মতবাদ ব্যক্তিদের অভিমুখী হয়... মোটকথা শ্রমিক ও তার শ্রমলব্ধ জিনিসের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করার সুযোগ নেই। একইভাবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতন্ত্রেরও বিপরীত। সমাজতন্ত্র বলে, শুধু কেবল একজন শ্রমিকই বস্তুকে নিজের শ্রমের মাধ্যমে বিনিময় মূল্যের অধিকারী করে তোলে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যেমন পাথর ও কাঠ নিজের মূল্যকে শ্রম থেকে পায় না। বরং প্রত্যেক বস্তুর মূল্য সাধারণ সামাজিক কাম্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়, যে কামনা ব্যাপক জনগোষ্ঠী উক্ত বস্তুকে পাওয়ার জন্য নিজেদের থেকে প্রকাশ করে থাকে।’[৬১]

এখানে অবশ্য মূল্যের শ্রমতত্ত্ব সম্পর্কিত বাকের সদরের সমালোচনা উপস্থাপন করার পর এ বিষয়ে তাঁর মতবাদকে যাচাই করার অবকাশ রয়েছে। বাকের সদরের মতে, ইসলামে শ্রমিকের শ্রমই তার শ্রমলব্ধ জিনিসের মালিক হওয়ার কারণ হয়। আর এই যে ব্যক্তি-মালিকানা, যা শ্রমের ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে, নির্দেশ করে যে মানুষ স্বভাবতই নিজেই নিজের শ্রমের মালিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। একারণে শ্রমের ভিত্তিতে মালিকানা অর্জন করার বিষয়টি মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার বটে এবং তা তার স্বভাবগত আবেগ ও অনুভূতি থেকেই উৎস লাভ করে। কাজেই ইসলামে শ্রমই হচ্ছে শ্রমিকের মালিকানার ভিত্তি।[৬২] অর্থাৎ, যেহেতু শ্রমই হচ্ছে মালিকানার ভিত্তি এবং বিতরণের প্রধান মাধ্যম, সেহেতু যে কেউ প্রাকৃতিক অঙ্গনে শ্রম দিবে, সে নিজের শ্রমলব্ধ জিনিসকে অর্জন করবে এবং এভাবে সে উক্ত জিনিসের মালিক হবে।

gvKmev' I ev‡Ki m'‡ii 'wóf½i mv'k¨-^emv'k¨

প্রতীয়মান হচ্ছে যে মূল্যের শ্রমতত্ত্ব সম্পর্কে বাকের সদরের মতবাদ কোন একভাবে শেষ পরিণতিতে ঐ অবস্থায় পর্যবসিত হয়, যে অবস্থায় পর্যবসিত হয় মার্কসের মূল্যের শ্রমতত্ত্ব। আসলে বাকের সদরের সমালোচনাগুলোর মধ্যে কোনটাই সারবস্তুগতভাবে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের মূল রূপকাঠামো বিধ্বংসের কারণ হয় না। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় শোষণের ধারণার জন্ম দেয় না। বাকের সদর একইভাবে মনে করেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে কোন রূপেই হোক না কেন শ্রমশক্তির শোষণে লিপ্ত থাকে।

মার্কসের মতানুসারে পণ্যের মূল্য শ্রমেরই প্রাপ্য। অর্থাৎ শ্রমই হচ্ছে বিনিময় মূল্যের উৎস। আর বাকের সদরের মতানুসারে শ্রম মালিকানার উৎস। তবে এ মতদ্বয়ের মধ্যে কি কোন স্বরূপগত পার্থক্য রয়েছে? এমনকি যদি ধরে নিই যে মূল্য বিষয়ে নয়া-ধ্রুপদীদের তত্ত্বটি, যা বাকের সদরের সমালোচনার ভিত্তি, মার্কসের মূল্যের শ্রমতত্ত্বের পরিপন্থী, তারপরও শ্রম বিষয়ে বাকের সদরের মতবাদ পুরোপুরি আলাদা ফলাফলে পর্যবসিত হয় না। এটা সুস্পষ্ট যে, শ্রমিক যদি কোন পণ্যের মালিক হয় যে পণ্য সে উৎপাদন করেছে, তাহলে তার কল্পিত বিনিময় মূল্যও তারই প্রাপ্য হওয়া উচিত, অন্য কারও নয়। এই সমীকরণের ভিত্তিতে কথা যখন এটা নিয়ে যে পণ্যের বিনিময় মূল্য শ্রম শক্তিরই প্রাপ্য, তখন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত পণ্যের মালিকানাও তারই প্রাপ্য হবে। বিশেষ করে বাকের সদর যে সকল ক্ষেত্রগুলোকে তাঁর BKwZmv'bv গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সরল উৎপাদনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর মধ্যে এই ঐক্য আরও বেশি প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান।

---

[৬১]. দ্র. cÖv¸³, পৃ. ৩১৯।
[৬২]. দ্র. cÖv¸³, পৃ. ৩৯৩।

আসলে মার্কস্‌বাদীদের সকল পুঁজি ও পণ্যকে সাধারণী তথা সর্বজনীন করার যে ঝোঁক (যা মার্কসের পরে তাদের একটি মূল কাজে পরিণত হয়) তা মার্কসের মূল্যের শ্রমতত্ত্বের সাথে যেমন কোন সম্পর্ক রাখে না, তদ্রূপ পুঁজিবাদ অবৈধ হওয়া সংক্রান্ত এ তত্ত্বের ফলাফলের সাথেও কোন সম্পর্ক রাখে না। যদিও বামপন্থী মতবাদসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশের সাথে বাকের সদরের মতৈক্য, তাঁকে মার্কস্‌বাদের মূলনীতিসমূহের উপর সমালোচনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যেমন খনিজ সম্পদ, কৃষিজমি ইত্যাদি ব্যক্তি মালিকানায় অন্তর্ভূক্ত না হওয়া মর্মে বাকের সদরের অভিমত[৬৩] হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও মার্কস্‌বাদের সাথে এ মতের প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার একটি ফল। বাকের সদরের দৃষ্টি থেকে যদি শ্রমিক কোন ফসলের মালিকানার সংকল্প রাখে যা সে নিজে উৎপাদন করেছে, তাহলে সে উক্ত ফসলের মালিক হবে। আর উৎপাদনের উপকরণ তথা হাতিয়ার ব্যবহার করা বাবদ কেবল উক্ত উপকরণের ভাড়া শোধ করবে। তাঁর দৃষ্টিতে, সম্পদের এমন কোন ধরনের ব্যক্তি মালিকানা থাকতে পারবে না যা মনুষ্য সমাজের প্রতিনিধিত্ব ও সমাজের সর্বজনীন অধিকারের জন্য বিঘ্ন ঘটায়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি মালিকানা হবে মানব সমাজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি অর্থে, ততক্ষণ এটা স্পষ্ট যে ব্যক্তি সর্বদা সমষ্টির কাছে দায়বদ্ধ। ব্যক্তিকে তার সমস্ত ভোগদখলে জন্য সমাজের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আর যে কোন ধরনের ভোগদখল হতে হবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে তার যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং যে দায়িত্ব ও কর্তব্য 'সাধারণ প্রতিনিধিত্ব' সূত্রে তার স্কন্ধে ন্যাস্ত হয়েছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।[৬৪]

অপ্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ পুঁজিবাদী কায়দায় কোন জিনিস আবাদ করা অর্থাৎ শ্রমিক নিয়োগ করা ও কাজের সরঞ্জাম তার হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বা ফসলে নিয়োগকর্তার জন্য কোন অধিকার জন্মায় না। সে উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক হয় না এবং বর্তমানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে যে পন্থা প্রচলিত রয়েছে সেই পন্থায় শ্রমের ফল সে একাই নিজের জন্যে তুলে নিতে পারে না। খনিজ উত্তোলন শিল্পে পুঁজিবাদী কায়দায় উৎপাদন, পুঁজিপতির জন্য উত্তোলিত দ্রব্যে মালিকানা সৃষ্টি করে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি এক বা একাধিক লোক তৈল উত্তোলনকারী শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করে এবং উত্তোলনকার্যে ব্যবহৃত সরঞ্জাম তাদের হাতে ন্যাস্ত করে, সেক্ষেত্রে উত্তোলিত তৈল, মজুরি পরিশোধকারীদের ও খনন কার্যে ব্যবহৃত উপকরণ ও সরঞ্জামের মালিকদের মালিকানাভুক্ত হবে না। অর্থাৎ উত্তোলন শিল্প পুঁজিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিকানা এবং অন্যান্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উপকরণ সামগ্রীর মালিকানা উক্ত সরঞ্জামাদির মালিকের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যে কোনই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে না। যখন কিছু লোক তাদের পশমকে পশম বয়নযন্ত্রে দিল তখন বয়নযন্ত্রের মালিক বয়নকৃত পশম থেকে গ্রহণ করার অধিকার পায় না। তার যন্ত্র ব্যবহার করা বাবদ শুধু যেটুকু অধিকার তার পাওনা হয় তা হল উক্ত যন্ত্রের ভাড়া। কিন্তু উৎপাদিত পণ্যে তার কোন পাওনা প্রাপ্য হবে না।[৬৫]

wbMZ kZ‡Ki cwiewZZ ev¯ÍeZvi Av‡jv‡K ev‡Ki m'‡ii mgv‡jvPbvi gj¨vqb

উপস্থাপিত পর্যালোচনার আলোকে বলা যায় বাকের সদর মূল্যের শ্রমতত্ত্বের বিশেষ এক রূপকে গ্রহণ করেছেন। যদিও মার্কসের মূল্যের শ্রমতত্ত্ব এবং এর দোষক্রুটিগুলোর ব্যাপারে তাঁর সমালোচনার ভাষাটাও ছিল কড়া। উপরুন্তু বাকের সদরের বিশ্লেষণে এ তত্ত্বটি এক নতুন কাঠামো সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং পুঁজিবাদের বিপরীতে তাঁর অবস্থানকে অনেকটা স্বচ্ছ করে তুলেছে। মার্কস্‌ ও মূল্যের শ্রমতত্ত্বের আবির্ভাবের পর পুঁজিবাদের

---

৬৩. দ্র.cv¸ 3, পৃ. ৪০২।
৬৪. দ্র.cv¸ 3|
৬৫. দ্র.cv¸ 3|

অন্যায্য স্বরূপ প্রথমবারের মত বৈজ্ঞানিক ও অকাট্য রূপ পরিগ্রহ করে। অন্যকথায় বলা যায়, যেহেতু মূল্যের শ্রমতত্ত্ব শ্রমশক্তি ও পুঁজির কর্তার মধ্যকার সম্পর্কের শোষণমূলক স্বরূপকে প্রত্যক্ষ ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছে, একারণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, কমপক্ষে মার্কস্ থেকে পরবর্তীকালে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের বিভিন্ন বর্ণনার দিকে মনোযোগ প্রদান করা আর ঠিকাদার ও মুজরীভিত্তিক শ্রমিকের মধ্যকার শোষণমূলক জটিল সম্পর্ককে বিজ্ঞান সহকারে ও অকাট্যভাবে বুঝা একসমান। এভাবে যদিও এ তত্ত্বটি মার্কসের আগেই রূপকাঠামো লাভ করেছিল, আর সেকারণেই পুঁজিবাদের শোষণমূলক চেহারা নিয়ে কথা বলাটা অর্থহীন ছিল না, তবে এ শোষণমূলক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক ও অকাট্য চেহারাটি স্পষ্ট করা যেত না। কিন্তু কার্ল মার্কস্ সক্ষম হলেন এ তত্ত্বের বক্ষ ভেদ করে একটি নতুন অর্থ বের করে আনতে এবং উক্ত অর্থের ভিত্তিতে পুঁজিবাদের শোষণমূলক সম্পর্ককে একটি সর্বজনবিদিত বিষয়ের মত স্পষ্ট করে দিতে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে, যখন এ তত্ত্বটির একটি বিশেষ রূপ বাকের সদর কর্তৃক গ্রহণ করা হল, তখন স্বাভাবিক কারণেই এর পরবর্তী ফলাফলও প্রকাশ লাভ করল। আর তা হল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শোষণমূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ফলে এটা একটি অন্যায়মূলক ও অন্যায্য ব্যবস্থা। কাজেই এটা একটা সমগ্র হিসাবে ইজতিহাদের আওতায় আসতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে কমপক্ষে পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক বিষয়ে মৌলিক সংশোধন ও সংস্কার চালাতে হবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদী প্রসঙ্গ ও উৎপাদন পদ্ধতি একচেটিয়াভাবে ছড়িয়ে পড়ায় মুসলিম চিন্তা-মানসে এখন এ উভয়সংকট দানা বাঁধতে শুরু করেছে যে এ পরিস্থিতিতে বাকের সদরের আর্থ-সামাজিক চিন্তার অবস্থান কী? অন্য কথায় বলা যায়, বাকের সদর, ড. আলী শরীয়তি, অধ্যাপক মূর্তজা মোতাহ্হারি, ড. মুহাম্মদ ইকবাল প্রমুখ সমসাময়িক মুসলিম মনীষীবৃন্দ, যারা পুঁজিবাদ বিরোধী চিন্তার ধারক ছিলেন, বর্তমান একচেটিয়া পুঁজিবাদের আধিপত্য বিস্তার করা রাষ্ট্রগুলোতে তাদের চিন্তার সমন্বয় করা কি সম্ভব? বিশেষ করে যে সকল রাষ্ট্র ইসলামি অর্থনীতির ধারায় অর্থনীতিকে পরিচালনা করে থাকে যেমন ইসলামি বিপ্লবোত্তর ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের ভেতরে ও বাইরের কিছু মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র, তারা এ উভয়সংকটে আক্রান্ত হয়ে অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হচ্ছে কি-না? অর্থাৎ তাদের চিন্তাধারা বিশেষ করে ইসলামি অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত চিন্তা-দর্শন আর সমাজের বর্তমান অবস্থার বাস্তবতা- এ দুয়ের মধ্যকার বিস্তর ফারাক তাদের চিন্তাকে অন্ধগলির মধ্যে আটকে ফেলছে না তো!

এক্ষেত্রে উদ্ভূত উভয়-সংকটকে জ্ঞানতাত্ত্বিক সমাজবিদ্যার (Sociology of Knowledge) কাছে ন্যাস্ত করতে হবে। জ্ঞানতাত্ত্বিক সমাজবিদ্যা হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের এমন একটি ধারা, যেখানে বিভিন্ন চিন্তাধারা যে পরিবেশ ও প্রেক্ষিত থেকে আবির্ভূত হয় তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে এবং উক্ত চিন্তা ও দর্শন জন্ম নেওয়ার পেছনে অভ্যন্তরীণ যে কারণগুলো ভূমিকা রাখে সেগুলোকে চিহ্নিত করে। বাকের সদরের চিন্তাগুলোও যে তৎকালীন বামপন্থী ও দৃষ্টবাদীদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দৌরাত্ম্যের আবহের মধ্যে গড়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে এটুকু বলা যায় যে অন্ততপক্ষে তাঁর কিছু কিছু তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত আবশ্যিকভাবে সর্বকালের ও সর্বযুগের জন্য অভ্রান্ত হবে এমন কোন কথা নেই। যে যুগে গোটা বিশ্বের তাবত চিন্তাবিদগণ ও মনীষীবৃন্দ পুঁজিবাদকে স্বভাবগতভাবেই শোষণমূলক বলে মত পোষণ করতেন, সেখানে এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, বাকের সদরসহ অন্যান্য মুসলিম চিন্তানায়করাও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও প্রসঙ্গের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত বামপন্থার দিকে এবং এমনকি ইসলামি ঐতিহ্যের দিকেই

অভিমুখী হবেন। কেননা, তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ও আদর্শস্থানীয় বামপন্থা ধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলার ফলেই চিন্তাদর্শনের সর্বজনীন পরিমণ্ডলে তাদের উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হত।

এরূপ গুঞ্জণের মাঝে এবং এরূপ সমাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রমশক্তি এবং শ্রমিকদের উপর যে অন্যায় ঘটে, তার উপরেই প্রধান গুরুত্ব প্রদান করা হবে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। আর যে সকল চিন্তাবিদ সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি করার সংকল্প পোষণ করেন যেমন ড. আলী শরীয়তি, বাকের সদর, অধ্যাপক মূর্তজা মোতাহ্‌হারি প্রমুখ, তারা সমাজের অধুনা শ্রেণির সাথে সংলাপে ব্রতী হন এবং অগত্যা তাঁদের ভাষাতেই কথা বলেন। পুঁজিবাদের থাবা থেকে নিস্তারের যে ধারণা এবং উৎপাদনের পরিপূর্ণতম পর্যায়গুলোতে উত্তরণের নিমিত্তে তাদের ঐতিহাসিক ও বাধ্যবাধকতাবাদী ভূমিকাকে ভেঙ্গে ফেলাই ছিল ঐ যুগের চিন্তাবিদদের চিন্তাধারার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সময়ে অপরিপক্ব দৃষ্টবাদ ও বিজ্ঞানমুখিতার দৌরাত্ম্যের কারণে সামাজিক তত্ত্ব ও মতবাদগুলোর অনাবশ্যম্ভাবী স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করে। মূল্যের শ্রমতত্ত্বটি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে গণ্য হত এবং বামপন্থীরা সমালোচকদের সাথে মুখোমুখী হওয়ার সময় তাদেরকে মেথড্‌লজির প্রাথমিক পাঠগুলো শিক্ষণে এবং বিজ্ঞানের দর্শন আর মার্কস্‌বাদ ও সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর অধ্যয়নের উপদেশ দিতেন। এ যুগে যে অপরিপক্ব বাস্তববাদ তার চরমসীমায় পৌঁছেছিল, সে প্রেক্ষিতে মার্কস্‌বাদের ভিত্তি নিয়ে কোন সংশয় প্রকাশের অবকাশ ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবে মূল্যের শ্রমতত্ত্ব নিয়েও কোন সংশয় সৃষ্টির সুযোগ ছিল না।

এদিকে নয়া ধ্রুপদী মতবাদের আবির্ভাবের পর সামাজিক বিজ্ঞানের পরিসরে মূল্য ও মান তত্ত্বের বিষয়ে একাধিক ধারা আত্মপ্রকাশ লাভ করে। ফলে ঐতিহ্যগত মতবাদসমূহের পবিত্রতাপূর্ণ স্বরূপ ক্ষুন্ন হয়। অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, আজ এমন কম চিন্তাবিদকেই পাওয়া যাবে যারা শ্রমের মূল্যতত্ত্ব নিয়ে কথা বলেন। আজ এ মতবাদর সঠিক হওয়া না হওয়া তেমন গুরুত্বই বহন করে না। মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদের ভিড়ের চাপে আজও শ্রমশক্তির শোষণেই সবার মনোযোগ। তাই অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ইত্যাদি ইস্যুগুলোতে মার্কস্‌বাদের যমানার বিপরীতে এ যুগে কেবল নৈতিক ও ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করেই ক্ষ্যান্ত থাকে। এ ধারার পক্ষাবলম্বীরা এ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় যাতে ইসলামি চিন্তাবিদরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও একাত্মতার সাথে সংলাপ ও মতবিনিময়ে লিপ্ত হতে পারেন। আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার সূত্রগুলোতে বৈচিত্র্য আনয়নের অর্থই হচ্ছে এ ব্যবস্থার শোষণমূলক স্বরূপ ও সত্তাকে নাকচ করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে হয় যে এ ব্যবস্থার মধ্যে আর কোন অন্যায় ও শোষণমূলক স্বরূপ নিহিত নেই যা সমালোচকদের বাহানায় পরিণত হবে।

বর্তমানে উত্তর-আধুনিক ধারার আবির্ভাবের পর চিন্তা-অনুধ্যান ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের সক্ষমতা কমে এসেছে এবং অতীতের ন্যায় চিন্তার সূত্রাবলির ভিত্তিতে প্রকৃত বিশ্বের পুনর্গঠনের সুযোগ এখন আর নেই। এখন কেবল তাত্ত্বিক ও অ-তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রদর্শন করেই চলতে হবে, যেগুলোর অধিকাংশই ব্যক্তি থেকে সমষ্টি অবধি সামাজিক আচার-আচরণের উপর ভিত্তিশীল। এমতাবস্থায় মূল্যের শ্রমতত্ত্বের অখণ্ডনীয় স্বরূপের প্রতি গুরুত্বারোপ করার পরিবর্তে সংলাপ ও আলোচনার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে, ব্যক্তিগত সৃজনশীলতার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে এবং এমন সব আলোচনা চালু করতে হবে যার পথ ধরে পুঁজিপতি ও শ্রমিক নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন অংশ প্রযুক্তি, কারিগরি, শিক্ষা, নৈতিকতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারে। বিমূর্ত চিন্তাধারার ওপর গুরুত্বারোপ করার পরিবর্তে এবং এ সূত্র ধরে সমাজের পরিমণ্ডলকে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণিতে বিভক্তি ও মেরুকরণ করার পরিবর্তে বিশালায়তনে বিচিত্র সামাজিক শ্রেণির ক্রমধারা গড়ে তুলতে হবে।

8. c׳Rev‡'i mv‡_ Zjbv

পুঁজিবাদ হচ্ছে একটি অর্থ-ব্যবস্থা যেখানে পণ্য এবং পরিষেবার উৎপাদন ও বিতরণ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকে।[৬৬] কখনো কখনো একে বলা হয় 'ফ্রি এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম' (free enterprise system), যে সিস্টেমে ব্যক্তিরা তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। আবার কখনো কখনো একে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' বলে অভিহিত করা হয়। কারণ এ অর্থ-ব্যবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ তাদের পণ্য ও সেবা বিনিময়ে স্বাধীন থাকে।[৬৭] উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজি বা মূলধন হচ্ছে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের একটি উপাদান। সম্পদ বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমি, যন্ত্র, শ্রম এবং পুঁজি- এই চারটি উপাদান প্রধান। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 'পুঁজি' শব্দ দ্বারা নতুন পণ্য ক্রয়ের আর্থিক সামর্থ বোঝায়। এরূপ অর্থে পুঁজি বলতে কেবল টাকা নয়, মালিকের মালিকানাধীন দালানকোঠা, জমি-জমা, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী বোঝাতে পারে।[৬৮]

মার্কস্‌বাদী অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় পুঁজির আসল কাজ হল বাড়তি পণ্য অর্থাৎ বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করা এবং এই কাজ দিয়েই তার পরিচয়। কাজেই যে কোন উৎপাদন যন্ত্র বা উপায় বাড়তি মূল্য তৈরির কাজে নিয়োজিত হলে তাকে পুঁজি বলা যেতে পারে। পুঁজিই অর্থ এবং পুঁজিই পণ্য। মূল্য হওয়ার দরুণ এটা নিজের মূল্য বাড়াবার যাদুময় ক্ষমতার অধিকারী। তা জীবন্ত বাচ্চা দেয় অথবা অন্তত পক্ষে সোনার ডিম পাড়ে।[৬৯] পুঁজি কথাটির ভেতরেই অনেক কথা লুকিয়ে আছে।

পুঁজিবাদের প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে মধ্যযুগীয় ইউরোপে। সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণির ক্রমবিকাশের ধারায় বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। পুরোহিতদের সাথে যোগসাজসে রাজতন্ত্র হয়ে ওঠে চরম শোষণতন্ত্র ও পীড়ণবাদী শাসনব্যবস্থা। ফ্রান্সে ভূমিবাদীদের প্রভাব মিলিয়ে না যেতেই প্রথমে ইংল্যান্ডে এবং পরে সমগ্র ইউরোপে বণিকবাদ তথা মার্কেন্টাইলিজমের বিকাশ ঘটে। এদের মূল কথা ছিল বেশি করে রপ্তানী করো, প্রাপ্য অর্থ সোনাদানায় বুঝে নাও। আর গোটা দুনিয়ার সম্পদ এনে জড়ো করো নিজের দেশে। পৃথিবীর সেরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেন এর নেতৃত্ব দিয়েছিল। পুঁজিবাদের বীজ নিহিত ছিল এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যেই। সেটা আরও উচ্চকিত ও প্রবলতর হয় শিল্প বিপ্লবের ফলে। এসময়েই ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হল অ্যাডাম স্মিথের পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির কালজয়ী গ্রন্থ '¨ I‡qj_ Ad †bkÝ।

শিল্প বিপ্লবের ফলে উপনিবেশবাদ আরও জেঁকে বসে। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের আবিষ্কার ও শিল্প উৎপাদনের ক্রমবিকাশমান কলাকৌশলকে বেনিয়ারা নিজেদের স্বার্থে ব্যাপক ও নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এরই ফসল শিল্পবিপ্লব। পুঁজিবাদের জীবনদর্শন হল জড়বাদী বা বস্তুবাদী জীবন দর্শন। যেখানে এই নশ্বর জীবন পুরোপুরি ভোগের বস্তু বলে স্বীকৃত। এ দর্শনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে বলা হত 'খাও দাও আর ফূর্তি করো।' প্রকৃতপক্ষে যান্ত্রিক ও ইতর বস্তুবাদ হয়ে পড়লো সমাজ দর্শনের ভিত, যেখানে নীতি-নৈতিকতা নিতান্তই অবান্তর। আর এ বস্তুবাদে ইন্ধন যোগালো অবাধ ও নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-মালিকানা এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণা। প্রথমদিকে চার্চের পুরোহিতরা কিছুটা বাধার সৃষ্টি করতে চাইলেও তাদের সে চেষ্টা রাজন্যবর্গ ও বুর্জোয়া শ্রেণির চাপে টিকতে পারেনি। এরই সাথে পরবর্তীকালে যুক্ত হল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। পুঁজিবাদ এভাবেই তার শক্তিমত্তা ও দাপট

---

[৬৬]. The New International Websites Comparative Dictionary of English Language (Deluxe Encyclopedic Edition, Trident Press International) 2003 Edition, p. 148 *'Capitalism is an economic syetem in which the production and distribution of goods and services are privately owned'.*

[৬৭]. cv¸ ³, পৃ. ৬৮৮।

[৬৮]. দ্রঃ সরদার ফজলুল করিম, 'kb‡Kvl, প্যাপিরাস, ঢাকা : জুলাই ২০০৬, পৃ. ৯৭।

[৬৯]. কার্ল মার্কস্‌, c׳R, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো : ১৯৮৮, পৃ. ১৯৮।

বৃদ্ধি করে অগ্রসর হয়। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ দিয়ে তার শুরু। ক্রমে শিল্প পুঁজি, ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল ইত্যাদি পর্যায় পেরিয়ে সে পৌঁছেছে আন্তর্জাতিক তথা বহুজাতিক পুঁজির বিশাল বাজারে। এ বাজার তারই রচিত, বিশ্বকে শোষণে তারই উদ্ভাবিত কৌশল। এর অপ্রতিরোধ্য গতি ও সাফল্যকে ধরে রাখতে পুঁজিবাদের সর্বশেষ কৌশল হল বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ।

cwRev‘x Drcv‘‡bi bKkv[৭০]

M → C → *Lp* → P → C\` M\`

C → *Mp* → P

M\` - M = ΔM

এখানে

M = Initial money capital

Lp = Labour power

Mp = Means of production (raw material and machinery)

P = Production

C = Commodities

M\` = Sales value of the commodities

ΔM = Profit / surplus value

Next Cycle of production will start with M + part of ΔM

উপরোক্ত নকশা অনুযায়ী পুঁজিবাদের যেসব অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য (মার্ক্‌সীয় অর্থে) পাওয়া যায় তা হচ্ছে -

ক. যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদের বা অর্থ-বিত্তের ব্যক্তিগত মালিকানা।

খ. অর্থ-বিত্ত-সম্পদ অলস ফেলে না রেখে বা ভোগ-বিলাসে না উড়িয়ে তা দিয়ে শ্রমশক্তি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করা। মার্ক্‌স্‌ অবশ্য বেশি জোর দিয়েছেন শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয়ের উপর।

গ. তার বা তার প্রতিনিধির পরিচালনায় পণ্য উৎপাদন এবং তা বাজারে বিক্রি করে মুনাফা উপার্জন করা।

ঘ. পুঁজির পরিমাণ অনুযায়ী মুনাফা এমন মাত্রায় হতে হবে যাতে তার একাংশ সঞ্চয় করে পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে পুনরুৎপাদন শুরু করা সম্ভব হয় এবং বাকি অংশ দিয়ে পুঁজির মালিক শ্রমিকের তুলনায় যথেষ্ট ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়।

এক কথায় পুঁজিবাদের ব্যাখ্যায় পুঁজি একটি সামাজিক সম্পর্ক বা সামাজিক শক্তির একটি জটিল পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। এভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একাধারে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে। কেননা, মুক্ত বাজারে

[৭০]. সূ. ÔmgvR A_bxwZ I ivóª সাময়িকী, ঢাকা : সমাজ গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত,সংখ্যা ৮, জানুয়ারী ২০১৪, পৃ. ১০-১১।

প্রত্যেক প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এ ভয় কাজ করে যে কেউ মূল্য বৃদ্ধি করে নাকি মূল্যহ্রাস ঘটায়। আর এ ভয় থেকে তাদের মধ্যে মূল্যের ব্যাপারে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ব্যক্তি পর্যায় থেকে সমাজ পর্যায়ে বিস্তৃত হয়।

পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে -

১. জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি।
২. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন।
৩. অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা।
৪. উন্মুক্ত বা অবাধ অর্থনীতি।
৫. ব্যক্তির নিরঙ্কুশ মালিকানা।
৬. লাগামহীন চিন্তার স্বাধীনতা।
৭. গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন।
৮. পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী।

একটি পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় কি উৎপাদন করতে হবে, কীভাবে উৎপাদন করতে হবে এবং কার জন্য উৎপাদন করতে হবে- অর্থনীতির এই সকল কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলো মীমাংসিত হয় চাহিদা ও সরবরাহ শক্তির মুক্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে।

c‚Rev‡‘i A_‰bwZK ‘kb

জড়বাদী জীবন দর্শনের অর্থনৈতিক মতাদর্শ পুরোপুরিই ভোগবাদী ও ব্যক্তি ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা নির্ভর। সমাজের কল্যাণ বা রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে গৌণ। ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায় এই ইচ্ছারও রূপান্তর ঘটেছে। ভূমিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমে মার্কেন্টাইলিজম, সংরক্ষণবাদ, অবাধ অর্থনীতি এবং অধুনা উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাজার অর্থনীতির নামে অবাধ ও অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিতে রাষ্ট্রও উৎসাহ ও মদদ যুগিয়েছে। সেভাবেই তৈরি হয়েছে দেশের বিচার ও আইন কাঠামো। নিজ দেশের সম্পদ যখন পর্যাপ্ত মনে হয়নি তখন ছলে বলে কৌশলে অন্য দেশের সম্পদ লুণ্ঠনে তৎপর হয়েছে। কখনো এরা জোট বেধে চড়াও হয়েছে অন্যের উপরে। কখনো বা একাকী প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল লুটে নিয়েছে। শুধু বাণিজ্যের নামেই পুঁজিবাদ যা করেছে তা নজিরবিহীন। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর স্বার্থেই গড়ে উঠেছে বিশ্বব্যাংক। বাণিজ্য সুবিধা লাভের জন্য গ্যাট, আঙ্কট্যাড হতে উত্তরণ ঘটেছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায়। অসম প্রতিযোগিতা ও অশেষ মুনাফার জের ধরে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। এরাই অর্থনীতির নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানকে প্রকারান্তরে এরাই কুক্ষিগত করে রেখেছে। ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বারবার আবির্ভাব হয়েছে মন্দার, কখনো তার রূপ হয়েছে মহামন্দার। চরম ব্যক্তিস্বার্থপরতা, একচেটিয়া কারবার, অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের অভিলাষ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনে গুরুত্ব না দিয়ে বিলাস সামগ্রী উৎপাদন জোরদারের ফলশ্রুতিতে ১৯৩০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত হয়েছিল এই মহামন্দা। একদিকে হাজার হাজার টন গম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, ক্ষেতের ভুট্টা ক্ষেতেই পুড়েছে, আপেল-আঙ্গুর-পীচ-কমলা গাছতলাতেই পচেছে, অন্যদিকে নিরন্ন বুভুক্ষ লক্ষ লক্ষ নর-নারী কর্মহীন, উপার্জনহীন ও চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থায় কাটিয়েছে। ব্যাংকের পর ব্যাংক লালবাতি জ্বালিয়েছে, কারখানাগুলা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই গভীর সঙ্কট হতে উত্তরণের জন্যে রাষ্ট্রকেই আবার গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসতে

হয়েছে, পুঁজি বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। অসহায় শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্যে ভাতা ও কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করতে হয়েছে। শাস্ত্রে পূর্ণপ্রতিযোগিতার কথা বলা থাকলেও বাস্তবে কাজ করে অপূর্ণ ও অসম প্রতিযোগিতা।

সুদ এই অর্থনীতির জীয়নকাঠি। সুদের মাধ্যমেই তার সকল লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সুদ যে অপরিমেয় ক্ষতি করে তা পুষিয়ে নেওয়ার বা তার প্রতিবিধানের কোন উপায় নেই এই অর্থনীতিতে। পুঁজিবাজার, বিনিয়োগ, কর্ম-সংস্থান, উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, মুনাফা সকল কিছুরই নেপথ্যে নির্ণায়ক ও নির্ধারক শক্তি হচ্ছে সুদ। রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় বাংকের মাধ্যমে সুদের হার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও তা সবসময় ফলপ্রসু হয় না। এর পরিণাম ফলও সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আসে না। মিল্টন ফ্রিডম্যান, ম্যাক্স বেভার, গুনার মিরডল, পল এ্যন্থনী স্যামুয়েলসন, ডাবলিউ, রষ্টো, আর্থার লুইস, টি, ডাবলিউ, সুলজ, সাইমন কুজনেটস্, জন কেনেথ গলব্রেথ অথবা অমর্ত্য সেন কেউই পুঁজিবাদের চক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারেন নি। বরং একে সকলেই ঘষে-মেজে প্রকারান্তরে এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতেই সহায়তা করেছেন। একজনের ভুল ব্যবস্থাপত্র অন্যজন শুধরে দিয়েছেন। ফন হায়েক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারি হস্তক্ষেপের ঘোরতর বিরোধিতা করলেও কেইন্স গলব্রেথরা এগিয়ে এসেছেন সরকারের হাতকেই শক্ত করতে, যেন পুঁজিবাদের রেলগাড়ী লাইনচ্যুত হয়ে গেলে তাকে আবার লাইনে তুলে দিয়ে সচল করা যায়।

পুঁজিবাদে ব্যক্তির স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ। পুঁজিবাদী জীবনব্যস্থায় একজন লোকের নিজের খেয়াল-খুশী মতো যে কোন কিছু করার স্বাধীনতা রয়েছে। তার এই স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে শুধু তারই তৈরি আইন অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত পার্লামেন্ট, ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক জান্তা। তার ভোগের পেয়ালা উপচে পড়লেও সে নিবৃত্ত না হলে দোষের কিছু নেই। শত সহস্র আদম সন্তান ক্ষুৎপিপাসায় কাতর থাকলেও তার খাবার টেবিল বহুবিচিত্র পদে সজ্জিত ও ভরপুর থাকা চাই। শুধু ভোগেই নয়, বিনিয়োগ, বণ্টন, উৎপাদন, পারিবারিক জীবন, সাংসারিক জীবন-সর্বত্রই তার এই স্বাধীনতা স্বীকৃত ও কাজে কর্মে প্রতিফলিত। ইন্দ্রিয়পরায়নতাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

পুঁজিবাদে ব্যক্তিই তার অর্জিত ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা ভোগ করে। এই সম্পত্তি সে ইচ্ছামত ব্যবহার ও ভোগ করতে পারে। চুড়ান্ত ভোগ-বিলাসের জন্য ব্যক্তি তার সম্পদের পুরোটাই ব্যবহার করলেও তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। পক্ষান্তরে আত্মীয়-স্বজনকে বঞ্চিত করে কুকুর-বিড়ালকে সম্পদ দিয়ে গেলেও বলার কেউ নেই। মৃতের সম্পদের ওয়ারিশ তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা পরিবারের সবাই নয়, বরং ব্যক্তি যার নামে উইল করে যাবে বা যাকে নোমিনি করে যাবে সম্পদ সেই পাবে। অন্যথায় পাবে জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যা।

ev‡Ki m'‡ii we‡kølY

বাকের সদর তাঁর dvjmvdvZbv গ্রন্থের মধ্যে পুঁজিবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণের সূচনা করেছেন এভাবে:

> 'নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হচ্ছে একটি জড়বাদী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় মানুষ তার উৎপত্তি ও গন্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বস্তুগত মুনাফা।'[৭১]

তিনি পাশ্চাত্যে বস্তুবাদের প্রচলন ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি তথা মূলনীতি হিসাবে কোন লিখিত দর্শন নেই ঠিকই, কিন্তু তাই বলে একথার অর্থ এটা নয় যে পুঁজিবাদী বিশ্বে কোন বস্তুবাদী

[৭১]. বাকের সদর, dvjmvdvZbv, (ফা. অনু. সাইয়্যেদ হোসাইনী), তেহরান : বদর পাবলিশার্স, ১৩৬২ সৌ. সন. পৃ. ১৭৬।

মতাদর্শ (ডকট্রিন) নেই। কেননা, ইতিহাস নির্দেশ করে যে, অভিজ্ঞতাসর্বস্ব বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবাধীনে শিল্প বিপ্লবের প্রথম থেকেই বস্তুবাদী টান ও ঝোঁকসমূহ বিদ্যমান ছিল। অপরদিকে, এ যুগেই বহু মানুষের মধ্যে সংশয়বাদী মননশীলতা আর চিন্তাগত দোদুল্যমানতা বিস্তার লাভ করে। তৃতীয় প্রেক্ষিত ছিল এ সময়ে ধর্মের স্থবিরতা ও পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ এতটাই ফেটে পড়ে যে, কেউ কেউ মনে করেন অসহায়দের বিরুদ্ধে সামাজিক দুর্নীতির ক্ষেত্রে ধর্ম সাহায্য করতো। এ সমস্ত কারণই পশ্চিমাদের চিন্তা-চেতনায় বস্তুবাদের প্রচলন ঘটতে ভূমিকা রাখে।[৭২]

বাকের সদর পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে দুইটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত করেছেন। একটি হচ্ছে বিজ্ঞানগত (Scientific) দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপরটি হচ্ছে মতাদর্শিক (Doctrinal) দৃষ্টিভঙ্গি। ঠিক যেভাবে তিনি মার্কসীয় অর্থনীতিকেও এ দুই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত করেছেন। বাকের সদরের মতে, পুঁজিবাদ তার বিজ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থিতিশীলতা ও বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি উদ্দেশ্যমূলক উপায়ে অর্থনৈতিক জীবনের ঘটনাবলির ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করে।[৭৩]

আর পুঁজিবাদী ডকট্রিন তথা মতাদর্শ হচ্ছে একটি সামাজিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদ যে সামাজিক ব্যবস্থার দিকে আহ্বান করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মানব জাতিকে নেতৃত্ব প্রদান করে।[৭৪] বাকের সদর দাবি করেন যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির উত্থানের সময় অর্থনীতিবিদদের মধ্যে দুটি ধারণা বিস্তৃত ছিল -

প্রথমত, অর্থনৈতিক জীবন চালিত হয় কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা, যেগুলো সমাজের সমস্ত অর্থনৈতিক অস্তিত্বকে শাসন করে থাকে। কাজেই অর্থনীতিবিদদের কাজ হল মানব জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ এবং ঘটনাবলিকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত নিয়মগুলোকে আবিষ্কার করা।

দ্বিতীয়ত, এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলো মানুষের সুখের নিশ্চয়তা বিধান করে যদি সেগুলো একটি মুক্ত পরিবেশে প্রয়োগ করা যায় এবং সমাজের প্রতিটি সদস্য যদি মালিকানা, ভোগ এবং ব্যবহারের স্বাধীনতা উপভোগ করে।[৭৫]

বাকের সদরের মতে, প্রথম ধারণাটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিজ্ঞানগত ভিত্তির মধ্যে নিহিত। আর দ্বিতীয় ধারণাটি নিহিত রয়েছে এর মতাদর্শিক ভিত্তির মধ্যে।[৭৬]

বাকের সদর বর্ণনা করেন, সে সময়কার অর্থনৈতিক চিন্তাবিদরা বিশ্বাস করতেন যে এ দুটি ধারণা একে অপরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে নিষিদ্ধ করা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তার অর্থনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হত।[৭৭] যাহোক, এধরনের চিন্তাধারা আর শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ কোন পরিস্থিতিতেই ব্যর্থ হয় না। সুতরাং পুঁজিবাদী স্বাধীনতাকে প্রাকৃতিক নিয়মের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে গণ্য করা এবং এগুলোকে লঙ্ঘন করা তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে বিবেচনা করাটা ভুল।

---

৭২. দ্র.Cv¸ ³ |

৭৩. দ্র.বাকের সদর, BKwZmv‘bv, ইং. অনু. তেহরান : ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক সার্ভিসেস, ১৯৮২, খ. ১, পৃ. ৩।

৭৪. Cv¸ ³ |

৭৫. Cv¸ ³, পৃ. ৯।

৭৬. Cv¸ ³ |

৭৭. Cv¸ ³, পৃ. ১০।

বাকের সদরের মতে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলো ব্যক্তি কর্তৃক মালিকানা, ভোগ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে মাত্রার স্বাধীনতা ভোগ করে তার সকল পরিস্থিতিতেই নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে থাকে।[৭৮]

বাকের সদর মনে করেন, পুঁজিবাদে বড় শূন্যতা আধ্যাত্মিকতায়। পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় শূন্যতার জায়গা হচ্ছে এ জীবনদর্শনে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন প্রয়াসের শূন্যতা। বৈষয়িক উন্নতিই এর একমাত্র বা চুড়ান্ত লক্ষ্য। স্বার্থ ও উপযোগিতাবাদই এর আইন-কানুন বা নীতি নির্ধারণের প্রধান মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে থাকে। এখানে সম্পদের দাপটে মানুষ মানুষের উপর প্রভুত্ব করে। চরিত্রহীনতার সংজ্ঞা এখানে নতুন করে লেখা হচ্ছে। মানুষের স্বার্থে মানুষের মনগড়া আইন দিয়েই এই সমাজব্যবস্থা পরিচালিত বলে পুঁজিবাদী জীবনদর্শন ভারসাম্যহীন ও একদেশদর্শী।

বাকের সদরের উপরোক্ত মূল্যায়নের আলোকে পুঁজিবাদের বর্তমান চরিত্রকে সংক্ষেপে তুলে ধরলে যা দাঁড়ায় তা নিম্নরূপ :

১. একক পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ;
২. চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য (ধনী-দরিদ্রের জীবন যাপনের ব্যয়সূচক বিগত দুই দশকে ১০ঃ১ হতে ৭০ঃ১ এ উন্নীত);
৩. বিশ্বায়ন ও উদারিকরণের ছলে বিশ্বকে শোষণের কৌশল গ্রহণ;
৪. যুগপৎ চরম দারিদ্র্য ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন নিত্যকার দৃশ্য;
৫. গণতন্ত্রের স্লোগানের আড়ালে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা;
৬. স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পুঁজিবাদী জীবনাদর্শের স্লো-পয়জনিং;
৭. এনজিও কালচার পত্তনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শোষণের বিস্তৃতি এবং
৮. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার।

বিশ্বখ্যাত ধনপতি বিল গেট্স এর পুঁজিবাদ সম্পর্কে অকপট স্বীকোরোক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> 'পুঁজিবাদ একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, যা মানুষের মাঝে প্রেরণা যোগায়। এর কারণে কিছু উদ্ভাবন হতে পারে। কিন্তু এ পৃথিবীর সব এলাকার জন্য এটা মঙ্গলজনক নয়।'[৭৯]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে কমিউনিজম কিম্বা পুঁজিবাদ সম্পর্কে যে উপলব্ধি খোদ্ পশ্চিমাদের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে, সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর ৭০ বছর আগেই সেগুলো শনাক্ত ও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অতঃপর তিনি বিকল্পস্বরূপ ইসলামি অর্থনীতির রূপরেখা প্রস্তাব করেন। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিচারে BKwZmv'bv ছিল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মার্কস্‌বাদের বাঁধভাঙ্গা প্লাবনের বিপরীতে এক প্রতিক্রিয়া। তিনি পুঁজিবাদেরও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা উপস্থাপন করেছেন। অবশ্য তাঁর মার্কস্‌বাদের সমালোচনায় যে গভীরতা চোখে পড়ে, পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে তদ্রূপ বৈজ্ঞানিকভাবে সমালোচনা করা হয়নি। এর কারণ হিসাবে যেটা বলা যায়, তা হল বাকের সদর মূলত বিশ্বাস করেন যে পুঁজিতন্ত্রের কোন বৈজ্ঞানিক রূপ নেই। বরং এক প্রকার অর্থনৈতিক সিস্টেমের প্রতিই এর নির্ভরতা বেশি। তিনি মার্কস্‌বাদী রাজনৈতিক অর্থনীতিকেও প্রাচ্য ব্লকের উপর শাসনকারী

---

৭৮. cÖ, ³|

৭৯. দৈনিক যুগান্তর (ঢাকা), ৪ঠা এপ্রিল, ২০১৬ সংখ্যা।

একটি সিস্টেমের পর্যায়ে অবনমিত করেন এবং এটাকে মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থনীতির বাস্তবিক রূপ বলে মনে করেন। তিনি এই অবনমন ও সরলীকরণের মাধ্যমে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দ্বিত্বতা তুলে ধরেন, যাতে এর বিপরীতে ইসলামি অর্থনীতিকে উত্থাপন করতে পারেন। বাকের সদর দুইটি বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতে একটি অনস্তিত্বশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলেন। অর্থাৎ তিনি একটি অনস্তিত্বশীল ও নিছক তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে এমন সব বিষয়ের মোকাবিলায় লিপ্ত হন যেগুলো কার্যত বাস্তবায়নগত সমস্যার সম্মুখীন।

এখানে এটাই প্রশ্নের বিষয়। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি অর্থনীতিও অপর দুই অর্থ-ব্যবস্থার ন্যায় বাস্তবায়ন না হবে এবং এর দুর্বল ও শক্তিশালী দিকগুলো প্রকাশ না পাবে, ততক্ষণ কি একে ঐ অর্থ-ব্যবস্থাদ্বয়ের সাথে তুলনা করা এবং একটিকে অপরটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে রায় দেওয়ার অবকাশ আছে?

বাকের সদর বিশ্বাস করতেন যে এ উভয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মানুষের স্বার্থপর ঝোঁক-প্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদুটির একটি শক্তিমান তথা বিজয়ীর পক্ষ নেয়, আর অন্যটি নেয় বিজিতের পক্ষ। কিন্তু বাস্তবায়নের পর্যায়ে এসে তারা তাদের দাবিকৃত একনিষ্ঠতাকে রক্ষা করতে পারেনি। বরং প্রত্যেকেই বিপরীত ব্যবস্থার কিছু অংশকে আত্মীভূত করেছে।

প্রত্যেক তত্ত্বেরই প্রয়োগের পর্যায়ে কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। নিখাঁদ ও নির্ভেজাল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদ বাস্তব জগতে হয়ত কখনই সম্ভবপর হবে না। একারণে যে সকল ব্যবস্থা বাস্তব জগতের সীমাবদ্ধতার সাথে পাঞ্জা লড়ে চলেছে, তাদের সাথে যে ব্যবস্থার স্রেফ তাত্ত্বিক ভিত্তিকেই দাঁড় করানো হয়েছে, তার তুলনা সঠিক বলে মনে হয় না।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র- এ উভয় অর্থ-ব্যবস্থার যাত্রাবিন্দু হচ্ছে বাইরের বাস্তবতা। এ ব্যবস্থাদ্বয় এবং এদের সমর্থনকারী রাজনৈতিক অর্থনীতি এমন কিছু ঘটনাবলি থেকে শুরু করে, যা অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে সংঘটিত হয়। আর তাদের পার্থক্য শুধু এসব ঘটনাবলির স্বরূপ ও গতিপথ উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত। কিন্তু বাকের সদরের দৃষ্টিতে যে ইসলামি অর্থনীতি, প্রতীয়মান হয় যে সমসাময়িক বিশ্বের ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত তার কাছে মুখ্য নয়। বরং সেটা দেশ-কালের ঊর্দ্ধে কিছু।

তিনি এক প্রকার নৃ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র- এ দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল উদ্‌ঘাটন এবং একে ইসলামি নৃ-তত্ত্বের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে একটি কার্যকর ও সর্বব্যাপী ব্যবস্থা হিসাবে তাঁর নিজের ডিজাইনকৃত ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূলে সত্যয়ন খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস চালান।

বাকের সদর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর বিশেষ করে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর উপর পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধ্বংসাত্মক প্রভাবসমূহের ব্যাপারে আলোচনা থেকে বিরত থাকেন। যে প্রভাব এক শতাব্দীকাল আগে থেকে আরম্ভ হয়েছিল এবং মুসলমানরূপে বেঁচে থাকাকে কার্যত অসম্ভব করে ফেলছিল। সেক্ষেত্রে তিনি সেই বিপদের হুমকির ব্যাপারে বেশি সোচ্চার হন, যে হুমকি নিজেকে পুঁজিবাদের বিকল্প হিসাবে পরিচয় দিচ্ছিল (অর্থাৎ মার্কস্‌বাদ)।

পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার প্রতি অমনোযোগিতা এবং মুসলমানরূপে বাঁচার এবং তদ্রূপ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা যা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় স্বল্পকালের জন্য আরব উপদ্বীপে চালু হয়েছিল, এটাই প্রমাণ করে যে বাকের সদর কতটা আত্ম-সচেতন ছিলেন এবং অতীতে প্রত্যাবর্তনে কতটা আগ্রহী ছিলেন, যে অতীত হুমকির সম্মুখীন ছিল। বাকের সদর মুখপাত্র হয়ে কথা বলেছেন। এই অতীতে প্রত্যাবর্তনের আগ্রহে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইন-কানুন নয়, বরং নৈতিক ও দীক্ষাগত বিষয়গুলোই অগ্রাধিকার লাভ করত।

Iô Aa¨vq

Bmjvwg A_bxwZi iƒc‡iLv

Iô Aa¨vq

Bmjvwg A_bxwZi iƒc‡iLv

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন হিসাবে ইসলাম ধর্ম মানব জীবনের সর্ব অঙ্গনে কথা বলেছে। মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও বিশ্ববীক্ষা থেকে আরম্ভ করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ প্রত্যেকটি অঙ্গনে ইসলাম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে। একটি কল্যাণরাষ্ট্র গঠন এবং পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণে পৌঁছুনোর ব্যাপারে অপরিহার্য দিকনির্দেশনা ও রূপরেখা ইসলাম উপহার দিয়েছে।

ইসলামের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় অনেক শীর্ষস্থানীয় মুসলিম মনীষী ইসলামের এ অবস্থানকে আরও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালিয়েছেন এবং ধর্মের বুনিয়াদী তাৎপর্যের ভিত্তিতে সেগুলো সুবিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের সদর সমসাময়িক কালের এমনই একজন বরেণ্য মুসলিম চিন্তাবিদ, যিনি এক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার আলোকে ইসলামের দর্শনকে যুগোপযোগী ভাষায় উপস্থাপন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। বিশেষ করে ইসলামের অর্থনৈতিক ডকট্রিন সম্পর্কে তিনি অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন, যা আসলে ইসলামের সমৃদ্ধ উৎস্যসমূহ হতে গৃহীত।

দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অর্থ-ব্যবস্থায় যে অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছিল, বাকের সদরের দার্শনিক বিশ্লেষণে উক্ত অচলায়তন ভেঙ্গে তার মধ্যে গতি সঞ্চারিত হয় এবং নানান অর্থনৈতিক জটিলতা নিরসনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ইসলামি অর্থনীতির উপর রচিত তাঁর একাধিক গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র[১] অধুনা মুসলিম বিশ্বের জন্য এক অভিনব ও মূল্যবান কর্ম হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার যে প্রবিধান চালু হয়েছে, তা অনেকাংশে এ মনীষীর উপস্থাপিত সামগ্রিক চিন্তা ও রূপরেখার ফসল।[২] দৃশ্যত প্রতীয়মান হয় যে বাকের সদর যে সমস্ত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, কালপাত্র বিচারে সেগুলোর একটি বড় অংশ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও প্রাচ্য ব্লকের সমালোচনা ও বিশ্লেষণেই কেন্দ্রিভূত ছিল, যা তৎকালের প্রেক্ষিতে বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অঙ্গনে ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাকের সদর বিশ্বাস করেন, আধুনিক বিশ্বে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র যে সমস্ত সমস্যাগুলো মানুষকে জর্জরিত করে রেখেছে, সেগুলো সমাধানে উত্তম বিকল্প হতে পারে ইসলামি অর্থনীতি। এভাবে তিনি ইসলামি অর্থনীতিকে তৃতীয় পথ হিসাবে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক অর্থনীতিরই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। একটি হচ্ছে বিজ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপরটি মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কসীয় অর্থনীতির বিজ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। আর এর মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয় স্যোশালিজম ও

---

[১]. অর্থনৈতিক চিন্তাদর্শনের উপর রচিত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের সদরের অনেক রচনাকর্ম রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত দুইটি গ্রন্থ BKwZmv'bv এবং Avj-e¨vsK Avj-jv ivewe`q¨vn wd Avj-Bmjvg ছাড়াও ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত Avj Bmjvg BqvK' Avj nvqvZ শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি গবেষণাপত্র যেমন'সূরাতু আন ইক্‌তিসাদ আল-মুজতামা আল-ইসলামি, 'আল উসুস আল আম্মাহ লিল বাঙ্ক ফি আল মুজতামা আল ইসলামি', 'মাদা তা'রিফু আনিল ইক্‌তিসাদ আল-ইসলামি'এর কথা উল্লেখযোগ্য। তদ্রূপ ১৯৭৫ সালে বৈরুতের দার আল-যাহ্‌রা প্রকাশনী হতে প্রকাশিত BLZvibv jvKv শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত 'খুতাতু তাফসিলীয়্যাহ আন ইক্‌তিসাদ আল-মুজতামা আল-ইসলামি', 'আল জানিব আল ইক্‌তিসাদি মিন আল নিযাম আল-ইসলামি', 'আল নিযাম আল ইসলামি মুকারানান বিল নিযাম আল রা'সুমালী ওয়াল মার্কসি','আল নাযারিয়্যাতু আল-ইসলামিয়্যাহ লি-তাউযি আল মাসাদির আল তাবিয়িয়্যাহ্‌', 'আল মাদরাসা আল ইসলামিয়্যাহ্‌', 'দাওর আল-দাওলাতি ফি আল ইক্‌তিসাদ আল ইসলামি' ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলো পরবর্তীকালে পৃথক পৃথক পুস্তিকারূপেও প্রকাশিত হয়।

[২]. দ্র. সাইয়্যেদ আব্বাস মুসাভিয়ান, "বঙ্কদরিয়ে বেদুনে রেবা আয নেগাহে শাহীদ সদর", ô^ÎgwmK BKwZmv'-G Bmjwgô, তেহরান, সংখ্যা ২১।

কমিউনিজম দ্বারা। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় একক কারণ[৩] হিসাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় না[৪]। পুঁজিবাদী অর্থনীতিরও মার্ক্সীয় অর্থনীতির ন্যায় দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে - বিজ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়মসমূহ প্রকৃতির দিক থেকে মতাদর্শগত। কেননা, সেগুলো মানবের ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত এবং এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে এর তারতম্য ঘটে। ইসলামি অর্থনীতির স্বতন্ত্র প্রকৃতি হচ্ছে তা মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সমাধানের সময় একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে থাকে। এ ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রেক্ষিত একসাথে সুসংহত। পাশাপাশি গোটা ব্যবস্থাটিই ইসলামের অপরাপর দৃষ্টিকোণসমূহ যথা সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাকের সদর মনে করেন, ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানবিক প্রয়োজন পূরণে অধিকতর সক্ষম এবং মানবীয় সম্ভাবনার সাথে তাল মিলিয়ে উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে।

1. A_©‰bwZK WKwUb I A_©‰bwZK weÁvb

বাকের সদর অর্থনৈতিক ডকট্রিনকে অর্থনৈতিক বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি দাবি করেন যে ইসলামি অর্থনীতি বিজ্ঞান নয়, এটি একটি ডকট্রিন।[৫] তাঁর দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক ডকট্রিন হচ্ছে অর্থনৈতিক জীবনের সকল মৌলিক সূত্রের সমাহার, যেগুলো কোন না কোন ভাবে সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। অর্থনৈতিক ডকট্রিন হচ্ছে একগুচ্ছ বুনিয়াদী মতবাদের সমষ্টি, যা অর্থনৈতিক সমস্যাবলির উভয়সঙ্কটকে পর্যালোচনা ও সমাধানকল্পে কাজ করে থাকে। অর্থনৈতিক আলোচনায় এসব নিয়মাবলি ও মতবাদসমূহ মূলনীতি ও ভিত্তি হিসাবে উত্থাপিত হয়।

পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক বিজ্ঞান হচ্ছে সকল অর্থনৈতিক তত্ত্বের সমাহার, যেগুলো সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে কোন রকম সম্পৃক্ততা ব্যতিরেকেই অর্থনৈতিক জীবনের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করে থাকে।[৬] বাকের সদরের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক বিজ্ঞান হচ্ছে এমন এক বিজ্ঞান, যা অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহকে ব্যাখ্যা করে এবং সেগুলোর কারণ ও নিয়ামকসমূহের সাথে এদের সম্পর্ককে উদ্‌ঘাটন করে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক বিজ্ঞান বাস্তবিক প্রপঞ্চসমূহের মাঝে বিদ্যমান সূত্রাবলিকে উদ্‌ঘাটন করে থাকে। অর্থনৈতিক বিজ্ঞান অবিরতভাবে বাস্তবিক অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহ আবিষ্কার ও সেগুলোর কারণ ও প্রভাবকে চিহ্নিতকরণ এবং তাদের মধ্যকার সূত্র ও সম্পর্ককে উদ্‌ঘাটনে প্রয়াস চালায়। সুতরাং অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের বার্তা হল অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহ আবিষ্কার এবং সেগুলোর উপর কর্তৃত্বশীল কারণ ও সূত্রসমূহকে উদ্‌ঘাটন করা।[৭]

বাকের সদর অর্থনৈতিক ডকট্রিন ও অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের মধ্যে মূলত তিনটি পার্থক্য বর্ণনা করেছেন :

GK. অর্থনৈতিক ডকট্রিন ন্যায়বিচারের নৈতিক ও মূল্যবোধগত মানদণ্ডের ভিত্তিতে কাঙ্ক্ষিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিজ্ঞান কোনরূপ বিশ্লেষণ ছাড়াই অর্থনৈতিক জীবনের প্রপঞ্চসমূহ এবং সেগুলোর কারণ ও নিয়ামকসমূহকে উদ্ভাবনের দায়িত্ব বহন করে।[৮]

---

[৩]. এখানে একক কারণ বলতে ‘অর্থনীতি’কে বুঝায়।

[৪]. কেননা অনেক ঘটনাই রয়েছে যেগুলো অর্থনীতি নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক কারণের ফল।

[৫].দ্র. বাকের সদর, BKwZmv‘bv, †Kvg : gvKZve Avj-Av©jvg Avj Bmjvwg, ১৩৭৫ সৌ. সন, c. 44|

[৬]. দ্র. cv¸³|

[৭]. দ্র. cv¸³, পৃ. ৪৪ ও ৩১৬।

[৮]. দ্র. cv¸³, পৃ. ৩৮১।

‘B. অর্থনৈতিক ডকট্রিন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিসীমায় একটি ন্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ ন্যায়পরায়নতা সম্পর্কে তার ধারণার ভিত্তিতে সবচেয়ে যোগ্যতম অর্থনীতিকে সৃষ্টি করার কাজে প্রয়াসী হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক বিজ্ঞান অর্থনীতির উপর বিদ্যমান ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার দায়িত্ব পালন করে যাতে এর কারণ ও প্রভাবসমূহকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে।

wZb. অর্থনৈতিক বিজ্ঞান অর্থনৈতিক প্রপঞ্চকে বৈজ্ঞানিক উপায়সমূহ যেমন প্রত্যক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে থাকে এবং অর্থনৈতিক নিয়মসমূহকে উদ্‌ঘাটন করে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক ডকট্রিন কখনোই বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে স্বীয় ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করার পিছনে ধাবিত হয় না। বরং ন্যায়বিচারের প্রতি তার যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তারই আলোকে অর্থনৈতিক ঘটনাবলির সমাধান করে থাকে।[৯]

2. Bmjvg I A_©bwZK weÁvb

বাকের সদর মনে করেন, ইসলামি অর্থনীতি বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামি অর্থনৈতিক ডকট্রিন, অর্থনৈতিক বিজ্ঞান নয়। তিনি স্পষ্টতই ঘোষণা করেন যে আমাদের কোন ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান নেই।[১০] অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এ কথার অর্থ এটা নয় যে আমাদের ইসলামি অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক বিজ্ঞান থাকবে না। বরং ইসলামি অর্থনীতি যখন এর সকল পরিসরে বাস্তবায়ন লাভ করবে এবং বাস্তবে সংঘটিত ও মূর্তমান হবে, তখন একজন অর্থনীতি বিশারদ অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহকে উদ্‌ঘাটন ও ব্যাখ্যা করতে পারবে, সেগুলোর মধ্যকার সম্পর্ককে অধ্যয়ন করতে পারবে, সেগুলোর কারণ ও নিয়ামকগুলোকে শনাক্ত করতে পারবে এবং ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশারদরাও এ পন্থায় অগ্রসর হয়েছেন। অর্থাৎ তারা প্রথমে পুঁজিবাদী ডকট্রিনপ্রসূত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই তাদের অর্থনীতিকে দাঁড় করিয়েছেন। অতঃপর তারা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের পেছনে গেছেন।[১১]

কিন্তু কীভাবে এবং কোন সময়ে ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান চালু করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে?– এরূপ প্রশ্নের জবাবে বাকের সদরের অভিমত হচ্ছে, অর্থনৈতিক জীবনের প্রপঞ্চসমূহের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দুটি ব্যাপারের উপর নির্ভর করে :

c_gZ, প্রকৃত জীবনের অভিজ্ঞতার সূত্রে অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহ একত্রিত করা এবং সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক বিন্যাস প্রদান করা, এমনভাবে যে জীবনের ঐ দিকটার উপর ক্রিয়াশীল বিশেষ আইন ও শর্তাবলি উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।

wØZxqZ. সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম তথা সূত্র, যা ধরে নেওয়া হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ করা এবং তা হতে অর্থনৈতিক প্রবণতা ও এর প্রপঞ্চসমূহের বিবর্তনধারার ফলাফলে উপনীত হওয়া।

প্রথম পন্থার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। কারণ ইসলামের অর্থনৈতিক ডকট্রিন, আজ অবধি মুসলিম সমাজে সেভাবে বাস্তবায়ন হয়নি যে অর্থনীতি বিশারদগণ বাস্তবে সংঘটিত হওয়া প্রপঞ্চসমূহকে লিপিবদ্ধ ও বিন্যাস করবেন এবং এর থেকে সামগ্রিক নিয়ম তথা সূত্র বের করবেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বেলায় যেটা

---

[৯]. দ্রঃ আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ কাযেম হায়েরী ও আহমদ আলী ইউসুফী, “ইক্‌তিসাদে ইসলামি ওয়া রাভেশে কাশফে অন আয দিদগাহে শাহীদ সদর”- ‘%ÎgwmK BK&wZmv‘-G Bmjvgx', তেহরান : ১৩৮০, বসন্তকাল, সংখ্যা ১।

[১০]. দ্র. বাকের সদর, BK&wZmv‘bv,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫।

[১১]. দ্র. %ÎgwmK BK&wZmv‘-G Bmjvg, সংখ্যা ১, পৃ. ৩১৬।

সম্ভবপর। সেখানে বিশারদগণ স্ব স্ব সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেদের মত-অভিমত গড়ে তোলেন... ।[১২]

আর দ্বিতীয় পন্থার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একটি সম্ভবপর ব্যাপার এবং এ পন্থাকে কিছু কিছু সত্য, যেগুলো মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক জীবনকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে, সেগুলোর ব্যাখ্যায় কাজে লাগানো যেতে পারে, এরূপে যে, ধর্মের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুমানগুলো থেকে আরম্ভ করতে হবে এবং উদ্দীষ্ট ব্যবহারিক অঙ্গনে সেগুলোর প্রভাবকে বের করতে হবে। আর এ ধর্মীয় অনুমানগুলোর ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক পরিসরে সাধারণ ও সর্বজনীন নিয়ম প্রবর্তন করতে হবে... ।

কিন্তু এধরনের ব্যাখ্যাসমূহ যতক্ষণ না বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই করা হবে, অর্থাৎ প্রকৃত ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা পর্যালোচনা করে না দেখা হবে, ততক্ষণ সূক্ষ্মরূপে মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক জীবনের জন্য কোন সর্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য উৎপত্তি লাভ করবে না ।[১৩] তাছাড়া মুসলিম সমাজে ক্রিয়াশীল সর্বজনীন মানসিকতা অর্থনৈতিক জীবনে অশেষ প্রভাব রাখে। এই মানসিকতা এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ কোন সীমাবদ্ধ পর্যায় এবং বিশেষ পরিসর বিশিষ্ট নয় যে তা অনুমানস্বরূপ ধরে নেওয়া হবে এবং তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির গোড়া পত্তন করা যাবে'[১৪]

3. Bmjwg A_bxwZi mvgwMK KvVv‡gv

বাকের সদর ইসলামি অর্থনীতির তিনটি প্রধান স্তম্ভের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ তিনটি স্তম্ভের উপরেই ইসলামি অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামো দণ্ডায়মান। যথা-

এক. মিশ্র মালিকানা।
দুই. বিশেষ কাঠামোর আওতায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।
তিন. সামাজিক ন্যায়বিচার ।[১৫]

GK. wgk gwjKvbv

বাকের সদর সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ- এ দুইটি মতাদর্শের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে মালিকানা প্রসঙ্গে এদের বক্তব্যকে ভারসাম্যহীন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর তিনি ইসলামের প্রধান সূত্রসমূহের আলোকে মিশ্র তথা সমন্বিত মালিকানা'র তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, মালিকানা মানুষের সত্তাগত অধিকার নয়। বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বের পথ ধরে মানুষের জন্য এই অধিকার আসে। তিনি লিখেন :

> 'ইসলামি সমাজে তিন ধরনের মালিকানা রয়েছে : ব্যক্তিগত মালিকানা, সাধারণ মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা। এই তিন প্রকার মালিকানার প্রত্যেকটিরই সমাজে কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। এগুলোর কোনটাই ব্যতিক্রম হিসাবে কিংবা বিশেষ কোন অবস্থা ও জরুরী পরিস্থিতির কারণে সাময়িক কোন সমাধান হিসাবে উত্থাপিত হয় নি।

---

[১২]. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।
[১৩]. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮।
[১৪]. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯।
[১৫]. দ্র. বাকের সদর, BKwZmv' bv, (ফার্সী অনু. মুহাম্মদ মাহদী ফুলাভান্দ), তেহরান : বুনিয়াদে উলুমে ইসলামি, ১৯৮২, পৃ. ২১৫।

> সুতরাং কিছু কিছু সম্পদ ও উৎপাদন সরঞ্জামের ব্যাপারে ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানার বিধান রেখেছে বলে ইসলামি সমাজকে একটি পুঁজিবাদী সমাজ বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। কারণ ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানাকে সামগ্রিক ও সর্বব্যাপী কোন মূলনীতি হিসাবে মানে না। একইভাবে ইসলামি সমাজকে কোন সমাজতান্ত্রিক সমাজ বলেও আখ্যায়িত করা যাবে না। যদিও ইসলাম কিছু কিছু সম্পদের বেলায় সাধারণ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার কথা বলে থাকে। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে সাধারণ তথা যৌথ মালিকানার বিধানটি কোন সামগ্রিক বিধান ও কোন সর্বজনীন মূলনীতি নয়। বরং ইসলামে তিন ধরনের মালিকানা বিদ্যমান। যেগুলোর প্রত্যেকটিই একেকটি স্বতন্ত্র মূলনীতি।'[১৬]

পুঁজিতন্ত্র ব্যক্তি মালিকানাকে একটি সর্বজনীন মূলনীতি বলে মনে করে। সে সূত্রে পুঁজিবাদ ব্যক্তিদের চৈন্তিক, দৈহিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক তৎপরতা ও অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার সম্পদ, তাদের মালিকানাভুক্ত হওয়ার অনুমোদন প্রদান করে এবং সামষ্টিক তথা যৌথ মালিকানাকে গ্রহণ করে না, যদি না সামাজিক প্রয়োজনের বশে তা অপরিহার্য হয়, যা একটা ব্যতিক্রম অবস্থা।

Louks এর ভাষায় :

> 'পুজিবাদ হচ্ছে অর্থনৈতিক সংস্থার এমন একটি পদ্ধতি যা ব্যক্তিগত মালিকানার বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এবং মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক পুঁজির ব্যক্তি মুনাফার ব্যবহার সম্বলিত।'[১৭]

পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাধারণ মালিকানাকেই সর্বজনীন মূলনীতি হিসাবে মনে করে। অর্থাৎ সকল সম্পদই সামষ্টিক মালিকানাভুক্ত। ইহা ব্যক্তি মালিকানাকে গ্রহণ করে না, যদি না সামাজিক প্রয়োজনের বশে তা অনিবার্য হয়। এ ব্যাপারে সমাজতন্ত্রের বিখ্যাত স্লোগানই হচ্ছে - 'প্রত্যেকের থেকে তার সামর্থ অনুসারে এবং প্রত্যেকে জন্য তার প্রয়োজন অনুসারে।'[১৮]

কিন্তু ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এতদুভয়ের কোনটিকেই মূলনীতি বলে মনে করে না। বরং একইসাথে বিভিন্ন প্রকার মালিকানা ইসলামে অনুমোদিত। এগুলোর প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র রয়েছে এবং কোনটিই ব্যতিক্রমরূপে কিংবা সমাজের পরিস্থিতির দাবির প্রেক্ষিতে সাময়িক বিকল্প সমাধানের উপায়স্বরূপ নয়।

তাই বলে যদি কেউ অভিযোগ করে যে মালিকানা প্রশ্নে ইসলামের নিজস্ব কোন বক্তব্য নেই। বরং ইসলামে অর্থনীতি বলতে যা বুঝায় তা আসলে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুই অর্থব্যবস্থারই একত্রে গোজামিল করা একটি রূপ মাত্র- তাহলে সেটা ভুল বলা হবে। এহেন অভিযোগকে বাকের সদর তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ ইসলামে মালিকানা প্রশ্নে এই বৈচিত্র্য প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মৌলিক আদর্শগত কাঠামোরই পরিচয় তুলে ধরে, যা সুনির্দিষ্ট দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার মূল্যবোধ ও তাৎপর্যসমূহ মুক্ত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও তাৎপর্যের সাথে সদৃশ নয়। তিনি মালিকানা প্রশ্নে ইসলামি অর্থনীতির স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, 'ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে হলে ইসলামে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অধিকার ও বাধ্যবাধকতাসমূহ আগে বুঝতে হবে।'[১৯]

---

[১৬]. C/¸ ৩, পৃ. ২৮২।

[১৭]. *'Capitalism is a system of economic organization featured by the private ownership and the use for private profit of manmade and nature made capital'.* - K.K Dewett, *Modern Economic Theories,* S. Chand and company 2003, p. 589.

[১৮]. *From each according to his ability, to each according to his needs'*-Karl Marx (1875), *Critique of the Gotha Program*, Retrieved 15-07-2008.

[১৯]. বাকের সদর, BK\Zmv`bv, (ইং. অনু.), তেহরান : ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক সার্ভিসেস, ১৯৮৩, খ. ১, পৃ. ৫১।

মালিকানা প্রশ্নে ইসলামের এ তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ই নিরূপায় হয়ে এমন সব মালিকানা ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যা তাদের মূলনীতিসমূহের পরিপন্থী। পুঁজিবাদী সমাজ দীর্ঘকাল হয়ে গেল কতেক সম্পদকে জাতীয় সম্পদ হিসাবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রও কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা পর্যায় পর্যন্ত ব্যক্তি মালিকানাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃষি সমবায় কোম্পানীর পরিবারসমূহের প্রত্যেক পরিবারকে এক খণ্ড জমি, বাড়ী, কিছু পশুপাখী এবং সরল কৃষি উপকরণ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এহেন দৃষ্টান্তসমূহ আসলে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মূলনীতি থেকে সরে আসারই নামান্তর।

‘B. we‡kl KvVv‡gvi AvIZvq A_©‰bwZK ¯^vaxbZv

ইসলামি অর্থনীতির দ্বিতীয় স্তম্ভটি হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির সীমাবদ্ধ পরিসরে স্বাধীনতা। ইসলামের দৃষ্টিতে এই স্বাধীনতা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহের কাঠামোর আওতাধীন।

বাকের সদর BKwZmv‘bv গ্রন্থে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের স্বাধীনতায় দু'ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা:

(ক) সত্তাগত সীমাবদ্ধতা, যা প্রাণের অন্তঃপুর হতে উৎসারিত হয় এবং যা একজন মানুষের ইসলামি ব্যক্তি-মানসের আত্মিক ও চৈন্তিক বিষয়াবলির সাথে সম্পৃক্ত।

(খ) আরোপকৃত সীমাবদ্ধতা, যা ইসলামি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাসূত্রে আরোপ করা হয়।

(K) mËvMZ mxgve×Zv

যা উৎসারিত হয় প্রাণের গভীর থেকে এবং ইসলাম মোতাবিক সামাজিক দীক্ষা ও প্রতিপালনের ভিত্তিতে, যে দীক্ষা মানবের চৈন্তিক ও আত্মিক ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে। ইসলামি সমাজে একজন মুসলমান ব্যক্তি যে আত্মিক ও চৈন্তিক ক্ষেত্রের আলোকে লালিত-পালিত হয়, তা ইসলামি সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ। অবশ্য সেটা সত্তাগত ও প্রাকৃতিক কাঠামোর অধীন। তবে ব্যক্তি তার থেকে কোনরূপ স্বাধীনতা হরণ করার অনুভব ব্যতীতই এ সীমাবদ্ধতাকে বরণ করে নেয়। অর্থাৎ এটাকে সে তার স্বাধীনতার জন্য কোন সীমাবদ্ধতা বলেই মনে করবে না। কারণ, এই সীমাবদ্ধতা তার অভ্যন্তরীণ ও চৈন্তিক বাস্তবতা থেকেই উৎস লাভ করেছে।[২০]

অন্যকথায় বলা যায়, ইসলামি প্রতিপালন ব্যবস্থার ছায়াতলে এই সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে এ সীমাবদ্ধতা জন্ম নেয়। এটা এক মহাশক্তি, যা স্বাধীনতাকে মানুষের মধ্যে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করে দেয় যে ব্যক্তিরা ভাবতেও পারে না যে কোন কিছু তাদের থেকে হরণ করা হয়ে থাকে। ফলে তারা এটাকে নিজের জন্য সীমাবদ্ধতা হিসাবেই দেখে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে মানুষের মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠা, এমনভাবে যে, এখানে স্বাধীনতাকে সঠিক পথে কাজে লাগানো হয়।[২১]

---

[২০].দ্র.CV¸ 3, পৃ.২৮৪।

[২১]. দ্র. CV¸ 3, পৃ. ২৮৪

যদিও ইসলামের আবির্ভাবকালে এর বাস্তব অভিজ্ঞতা খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছিল, কিন্তু মুসলমানদের উপর স্বীয় বিশেষ দীক্ষার মাধ্যমে যে অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা গেঁথে দিতে সক্ষম হয়েছিল, তা সমাজের মধ্যে এতটাই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে আবহমান কালের মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সদাচার, ন্যায়বিচার ও পরার্থপরতার চর্চা দেখা যায়, সেটা ঐ ইসলামি দীক্ষা থেকেই অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আর যদি ঐ অভিজ্ঞতা দীর্ঘতর হত, তাহলে সেটা হত পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে খোদায়ী প্রতিনিধিত্ব পালনের উপর একটি শক্তিশালী প্রমাণ। এই সীমাবদ্ধতাগুলোই ইসলামি শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পরও যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের মাঝে পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষিতা, সৎকর্ম এবং জনহিতকর কার্যক্রমের একমাত্র উৎস ও অনুপ্রেরণা হিসাবে বিদ্যমান ছিল। লক্ষ কোটি মুসলমান তাদের মাল সম্পদে যেসব খোদায়ী ও মানবীয় অধিকার বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো কোন সঙ্কোচ অনুভব করা ব্যতিরেকেই নির্দ্বিধায় এবং পূর্ণ আগ্রহ ও সন্তুষ্টচিত্তে যথাযথ প্রাপকের হাতে পরিশোধ করে দেয়।

(L) Av‡ivcKZ mxgve×Zv

যা (মানুষের অস্তিত্বসত্তার) বাহির থেকে আরোপ করা হয় এবং যা তার সামাজিক আচরণকে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট করে দেয়। শরয়ী বিধানসমূহ মানুষের জন্য এই সীমাবদ্ধতাকে আরোপ করে থাকে। বাকের সদর মনে করেন, ইসলামে এই চুক্তিগত সীমাবদ্ধতা জন্ম নিয়েছে একটি মূলনীতি থেকে। তিনি সেই মূলনীতিটি বিবৃত করেছেন এভাবে :

> ‘ইসলাম যে সকল ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টান্ত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করেছে এবং তা অত্যাবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে, সেগুলোর পরিপন্থী কোন প্রকার কাজ করার বেলায় ব্যক্তি স্বাধীন নয় এবং তাকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া হয় নি।’[২২]

ইসলাম স্বাধীনতাকে ইসলামি আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার পরিসীমানায় গ্রহণ করে থাকে। এই মূলনীতিতেও ইসলামি অর্থনীতি ও অপরাপর অর্থ-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পুঁজিতন্ত্রে স্বাধীনতা সীমাহীন। আবার সমাজতন্ত্রে কোনই স্বাধীনতা নেই। কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ভারসাম্যশীল অবস্থানের প্রবক্তা। অর্থাৎ সীমিত পরিসরে স্বাধীনতা প্রদান করেছে। স্বাধীনতাকে করেছে পরিশীলিত, যা সকল মানুষের সুখ ও মঙ্গলের উপায় বটে।

অন্যকথায় বলা যায়, বাইরের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এমন এক সীমাবদ্ধতা যা ইসলামি বিধানাবলি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর আরোপ করে থাকে। এক্ষেত্রে যে মূলনীতিটি সূত্র হিসাবে কাজ করে তা হল - ‘কেউই অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে যেসব কর্মকাণ্ড ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধসমূহের সাথে পরিপন্থী হবে সেগুলোর ব্যাপারে স্বাধীন নয়।’[২৩]

এ মর্মে ইসলাম যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলো নিম্নরূপ -

c_gZ, ইসলাম যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপ মূল ইসলামি মূল্যবোধসমূহ প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হয়, সেগুলোকে সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমন সুদ, মজুতদারি, স্বার্থপরতা, অপচয়, বিনষ্টকরণ ইত্যাদি।

---

[২২]. বাকের সদর, BKwZmv‘bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫।
[২৩]. দ্র. cÖv¸³, পৃ. ২৮৫।

wØZxqZ, ইসলাম অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের উপর রাষ্ট্রের[২৪] সাধারণ নজরদারী আরোপ করেছে এবং ইসলামি রাষ্ট্রকে জনকল্যাণ ও জনস্বার্থ রক্ষায় যথাযথ হস্তক্ষেপ করার এখ্‌তিয়ার প্রদান করেছে। এটাও ব্যক্তি সাধারণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। ইতিহাসকাল জুড়ে মৌলিক ইসলামি মূল্যবোধসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্যই এ মুলনীতিসমূহ আরোপ করা হয়েছে। কারণ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিও বদলে যাবে। সমাজের জন্য এক সময়ে একটি কাজ করা হয়ত ক্ষতিকর নাও হতে পারে। একটি বিধান, যা বহু শতাব্দীকালের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে, তার ক্ষেত্রসমূহকে একে অপর থেকে পৃথক করা যায় না। একমাত্র সঠিক পথ হল ইসলামি রাষ্ট্রের কর্ণধার উলুল আমর (أولو الأمر) তথা রাষ্ট্রের বৈধ কর্ণধারের হাতে নজরদারীর এখ্‌তিয়ার প্রদান করা, যাতে তিনি নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ইসলামি বিধি-নিয়ম মোতাবিক বৈধ কাজগুলো করার মধ্যেই নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করে রাখেন। বাকের সদর উলুল আমর কর্তৃক এ নজরদারীর বিধিগত ভিত্তি হিসাবে কুরআনের এ আয়াতটির উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন :

> "তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে 'উলুল আমর'-এর।"[২৫]

এখানে জনগণের জন্য 'উলুল আম্‌র' এর আনুগত্য করাকে আবশ্যক ঘোষণা করা হয়েছে। 'উলুল আম্‌র' হচ্ছেন রাষ্ট্রের বৈধ ক্ষমতার অধিকারী সর্বোচ্চ কর্তা ও অভিভাবক। কাজেই তিনি সমাজের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং সামাজিক সাম্যতা ও ভারসাম্য রক্ষার্থে এই হস্তক্ষেপ করার ও আনুগত্য লাভের অধিকার রাখেন। তবে শর্ত হল তাঁর হস্তক্ষেপ হতে হবে শরীয়াত তথা ধর্মীয় বিধি-বিধান মাফিক।

wZb. mvgwRK b¨vqwePvi

ইসলামি অর্থনীতির তৃতীয় স্তম্ভটি হচ্ছে 'সামাজিক ন্যায়বিচার'। বাকের সদর বলেন :

> 'ইসলামি অর্থনীতির তৃতীয় স্তম্ভটি হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার। যা ইসলামে মুসলিম সমাজের মধ্যে সম্পদ বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিমূর্ত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তাই ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব মূল্যবোধ রয়েছে, সেগুলোর সাথে ইসলামি ন্যায়পরতাকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক মতাদর্শ যে মৌলিক ভিত্তির উপরে গড়ে ওঠে, ইসলাম কর্তৃক সামাজিক ন্যায়বিচারকে ঐ ভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করার পর, সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিকে একটি বিক্ষিপ্ত সাধারণ তাৎপর্য হিসাবে ছেড়ে দেয়নি। তদ্রূপ এটাকে যে কোন ধরনের ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত রাখে নি। কিম্বা মানুষদেরকে তাদের জীবন ও জীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রত্যেকের স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধির আলোকে সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যাখ্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেনি। বরং ইসলাম এ তাৎপর্যটিকে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য রূপে তার সুনির্দিষ্ট সামাজিক কর্মসূচি হিসাবে বর্ণনা করেছে।'[২৬]

বাকের সদরের দৃষ্টিতে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গটি দুটি সামগ্রিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা :

১. সর্বজনীন দায়বদ্ধতার মূলনীতি (আল-তাকাফুল আল-আম্মাহ[২৭])।

২. সামাজিক সাম্যতার মূলনীতি (আল-তাওয়াযুন আল-ইজতিমাঈয়া[২৮])।

---

২৪. বাকের সদর কোন কোন স্থানে 'রাষ্ট্র' আবার কোন কোন স্থানে কুরআনিক পরিভাষা 'উলুল আমর' (তথা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তা বা কর্ণধার) কথাটি ব্যবহার করেছেন।

২৫. Avj-KziAvb, নিসা : ৫৯।

২৬. বাকের সদর, BKwZmv'bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

২৭. **التكافل العامة**

২৮. **التوازن الاجتماعية**

এ প্রসঙ্গে বাকের সদর ইসলামি সমাজের উষালগ্নে মহানবি (সা.) কর্তৃক মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের চুক্তির কথা উল্লেখ করেন। যার সূত্রে আনসাররা নিজ নিজ সহায় সম্পত্তিকে বাস্তুচ্যুত নিঃস্ব মুহাজিরদের সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। মহানবির (সা.) এ উদ্যোগ ছিল প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচার মূলনীতিরই বাস্তবায়ন।[২৯]

ইসলাম সমাজে সম্পদ বিতরণে সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলনীতি অনুসরণ করেছে। জীবনের প্রয়োজনসমূহ পূরণে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে যাতে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রসঙ্গটি কোন নিরপেক্ষ ও কল্পনাপ্রসূত তাৎপর্য নয়। এরূপ নয় যে এর হরেক রকম ব্যাখ্যা করা যাবে। বরং ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচারকে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক রূপকল্পের মধ্যে মাত্রায়িত করেছে এবং এটাকে সমাজে বাস্তবায়িতও করতে সক্ষম হয়েছে।

e¨vL¨v

ইসলামি অর্থনীতির প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে মালিকানা। বাকের সদরের অভিমত হল মালিকানা উৎপত্তি লাভ করে কর্ম তথা শ্রম থেকে। যে কেউ কাজ করবে, তার হাতের কামাইয়ের মালিক সে হবে। তবে এখানে যে কোন কর্মই উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীল কর্ম হতে হবে। মালিকানা তত্ত্বে তার অভিমত হল কর্মের সাথে মালিকানার সঙ্গতি থাকতে হবে। এর শিরোনাম তিনি দিয়েছেন 'মিশ্র তথা সমন্বিত মালিকানা'। অর্থাৎ বাকের সদরের দৃষ্টিতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সেখানে পুঁজিতন্ত্রীয় ব্যক্তি মালিকানাও একটি পর্যায় পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। আবার সাধারণ সর্বজনীন মালিকানাকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়। তিনি মনে করেন, ইসলামি বিধি-বিধানের ভিত্তিতে আমরা আমাদের জাতীয় সম্পদসমূহকে ব্যক্তি মালিকানাধীন করে ফেলব- এমন বৈধতা আমাদের নেই। তাঁর মতে খনিজ সম্পদ এবং যে সমস্ত সম্পদ গণমানুষের, সেগুলো কোন ব্যক্তি কিম্বা কোম্পানীর ব্যক্তিগত মালিকানায় দেওয়া যাবে না, যদিও ইতোপূর্বে রাষ্ট্রকে কর তথা খাজনাও পরিশোধ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্ব স্ব স্থানে ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন মালিকানা মেনে নেওয়া হয়। আর যেসব জায়গায় ব্যক্তি মালিকানা রয়েছে, অধিকাংশই কর্মের উপর ভিত্তি করে উক্ত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাকের সদর ইসলামে উপার্জন (নির্ধারিত প্রাপ্য) সংক্রান্ত সাধারণ নীতি সম্পর্কে বলেন :

> '...উপার্জনের (নির্ধারিত প্রাপ্যের) ভিত্তি হচ্ছে (উৎপাদন) প্রক্রিয়া চলাকালে প্রদত্ত শ্রম। অতএব, যে শ্রমিক শ্রম প্রদান করেছে সে-ই (উৎপাদন) প্রক্রিয়ার মালিকের নিকট থেকে বিনিময় পাবার অধিকারী। ...এ ধরনের অবদান ছাড়া উপার্জনের (নির্দিষ্ট প্রাপ্যের) কোনই বৈধতা নেই।'[৩০]

এই নীতি অনুযায়ী পুঁজির মালিক প্রাথমিক দ্রব্যাদির মালিকের নিকট থেকে কোন সুনিদ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ তা হবে রিবা (সুদ); আর ইসলামে রিবাকে হারাম করা হয়েছে। আর্থিক পুঁজিকে কোনভাবেই শ্রমদান হিসাবে গণ্য করা যাবে না।[৩১]

ইসলামে কেবল একটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে শ্রম প্রদানের বিনিময়স্বরূপ। এই শ্রম প্রদানের কাজ দু'ভাবে হতে পারে। যথা-

---

[২৯]. cÖv¸³, পৃ. ২৮৯।

[৩০]. বাকের সদর, BKwZmv'bv, (ইং. অনু.), তেহরান : ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক সার্ভিসেস, ১৯৮৩, পৃ. ৬২৩।

[৩১]. cÖv¸³, পৃ. ৬২৫-৬২৭।

(১) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একজন শ্রমিক কর্তৃক সরাসরি শ্রম প্রদান অথবা

(২) উৎপাদন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শ্রম প্রদান (স্মর্তব্য, যন্ত্রপাতি হচ্ছে সঞ্চিত শ্রম)।

এ উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমের ক্ষয় বা বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু আর্থিক পুঁজির ক্ষেত্রে তা ঘটে না। তাই এক্ষেত্রে পুঁজির মালিককে প্রাথমিক দ্রব্যসামগ্রীর মালিকের সাথে লাভ-লোকসানের অংশীদার হবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তার উপার্জনের বৈধতার ভিত্তি হচ্ছে, সে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু ও অব্যাহত রাখার কাজে প্রাথমিক দ্রব্যাদির মালিককে সাহায্য করেছে। সুতরাং সে মুনাফায় অংশীদার হওয়ার মাধ্যমে পুরস্কৃত হওয়ার অধিকার রাখে।

কার্ল মার্কস্ও মালিকানার উৎপত্তি হিসাবে কর্ম তথা শ্রম বলে মনে করতেন।[৩২] কিন্তু ইসলামে এছাড়াও মীরাছ ও হিবা'কেও মালিকানার উৎস হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। বাকের সদরের মূল কথাই হচ্ছে এটা যে, কাজ না করে ও মজুতদারি করে কেউ মালিক হতে পারবে না। যে কেউ মালিক হতে চায়, তাকে কাজ করে থাকতে হবে। আর এ কারণেই সুদকে নাকচ করা হয়েছে। সুদ গ্রহণ এ কারণে নিন্দনীয় যে সুদখোর কোন কাজ করে না। অথচ মাস শেষে নিশ্চিত মুনাফা লাভ করে থাকে। একারণে তিনি যা কিছুই কাজ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে হয়, সেটাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাখ্যান করেন।

অন্য আরেকটি যে বিষয় বাকের সদর উত্থাপন করেন সেটা হল রাষ্ট্র (state)র প্রসঙ্গ। তিনি রাষ্ট্রের হাতে অনেক স্বাধীনতা ও ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন। উল্লেখ্য, তিনি এই যে রাষ্ট্রের বিশালায়তন দায়িত্ব-কর্তব্যের পক্ষপাতি, এটা নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এটা সুনির্দিষ্ট নয় যে এসব দায়িত্ব-কর্তব্য পরিপূরণের উৎসগুলো কি? প্রতীয়মান হয় যে, বাকের সদর এ মর্মে ব্যাখ্যা দেওয়ার অবকাশ পাননি। তবে আমরা যদি তাঁর চিন্তার কাঠামো অনুসরণ করে তাঁর BKwZmv‘ bv গ্রন্থটির ভাষ্য তুলে ধরতে চাই, তাহলে বলা যায় যে, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে জনগণকে সহায়তা করা। অর্থাৎ তাদের জন্য কর্ম সৃষ্টি করা, তাদের পকেটে টাকা ভর্তি করে দেওয়া নয়। প্রকৃতপক্ষে যদি কোন চিন্তাবিদ মানব ও রাষ্ট্রের প্রকৃতির মাঝে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হন, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি রাজনৈতিক বিশারদ হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টাকেই সম্পাদন করলেন। এরূপ সাফল্যের প্রশংসায় Andrew Vincent[৩৩] লিখেছেন :

> 'মানুষের স্বভাব-প্রবৃত্তি ও রাষ্ট্রের মাঝে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস (যে অর্থেই হোক না কেন) হল রাজনৈতিক তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস।'[৩৪]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমকালীন মুসলমান চিন্তাবিদদের মধ্যে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর এ বিষয়ে ব্যাপক চর্চা করেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সামাজিক মানব ও রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য ও চমৎকার

---

[৩২]. বিষয়টিকে তিনি এভাবে বুঝিয়ে বলেছেন : *"Take two commodities, e.g., corn and iron. The proprotions in which they are exchangebale whatever those proportions may be can always be represented by an equation in which a given quantity of corn is equated to some quantity of iron. E.g., 1 quarter corn = x cwt. iron what does this equation tell us? It tells us that in two different things-in 1 quarter of corn and x cwt. Of Iron, there exists in equal quantities something common to both. The two things must therefore be equal to a third, which in itself is neither the one nor the other... If we leave out of consideration the use value of commodity, they have only one property left that is being products of labour."*-Karl Marx, *Capital : A Crirical Analysis of Capitalist Production*, vol. 1, p.38.

[৩৩]. ইংল্যান্ডের শেফিয়েল্ড ইউনির্ভার্সিটির পলিটিক্যাল থিওরী'র অধ্যাপক।

[৩৪]. Andrew Vincent, *Theories of the State*, (ফা. অনু. হোসেইন বাশিরিয়ে), তেহরান : নেয়ী পাবলিকেশন্স, ১৯৯২, পৃ. ২৭৫।

সম্পর্ক চিত্রায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি এমন এক দার্শনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমগ্র রচনা করেছেন যা সর্বব্যাপী ও যথাযথ সঙ্গতির অধিকারী। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

ইসলামি অর্থনীতির দ্বিতীয় স্তম্ভটি হল সুনির্দিষ্ট ও ফলপ্রসু কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মূলনীতিকে গ্রহণ করা। এই অর্থে যে ইসলামি চিন্তা ও দর্শনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কর্মীবৃন্দ এরূপ নয় যে তারা তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অবধারিতভাবে কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারকদের অলঙ্ঘনীয় সিদ্ধান্তের সামনে হাত-পা বাঁধা ও আত্ম-সমর্পিত থাকবে, আর উৎপাদন, পণ্য সরবরাহ এমনকি কর্ম তথা শ্রম আইন-কানুনের ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারকরাই কর্তব্য নির্ধারণ করে দিবে। বরং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এক উঁচু পর্যায়ের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয় ইসলামি আর্থ-সামাজিক দর্শনে। অবশ্য এ স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয় এবং তা সমাজের অন্য ব্যক্তিদের স্বাধীনতা হরণের কারণ হতে পারবে না।

ইসলাম অপরাপর ধর্মসমূহের মত সকল মনুষ্য আচরণ (যেমন ব্যক্তির চাহিদাসমূহ)কে নৈতিকতা ও শরিয়ত নির্দেশিত সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। চাহিদাসমূহের সীমাবদ্ধতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেও অনাবশ্যক করে দেয়। একারণে সামষ্টিকতা-প্রবণ ইসলাম সাংস্কৃতিক আদর্শ এবং অর্থনৈতিক আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তি ইসলামি সমাজের একজন সভ্য বটে। একারণে তার আচরণ সমষ্টির স্বার্থে এবং মুসলিম সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক ও মূল্যবোধসমূহের আদর্শ অনুসরণ করে চলে। তাই বাকের সদর 'অর্থনৈতিক মানুষ'[৩৫] এর ধারণার বিপরীতে 'ইসলামি মানুষ' এর ধারণা পেশ করেছেন। ইসলামি মানুষ হবে মূল্যবোধসমূহের দ্যুতির প্রকাশস্থল। ইসলাম জীবনের জন্য একটি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী পন্থা হিসাবে সকল মনুষ্য কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, যার মধ্যে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অন্যতম।

অনুরূপভাবে একজন মুসলমান ব্যক্তির স্বাধীনতা সর্বদা তার সামাজিক ও ধর্মীয় দায়-দায়িত্বের শর্তে বাধা থাকে। মুসলমানরা স্বাধীন বটে। কিন্তু একই সাথে তাদের কৃতকর্মের বিপরীতে স্রষ্টা আল্লাহ্ ও অপরাপর মুসলমানদের সম্মুখে দায়বদ্ধ। একারণে ইসলামে 'স্বাধীনতা' এবং 'দায়বদ্ধতা' একই মুদ্রার দুই পিঠ। ধর্মীয় ও সামাজিক দায়-দায়িত্বসমূহ হচ্ছে এমন দায়-দায়িত্ব যা মুসলমানদের আচরণে বিশেষ করে তাদের অর্থনৈতিক আচরণে প্রতিফলিত হয়।

ইসলামি আচরণের আদর্শসমূহ হচ্ছে এমন কিছু শর্তের বেড়া, যা মানুষের স্বার্থপরায়ন স্বভাবকে আত্মত্যাগী ও মানবপ্রেমী অর্থনৈতিক আচরণে পরিবর্তন করে ফেলতে চায়। তবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ইসলাম কোনক্রমেই সন্ন্যাসবৃত্তিকে মুসলমানদের জন্য বৈধ করে না। মুসলমানরা আইন মান্য করে এবং আইনের

[৩৫]. অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি সকল ধরনের মানুষ নয়, এর মৌল উপাদান হল 'অর্থনৈতিক মানুষ'। অর্থনৈতিক মানুষ সম্পর্কে বিমূর্ত ধারণাটির জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এর প্রধান প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল। যদিও মিলের লেখাতে 'অর্থনৈতিক মানুষ' অভিব্যক্তিটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি। তবু 'অর্থনৈতিক মানুষ' সম্পর্কে ধারণাটি তাঁর লেখাতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সংকীর্ণ অর্থে 'অর্থনৈতিক মানুষ' একটি লোভী প্রাণী। এর জীবনের একমাত্র ব্রত হল যে কোন উপায়ে অধিকতর সম্পদ কুক্ষিগত করা। ফ্রাঙ্ক বুখম্যান এ প্রসঙ্গে বলেন *There is enough in the world for everyone's needs but not enough for everyone's greed*.[উদ্ধৃত Partington, Angel, ed., *The Concise Oxford Dictionary of Quotations* (Oxford: Oxford University Press, 1997), p.77]

যদিও মিল 'অর্থনৈতিক মানুষ' -এর সংকীর্ণ সংজ্ঞার অসারতা উপলব্ধি করেন। একারণে তিনি অর্থনৈতিক মানুষের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা উপস্থাপন করেন। মিলের উক্ত সংজ্ঞায় 'অর্থনৈতিক মানুষ' চারটি তাড়নায় পরিচালিত। যথা : (১) অর্থনৈতিক মানুষ অবশ্যই অর্থলোভী (২) অর্থনৈতিক মানুষ শ্রমের চেয়ে অবসর পছন্দ করে। তাই সে কম কাজ করতে চায় (৩) অর্থনৈতিক মানুষ ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানকে পছন্দ করে। তাই সে অর্থ জমানোর চেয়ে ভোগে আগ্রহী এবং (৪) অর্থনৈতিক মানুষের রয়েছে সন্তান উৎপাদনের জৈব তাড়না।- দ্রঃ ড. আকবর আলি খান, civ_ciZvi A_bxwZ, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ১৫৩।

দায়বদ্ধতা ও কর্তব্যসমূহ তাদের অর্থনৈতিক পছন্দগুলোকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, যেগুলো পালন করার মাধ্যমে তারা একটি খোদায়ী কৃপাধন্য পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে।

আর তৃতীয় স্তম্ভটি হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার। এ মূলনীতিটির ভিত্তি হচ্ছে সমাজ তার নিজের ভেতরে প্রথমে দরিদ্রদের চাহিদাসমূহকে পূরণ করতে সক্ষম হবে। আর যদি এ কলা-কৌশল তা সমাধান করতে সফল না হয়, তখন রাষ্ট্রের কর্তব্য চলে আসে। বাকের সদর সামাজিক সাম্যতাকে সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ের আরেকটি অংশ হিসাবে উত্থাপন করেন।

বাকের সদরের দৃষ্টিকোণ থেকে ‘সামাজিক ন্যায়বিচার’-এর মূলনীতিটি অপর দুটি প্রধান মূলনীতি অর্থাৎ ‘মিশ্র মালিকানা’ ও ‘সীমিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা’র সাথে একই তালে চলে। তিনি ‘সামাজিক ন্যায়বিচার’কে অপর দুটি মূলনীতির উপর অগ্রগণ্য করেছেন। এ মর্মে ব্যাখ্যায় তিনি একটি হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান করেন। হাদিসটি হল, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রহরেই বলেছিলেন :

> ‘হে জনগণ! যে কেউ অন্ততপক্ষে একটি খোরমার অর্ধেকাংশও দান করার মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করতে পারে, সে যেন এ কাজটি করে।’[৩৬]

আর সীমাবদ্ধ পরিসরে স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি BKwZmv‘bv গ্রন্থে এমনভাবে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন যা আইনশাস্ত্রে এবং অর্থনীতিতে তাঁর একটি অভিনব উদ্ভাবন হিসাবে পরিগণিত হয়। তাঁর উদ্ভাবিত এ তত্ত্বটি আরবি ভাষায় Avj-gvšÍvKvZj dvivM (المنطقة الفراغ) তথা ‘মুক্ত অঞ্চল’ হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ তত্ত্বের সারকথা হল সামাজিক সংস্থাসমূহের অগ্রগতি ও কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করা, যার আওতায় ইসলামি রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রের কর্ণধার (উলুল আম্‌র) ইসলামের মূলনীতি, বিধিমালা ও লক্ষ্যসমূহের ভিত্তিতে পরিস্থিতির উপযোগী করে আইন প্রবর্তন, অনুমোদন এবং প্রয়োগ করতে পারেন।

Bmjvwg A_©bwZK gZv‘‡ki ˆewkó¨

বাকের সদরের মতে ইসলামে অর্থনৈতিক মতাদর্শের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এর স্বতন্ত্র পন্থা ও পদ্ধতির সুবাদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়।[৩৭] প্রথমত, ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয়ত, ইসলামি অর্থনীতির ভিত্তি হল নৈতিকতা। অতএব ইসলামি অর্থনীতি যেমন বাস্তবসম্মত, তদ্রূপ নৈতিকতাপূর্ণ।

GK. Bmjvwg A_©bxwZ ev¯ÍemgZ : বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনে বলেন, মানব জাতির প্রকৃতি ও সহজাত প্রবৃত্তিগত যেসব সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলোর সাথে ইসলামি অর্থনীতির বিধানাবলি এবং কাঠামোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলামি অর্থনীতি সর্বদা লক্ষ্য রাখে যেন মানুষ শরীয়তের বিধানের পক্ষ থেকে কোন সংকীর্ণতার মধ্যে নিপতিত না হয়, তদ্রূপ মানুষকে যেন তার সামর্থ ও সাধ্যের উর্দ্ধে কোন কাল্পনিক পরিমণ্ডলে যুক্ত না করে। বরং ইসলামের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সর্বদা মানুষের প্রতি এক বাস্তবসম্মত ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রণীত হয়েছে। আর এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাস্তবিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহই অনুসরণ করে থাকে।

---

৩৬. mnxn Avj eLvix, খ. ২, পৃ. ১০৯, হাদীস নং ১৪১৭; সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৭০৩, হাদীস নং ১০১৬।
৩৭. দ্র. বাকের সদর, BKwZmv‘bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১।

‘B. Bmjvwg A_bxwZi wfwË ^bwZKZv : এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকটি। ইসলাম অর্থনীতির দ্বারা বস্তুগত ও প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী সমাজে যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চায়, সেগুলোতে মানুষের গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে বাকের সদর দাবি করেন। এসবের বাস্তবায়ন (যেমন অভাবীদের অভাব পূরণ করা) নৈতিকতা ও বিবেকের দিক থেকে একটি মূল্যবান ও দরকারি কাজ। ইসলাম তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের পন্থা হিসাবে যে অভ্যন্তরীণ কারণ (অর্থাৎ মানবের প্রাণসত্তা)-কে নির্বাচিত করেছে, তার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ কখনো কখনো কোন অভাবী লোকের চাহিদা পূরণ করার নিমিত্তে ধনীর ধন থেকে নেওয়া হয় এবং এ কাজ দ্বারা একজন দরিদ্র লোকের অভাব মেটানো হয়। এটা হল সেই জিনিস যা ইসলামি অর্থনীতিতে ‘সর্বজনীন নিরাপত্তার দায়বদ্ধতা’র মূলনীতি হিসাবে বিষয়ভুক্ত হয়। কিন্তু ইসলাম সর্বজনীন নিরাপত্তা বাস্তবায়নের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করে দিয়েছে, এটা তার সবটা নয়। বরং অন্যতম এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অন্যান্য উপায়ও রয়েছে। ইসলাম অর্থ সংক্রান্ত ফরয কাজসমূহকে শরয়ি ইবাদতের মধ্যে অংশ হিসাবে নির্ধারণ করেছে যাতে দরিদ্রদেরকে সাহায্য করার মত কাজগুলোও ঐশি চেতনা সহকারে মানুষের মনের গভীর থেকে উৎসারিত হয় এবং মানুষ যেন এ কাজগুলোও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সংকল্প সহকারে সম্পাদন করে।[৩৮]

gmwjg mgvRmg‡ni mv‡_ cvðvZ¨ A_%bwZK g‡W‡ji Am½wZ

বাকের সদরের মতে, অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত মডেল থাকা দরকার। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে পশ্চিমা মডেলকেই অনুসরণ করতে হবে। উন্নত মডেল সেটাই যা অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা ও প্রতিভার উপর ভিত্তিশীল হবে। আর এর মাঝে ‘জনগণের ইচ্ছা’ই ভাগ্য নির্ধারণী। কারণ যতক্ষণ না খোদ্‌ জনগণ বিকশিত হবে, ততক্ষণ তাদের অর্থনীতিও বিকশিত হবে না। অন্যকথায়, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় প্রত্যয় বিকশিত না হওয়া অবধি অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভবপর নয়।[৩৯]

আরব সোশ্যালিজম নামে কিছু কিছু রাষ্ট্রে গোজামিল ধরনের অর্থনৈতিক মডেলের আবির্ভাব ঘটেছে মূলত সমস্যাবলি সমাধানে ধর্মের সার্বিক সামর্থের প্রতি বিশ্বাসের ঘাটতি ও অজ্ঞতা থেকে। বাকের সদর, যিনি উত্তমভাবেই এ সমস্যার মূল উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন[৪০], রোগনির্ণয় মূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেন যে দুই বিখ্যাত অর্থ-ব্যবস্থার আদলে পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক মডেল আদতেই মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য জনগণের সহযাত্রা ও সহচিন্তা দরকার, তবে তা চাপিয়ে দেওয়ার অবকাশ নেই। বরং এর জন্য ন্যুনতম দাবি হল আমরা যেন অর্থনীতি ও নৈতিকতা সম্পর্কে উপেক্ষা না করি। তাই বাকের সদর প্রশ্ন রাখেন- আমরা যেহেতু স্বীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের পাদপীঠ থেকে উত্থিত হতে পারি এবং ধর্মীয় নির্দেশাবলিকে নিজেদের অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নির্ধারণ করতে পারি এবং উক্ত পবিত্রতার রঙে রাঙাতে পারি, তাহলে কেন পাশ্চাত্য অর্থনীতির দিকে যাব, যার সমস্তই বস্তুবাদ ও পার্থিব রঙে মোড়ানো? যে বস্তুবাদী পাশ্চাত্য এমনকি খৃষ্টবাদকেও পার্থিবকরণ করে ছেড়েছে! তাই বাকের সদর একাধিক বর্ণনায় গুরুত্বারোপ করেন যে পাশ্চাত্যের অর্থব্যবস্থা

[৩৮]. দ্র. cv¸ ³, পৃ. ২৯১।
[৩৯]. দ্র. gIm‌AvZ Avj-kvnx‘ Avj-mv‘i, বৈরুত : দার আল মাআরিফ লিল মাতবুয়াত, তা. নে. খ. ১৯, পৃ. ২৬।
[৪০]. দ্র. cv¸ ³, পৃ. ২৩।

সেখানকার বিদ্যমান চৌন্তিক মূল্যবোধ এবং তাদের কাছে গ্রহণীয় নৃ-তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বরং ঐ অর্থব্যবস্থাই তাদের কাছে মানুষ, জগত ও নৈতিকতার ভিত্তি।[৪১]

বাকের সদর ÔBKwZmv'bvÕ গ্রন্থের ভূমিকার শেষভাগে লিখেন, আমাদের অর্থব্যবস্থা, নৈতিকতা ও সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থার সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। আমদানীকৃত মডেলসমূহ এ সামঞ্জস্যতাকে ক্ষুণ্ন করে।[৪২] কিন্তু বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে তিনি এ বিষয়টিকে ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ গঠনের ক্ষেত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে বর্ণনা করেছেন এবং এর তিনটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

১. বিশ্বাস;

২. ধারণা, যা উক্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং মূল্যবোধ ব্যবস্থার পরিচায়ক। যেমন, তাক্ওয়া (সংযমশীলতা)-র ধারণা একত্ববাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং

৩. আবেগ, যা পূর্বোক্ত দুইটি উপাদানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং তাকওয়াবান ব্যক্তিকে মূল্যায়ন এবং তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কারণ হয়।[৪৩]

বাকের সদর প্রথমে ধর্মীয় ভিত্তিসমূহকে চিহ্নিতকরণ, অতঃপর উক্ত ভিত্তিসমূহের উপর নির্ভর করে ইসলামের অর্থব্যবস্থার রূপকল্প স্থির করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন, যাতে কেউ এটা না ভাবে যে আমরা স্বীয় জাতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিবেচনায় না নিয়েই উন্নত অর্থনৈতিক মডেলের অধিকারী হতে পারি। ধর্মীয় ভাষ্যসমূহের (আয়াত ও রেওয়ায়াত) সহায়তায় বিভিন্ন পর্যায়ে এ বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হয়েছে এবং ইসলামের রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে এর অর্থনৈতিক মতাদর্শের এক প্রকার সম্পর্কের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। বাকের সদর বিশ্বাস করেন যে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি এরূপ পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই কেবল মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ আর সমষ্টি তথা সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়ের পথ বের করা যেতে পারে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থব্যবস্থাসমূহ এ সমস্যা সমাধানে নেহায়েতই অপারগ।

ইসলামের অর্থনীতি, ইসলামের মূল্যবোধ ব্যবস্থারই অংশবিশেষ। অপরদিকে, ইসলামি অর্থনীতি এবং ইসলামি মডেলকে হতে হবে ইসলামি শরীয়ত ও নৈতিকতার বহতা, যা ইসলামি রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থে কাজ করবে। ইসলামের মূল্যবোধ ব্যবস্থা পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ব্যবস্থার সথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই ইসলামের অর্থনীতি স্বভাবতই পাশ্চাত্য অর্থনীতি হতে ভিন্ন হবে।

বাকের সদরের চিন্তার অভিনব দিকসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম দিক হচ্ছে তিনি ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত ও সমাধানমূলক মতাদর্শ রূপে উপস্থাপন করেছেন। স্বভাবতই ধর্মীয় শিক্ষাকে পদ্ধতিগতভাবে অধ্যয়নের আবশ্যকতার ব্যাপারে এ আলোচনার একটি ভূমিকা দরকার ছিল। বাকের সদর ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি পদ্ধতিগতভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন কয়েকটি স্থানে। তবে সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন ইসলামি অর্থনীতির উপস্থাপনায়। কেননা ইসলামি অর্থনীতিকে তিনি অপরাপর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতে স্বতন্ত্র একটি ব্যবস্থা হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন।[৪৪]

---

[৪১] . দ্র. CÖv¸³, পৃ. ৩১।

[৪২].দ্র. CÖv¸³, পৃ. ৩৪।

[৪৩].দ্র. CÖv¸³, পৃ. ৩৩৮।

[৪৪].দ্র. CÖv¸³, খ. ২০, পৃ. ১২৮।

A_bxwZ I ˆbwZKZv

বাকের সদর ÔBKwZmv'‡bvÕ গ্রন্থে অর্থনীতির উপর নৈতিকতার প্রভাব সম্পর্কে সবিস্তারে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ইসলামের অর্থনৈতিক সূত্রসমূহের প্রয়োগ ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধসমূহের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধসমূহ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিতরণের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

পশ্চিমা ধারার অর্থনীতি রেনেসাঁ যুগের (১৪৫৩ খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত মানবিক বিজ্ঞানের শাখা তথা নীতিবিদ্যা ও ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন এ বিজ্ঞানের শিক্ষাসমূহ অ্যারিস্টটল ও চার্চের চিন্তা-দর্শন হিসাবে পরিগণিত হত। অ্যারিস্টটলকে যথার্থই 'প্রথম শিক্ষাগুরু' আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি প্রথমবার যখন শাস্ত্র-বিজ্ঞানসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করেন, তখন 'ইকোনোমিক্স-এর প্রতি কোন ইশারাই করেননি। কিন্তু 'পলিটিক্স' ও 'ইথিক্স'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। অ্যারিস্টটল ব্যক্তিমালাকানাকে সমর্থন করেছেন এবং যৌথ মালিকানার সমালোচনা করেছেন। তিনি 'সুদ'কে নিষিদ্ধ করেছেন এবং 'ব্যবহারিক মূল্য' ও 'বিনিময় মূল্য'র মাঝে পার্থক্য করেছেন। অ্যারিস্টটলের অভিমতসমূহ তাঁর ÔcwjwU·' গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে। এসব মত-অভিমতসমূহ নৈতিক বিষয়াবলির সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। 'স্কলাটিক্স' মতাদর্শ, যা কখনো কখনো একটি অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেটাও একটি নৈতিকতাকেন্দ্রিক ও মূল্যবোধভিত্তিক মতবাদ, যা অর্থনীতির মূলনীতিসমূহকে অ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তা এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছে।

প্রাচ্যেও মুসলিম চিন্তাবিদগণ যেমন ইবনে খালদুন, আবু নাসের আল-ফারাবি প্রমুখের অর্থনৈতিক চিন্তা ও দর্শন ছিল মূলত নৈতিকতার আলোকে। কিন্তু রেনেসাঁর আবির্ভাব এবং ডেকার্ট-এর তাত্ত্বিক দর্শন ও প্রয়োগিক দর্শনের মাঝে পার্থক্য করা তত্ত্বসমূহ যা তাঁর 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি'- এ বিখ্যাত আপ্তবচনের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলিত গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে মানবতাবাদ-এর দিকে ধাবিত হয়। ফলে অর্থনীতি আর নৈতিকতা একে অপর থেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। Sir Berlin (১৯০৯-১৯৯৭) বলেন :

> 'যতদিন পর্যন্ত অর্থনীতি কিছু আধিবিদ্যক ধারণাসমূহের সাথে অবিমিশ্রিত ছিল, ততদিন তা দর্শনেরই একটি অংশ ছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে তা একটি স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হয়ে গেছে কিংবা ক্রমে ক্রমে হয়ে যাচ্ছে।'[৪৫]

খ্রিষ্টীয় পনের শতকে ইউরোপে মার্কেন্টাইলিজম মতবাদ প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতা ও অর্থনীতির বিচ্ছেদের স্লোগান মুখরিত করা হয়। এ মতবাদের ভিত্তি ছিল আধিপত্যের জন্য সম্পদ ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য আহরণ করা। অথচ প্রত্যাশা করা হচ্ছিল যে অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে নৈতিকতার নির্যাস ধারণ করে। এ মর্মে বাকের সদর বলেন:

> "...ন্যায়বিচারকামিতার তাৎপর্যই হচ্ছে 'ডকট্রিন' ও 'সায়েন্স' -এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্যের সূচকস্বরূপ। ন্যায়বিচারের তাৎপর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিবেচনা ও পরীক্ষণযোগ্য নয়। বরং এটা একটি নৈতিক উপলব্ধি।"[৪৬]

অ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতিকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে পরিচিত করেছেন এবং আধুনিক অর্থনীতি তাঁর হাত ধরেই রূপ লাভ করেছে। তিনি ১৭৫৯ সনে *The Theory Of Moral Sentiments* শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন নৈতিক নিয়মনীতি সম্পর্কে, যা সমাজকে সুসংবদ্ধ রাখে। অর্থনীতিবিদরা এ গ্রন্থটি পাঠ করেন না এবং এটাকে

---

[৪৫]. উৎ. সাইয়্যেদ হোসাইন ইমামী রচিত প্রবন্ধ "দিদগাহে অমর্ত্য সেন দার জুদায়ীয়ে আখলাক ওয়া ইক্তিসাদ" (Amartya Sen's view on separation of ethics and economics), দ্র. www.Magirain.ir.

[৪৬]. প্রাগুপ্ত |

তাঁর ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত অপর গ্রন্থ *The Wealth of Nations* এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন না। অথচ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হল অ্যাডাম স্মিথ ছিলেন গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির নীতিবিদ্যার একজন অধ্যাপক।

অধ্যাপক হায়দার নাকভী[৪৭] যেসব কারণে অর্থনীতিতে নৈতিকতা বিস্মৃত হওয়ার ব্যাপারে প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে লিখেছেন :

> ‘হয়ত যুগকালের আত্মাকে এজন্য দায়ী করতে পারি। যে আত্মা স্মিথের সময় থেকে অর্থনীতিবিদদেরকে নাড়া দেয়। সেই অ্যাডাম স্মিথ, যিনি নীতিবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন এবং নৈতিকতা থেকে অর্থনীতি পৃথক হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করতেন। এমন এক বিচ্ছেদ, যা পরবর্তীকালে Lionel Robbins (১৮৯৮-১৯৮৪)[৪৮]এটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেন।’[৪৯]

আধুনিক অর্থনীতির যুগে অর্থনীতির সাথে নৈতিকতাকে সম্পৃক্ত করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রদান করেছেন নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। তাঁকে ১৯৯৯ সালে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচনের প্রধানতম কারণ ছিল তাঁর *Collective Choice and Social Welfare* শীর্ষক রচনাকর্মটি। এ গ্রন্থে তিনি অর্থনীতির ভিত্তিগত দুইটি প্রশ্নের প্রতি পুনরায় ফিরে তাকাবার চেষ্টা করেছেন। দুইটি প্রশ্ন, যেখানে তিনি দু’জন ব্যক্তির উন্নয়নের তুলনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হন। তিনি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে তারা (বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারীরা) নাঙ্গা পায়ের লোকদের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাসমূহের এবং তাদের নিজেদের বিলাসী পণ্যদ্রব্যের মাঝে কোন পার্থক্য করেন না- এতে তিনি মনঃপীড়া অনুভব করেন। তিনি দাবি করেন যে, আধুনিক অর্থনীতি নৈতিকতা হতে গুরুতর দূরত্বে সরে গেছে যা অর্থনৈতিক বিজ্ঞানেরও দুর্বলতার কারণ হয়েছে। তদুপরি অর্থনীতির ঐ অংশটি, যা নৈতিকতার প্রতি খেয়াল রেখেছে, দুঃখজনকভাবে ভ্রান্ত উপলব্ধিতে উপণীত হয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যেমন, ‘অর্থনৈতিক মানুষ’-এর বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণকে তার ‘প্রকৃত আচরণ’-এর সাথে একসমান বলে ধরে নিয়েছে।[৫০]

বাকের সদর ‘অর্থনৈতিক মতাদর্শ’ এবং ‘অর্থনৈতিক বিজ্ঞান’- এ দুয়ের পার্থক্য আরও স্পষ্ট করার লক্ষ্যে ‘নৈতিকতা’র প্রসঙ্গ টেনেছেন। তিনি ন্যায়বিচার-এর তাৎপর্যকেই মতাদর্শ এবং বিজ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্যরেখা বলে মনে করেন। এটাকে তিনি মতাদর্শগত চিন্তাধারা আর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পার্থক্য নিরূপণকারী নির্ণয়ক বলেও মনে করেন।[৫১] তিনি বলেন, ‘এখান থেকে জানা যায় যে অর্থনৈতিক ডকট্রিনের কর্তব্য হচ্ছে অর্থনীতির এমন সব সমাধানের উপায় বাৎলে দেওয়া যেগুলো ন্যায়বিচারকামিতার তাৎপর্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে।’[৫২]

ন্যায়বিচার-এর তাৎপর্য হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চমান একটি মূল্যবোধ। বিশ্বের সর্বযুগের সর্ব ধর্মে ও জনজীবনে ‘ন্যায়বিচার’ শ্রেষ্ঠতম নৈতিক গুণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। পক্ষান্তরে ‘অবিচার’ নিকৃষ্টতম অনৈতিকতা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে।

---

[৪৭]. অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপক, ফেডারেল উর্দু ইউনিভার্সিটি অফ আর্টস্ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি, করাচি।

[৪৮]. ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ এবং লণ্ডন স্কুল অব কলেজ- এর অর্থনীতি বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক।

[৪৯].Prof. Haider Naqvi, *Development Economics: A New Paradigm*. New Delhi: Sage Publications, 1993.

[৫০]. উৎ. সাইয়্যেদ হোসাইন ইমামী রচিত প্রবন্ধ “দিদগাহে অমর্ত্য সেন দার জুদায়ীয়ে আখলাক ওয়া ইকতিসাদ”, প্রাগুক্ত।

[৫১]. দ্র.বাকের সদর, BKwZmv‘bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

[৫২]. দ্র. cÖv¸³, পৃ. ১৬।

বাকের সদর দাবি করেন, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজেই এক চিন্তাগত ভিত্তির অধিকারী, খোদ্ ব্যবস্থা আমাদেরকে ঐদিকে পথ দেখায়। এই ভিত্তির মধ্যে ইসলামি নীতিশাস্ত্র, বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক দর্শন কিংবা ইতিহাস দর্শনও অন্তর্ভুক্ত। যা রাজনৈতিক অর্থনীতি কিম্বা মানব সমাজের ইতিহাসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমস্যাবলির সাথে সম্পর্ক লাভ করে।[৫৩] অন্যকথায় বলা যায়, বাকের সদর ইসলামের অর্থব্যবস্থাকে 'অর্থনৈতিক বিজ্ঞান' এবং 'ইসলামের নৈতিক দর্শন'র একটি সমন্বয় বলে মনে করেন।

বাকের সদরের একটি মূল্যবান উদ্যোগ হল তিনি বর্তমান যুগের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যাবলির দিকে এমনকি ভবিষ্যতের সমস্যাবলির দিকেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করেছেন। বিশেষ করে সুদ, ঋণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি তিনি আলাদা স্পর্শকাতরতার পরিচয় দেন। আর এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিই নৈতিকতা ও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুদ হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিচারে নিকৃষ্টতম একটি কর্মের প্রতীক। আবার 'ঋণ প্রদান' হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিচারে উৎকৃষ্ট একটি কর্ম। অন্যকথায় বলা যায়, 'ঋণ প্রদান' হচ্ছে এমন একটি তাৎপর্য, যা অর্থনীতি এবং নৈতিকতা -এ উভয় অঙ্গনেই একই সম্পর্কে যুক্ত।

বাকের সদর এসব তত্ত্ব উপস্থাপনে এমনভাবে অগ্রসর হয়েছেন যাতে বৈধভাবে এবং বেশি বেশি 'আল-মান্তাকাতুল ফারাগ' তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে নৈতিকতার দৃষ্টি থেকে ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সকল পক্ষের (যেমন যন্ত্রপাতির মালিক, শ্রমের মালিক, পুঁজির মালিক ইত্যাদি সকল পক্ষের) বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য হয়।

mvgwRK wbivcËv

ইসলামি অর্থনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে লোকদেরকে অভাবমুক্ত করা এবং সর্বজনীন আপেক্ষিক সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা, সেহেতু ইসলামি সরকার তথা রাষ্ট্রের অভিভাবকের কর্তব্য হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

ইসলামি রাষ্ট্র জনগণের সম্পূর্ণ জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার বিধান করার দায়িত্ব বহন করে। সচরাচর দুইটি পর্যায়ে রাষ্ট্র তার এই দায়িত্বকে পালন করে থাকে। প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্র, ব্যক্তির জন্য কর্মের মাধ্যম এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তার সম্মানজনক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। যাতে সে কর্ম ও প্রচেষ্টা দ্বারা তার জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। আর দ্বিতীয় পর্যায়টি তখনই বাস্তবায়িত হয় যখন রাষ্ট্র বিশেষ পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে পুরোপুরি কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না। এরূপ পরিস্থিতিতে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি উত্থাপিত হয়, যা সমাজের সকল ব্যক্তির জন্য অপেক্ষাকৃত ন্যূনতম সচ্ছলতা বিধান করার দায়িত্ব রাখে।[৫৪]

সামাজিক নিরাপত্তা দুইটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত :

এক. সর্বজনীন দায়বদ্ধতা এবং

দুই. রাষ্ট্রের সরকারি আয়ে সমাজের অধিকার।

সর্বজনীন দায়বদ্ধতা ব্যক্তিদের মৌলিক ও জীবন রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলোর অধিক কিছু দাবি করে না। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তার দ্বিতীয় স্তম্ভের ক্ষেত্রে, যা রাষ্ট্রের সরকারি আয়ে সমাজের অধিকারের কথা নির্দেশ

[৫৩]. দ্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

[৫৪]. দ্র. cv¸³, পৃ. ৬৬১।

করে, সকল অত্যাবশ্যকীয় এবং প্রচলিত চাহিদাসমূহের পর্যাপ্ত মাত্রায়, বরং তার চেয়েও অধিকমাত্রায় পূরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটি ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্য হল এ উভয় ক্ষেত্রে তার সুযোগ-সুবিধার আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।[৫৫]

mvgwRK mvg¨Zv

সমাজের ব্যক্তিদের একে অপরের সাথে প্রাকৃতিক এবং স্বেচ্ছাধীন উভয় রকমের পার্থক্য রয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি ধরে নিই যে, মালিকানার ভিত্তি হিসাবে কর্মই হচ্ছে আয়-উপার্জনের জন্য একমাত্র মাপকাঠি, আর সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্থাও কোন অন্যায়াচারী কিম্বা শোষণমূলক সংস্থা না হয়, তাহলে দেখা যাবে যে কিছুকাল পরে মেধা, আত্মিক ও দৈহিক পার্থক্যের কারণে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পরিমাণের মধ্যে তারতম্য ঘটবে। বাকের সদর বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম ব্যক্তিদের মেধাগত ও দৈহিক পার্থক্যকে অনুমোদন করে।[৫৬] কিন্তু যেহেতু ইসলামের সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থা ন্যায়বিচারপূর্ণ এবং ইসলাম তার বিধি-বিধান ও মূল্যবোধের কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বজায় রাখে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাকে অনুমোদন দিয়ে থাকে, সেহেতু সামাজিক সাম্যতাকে এর সদর্থক ও নঞর্থক– দুই পথেই সম্পাদন করে থাকে :

১. নঞর্থক পথ : ইসলাম মজুতদারি, একচেটিয়া প্রবণতা ও সম্পদ কুক্ষিগত করা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে আয়-উপার্জনে অসাম্যতার হ্রাস ঘটায়।

২. সদর্থক পথ : সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের জীবনমানকে পরস্পর নিকটবর্তী করার মাধ্যমে জীবন-জীবিকায় সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠার কারণ হয়।[৫৭]

ইসলামে সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠার মধ্যে উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন-জীবিকার স্তরে সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে সাম্যতা আনয়ন করা, আয়-উপার্জনে সাম্যতা উদ্দেশ্য নয়। আর জীবন-জীবিকার স্তরে সাম্যতা আনয়ন করা বলতে উদ্দেশ্য এটাই যে সম্পদ সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে এক হাত থেকে আরেক হাতে সঞ্চালিত হবে, এমনভাবে যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই যেন সচ্ছল জীবনমানের সংস্থান হয়। যদিও আয়-উপার্জনের দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকতেই পারে। কেননা, ইসলাম তো ব্যক্তিদের মেধাগত ও দৈহিক সামর্থের পার্থক্যকে অনুমোদন করেই থাকে।[৫৮]

বাকের সদরের মতে, ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেমনভাবে সরকার সমাজের ব্যক্তিদের সামনে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাখে, তদ্রূপ তার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের উৎস, সুযোগ-সুবিধা এবং কর্তৃত্বসীমাকেও বিবেচনায় রেখেছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

¯^vqx Kimgn : যাকাত আর খুম্স হচ্ছে স্থায়ী কর। এগুলো শুধুমাত্র মৌলিক অপরিহার্য চাহিদাসমূহ পূরণকল্পে প্রবর্তিত হয় নি। বরং এছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন এবং দরিদ্রদের জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে তা প্রবর্তন করা হয়েছে, যাতে ইসলামের দৃষ্টিতে যে সামাজিক সাম্যতার কথা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্যের বাস্তবায়ন ঘটে।[৫৯]

---

[৫৫]. দ্র.cv¸ ³, পৃ. ৬৬১-৬৬২।
[৫৬]. দ্র. cv¸ ³, পৃ. ৬৭৩।
[৫৭]. উৎ. নাসের জাহানিয়ান, "জায়গাহে দৌলাত দার ইকতিসাদ-এ ইসলামি," Ô^Î-gwmK BKwZmv`-G Bmjwg©, প্রাগুক্ত।
[৫৮]. দ্র. বাকের সদর, বাকের সদর, BKwZmv`bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৩।
[৫৯]. দ্র.cv¸ ³, পৃ. ৬৭৬।

ইসলামে যাকাত ও খুমসের ব্যবস্থা যে সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠাকল্পেই প্রবর্তিত হয়েছে– বাকের সদর তাঁর এ দাবির সপক্ষে কিছু ইসলামি বর্ণনাসূত্রের উল্লেখপূর্বক মন্তব্যে বলেন :

> ‘এসব বর্ণনা যাকাত ও অনুরূপ অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ প্রদান করে, যাতে অভাবী ব্যক্তিরা সর্বসাধারণ জনগণের জীবনমানে পৌঁছতে পারে এবং খাদ্য-খোরাক, পোশাক, বিবাহ, দান-খয়রাত এবং হজ্জ ইত্যাদির দিক থেকে অপরিহার্য চাহিদাগুলো পূরণ করতে সক্ষম হয়। এ সবগুলো বিষয়ই একটি অভিন্ন লক্ষ্যকে অনুসরণ করে চলে। আর তা হল, ইসলামি অর্থে অভাবমুক্তির বিস্তার ঘটানো এবং জীবনোপকরণের স্তরে সামাজিক সাম্যতা সৃষ্টি।’[৬০]

cvewjK †m±i mw৶ó : ইসলাম স্থায়ী করসমূহ ছাড়াও রাষ্ট্রকে সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠাকল্পে পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ করার জন্য দায়িত্বশীল বলে মনে করে থাকে। যাতে স্থায়ী করসমূহ যদি অপ্রতুল হয়, সেক্ষেত্রে সরকারি রাজকোষ (তথা বাইতুল মাল) অভাবী লোকদের অভাব পূরণে কাজে লাগানো হয়।[৬১] আর এই কারণেই ‘আনফাল’[৬২] সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদকে সামাজিক সাম্যতা এবং সর্বজনীন দায়বদ্ধতা পূরণে ব্যবহার করা যেতে পারে। একইভাবে জনকল্যাণমূলক কাজেও এ সম্পদ কাজে লাগানো যায়।

Bmjvwg AvBb-cYq‡bi ¯^iƒc-mËv

ইসলামি আইন-প্রণয়ণের স্বরূপ-সত্তা, যা বিভিন্ন সেক্টরে অর্থনৈতিক জীবনকে বিন্যস্ত করে থাকে, রাষ্ট্রকে সামাজিক সাম্যতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহকে সম্পাদনে সহায়তা করে থাকে। নিম্নে এরূপ কিছু আইনের স্বরূপ তুলে ধরা হল ঃ

(K) m‘ wbwl×KiY : আজ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে সম্পদকে ঘিরে যে অত্যাধিক দ্বন্দ্ব ও বিভেদ, এগুলোর অধিকাংশই জন্ম নেয় সুদ গ্রহণ এবং তা থেকে বে-হিসাবী আয়-উপার্জনের স্পৃহা থেকে। ইসলাম সুদকে অর্থনৈতিক জীবন থেকে মুছে ফেলার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ এবং বঞ্চিতদের ভোক্তা খরচ হ্রাস করে এনেছে। আর এভাবে দরিদ্রদের থেকে ধনীদের নিকট আয়-উপার্জন স্থানান্তরিত হওয়ার পথকে বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে সম্পদের পার্থক্য এবং আয়-উপার্জনের পার্থক্যের একটি বড় রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

(L) DËiwaKvi AvBb : ইসলামে প্রবর্তিত উত্তরাধিকার আইনও সম্পদের সাম্যতা সৃষ্টির আরেকটি মাধ্যম। কেননা, বেশিরভাগ সম্পদশালীরা আর্থিক ক্ষেত্রে সকল অবশ্যপালনীয় অধিকারসমূহ পরিশোধ করার পরও তাদের জীবদ্দশায় আরও অনেক সম্পদ উপার্জন করবে। এমতাবস্থায় তাদের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে উক্ত সম্পদরাজি তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করা হয়। এটা নিজেই এক প্রকার সম্পদের সাম্যতার প্রয়াস। কিন্তু যদি সমস্ত সম্পদ জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রাপ্য হত কিংবা সম্পদের মালিক যদি তার সমুদয় সম্পদকে মৃত্যুর পরে তার পছন্দের কোন লোকের কাছে স্থানান্তরিত করতে পারতো, সেক্ষেত্রে সম্পদের এই সাম্যতা ও সুষম বণ্টন সম্পন্ন হত না।

---

[৬০]. cv¸³, পৃ. ৬৭৯।

[৬১]. দ্র.শায়খ কুলাইনি, Dm‡j Kwd, খ. ১, পৃ. ৫৪১।

[৬২]. আনফাল (انفال) বলতে বুঝায় ঐ সমস্ত সম্পদ, যেগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা নেই এবং সকল ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হাতে ন্যাস্ত হয়। সাধারণত মুসলমানরা বিনা যুদ্ধে যে সম্পদ হস্তগত করে থাকে তা আনফালের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ অর্থে ‘ফেই’সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদও আনফালের পাশাপাশি একই হুকুমভুক্ত হয়ে থাকে।

(M) gRZ‘vix, GK‡PwUqvcbv I m¤ú‘ KwÿMZ Kiv wbwl×KiY: ইসলামি রাষ্ট্র মজুতদারী ও একচেটিয়াপনা নিষিদ্ধকরণ, বিশেষ করে পুঁজিবাদী কায়দায় কাঁচামালজাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের একচেটিয়া ভোগদখলকে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে সম্পদ কুক্ষিগত করার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। আর এ পদক্ষেপের মাধ্যমে সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠার পথ মৃসণতর হয়েছে।

রাষ্ট্র উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়াও নতুন নতুন খাতে করারোপের মাধ্যমে সম্পদশালীদের সম্পদ কমিয়ে আনতে পারে, কিছু কিছু পণ্যের মূল্যসীমা নির্ধারণ করে দিয়ে সেগুলোর সীমাহীন মুনাফা করা থেকে থামিয়ে রাখতে পারে, ঠিকাদারদের জন্য কিছু কিছু শর্ত (যেমন ন্যুনতম মজুরির পরিমাণ ও সর্বোচ্চ কর্ম ঘণ্টা নির্ধারণ ইত্যাদি) নির্ধারণ করে দেওয়ার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের উপযুক্ত জীবনমান রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। একইভাবে আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে ভূমি ও শিল্পের বৃহত্তর মালিকানা এবং ব্যাপক মুনাফা অর্জন থেকে বিরত রাখতে পারে। উপরোক্ত এ সবগুলো ক্ষেত্রেই সমাজের কল্যাণার্থে কাজ করা একটি প্রধানতম সূত্র তথা মূলনীতি।

যদিও বাকের সদরের অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ এবং তাঁর উপস্থাপিত রূপরেখাটি এমন একটি সময়ে উত্থাপিত হয়েছে, যখন ইসলামি অর্থনীতি এবং ইসলামি অর্থনৈতিক মতাদর্শ তথা ব্যবস্থার আলোচনা মুসলিম সমাজের মধ্যে ততটা প্রচলিত ছিল না। ফলে এ অঙ্গনে তাঁর পর্যালোচনাগুলো নতুন বলেই পরিগণিত হত। তদ্‌সত্ত্বেও তিনি ইসলামি অর্থনীতি এবং এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা (যেমন ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বসীমা, সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইত্যাদি)কে যথার্থরূপে ও বিজ্ঞতাপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন।

4. Bmjwg A_bxwZi we¯ÍwiZ i/c‡iLv

‘ইসলামি অর্থনীতি’- কথাটি শোনামাত্রই অনেকের মস্তিষ্কে জেগে ওঠে একটি ধারণা। আর তা হল আয়াত ও রেওয়ায়াতসূত্রে প্রাপ্ত অর্থনীতি কেন্দ্রিক একগুচ্ছ বিধানাবলি, যা ইসলাম ধর্মে বিদ্যমান। তবে এ সমস্ত সূত্রগুলো ইসলামী অর্থনীতির আংশিক চেহারাই প্রতিফলিত করে থাকে। অর্থাৎ এই সীমিত সূত্রসমূহের পাশাপাশি কতেক ব্যক্তিরও অবদান অনস্বীকার্য, যারা এ অঙ্গনে জ্ঞান-গবেষণা পরিচালনা করেছেন। যদিও তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ইসলামের দীর্ঘ পরিক্রমায় ফিকাহ্ গ্রন্থগুলোতে যোগ করা হয়েছে عقود (উকুদ) তথা অর্থনৈতিক চুক্তি মর্মে অধিকতর ব্যাখ্যা। তথাপি পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি কোন সূত্র মুসলিম গবেষকদের হাতে সেভাবে ছিল না। বাকের সদর মনে করেন, উপরোক্ত বিষয়গুলো ইসলামি অর্থনীতির সব দৃষ্টান্ত ছিল না। কখনো আবার অর্থনীতিতে অদক্ষ ব্যক্তিরাও ইসলামের বিধি-বিধানকে ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করেছে। অথচ বাকের সদর বিশ্বাস করেন, ইসলাম একটি অর্থনৈতিক ডকট্রিনের অধিকারী। তিনি ইসলাম ও অর্থনীতির সম্পর্ককে দুইটি রূপে নির্ধারণ করেন : একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তথা বন্ধন, যা ইসলামি চুক্তিপত্র যেমন ওয়াক্‌ফ, হিবা, মুযারেয়া ও মুসাকাত, মুদারাবা এবং এমনকি উত্তরাধিকার ও সদকা’র মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আর অন্যটি অপ্রত্যক্ষ সম্পর্ক, যার আওতার মধ্যে পড়ে অর্থনৈতিক নৈতিকতার বিষয়টি।[৬৩] যেমন চুরি নিষিদ্ধ হওয়া, উৎকোচ নিষিদ্ধ হওয়া, আমানতের খেয়ানত ঘৃণ্য হওয়া ইত্যাদি।

বাকের সদর এভাবে ইসলামি অর্থনীতিকে একটি মৌলিক চিন্তার উপরিকাঠামো হিসাবে দেখেছেন, যাকে সামাজিক ন্যায়বিচার বলে অভিহিত করা যায়। অন্যকথায় বলা যায়, ইসলামি ন্যায়পরতা ইসলামি অর্থনীতির মেরুদণ্ডসম।

[৬৩]. দ্র. মূর্তজা মোতাহহারি, gvewb-G GK‡Zmv‡‘ Bmjwg, কোমঃ এন্তেশারাতে ইসলামি, ১৪০৩ হি. পৃ.৩২।

এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে ইসলামে হালাল ও হারামের নির্দেশনাই বাকের সদরের এহেন দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতাকে প্রতিপন্ন করে। নিম্নে বাকের সদরের উপস্থাপিত ইসলামি অর্থনীতির বিস্তারিত রূপরেখা উপস্থাপন করা হল:

Bmjwg weZiY ZË

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অসঙ্গতি রোধ করার প্রথম পদক্ষেপই শুরু হয় জনগণের মাঝে অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের বিতরণের মাধ্যমে। একটি ন্যায়ানুগ সমাজ হল সেটাই, যেখানে অর্থনৈতিক সম্পদ হতে সকল জনগণের উপকৃত হওয়া স্বীকৃত থাকবে। বাকের সদর দাবি করেন, ইসলামি অর্থনীতি ঠিক এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামে বিতরণ ব্যবস্থা দুটি প্রধান উপায় দ্বারা গড়ে ওঠে। যথা :

(১) শ্রম এবং

(২) চাহিদা।

অর্থনৈতিক সম্পদের প্রথম রূপটি হল পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ। অর্থনৈতিক সম্পদের অন্যায্য বিতরণ ব্যবস্থা শুরু হয় এসব প্রাকৃতিক সম্পদ উৎস্যসমূহের মালিকানা সমস্যা দ্বারা। এখানে জেনে নেওয়া দরকার যে, ইসলামে এ সকল সম্পদ উৎসে মালিকানা অধিকার কার? বাকের সদর এক্ষেত্রে অভিমত প্রদান করেন যে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের বিতরণ ব্যবস্থা দুইটি ধাপে গড়ে ওঠে। যথা :

১. উৎপাদন-পূর্ব বিতরণ।

২. উৎপাদন-পরবর্তী বিতরণ।[৬৪]

বাকের সদরের তত্ত্বে এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে : 'সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদই পাবলিক সেক্টরের অংশ। আর ব্যক্তিরা শুধু তা ব্যবহার করার বিশেষ অধিকার লাভ করে একটি উপায়ে, সেটা হল শ্রম। যে শ্রম [উক্ত] সম্পদের উন্নয়নে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে প্রয়োগ করে।'[৬৫]

উপরোক্ত মূলনীতি অনুসারে একজন ব্যক্তি উদাহরণস্বরূপ বৃহৎ কোন সম্পত্তির মালিকানা অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নে অপর ব্যক্তিদেরকে ব্যবহার করতে পারবে না। অন্যথায় তারা তাদের শ্রমের ভিত্তিতে উক্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানায় এবং মুনাফায় ভাগিদার হবে। এই একই কারণে এরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন তৈল এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়নের শিল্পখাত কেবল রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত ও রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবস্থাপনা হতে পারে।

e¨w³MZ gvj-m¤ú‘

যা কিছু মানব শ্রম দ্বারা উৎপাদিত হয় অথবা রূপান্তর সাধিত হয়, সেটা ব্যক্তিগত সম্পদভুক্ত হয়। যেমন কৃষিজাত ফসল, কাপড় ইত্যাদি। তদ্রূপ যেসব সম্পদ ভূমি কিংবা সমুদ্রের তলদেশ হতে নিস্কাশিত অথবা মরুভূমি কিংবা আকাশ হতে শিকার করতে মানব শ্রম দরকার হয়। সম্পদ সৃষ্টি ও উৎপাদনে শ্রমের প্রভাব যেমন কৃষিজ ফসল

---

[৬৪]. দ্র. বাকের সদর, "আল-নাযারিয়্যা আল-ইসলামিয়্যা লি তাওযী আল-মাসাদির আল তাবিয়িয়্যা", BLZvibv jvKv, বৈরুত : দার আল-যাহরা, ১৯৮২, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

[৬৫]. ________, "খুতাত তাফসিলিয়্যা আন ইকতিসাদ আল-মুজতামা আল-ইসলামি",Avj-Bmjvg BqvK' Avj-nvqvZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

লাভের জন্য কাজ এবং প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে কাজের প্রভাব যেমন বিদ্যুৎ শক্তির নিঃসরণ কিংবা ভূমি অভ্যন্তর হতে তেল উত্তোলন, এসব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও তেল মানুষের হাতে সৃষ্ট নয়। কিন্তু শ্রম এগুলোকে একটি রূপ প্রদান করেছে, যার ফলে এগুলো ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠেছে। এ দু'ধরনের সম্পদ ব্যক্তি মালিকানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ শ্রমই হচ্ছে মালিকানার ভিত্তি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এধরনের সম্পদ মানব শ্রমের সাথে সংযুক্ত থাকবে, ততক্ষণ শ্রমিক তার মালিক থাকতে পারবে।

mvaviY (meRbxb) gvj-m¤ú'

যা কিছুর সৃষ্টি কিংবা রূপান্তরে মানুষের হাতের কোন হস্তক্ষেপ থাকে না, যেমন ভূমি। এর অভ্যন্তরের মূল খনিজ এবং নিহিত সম্পদসমূহ, এসব সর্বজনীন সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা বর্তায় না।

Abvev'x fLÐ : এ ব্যাপারে ফকীহবৃন্দের মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন জমি আবাদযোগ্য ও বসবাসযোগ্য করে তুললেও উক্ত জমির মালিক হওয়া যায় না। তবে অধিকাংশ ফকীহ্ই মনে করেন যে, মৃত জমি আবাদযোগ্য করে তুলতে পারলে তার মালিকানা লাভের কারণ হয়। অবশ্য এ তাত্ত্বিক মতপার্থক্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনই প্রভাব ফেলে না। কারণ উভয় পক্ষই বলেন, যদি ভূমিকে আবাদযোগ্য করে, তা হলে যতক্ষণ অবধি উক্ত জমিতে এ আবাদের চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ তা তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। যখন জমি পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে উক্ত আবাদের চিহ্ন বিলীন হয়ে যাবে, তখন অন্যরা তা ব্যবহার করতে পারবে। অনুরূপভাবে উভয়পক্ষের ফকীহগণই বলেন যে মুসলিম শাসক (হাকিম) ভূমির উপর 'খাররাজ' হিসাবে খাজনা আরোপ করতে পারবেন এবং যাদের হাতে জমি রয়েছে তাদের নিকট হতে এ খাজনা গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রথম মতের ভিত্তিতে, ভূমি যেহেতু এমন কোন সম্পদ নয় যা সৃষ্টি করতে মানুষের কোন হস্তক্ষেপ থাকে, একারণে এর ব্যক্তি মালিকানা হবে না এবং এর আবাদ ও বসবাসযোগ্য করে তোলা হচ্ছে ভূমির একটি সাময়িক রূপান্তর। এটা শ্রমিকের জন্য কেবল উক্ত জমি ব্যবহার করার অধিকার এনে দেয় এবং অন্যরা তার জন্য বিঘ্ন সৃষ্টির অধিকার পায় না। কারণ সে উক্ত ভূমিতে যে শ্রম ব্যয় করেছে তদ্দ্বারা সে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার লাভ করেছে। কেননা এ ভূমির জন্য যে হাত কাজ করেছে এবং যে হাত কাজ করেনি তারা উভয়ই উক্ত জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমানাধিকার পাবে -এটা নেহায়েতই অন্যায্য কথা। সুতরাং ব্যক্তির হস্তগত রাখার অধিকার আছে এবং যতদিন অবধি জমিতে তার শ্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট অবস্থা বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত সে এই অধিকার সংরক্ষণ করবে। হ্যাঁ, যদি সে জমিকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার ব্যক্তি অধিকারও চলে যাবে। অবশ্য এরূপে অর্জিত ব্যক্তি মালিকানার মূলনীতিটির কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে শুধু ইসলামি 'দাওয়াত' এর ক্ষেত্রে।

gwjKvbv nj weZiY e¨e¯'vi ˆØZwqK gva¨g

ইসলাম শ্রমভিত্তিক ব্যক্তি মালিকানার প্রবক্তা, কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের ন্যায় মালিক যে কোন উপায়ে তার সম্পদকে বৃদ্ধি করবে এমন বৈধতা প্রদান করেনি। বরং এটাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। একইভাবে মার্কস্‌বাদের ন্যায় সামগ্রিকভাবে তা ব্যবহার বা ভোগকে নিষিদ্ধও করেনি। বরং ইসলাম একটি মধ্যম পথে অগ্রসর হয়েছে এবং কতেক মুনাফাকে হারাম ঘোষণা করেছে যেমন সুদি মুনাফা। আবার কতেক মুনাফাকে বৈধ ঘোষণা করেছে। যেমন ব্যাবসায়ের মুনাফা। সুদি মুনাফা নিষিদ্ধকরণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কে পুঁজিবাদের সাথে ইসলামের মূল

পার্থক্যের কারণে। আর ব্যবসায়ের মুনাফা বৈধকরণ, মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কে মার্কস্‌বাদের সাথে ইসলামের মূল পার্থক্যের কারণে।

আর যেহেতু ইসলাম ব্যবসায়ের মুনাফাকে বৈধ বলে মনে করে, একারণে ব্যবসার মাধ্যমে এবং শরীয়তের শর্তাবলি ও সীমা-পরিসীমা অনুযায়ী মালিকানা, সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যম হয়। আর ইসলামের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও সামাজিক স্বার্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ সম্পদ বিতরণের জন্য মালিকানা দ্বৈতীয়িক মাধ্যম হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায় -

প্রথমত : ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ তথা শ্রমই হচ্ছে সম্পদ বিতরণের প্রধান মাধ্যম। কারণ এ শ্রমই হচ্ছে মালিকানার ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত: বিতরণের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে 'চাহিদা'। কারণ চাহিদাই ভাল জীবন-জীবিকা সম্পর্কে মানব অধিকারের পরিচায়ক।

তৃতীয়ত: মালিকানা হচ্ছে বিতরণের দ্বৈতীয়িক মাধ্যম, তবে বিশেষ শর্তাবলি দ্বারা সীমাবদ্ধ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

বাকের সদর শ্রমিকের শ্রম এবং এদ্বারা যে মূল্য উৎপাদন করে তার মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে পর্যালোচনা করেছেন। শ্রম বিভিন্ন প্রাকৃতিক কাঁচামালের উপর প্রয়োগ করা হয়। ভূমি হতে খনিজ সম্পদ নিষ্কাশন, বনভূমির গাছ-গাছালির কাঠ কাটা, সাগরে ডুব দিয়ে মণি মুক্তা আহরণ, মরুভূমির জীবজন্তু শিকার এবং অন্যান্য সম্পদ আহরণ যেগুলো মানুষ শ্রমের বিনিময়ে প্রকৃতি হতে আহরণ করে থাকে।

তিনি বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, কাঁচামালের উপর শ্রমের বিনিয়োগের ফলে আসলে কি ঘটে? আর শ্রমের মাধ্যমে যে সম্পদ অর্জিত হয়েছে তার সাথে শ্রমিকের সম্পর্কই বা কী? এক্ষেত্রে কমিউনিজমের অভিমত হল, শ্রমিক ও তার শ্রমের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নেই। শ্রমিকের কোন অধিকার নেই, শুধু তার চাহিদা পূরণ ব্যতীত। কারণ কাজ হচ্ছে একটি সামাজিক কর্তব্য, যা ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকে এবং সমাজ এর প্রতিদান প্রদান করবে তার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে। যেন সমাজ হচ্ছে একটি বিশাল অস্তিত্বসত্তা, যার মধ্যে ব্যক্তিরা শরীরের অঙ্গ ও কোষসমূহের ন্যায় কাজ করে। আর শরীরের কর্তব্য হচ্ছে সেগুলোর খাবার যোগান দেওয়া। সুতরাং কাজ তথা শ্রমের কোন সম্পর্কই নেই বিতরণের সাথে।

কিন্তু মার্কসের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ্রম ও শ্রমিকের সম্পর্ক পাওয়া যায় মূল্যের সূত্র হতে। শ্রমিক কাঁচামালের উপর যে শ্রম বিনিয়োগ করেছে এর দ্বারা সে তার মধ্যে বিনিময় মূল্য সৃষ্টি করেছে। কাজেই কাঁচামাল, মানুষের শ্রম বিনা কোন মূল্য রাখে না। যেহেতু শ্রমই মূল্য সৃষ্টির কারণ হয়েছে, কাজেই উৎপাদিত মূল্য বিতরণ হবে শ্রমের ভিত্তিতে। সুতরাং প্রত্যেক শ্রমিককে তার শ্রমের অনুপাতে মূল্য দেয়, তার চাহিদার অনুপাতে নয়।

কিন্তু বিতরণের প্রশ্নে ইসলাম অপরাপর অর্থব্যবস্থার সদৃশ নয়। কমিউনিজমের সাথে সদৃশ নয়, কারণ শ্রম ও তার ফলের সাথে সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে না। কেননা ইসলাম সমাজকে একটি একক সমষ্টি বলে মনে করে না। বরং বহু ব্যক্তিক বলে মনে করে যারা শ্রম দেয়। আর সমাজতন্ত্রের সাথে সদৃশ নয়, কারণ ইসলাম জানে যে প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি যেমন কাঠ, খনিজদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ নিজ মূল্যকে মানুষের শ্রম হতে লাভ করে না। বরং প্রত্যেক কাজের মূল্য হচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি সামাজিক আকর্ষণ ও মূল্যায়ন, যা উক্ত দ্রব্যের প্রতি থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম, শ্রমিকের জন্য (তার নিজের শ্রমের) মালিকানার কারণ হয়। আর এই শ্রম সূত্রে ব্যক্তি-মালিকানা উৎসারিত হয় মানুষের স্বীয় শ্রমের ফল নিজেই মালিক হওয়ার প্রতি তার সহজাত বাসনা থেকেই। মানুষের এই যে সহজাত বাসনা, কেননা মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করে থাকে যে নিজের শ্রমের উপর কর্তৃত্ব তার নিজেরই। সুতরাং শ্রমভিত্তিক মালিকানা হচ্ছে মানুষের জন্য একটি অধিকার। কাজেই ইসলামে শ্রমই হচ্ছে প্রাকৃতিক কাঁচামালে মালিকানার ভিত্তি, তদ্রূপ সম্পদ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রধানতম ভিত্তিও বটে। শ্রমই পণ্যের সম্পর্কে শ্রমিকের মালিকানার কারণ, পণ্যে মূল্য সৃষ্টির কারণ নয়। যে শ্রমিক সমুদ্র হতে মুক্তা আহরণ করে, সে উক্ত জিনিসে মূল্য দান করে না, বরং সেটার মালিক হয়। ড. আসলাম হানিফ বাকের সদরের বিতরণ তত্ত্বকে একটি সারণির মাধ্যমে এভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ[৬৬]

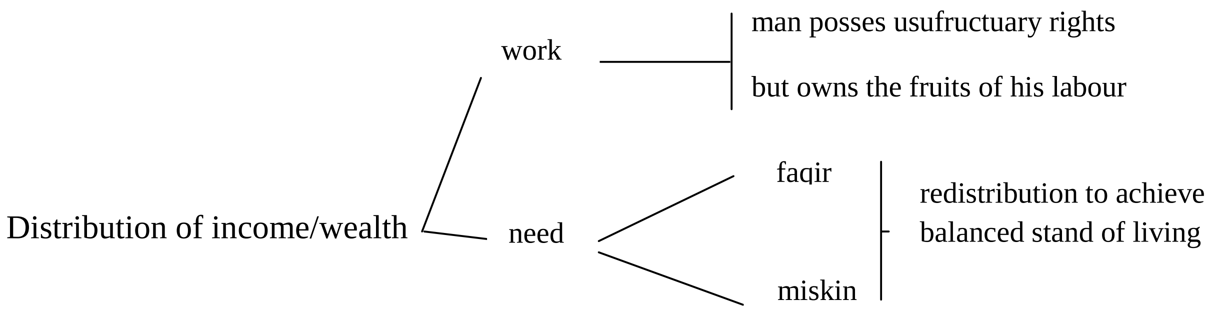

weZi‡Yi †ÿ‡Î ÔPvwn'vÕi fwgKv

মুসলিম সমাজে বিতরণের প্রথম রূপটি নির্ধারণ করে ‘শ্রম’ এবং ‘চাহিদা’র যৌথ ভূমিকা। জনগণ একটি সমাজে তিনটি দলে বিভক্ত হয়। একদল হচ্ছে যারা কাজ করতে পারে এবং নিজ চিন্তা ও জ্ঞানের শক্তি কাজে লাগিয়ে উন্নত পর্যায়ে জীবন নির্বাহ করতে সক্ষম থাকে। আরেক দল যারা নিজের কাজ ও শ্রম দ্বারা শুধু জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলোই পূরণ করতে সক্ষম হয়। আর তৃতীয় দলটি হচ্ছে যারা দৈহিক দুর্বলতা কিম্বা মানসিক প্রতিবন্ধিতাবশত কাজ করতে পারে না।

ইসলামি অর্থনীতির ভিত্তিতে বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথম দলটি নিজের কাজ ও শ্রমের উপর নির্ভর করে, যদিও তা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত হয়ও। এ দলটি সম্পর্কে ‘চাহিদা’র কোনই প্রভাব নেই। তাদের বিপরীতে তৃতীয় দলটি চাহিদা মাফিক বিতরণ অনুযায়ী তাদের জীবনকে নির্বাহ করে থাকে। কারণ, তারা কাজ করতে পারে না। আর মাঝখানে দ্বিতীয় দলটি নিজেদের উপার্জনের ক্ষেত্রে কাজ এবং চাহিদার উপর নির্ভর করে। কাজ তাদের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলোকে পূরণ করে থাকে। আর চাহিদা তাদেরকে সাধারণ সুখ-স্বচ্ছলতার জীবন এনে দেয়।

e¨w³-gvwjKvbv

বাকের সদর ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শে ‘মালিকানা’ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি দাবি করেন যে, ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার সূত্রটি হচ্ছে ‘কাজ মালিকানার মূল ভিত্তি।’ একারণে প্রত্যেক শ্রমিক, সে যেসব

---

৬৬. সারণি সূত্র : Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis,* Kuala Lumpur, Ikraq,1995, p.126.

পণ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখল, তাতে তার মালিকানা অর্জন করল। সুতরাং যে মালই মানুষের বিশেষ 'শ্রম' থেকে রূপ লাভ করবে, সেটা ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে স্থান পাবে। যেমন কৃষিজ ও বয়নকৃত পণ্য এবং একইভাবে যেসব সম্পদ ভূ-গর্ভ কিংবা সাগর থেকে নিস্কাশনে অথবা তা শিকার করতে কোন কাজ সম্পাদন করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে যে সমস্ত মালে 'শ্রম' কোনই প্রভাব রাখে না, সেগুলো ব্যক্তি মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ ভূমি ও খনি ব্যক্তি মালিকানার আওতায় আসবে না। আর জলজ সম্পদ সকলের জন্য বৈধ হিসাবে পরিগণিত হবে, যা ব্যবহার করার অধিকার সকল মানুষেরই থাকবে।[৬৭]

বাকের সদরের ব্যাখ্যা মতে, শ্রমের উপর ভিত্তিশীল না হলে কোন উপার্জনই বৈধ নয়। অতঃপর তিনি 'শ্রম'কে দুইভাগে ভাগ করেন :

১. প্রত্যক্ষ শ্রম : যে শ্রমের উৎপাদন ও খরচ একই সময়ে ঘটে। যেমন শ্রমিকের শ্রম।
২. বিচ্ছিন্ন ও গচ্ছিত শ্রম : যে শ্রম একটি সময়ে উৎপাদিত এবং অন্য আরেক সময়ে খরচ হয়, তাকে গচ্ছিত শ্রম বলে। যেমন আবাসন কিম্বা উৎপাদন সরঞ্জামের মধ্যে গচ্ছিত শ্রম।[৬৮]কেননা আবাসন থেকে যে ভাড়া মালিকের পাওনা হয় সেটা তার ঐ গচ্ছিত শ্রমই।

বাকের সদর স্মরণ করিয়ে দেন যে, পণ্যের মধ্যে এই গচ্ছিত শ্রম, সেটা ব্যবহারের ফলে সময়ের পরিক্রমায় ক্ষয় হয়ে যায়। একারণে যদি কোন ব্যক্তি তার মালিকানাভুক্ত কোন পণ্যকে অন্য কারও হাতে দেয় তাহলে সময়ের পরিক্রমায় তার পণ্য কিংবা ঐ গচ্ছিত শ্রম ক্ষয় হয়ে যায়। কাজেই মালিক এর বিপরীতে পারিশ্রমিক (তথা উপার্জন) দাবি করতে পারে।

gwjKvbv I mvgvwRK 'vq-'wqZ

বাকের সদরের দৃষ্টিতে ব্যক্তি কর্তৃক জিনিসকে হস্তগতকরণের ফলে উক্ত জিনিসের সাথে সমাজের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় না। বরং সমাজের নজরদারি ও দায়বদ্ধতা পূর্ববৎ বহাল থাকবে। তিনি এ প্রসঙ্গে নির্বোধ প্রকৃতির মালিকের জন্য তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে বাধা সংক্রান্ত ইসলামের বিধানটি উল্লেখ করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি সম্পদের মালিক থাকে কিন্তু নির্বোধ প্রকৃতির হওয়ার কারণে তার সম্পদ অপচয় কিম্বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে এক্ষেত্রে সমাজ তার সম্পদের নজরদারী করবে এবং তার প্রয়োজন যতটুকু, ততটুকু তাকে প্রদান করবে এবং বাকী সম্পদ তার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখবে ও সংরক্ষণ করবে। বিধানটি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে -

> 'আর আল্লাহ্ তোমাদের সম্পদকে যা তোমাদের উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না। তা হতে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে মিষ্ট কথা বলবে।'[৬৯]

অর্থাৎ সম্পদে সমাজের নজরদারির ব্যবস্থা কতটা স্পর্শকাতর বিষয় যে নির্বোধ হওয়ার কারণে স্বয়ং মালিকও তার সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ এতে সম্পদের অপচয় কিংবা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। একারণে সমাজের উপর দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে এরূপ নির্বোধ ব্যক্তির সম্পদের উপর নজরদারি করবে যাতে সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার হয়।

---

[৬৭].দ্র. বাকের সদর, Zvi‡n ¸¯Íyi‡'n-G BKwZmv‡' Bmjwg, (ফা. সং.), পৃ. ৬৭।
[৬৮].দ্র. ________, BKwZmv'bv, কোম : দাফতারে ইন্তেশারাতে ইসলামি, (ফা. অনু. ইস্পাহবাদী) ১৩৬০ সৌ. সন, খ. ২, পৃ ২৫২।
[৬৯]. Avj-KziAvb, নিসা : ৫।

এ কারণে যেসব কাজ সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়, তা মালিকানা ও উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত হয় না। বাকের সদর মনে করেন, ব্যক্তি হচ্ছে সমাজের সদস্য। আর প্রাকৃতিক সম্পদসমূহও সকল মানুষের ব্যবহার ও ভোগের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানার বৈধ সম্পর্কগুলো এমন হলে চলবে না যা অধিকাংশ মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধিকে ব্যহত করে এবং সামাজিক ক্ষতি ও বিপর্যয়ের কারণ হয়। একারণে মালিকানার বিধানসমূহ এমন একটা পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় যাতে সমাজের জন্য কোন ক্ষতি না করে।

বাকের সদর উল্লেখ করেন যে, ব্যক্তির মালিক হিসাবে সম্পদে হস্তক্ষেপ করার ফলে যে ক্ষতি সংঘটিত হয়, সেটাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(K) প্রত্যক্ষ ক্ষতি : যেমন কেউ যদি তার নিজের জমিতে গর্ত খোড়ার মাধ্যমে প্রতিবেশির বাড়ী ধ্বসে পড়ার কারণ হয়।

(L) অপ্রত্যক্ষ ক্ষতি : যেমন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যার কারণে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। অথবা মজুতদারীর মাধ্যমে মুনাফা কামাই করা।

অনুরূপভাবে সম্পাদিত কাজের অর্থনৈতিক মূল্য থাকতে হবে। অর্থাৎ কাঁচামালের মধ্যে কোন না কোন পরিবর্তন সাধন। যেমন কাঠমিস্ত্রীর কাজ। সুতরাং কাজ, যার মাধ্যমে মালিকানার অধিকার জন্মায়, তা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক হতে হবে, অপরদিকে তেমনি তা সমাজের জন্য ক্ষতিকর হতে পারবে না। তাছাড়া ব্যক্তি ও মালের মধ্যে মালিকানার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শুধু যে পরিসরে সমাজের জন্য কোন ক্ষতির কারণ হবে না, সেই পরিসরের মধ্যেই তা ব্যবহার তথা ভোগ করতে পারবে।

আরেকটি বিষয় হল, যেহেতু শুধুমাত্র সেই কাজই ব্যক্তি ও মালের মধ্যে মালিকানার সম্পর্ক জন্ম দিতে পারে যে কাজ অর্থনৈতিক হবে, একারণে কেবলমাত্র সেই সব মালই ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত হবে যেগুলোতে ব্যক্তির শ্রমের কারণে কোন না কোন পরিবর্তন সাধিত হয়।

5. Bmjv‡g cvKwZK m¤ú‘mg‡ni gwjKvbv

বাকের সদর উপরোক্ত মালিকানা নীতির ভিত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়াও আরও দু'ধরনের মালিকানার কথা উত্থাপন করেছেন। যথা:

(১) সাধারণ তথা সর্বজনীন মালিকানা এবং

(২) রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

সর্বজনীন তথা সাধারণ মালিকানা সেই সমস্ত সম্পত্তির বেলায় প্রযোজ্য, যা শ্রমের সাথে যুক্ত হয় না এবং যা সর্বজনীন সম্পদ বিশেষ। যেমন ভূমি, যা সৃষ্টিতে মানুষের কোন হাত নেই। সে শুধু চাষাবাদের জন্য প্রস্তুত করে মাত্র। এই পরিবর্তন ভূমির অনন্ত আয়ুস্কালের তুলনায় নিছক সাময়িক কালের এবং তুচ্ছ বটে। একইভাবে খনি ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ, যা ভূ-গর্ভে নিহিত রয়েছে। এক্ষেত্রে মানুষ কেবল তার শ্রমের দ্বারা সেগুলো নিস্কাশনের কাজই করে থাকে। অনুরূপভাবে জমিতে কৃষকের কাজ শুধু তার একটি অধিকার জন্মাবার কারণ হয়, যে অধিকার

বলে সে উক্ত জমির সুবিধা ভোগের দিক দিয়ে অন্যদের চেয়ে অগ্রাধিকার লাভ করে এবং এ অধিকার অন্যদেরকে এই জমিতে হস্তক্ষেপ করতে বাধা হয়।[৭০]

তদ্রূপ কিছু কিছু সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বর্তায়, যেমন খনি। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় মালিকানা বলতে নবি কিম্বা ইমামের মালিকানাই উদ্দেশ্য।

বাকের সদর ব্যাখ্যা করেন যে, প্রাথমিক অবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের বিতরণ এমনভাবে সম্পন্ন হয়েছে যেন উৎপাদন হয় সামাজিক সাম্যতার লক্ষ্যপানে এবং এতে করে কেউ অন্যদেরকে নিয়োগ প্রদান করে সামাজিক ভারসাম্যতাকে বিনষ্ট করতে পারবে না।[৭১]

ইসলামের অন্তর্নিহিত শিক্ষার আলোকে বাকের সদর ব্যাখ্যা দেন যে, ভূমি আসলে নবি (এবং তদ্‌পরবর্তীকালে পবিত্র ইমামের) সম্পত্তি ছিল এবং তিনি ব্যতিত কেউই ভূমির মালিক নয়। আর ব্যক্তিগত মালিকানার বৈধতা ও উৎপত্তির কারণও হচ্ছে ঐ শ্রম, যা উক্ত সম্পত্তি থেকে উপকার লাভের নিমিত্তে ব্যয় করা হয়। অপরদিকে মৃত ভূমিকে যে শ্রম ব্যয় করে জীবিত তথা আবাদযোগ্য করে তুললো, তার জমিকে অব্যবহৃত ফেলে রাখার অধিকার নেই। অন্যথায় তার অধিকার হারাবে।[৭২]

দেখা যাচ্ছে যে, বাকের সদর মালিকানা প্রশ্নে একটি মূলনীতি দাঁড় করিয়েছেন। তা হল, প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা ও অধিকারের উৎস হচ্ছে 'শ্রম'। অতঃপর তিনি এ মূলনীতির আলোকে প্রাথমিক সম্পদসমূহের মালিকানা বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা নিম্নোক্ত কয়েকটি ধারায় বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

১. যে ব্যক্তি কোন জমিকে আবাদযোগ্য করে তুলবে, সেটা তারই অধিকারভুক্ত হবে। ফলশ্রুতিতে যতদিন পর্যন্ত ঐ জমিতে আবাদীর প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন এটা অন্যদেরকে ঐ জমির উপর কর্তৃত্ব থেকে বিরত রাখবে। কিন্তু আবাদী জমির ক্ষেত্রে যতক্ষণ না ঐ জমি থেকে উপকার গ্রহণ বন্ধ হবে, ততদিন প্রাকৃতিক সুযোগকে কাজে লাগাতে পারবে।[৭৩]

২. যে কেউ জমিতে খনন করবে এবং কোন খনির সন্ধান পাবে, সে ঐ খনির ভোগ-দখল করতে অন্যদের চেয়ে অগ্রগণ্য হবে এবং ঐ খনিজ সম্পদের মালিক হবে সে। কিন্তু গভীর ভূ-অভ্যন্তরের খনিজ সম্পদ ব্যক্তিগত মালিকানাযোগ্য নয়।

৩. যে কেউ প্রাকৃতিক কাঁচামলের উপর শ্রম দিবে, সে তার ঐ শ্রম দ্বারা অর্জিত ফলের হকদার হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দখলে রাখার কারণে কোন জিনিসের মালিক হয় এবং পরে তা ছেড়ে দেয়, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়, এক্ষেত্রে ঐ জিনিসে তার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন জিনিসটি দখল-পূর্ব অবস্থার ন্যায় উন্মুক্ত (মুবাহ্) হয়ে যাবে।

৪. যখন কোন ব্যক্তি শ্রমের কারণে বিশেষ কোন অধিকার লাভ করে, এক্ষেত্রে যতদিন প্রাকৃতিক সম্পদে শ্রমের প্রভাব গোচরীভূত হবে, ততদিন ঐ শ্রমসূত্রে অর্জিত অধিকারও বহাল থাকবে। কেউ তখন এমনকি নতুন করে শ্রম দিয়েও ঐ সম্পদে বিশেষ কোন অধিকার অর্জন করতে পারবে না। এ কারণে শ্রম দাতা অন্য সব

---

[৭০]. দ্র. বাকের সদর, BKwZmv'bv, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪২।
[৭১]. দ্র. cv¸3, খ. ২, পৃ. ৩৪২।
[৭২]. দ্র. cv¸3, খ. ২, পৃ. ৩৭৯।
[৭৩]. দ্র. cv¸3, খ. ২, পৃ. ১৫৩।

কিছুর আগে তার নিজের শ্রমের ফসলের মালিক হয়। 'শ্রমের ফসল' বলতে বুঝায় প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির এমনভাবে ব্যবহার তথা ভোগের উপযোগী হয়ে ওঠা, যা অন্যদের হস্তক্ষেপে বাধা হওয়ার কারণ হয়।[৭৪]

৫. শিকারি যে পাখি শিকার করেছে তাতে তার অধিকার জন্মায় তার শ্রমের কারণে। যদি শিকারি তীর দিয়ে কোন পশু শিকার করে, তাহলে অন্য কেউ শিকারির বিলম্বের কারণে আগে গিয়ে দখল করতে পারবে না। ফলে শিকারির অধিকার হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলে। যদি জমির মধ্যে প্রাণের চিহ্ন তথা প্রভাব বিলীন হয়ে যায় এবং মৃত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে সেটা হবে যেন শিকার পুনরায় শক্তি সঞ্চার করে পালিয়ে গেল। সুতরাং উভয় অবস্থায় সৃষ্টি হওয়া সুযোগ হারিয়ে গেল এবং কোন অধিকারই অবশিষ্ট থাকলো না।[৭৫]

৬. এর ফল দাঁড়ায় এটা যে, অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের বেলায় শ্রম ব্যতিরেকে সেগুলো হস্তগত করার কারণেই মালিকানার বৈধতা আসে না। একারণে যখন কোন অ-গৃহপালিত পশুকে শিকার করে কিম্বা কাঠ কুড়ায়, তার মালিক হয়। কিন্তু যখন কোন শ্রমবিনা শিকার কারও হস্তগত হয়, সে তার মালিক হয় না।

অতএব ইসলামের নীতি অনুসারে ভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে মালিকানার আইন-কানুনের কারণে কেউ জমি কিম্বা অন্য কোন জিনিস করায়ত্ব বা মজুতদারী করার মাধ্যমে অন্যদেরকে তা ব্যবহার তথা ভোগে বাধা দিতে পারে না।[৭৬]

6. †jb‡'b

অর্থনৈতিক জীবনের একটি প্রধানতম স্তম্ভ হচ্ছে লেনদেন। এর গুরুত্ব উৎপাদন ও বিতরণের তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। যদিও ক্রমিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর উৎপত্তি ঐ দুটির পরে। কেননা উৎপাদন ও বিতরণ মানুষের সামাজিক জীবানাচারের সূচনা থেকে প্রচলিত রয়েছে। কোন সামাজিক জীবনই উৎপাদন ও বিতরণ ব্যতীত ছিল না। কিন্তু লেনদেন হচ্ছে এ দুটির পরের প্রপঞ্চ। আদিম সমাজসমূহের অর্থনীতি ছিল বদ্ধ প্রকৃতির। প্রত্যেক পরিবারই যা কিছু প্রয়োজন পড়তো, সেটা উৎপাদন করতো এবং অন্যের প্রচেষ্টা হতে সাহায্য গ্রহণ করতো না। যখন মানুষের প্রয়োজনসমূহ বেড়ে গেল ও নানা রূপ ধারণ করলো এবং জীবনে দরকারী পণ্যদ্রব্যের সংখ্যা একাধিক হয়ে গেল, এমনভাবে যে প্রত্যেকে নিজ নিজ সমস্ত প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে সম্পূর্ণরূপে অপারগ হয়ে পড়লো, তখনই লেনদেনের আবির্ভাব ঘটলো এবং সমাজ অনন্যোপায় হয়ে কাজ ভাগাভাগির পদ্ধতি আবিষ্কার করলো। ফলে প্রত্যেকে বিশেষ একটি কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করলো এবং যে পণ্যটি সে ভাল উৎপাদন করতে পারতো সেটাকে নিজের প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদন করতে লাগলো। পরে নিজের উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য আরেক জনের উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য, যেটা তার প্রয়োজন ছিল, তার সাথে বিনিময় করতো। কাজেই লেনদেন জীবনকে সহজ করার জন্য এবং মানুষের চাহিদাসমূহ বিস্তার লাভ করার প্রেক্ষিতেই এর উদ্ভব। তদ্রূপ ইহা উৎপাদন ও ভোগের মাঝে মধ্যস্থতাকারীর ন্যায় ভূমিকাও রাখতো। উৎপাদনকারী লেনদেনের মাধ্যমে সেই ভোক্তার সন্ধানে যায়, যে ভোক্তার তার পণ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আবার ভোক্তাও আরেকটি পণ্য উৎপাদন করে এবং উক্ত পণ্যের জন্য অন্য ভোক্তার সন্ধান করে ফেরে।

---

[৭৪] .দ্র. C\¸ ³, খ. ২, পৃ. ২৫৪।
[৭৫] . দ্র. C\¸ ³, খ. ২, পৃ. ১৭০।
[৭৬] . দ্র. C\¸ ³, খ. ২, পৃ. ১৫৪।

মানুষের অন্যায় ও অবিচার আপতিত হল বিতরণে এবং তা সংক্রমিত হল লেনদেনে এবং এটাকে চাহিদাসমূহ পূরণের নয়, বরং শোষণের এবং কাজকে জটিল করার হাতিয়ারে পরিণত করলো। তদ্রূপ তা উৎপাদন ও ভোগের মাধ্যম নয় বরং উৎপাদন ও মজুদ করার হাতিয়ারে পরিণত হল।

†jb‡'b m¤ú‡K Bmjv‡gi bxwZ

লেনদেন দুই প্রকার :

(১) পণ্য লেনদেন এবং

(২) নগদ (মুদ্রা) লেনদেন।

প্রথমটি হচ্ছে এক পণ্যের সাথে আরেক পণ্যের বিনিময়। এটাই লেনদেনের প্রাচীনতম রূপ। কিন্তু এ ধরনের লেনদেন সময় গড়ানোর সাথে সাথে নানান সমস্যার সৃষ্টি করলো। তখন এসব অসুবিধা দূর করার জন্য নগদ মুদ্রা (তথা স্বর্ণ ও রৌপ্য) লেনদেনের ময়দানে আনা হল, যাতে পণ্যের পরিবর্তে কাজে লাগে এবং অর্থের বিনিময়ে পণ্য পাওয়া যায়। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার চাহিদার মধ্যে যে সমন্বয়ের দুঃসাধ্যতা ছিল, তার অবসান ঘটলো।

কিন্তু পণ্যের স্থলে মুদ্রার প্রচলন অচিরেই নতুন কিছু সমস্যার জন্ম দিল। এ সমস্যাগুলো পূর্ববর্তী সমস্যাবলির ন্যায় প্রাকৃতিক ছিল না। বরং মানবসৃষ্ট সমস্যা ছিল, নানা প্রকার অন্যায়, শোষণ ইত্যাদি, যেগুলো মুদ্রার মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছিল। অবস্থা এতদূর গড়াল যে কখনো কখনো মজুতদার তার দৃষ্টিতে থাকা কোন পণ্যের মিথ্যা চাহিদা সৃষ্টি করে যাতে ঐ পণ্যের মূল্য চড়ে যায়। কিংবা কোন একটি পণ্যকে হ্রাসকৃত মূল্যেই বাজারে বিক্রয় করে যাতে অন্যান্য উৎপাদনকারী ও বিক্রেতাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দান থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং তারা দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এভাবে পণ্যদ্রব্যসমূহ তাদের প্রকৃত মূল্য মান হারিয়ে ফেলে এবং বাজার চলে আসে মজুতদারদের নিয়ন্ত্রণে।

এরপর থেকে সম্পদশালীরা অর্থ তাদের জন্য যে অবস্থান তৈরি করে দিয়েছে, সেই অবস্থানকে কাজে লাগায় এবং মজুত করা শুরু করে। তারা উৎপাদন ও বিক্রয় কার্য পরিচালনা করে এবং রাশি রাশি অর্থকে মূল অর্থনৈতিক প্রবাহ হতে বের করে ফেলে। এভাবে পর্যায়ক্রমে অর্থ শুষে নিয়ে জমা করতে থাকে এবং সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গকে অভাব ও দারিদ্র্যে আক্রান্ত করে। ফলে পণ্যের ব্যবহার (ভোগ) থেমে যায়। কারণ সর্বসাধারণের জীবনমান নিম্নমুখী হয়ে পড়ে এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পায়। অনুরূপভাবে উৎপাদনের চাকাও থেমে যায়। কারণ যখন ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা থাকে না, তখন উৎপাদন থেকে যায় বিনা মুনাফায়। ফলে বাজারে নেমে আসে মন্দাভাব।

তাছাড়া মুদ্রা সুদি পথে সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যম হয়, যে সুদ সম্পদশালীরা ঋণগ্রহিতাদের থেকে আদায় করে থাকে। অথবা নিজের অর্থ-কড়ি পুঁজিবাদী ব্যাংকে জমা রেখে বিরাট অংকের সুদ গ্রহণ করে থাকে। এভাবে বিশাল অংকের পুঁজি, উৎপাদন চক্র হতে বের হয়ে যায় এবং ব্যাংকের ভল্টে প্রবেশ করে। এরপর বণিকগণ আর উৎপাদন ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী থাকে না। যতক্ষণ না নিশ্চিত হবে যে ব্যাংকে জমা রাখা টাকার মুনাফার চেয়ে অধিক মুনাফা পাবে ব্যবসায়।

এছাড়াও অর্থ, উপকারী উৎপাদন চক্রে আবর্তনশীল থাকার পরিবর্তে বিনিময়কারীদের সিন্দুকেই জমা থেকে যায়। এরই ভিত্তিতে বড় বড় ব্যাংকের উদ্ভব হয়েছে যারা রাষ্ট্রসমূহের সম্পদের লাগাম নিজের হাতে কুক্ষিগত করেছে

এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এসব ত্রুটির সবই জন্ম নেয় অর্থ থেকে এবং লেনদেনের মধ্যে অর্থের অপব্যবহার থেকে।

বাকের সদর এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে সাবধান করে দিতে মহানবি (সা.) এর একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি (সা.) বলেন :

> 'স্বর্ণের দিনার আর রৌপ্যের দিরহাম তোমাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করবে, যেমনভাবে তোমাদের পূর্বসূরীদেরকে ধ্বংস করেছে।'[৭৭]

বাকের সদর দাবি করেন যে, ইসলাম এ সমস্যার সমাধান করেছে এবং উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে মাধ্যম হয়ে লেনদেনকে তার প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি ইসলামের নীতিপন্থাগুলো বিবৃত করেন। যথা :

১. ইসলাম অর্থকে পুঞ্জীভূত করা থেকে বিরত রেখেছে এবং তার উপর বাৎসরিক কর (যাকাত) আরোপ করেছে, যা প্রতি বছর পুনরাবৃত্তি হয়, যতক্ষণ না প্রায় সমুদয় নগদ অর্থকে কর্তন ও নিঃশেষ করে ফেলে।

২. ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ করেছে আপোষহীনভাবে। বিতরণে মুনাফা নাকচ করেছে। অর্থনৈতিক ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটা প্রতিহত করেছে এবং অর্থকে তার প্রাকৃতিক ভূমিকায় অর্থাৎ পণ্যের স্থলাভিষিক্তের ভূমিকায় ফিরিয়ে এনেছে।

৩. রাষ্ট্র (তথা উলুল আমর) কে লেনদেনের গোটা প্রক্রিয়া ও বাজারের উপর পূর্ণ নজরদারীর অনুমতি প্রদান করেছে। যাতে অর্থনৈতিক স্তম্ভসমূহের ক্ষতি সাধন ও নড়বড়ে করে দিতে পারে এমন যে কোন অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপকে রুখে দিতে পারে। অথবা বাজার ও লেনদেনের উপর কোন অবৈধ ব্যক্তি-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হন।

7. A_%bwZK mgm¨vewj

পুঁজিতন্ত্র মনে করে প্রাকৃতিক সম্পদের অপেক্ষাকৃত কমতি ও ঘাটতিই অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ। কেননা প্রকৃতিতে সম্পদ হচ্ছে সীমাবদ্ধ। এর ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেমন সম্ভব নয়, তদ্রূপ সম্ভব নয় এর প্রকৃতির মধ্যে নিহিত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। অথচ মানুষের জীবনের চাহিদাসমূহ দ্রুত বেড়েই চলেছে এবং সকল ব্যক্তির এ বিপুল চাহিদা পূরণে প্রকৃতিতে সম্পদ অপ্রতুল। ফলে মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব অবধারিত হয়ে উঠছে এবং অর্থনৈতিক সমস্যা ছড়িয়ে পড়ছে।

অপরদিকে মার্কস্‌বাদের মতে, অর্থনৈতিক সমস্যার জন্ম উৎপাদনের রূপ আর বিতরণের সম্পর্কের মধ্য থেকে। যখনই এদুয়ের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি হবে, তখনই তা স্থিতিশীলতা লাভ করবে- এ সামঞ্জস্যতা থেকে উৎসারিত সামাজিক ব্যবস্থার রূপ যেটাই হোক না কেন।

কিন্তু ইসলাম পুঁজিতন্ত্রের বিপরীতে প্রকৃতিকে মানুষের চাহিদাসমূহ পূরণে সক্ষম বলে মনে করে, যে সমস্ত চাহিদা পূরণ না হওয়ার ফলে মানুষের জীবনে সত্যিকার সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে ইসলাম মার্কস্‌বাদের বিপরীতে

[৭৭]. আলী আল-তাবারসি, wgkKvZ Avj-AvbIqvi wd ¸ivi Avj-AvLevi, বৈরুত : দার আল-হাদীস, তা. নে., খ. ১, পৃ. ২৪৭।

সমস্যাকে উৎপাদনের রূপ ও বিতরণ সম্বন্ধের মধ্যকার সম্পর্ক বলে মনে করে না। বরং মনে করে সমস্যা স্বয়ং মানুষের মধ্যে। বাকের সদর তার এ দাবির সপক্ষে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত ভাষ্যটি উপস্থাপন করেছেন:

> ‘তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের অধীন করেছেন রাত ও দিনকে। এবং তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তা তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলেও ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অব্যশই অতিমাত্রায় সীমালংঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।’[৭৮]

অধ্যাপক ড. আসলাম হানিফ এ মর্মে বাকের সদরের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক সমস্যাবলিকে নিম্নোক্ত সারণির[৭৯] মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন :

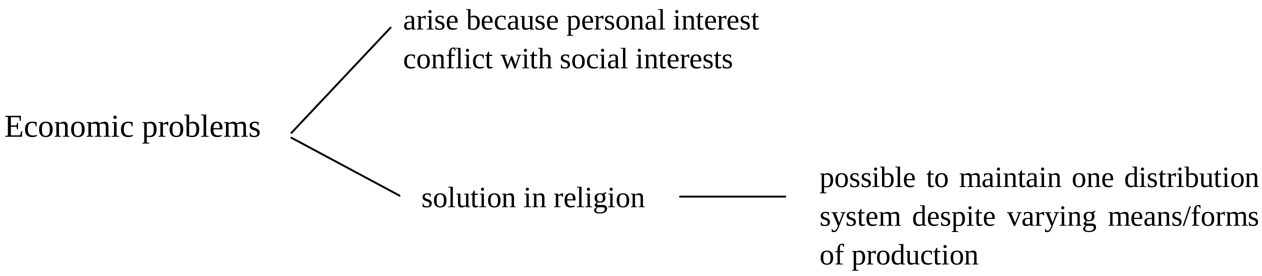

আল্লাহ্ সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন যাতে মানুষের বস্তুগত চাহিদাসমূহ পূরণ হয়। কিন্তু এই মানুষ নিজেই সুযোগকে নষ্ট করে সীমালঙ্ঘন ও অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে। তার সীমালঙ্ঘন হয় ব্যবহারিক জীবনে, কারণ ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিতরণ করে না। আর তার অকৃতজ্ঞতা হয় কারণ প্রকৃতিকে যথাযথ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে হেলা করে থাকে। তাই বাকের সদর বিশ্বাস করেন, যখন বিতরণের সামাজিক সম্পর্ক হতে অন্যায় তিরোহিত হবে এবং প্রকৃতিকে ব্যবহারের জন্য মানবের শক্তিসমূহ কাজে লাগানো যাবে, তখন অর্থনীতির প্রধানতম সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কেননা, ইসলাম অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনকে মুছে ফেলে বিতরণের জন্য সমাধানের উপায়সমূহ বাৎলে দেওয়ার মাধ্যমে। আর অকৃতজ্ঞতাকে মুছে ফেলে উৎপাদনের জন্য বিশেষ তাৎপর্য ও দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করার মাধ্যমে।

বাকের সদর মনে করেন অর্থনৈতিক জীবনে অন্যায়, যা গণমানুষকে তাদের জীবনের কল্যাণ ও মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করে ছেড়েছে এবং সম্পদ বিতরণের ক্ষেত্রে কারও না কারও অনুকূলে হস্তক্ষেপ করেছে, তা বিনিময়ের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে বিনিময়ের চেহারাটাকেই পাল্টে দিয়েছে এবং একে শোষণ ও জটিলতার মাধ্যম বানিয়ে ছেড়েছে। বিনিময়ের এ অন্যায়পূর্ণ অবস্থা নানান বিপর্যয় ও বিভিন্ন রকমের শোষণের কারণ হয়েছে, ঠিক সেই বিপর্যয় ও শোষণমূলক অবস্থার ন্যায়, যা অন্যায়মূলক দাসপ্রথা ও সামন্তবাদী আমলে কিংবা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজসমূহে সৃষ্টি করেছিল।[৮০]

বাকের সদর বিশ্বাস করেন, পণ্যবিনিময়ের মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চালনের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যা, (নগদ) অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চালনের সমস্যার চেয়ে বেশি ছিল। কারণ, পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কেউ একজন উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক যে এক হাজার কেজি চাউল উৎপাদন করতো এবং এর একটা অংশ নিজের

---

৭৮. Avj-KiAvb, ইবরাহীম : ৩৩-৩৫।

৭৯.দ্র. Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*, Kuala Lumpur, Ikraq,1995, p.126.

৮০. দ্র. বাকের সদর, BKwZmv‘bv, ফা. অনু. কাযেম মুসাভি, কোম : ইন্তেশারাতে ইসলামি, ১৩৪৮ সৌ. সন, খ. ১, পৃ. ৪৪৬।

প্রয়োজন পূরণের জন্য তুলে রাখতো। আর বাকিটা অন্যরা যেসব পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতো এবং তার সেগুলোর প্রয়োজন ছিল, তাদের সাথে বিনিময় করতো। এধরনের বিনিময় ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনকে সহজতর করতে পারতো না, ফলশ্রুতিতে তার সকল চাহিদাকে মেটাতে সক্ষম হত না। কারণ সময়ের পরিক্রমায় আরও বেশি বেশি এবং আরও বিভিন্ন রকমের চাহিদা সৃষ্টি হত, ফলে ঐ পরিমাণে বিনিময়ও কঠিন ও জটিলতর হত।

কাজেই পণ্যবিনিময়ের স্থলে নগদ অর্থ বিনিময় স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় পণ্য বিনিময়ের কারণে সৃষ্ট সকল সমস্যাই দূর হল এবং ব্যক্তিদের অর্থনীতিকে সহজ ও অনায়াস করে তুললো। তখন থেকে আর ক্রেতার চাহিদা আর বিক্রেতার প্রয়োজনের মধ্যে সমঝোতার কাজ ছিল না। জিনিসপত্রের মূল্যারোপের কঠিন কাজটিও উঠে গেল এবং মুদ্রার মাধ্যমে প্রত্যেক পণ্যের দাম নির্ধারণ করা সহজসাধ্য হয়ে গেল। কারণ তখন মুদ্রাই মূল্যের সামগ্রিক মাপকাঠি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলো।

কিন্তু বাকের সদর লক্ষ্য করেন যে এই স্থলাভিষিক্ত হওয়াটা এর সকল ইতিবাচক সুফল সত্ত্বেও অন্য আরেকটি সমস্যার জন্ম দিল যা পণ্য বিনিময়ের সমস্যার চেয়েও বেশি মাত্রার এবং বেশি খারাপ ছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

> '...কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় এই স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি এখানেই শেষ হল না। বরং ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক জীবনে এক গুরুতর ভূমিকা রাখতে আরম্ভ করে। অবস্থা এতদূর গড়ায় যে এ থেকে এমন সব সমস্যা ও দুর্গতির উদ্ভব ঘটে, যেগুলো পণ্য বিনিময়ের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলির চেয়ে কম ছিল না। শুধু একটা পার্থক্য ছিল এই যে, পণ্য বিনিময়ের ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো ছিল প্রাকৃতিক। কিন্তু পণ্যের স্থলে মুদ্রা স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ফলে যেসব নতুন ধরনের সমস্যা (অর্থাৎ নতুন ধরনের অন্যায় ও শোষণ) সৃষ্টি হতে লাগলো, সেগুলো ছিল মানব সৃষ্ট সমস্যাবলি।'[৮১]

মানতেই হবে যে এ ধরনের সমস্যাবলি প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি মুদ্রার আসল স্বরূপের সাথেই সম্পৃক্ত। কেননা, নগদ অর্থের লেনদেনের দৌরাত্ম্য আরো বেশি। নগদ অর্থ সব পণ্যদ্রব্যের সাথে বিনিময়যোগ্য। নগদ অর্থ দ্বারা যেমন প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করা যায়। তদ্রূপ তা পুঞ্জিভূত ও জমা করে রাখার ক্ষেত্রেও কোন খরচ লাগে না। তাই বাকের সদর বলেন :

> '...একারণেই অর্থনৈতিক জীবনে বিনিময় যে কল্যাণমূলক কর্তব্যের ধারক বাহক ছিল, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, এই অর্থে যে, নগদ অর্থ প্রথমে উৎপাদন ও ভোগের মাঝে মাধ্যম ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা উৎপাদন ও পুঞ্জীভূতকরণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এর ফলে বিক্রেতা উৎপাদন করে এবং তার উৎপাদিত জিনিসকে নগদ অর্থের মাধ্যমে বিনিময় করে, যাতে এই অর্থ সে তার পুঞ্জিভূত সম্পদের সাথে যোগ করতে পারে। অপরদিকে ক্রেতা বিক্রেতাকে নগদ অর্থ প্রদান করে, যাতে সে যে পণ্যটি ক্রয় করছে সেটা নিজের হস্তগত করতে পারে। কিন্তু এরপর এই ক্রেতা তার ফসলকে বিক্রয় করতে পারে না, কারণ বিক্রেতা নগদ অর্থকে জমা করে রেখেছে এবং ঐ অর্থকে সঞ্চালনের ধারা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে।'[৮২]

তিনি এ মূল্যায়নের সাথে আরও যোগ করেন :

> 'অর্থ থেকে যেসব সমস্যা উদ্ভূত হয়, তা এখানেই শেষ হয় না। বরং অর্থ এমন এক সমস্যার জন্ম দেয় তা কখনো কখনো পূর্বোক্ত সমস্যাবলির চেয়েও গুরুতর হয়। কেননা, অর্থ শুধু পুঞ্জিভূতকরণের মাধ্যম হয়েই ক্ষ্যান্ত হয় না, বরং তা সম্পদ বৃদ্ধিরও মাধ্যম বটে, ঐ মুনাফার মাধ্যমে যা ঋণ দাতারা ঋণ গ্রহীতাদের নিকট থেকে

---

[৮১]. CV¸ 3, পৃ. ৪৪৯।
[৮২]. CV¸ 3, পৃ. ৪৫২।

আদায় করে থাকে। কিংবা অর্থের মালিকরা ব্যাংকে অর্থ জমা রাখার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে যে মুনাফা লাভ করে থাকে। ...এভাবে সেই যেদিন থেকে পুঁজিবাদের যুগ শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই অর্থরাশি সুদের উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে ব্যাংকে জমা হতে লাগলো।'[৮৩]

বাকের সদর আরও বলেন:

'ইসলাম এই সমুদয় সমস্যা, যেগুলো অর্থ থেকে উৎপত্তি লাভ করতো, সেগুলো দূর করেছে এবং অর্থের সঞ্চালনের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছে। ফলে বিনিময়কে যেমনটা দরকার ছিল, উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করেছে।'[৮৪]

এক্ষেত্রে ইসলামে যে সকল প্রধানতম উপায় প্রবর্তন করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর আইনের ন্যায় যাকাত ধার্য করণ। তিনি বলেন :

"ইসলাম অর্থকড়ি পুঞ্জিভূত করে রাখাকে অবৈধ হিসাবে গণ্য করেছে। এ কারণেই 'নিশ্চল' অর্থের উপর যাকাত রূপী করারোপ করেছে, যা প্রতি বছর পুনরাবৃত্তি ঘটে। ফলে অর্থ পুঞ্জিভূত করে রাখা যদি কয়েক বছর দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে এই কর-ব্যবস্থা প্রায় সমুদয় পুঞ্জীভূত অর্থকে যাকাতের আওতায় বাইতুল মালের কোষাগারে চালিত করবে।"[৮৫]

8. A‡_i mÂvjb I 'wi'¨ we‡gvP‡b hvKvZ e¨e¯v

যে যুগে বিশ্বমাঝে জীবনের অপরিহার্য ও মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করাই অধিকাংশ মানুষের প্রধানতম দুশ্চিন্তার কারণ, যখন শ্রেণি ব্যবধানের তীব্রতা অধিকাংশ জাতিকে কাবু করে ফেলেছে, যে শতাব্দীতে এসে প্রযুক্তিই শক্তির পরিমাপক হিসাবে গণ্য হচ্ছে, আর অর্থনৈতিক সক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছে তাবত সাম্রাজ্যবাদী ও বলদর্পীদের হাতে, এরূপ সময়ে অর্থনৈতিক বিষয়াবলির প্রতি ব্যাপকভিত্তিক মনোনিবেশ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের পর্যালোচনা আজকের দিনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে চিন্তাবিদদের অসংখ্য তত্ত্ব ও মতাদর্শই প্রমাণ করে যে মানুষ এ ব্যাপারে ব্যাপক চিন্তা ও গবেষণা পরিচালনা করেছে। তবে এতসব তত্ত্ব ও মতবাদের মধ্যে থেকে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রই বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে অন্য সব মতবাদের চেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এবং নানান চড়াই উৎরাই ও বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। অথচ গণমানুষের যে প্রাণের দাবি অর্থাৎ ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, তা আজও পূরণ হয়নি। এতদসত্ত্বেও এ দুই ব্যবস্থার সমর্থকরা স্ব স্ব অর্থনৈতিক মূলনীতি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়নি। বরং পূর্ববৎ নিজ নিজ তাত্ত্বিক সূত্রাবলিকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর।

ঠিক এমনই এক প্রেক্ষিতে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর আবির্ভূত হন এবং বিশ্বে বহুল প্রসারিত দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি তৃতীয় পথ হিসাবে ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও স্পষ্টরূপে উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর উপস্থাপিত ইসলামি অর্থনীতির বাস্তবসম্মত ও ব্যবহারিক রূপটি এতবেশি সুস্পষ্ট যে এর কার্যকারিতা যুক্তি-তর্ক ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রতিষ্ঠিত

---

[৮৩]. Cv¸ ³, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪

[৮৪]. Cv¸ ³, পৃ. ৪৫৫

[৮৫]. Cv¸ ³, বাকের সদরের এ তত্ত্ব থেকে প্রতিপন্ন হয় যে,যাকাত ধার্য হওয়ার ক্ষেত্রে নগদ টাকা বিষয়ী নয়, বরং অর্থ-সম্পদই উদ্দেশ্য। সেটা স্বর্ণ-রৌপ্য কিম্বা টাকার নোট যেটাই হোক না কেন।

হয়েছে। সমাজে শ্রেণিব্যবধান ঘুচিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামে অর্থের ন্যায়ভিত্তিক সঞ্চালন নিশ্চিত করতে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এ ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থার সুফল হিসাবে সকল মানুষই আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদরাজি থেকে উপকৃত হতে পারে। ইসলাম কিভাবে যাকাত ব্যবস্থার রূপকল্প প্রণয়ন করেছে, বাকের সদর তা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন :

> 'যা কিছুই দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হবে এবং দ্রব্য হিসাবে তার কোন মূল্যমান থাকবে, অর্থ হোক বা কোন মালামাল হোক যা ব্যবসায়ে লাগানো হয়ে থাকে, তার যাকাত প্রদান করতে হবে।'[৮৬]

যাকাতের হকদারকে যাকাত প্রদান করা হয় এবং সে এই অর্থ তার পরিবারের সচ্ছলতার জন্য ব্যয় করবে। যাতে তাদের জীবনমান অন্য সকলের জীবনমানের কাছাকাছি উপনীত হয়। বলা বাহুল্য যে, এখানে লোকদের এবং পরিবারসমূহের অভাব দূর হওয়া বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের জীবনমান যেন স্বাভাবিক সীমায় পৌঁছে যায়। যাতে তারা কোন দুঃখ-কষ্ট ব্যতিরেকেই তাদের জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। আর এই অভাব থাকা আর না থাকাই যাকাত গ্রহণ বৈধ কিম্বা নিষিদ্ধ থাকার মাঝে পার্থক্যের সীমারেখা হিসাবে বিবেচিত।

অবশ্য ইসলাম এতটুকুতেই পরিতুষ্ট হয় না। বরং ইসলামের কাঙ্ক্ষিত চাওয়া হচ্ছে এটা যে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের অভিভাবকের সমস্ত চেষ্টা ও প্রয়াসকে কাজে লাগানো যাতে বঞ্চিত জনগণের জীবনযাত্রার মান সুখ-সমৃদ্ধির সর্বজনীন উন্নততর স্তরে পৌঁছে যায়।

সর্বজনীন সুখি-সমৃদ্ধ জীবনমান এবং সামষ্টিক সাম্যতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে কিছু স্বাধীনতা এবং ক্ষমতাও রাষ্ট্রের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে। বাকের সদর রাষ্ট্রের হাতে ন্যাস্তকৃত এসব স্বাধীনতা ও ক্ষমতার বিবরণ দিয়েছেন :

প্রথমত, সেই সব কর আরোপ করা, যেগুলো অব্যাহতভাবে আদায় করা হয় এবং সর্বজনীন সাম্যতার লক্ষ্যে ব্যয় করা হয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের গণপূর্ত ও পুঁজি-বিনিয়োগ বিভাগের কর্ম-তৎপরতা এবং

তৃতীয়ত, সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিন্যাসকরণ এবং উৎপাদনের উপর নজরদারীর জন্য আইনি ও অধিকারগত ক্ষমতা।[৮৭]

বাকের সদর স্থায়ী করসমূহের ব্যাখ্যা এবং তা ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেন :

> "স্থায়ী করসমূহ বলতে উদ্দেশ্য সেই উভয় ধরনের কর, যা যাকাত এবং খুমস্ নামে আদায় করা হয়ে থাকে এবং যা আদায় করা আবশ্যিক। এ কর কেবলমাত্র মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য নয়। বরং উপরোক্ত আয়গুলো দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং অভাবী জনগণের জীবনমানকে উন্নত করার জন্য, যাতে তা সুখি-সমৃদ্ধ জীবন যাপনে এবং শেষ পরিণতিতে সামষ্টিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠায় ব্যয় হয়।"[৮৮]

এ প্রসঙ্গে বাকের সদর একটি রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন :

> 'আল্লাহ্ বিত্তবানদের সম্পদে এবং গরীবদের অবস্থার দিয়ে তাকালেন। তখন তিনি বিত্তবানদের সম্পদে নিঃস্বদের জন্য কিছু অধিকার নির্ধারণ করেছেন, ততটা পরিমাণে, যাতে তাদের জীবনও সুখি-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আর এ

---

[৮৬]. বাকের সদর, Av j -Bm j vg BqvK' Av j -nvqvZ, বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল মাতবুআত, তা. নে. পৃ. ৪৮।
[৮৭].দ্র. ________, BKwZmv'bv, ফা. অনু. কাযেম মুসাভি, কোম : ইন্তেশারাতে ইসলামি, ১৩৪৮ সৌ. সন, খ. ১, পৃ. ৪৪৬।
[৮৮]. Cv¸ ³, পৃ. ৩৩৪।

লক্ষ্যে ধনীদের ধন-সম্পদ থেকে ততটা পরিমাণ গরীবদেরকে প্রদান করেন যেন তারাও খায়, পান করে এবং পরিধান করে। আর তদ্বারা তারা দাম্পত্য জীবন গঠন করে, অন্যদেরকে দান-খয়রাত করে এবং হজ্জে গমন করে।’[৮৯]

বাকের সদর পরিশেষে মন্তব্যে লিখেন :

> ‘যাকাত সম্পর্কে ইসলামের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, যারা যাকাত প্রদানকারীর আওতায় পড়বে, তাদের উচিত যাকাতের অর্থ এর হকদার ব্যক্তিদের প্রদান করা এবং সেটা ততটা পরিমাণে দেওয়া যাবে যতক্ষণ না তারা বাদবাকী জনগণের ন্যায় অভাবমুক্ত ও স্বচ্ছল হয়ে যায়। অথবা তারা তাদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করতে সক্ষম হওয়ার পাশাপাশি বিবাহ এবং হজ্জও সম্পাদন করতে পারবে।
>
> ইসলামের এসব উদ্ধৃতির সবগুলোর মধ্যে একটি অভিন্ন লক্ষ্য অনুসরণ করা হয়েছে। আর সেটা হচ্ছে ইসলাম যেভাবে সকল ব্যক্তিকে জীবনধারনের সমস্তরে দেখতে চায় সেভাবে সকলের জন্য অভাবমুক্তি ও স্বচ্ছলতা আনা।’[৯০]

9. ‘wi‘¨ I ¯”QjZvwK?

বাকের সদর ইসলামে দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দারিদ্র্য কি একটি স্থির ও অপরিবর্তনীয় ব্যাপার যে সকল কালে ও সকল স্থানে একশ্রেণির সুনির্দিষ্ট চাহিদার মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত হবে? নাকি অবস্থা-পরিস্থিতি, কাল-পাত্র এবং জীবনমান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং তদানুসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম চালাতে হয়? এ প্রসঙ্গে বাকের সদর বলেন :

> ‘ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতার তাৎপর্য কি- সেটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে দরিদ্র হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার সমাজের সাধারণ জীবনমান যেরূপ হওয়া চাই, তদ্রূপ থাকে না। অন্য কথায় দরিদ্র হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার জীবনমান বিত্তশালীদের জীবনমানের চাইতে অনেক বেশি পার্থক্য থাকে এবং দুইটি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে স্বচ্ছল তথা অভাবমুক্ত ব্যক্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার অবস্থা এরূপ নয়। বরং রাষ্ট্রের সম্পদের সাথে সঙ্গতি রেখে নিজের অত্যাবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় চাহিদাসমূহকে পূরণ করতে সক্ষম হয়, চাই তার হাতে বিপুল সম্পদ থাকুক আর নাই-বা থাকুক।
>
> এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামে সর্বাবস্থায় দারিদ্র্যের জন্য কোন নিঃশর্ত ও চিরায়ত তাৎপর্য দৃষ্টিতে রাখা হয়নি। অর্থাৎ সর্বজনীন জীবনমানে অসামাঞ্জস্যতাই হচ্ছে দারিদ্র্য। মৌলিক চাহিদাসমূহ অনায়াসে পূরণ করার সামর্থ না থাকা দারিদ্র্য নয়। জীবনমান যতই উন্নত হবে, সেই অনুপাতে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির সীমারেখা ততই উপরে উঠে যাবে।
>
> উদাহরণস্বরূপ যদি সর্বজনীন সুখ-সমৃদ্ধির পরিসরে এমন এক অবস্থা তৈরি হয় যে প্রত্যেক পরিবারই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাসস্থানের অধিকারী থাকবে, সেক্ষেত্রে যদি কোন একটি পরিবার স্বতন্ত্র বাসস্থান শূন্য থাকে তাহলে ঐ পরিবারটি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দরিদ্রের সংজ্ঞায় পড়বে। দারিদ্র্যের তাৎপর্যের মধ্যে এই যে বিস্তৃতি ও স্থিতিস্থাপকতার আভাষ রয়েছে, সেটা সামষ্টিক সাম্যতার ধারণার সাথে সম্পৃক্ত হয়।’[৯১]

---

[৮৯]. দ্র. Cv¸ ³|
[৯০]. দ্র. Cv¸ ³,খ. ২, পৃ. ৩৩৭।
[৯১]. দ্র. Cv¸ ³|

বাকের সদর সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেন :

> "যাকাতের হকদারদেরকে যাকাত থেকে সেই পরিমাণে প্রদান করতে হবে যাতে তাদের অভাব দূর হয়ে যায়। কাজেই 'অভাবমুক্তি' হচ্ছে যাকাতের হকদার হওয়ার সীমা।"[৯২]

বাকের সদরের শেষ কথা হচ্ছে, মানবসমাজে শ্রেণিবৈষম্য ও দারিদ্র্য থাকা একটি পীঁড়াদায়ক বিষয়, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থার উপর এ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও শ্রেণির জীবনমানে সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় রাষ্ট্রযন্ত্র ও শাসনব্যবস্থার উপর। এগুলো সবই স্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত বিষয়ের মধ্যে পড়ে এবং কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। শুধু কেবল এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ রাখতে হবে যে, 'বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্যের তাৎপর্যের সাথে নবুওয়াতের যুগের দারিদ্র্যের তাৎপর্যের পার্থক্য রয়েছে।'[৯৩]

10. m'g³ e¨vsK e¨e¯'v Ges A_©bwZK †jb‡'b

ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিশেষ করে ব্যাংকিং শিল্পের বিস্তারের সাথে সাথে রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা এবং ব্যাংকের মালিকরা সুদ নিষিদ্ধের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এ থেকে উত্তরণের জন্য ধর্মীয় পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে পণ্ডিতবর্গ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন : একদল পুঁজিবাদ ও সুদি ব্যাংক ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে 'সুদ' সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপনের চেষ্টা করেন, যা ব্যাংকিং লেনদেনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর দ্বিতীয় দলটি 'ব্যাংক' নামক মূল প্রপঞ্চটিকে মেনে নিয়ে চেষ্টা করলেন ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামি শিক্ষার আলোকে ঢেলে সাজাতে। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল এ প্রচেষ্টার অন্যতম ফসল।

বাকের সদর অলস পড়ে থাকা জমাকৃত বিপুল অর্থের সদ্‌গতি করা এবং একে উপকারী ও সম্পদ বৃদ্ধিকারী পুঁজিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকাকে স্বীকার[৯৪] করার পাশাপাশি স্পষ্টতঃ ঘোষণা করেন যে, প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ায় মুনাফা গ্রহণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ এবং হারাম।[৯৫]

তিনি প্রথম দলভুক্ত পণ্ডিতরা, যারা ব্যাংকে আমানতকৃত টাকার লভ্যাংশকে বৈধতা প্রদানের জন্য ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টায় ছিলেন, তাদের উত্তরে বিস্তারিত যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, প্রচলিত ব্যাংকসমূহ যে আমানতি অর্থ গ্রহণ করে থাকে, তা ফিকাহ্ শাস্ত্রের সূক্ষ্ম অর্থে আমানতি নয়। বরং তা হচ্ছে ঋণ। ফলে আমানতকারীরা যে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে তা ঋণের উপর লভ্যাংশ এবং সুদ হিসাবে গণ্য হবে।[৯৬] এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাকের সদর ইসলামি সমাজসমূহের ব্যাংকিং ব্যবস্থার শূন্যতা পূরণকল্পে ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের চিন্তা করেন।

---

[৯২]. cÖv¸³, পৃ. ৩৩৩।
[৯৩]. দ্র. cÖv¸³, খ. ২, পৃ. ৩৩৮।
[৯৪].দ্র. বাকের সদর, Avj-e¨vsK Avj-jv-iveweq¨v wdj Bmjvg, তেহরান : মারকাযুল আবহাছ ওয়া আল-দিরাসাতু আত-তাখ্‌সিসিয়্যা, ১৪১০হি. পৃ. ২০।
[৯৫]. দ্র. cÖv¸³, পৃ. ২১।
[৯৬].দ্র. cÖv¸³, পৃ. ২১০ ।

নিঃসন্দেহে বাকের সদর যখন তার সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যকর রূপরেখা উপস্থাপন করেন, তখনও সুদ বিবর্জন করে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথা অনেকের জন্য অচিন্তনীয় ছিল। আবার কারও কাছে এটা নিতান্তই একটি কৌতুক বলে মনে হত। সেহেতু বাকের সদরকে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার পথিকৃত হিসাবে ঘোষণা করতে আপত্তি থাকার কথা নয়। যদিও এ কথার অর্থ এটা নয় যে এ ব্যাপারে সব কথা বলা হয়ে গেছে। বরং বাকের সদর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে যে নবদিগন্ত উন্মোচন করে গেছেন, সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে এটাকে আরও ব্যাবহারিক ও যুগোপযোগী করা সম্ভব। নিম্নে বাকের সদর কর্তৃক উপস্থাপিত সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি :

১. বাকের সদর Avj-e¨vsK Avj-jv-iveweq¨vn গ্রন্থটি ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে কুয়েত সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে রচনা করেছিলেন।[৯৭]

২. বাকের সদর যদিও সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত স্তরকে ইসলামি ব্যবস্থার পরিমণ্ডলেই যথাযথ বলে মনে করেন, তবে একই সাথে তিনি এটাও বিশ্বাস করেন যে, ইসলামি পরিমণ্ডলের বাইরেও এ ধরনের ব্যাংকব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব।

৩. বাকের সদরের সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কোন দাতব্য সংস্থা কিম্বা কর্জুল-হাসানাহ্ তহবিল খোলা নয়। বরং এ পরিকল্পনা হচ্ছে একটি প্রকৃত অর্থে ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস। একারণে তিনি তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যাংকের অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন-

   - প্রথমত, ব্যাংক হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যা মুনাফা অন্বেষণ করে বেড়ায়।
   - দ্বিতীয়ত, ব্যাংক অলস পুঁজিসমূহকে সচল করে উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করে।
   - তৃতীয়ত, ব্যাংক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক কোম্পানীসমূহের আর্থিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে একদিকে যেমন বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, অপরদিকে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে।
   - চতুর্থত, ব্যাংক চেক ও চলতি হিসাবের পরিষেবার মাধ্যমে আর্থিক বিনিময়সমূহ সম্প্রসারিত করে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারে ও বাজার উন্নয়নে সাহায্য করে থাকে।[৯৮]

৪. বাকের সদর সুদি ব্যাংকব্যবস্থা আর সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে (যেটা তাঁর প্রস্তাবিত রূপরেখা) কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য দেখে থাকেন। যথা :

   ক) সুদি ব্যাংকের ক্ষেত্রে একদিকে ব্যাংক ও আমানতকারীদের মধ্যকার আইনি সম্পর্ক এবং অপরদিকে ব্যাংক ও গ্রহীতাদের মধ্যকার সম্পর্কটি হচ্ছে 'মুনাফা সম্বলিত ঋণ চুক্তি'র সম্পর্ক। যা ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ এবং তা হারাম। কিন্তু সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থায় এ সম্পর্কটি ইসলামের দৃষ্টিতে অনুমোদিত চুক্তির ভিত্তিতে একটি বৈধ সম্পর্ক।[৯৯]

---

[৯৭]. দ্র. আলী তাসখিরি, 'vimnwiq Avh BK\Zmv'-B Bmjwg, তেহরান : ১৩৮২ ফা. সন, পৃ. ৪১৮ ।

[৯৮]. দ্র. বাকের সদর, Avj-e¨vsK Avj-jv-iveweq¨v wdj Bmjvg, তেহরান : মারকাযুল আবহাছ ওয়া আল-দিরাসাতু আত-তাখসিসিয়্যা, ১৪১০হি. পৃ. ৭-৮।

[৯৯]. দ্র. cv¸³, পৃ. ৮।

খ) একটি সুদি ব্যাংক তার কার্যক্রমকে একজন পুঁজিপতির জায়গায় থেকে বিন্যস্ত ও সংজ্ঞায়িত করে থাকে। অথচ একটি ইসলামি ব্যাংক একজন কর্মীর জায়গায় থেকে কার্য পরিচালনা করে এবং নিজের উপার্জনকে মুনাফা তথা সুদের ভিত্তিতে নয়, বরং কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকে।[১০০]

গ) সুদি ব্যাংকব্যবস্থা বহু বছরের অভিজ্ঞতা দ্বারা এর অনেক ঝুঁকিকে অতিক্রম করে এসেছে। কিন্তু সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার সবে পথচলা শুরু। সুতরাং সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থাকে তার নতুন ব্যাংকব্যবস্থার প্রসারকল্পে কিছুকাল অল্প লাভেই তুষ্ট থাকতে হবে এবং বিভিন্ন রকম বিপদ ও ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাকে জানতে হবে যে, আজকের এই ক্রান্তিকালে তার উপরে ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক দায়-দায়িত্ব ছাড়াও জাতিকে সুদ ও কুফরী থেকে পরিত্রাণের নিমিত্তে আদর্শিক দায়-দায়িত্বও রয়েছে।[১০১]

10.1. ev‡Ki m'‡ii c¯ÍweZ g‡W‡ji i/c‡iLv

বাকের সদর যদিও ব্যাংকের নানাবিধ কার্যক্রম ও ভূমিকায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু অধিকাংশ ব্যাংক ও অর্থ বিশেষজ্ঞদের ন্যায় তিনিও মনে করেন যে, আমানতকারী আর বিনিয়োগকারীদের মাঝে মধ্যস্থতা করাই ব্যাংকের প্রধানতম কাজ। এ কারণে তাঁর wKZve Av j-e¨vsK Av j-j v-i vewweq¨vn॑র সিংহভাগ জুড়ে সম্পদ সংস্থান (অর্থাৎ আমানত সংগ্রহ) ও সম্পদ বরাদ্দের (বিনিয়োগ ও ঋণ প্রদান) কার্যক্রমের ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। সুদি ব্যাংকব্যবস্থার সাথে সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার পার্থক্য হচ্ছে সকল ব্যাংক সুবিধা এবং প্রত্যেক অর্থের সঞ্চালন একটি অর্থনৈতিক মুনাফাযুক্ত তৎপরতা এবং একটি পণ্যের আবর্তনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইহা কোন অলীক তৎপরতা নয়। বিশ্বের সকল অর্থনীতিও এই বিষয়টির পিছনেই ঘোরে।

ব্যাংকসমূহের মূল কার্যক্রম মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

১. আমানত সংগ্রহ এবং
২. অর্থের বরাদ্দকরণ (অর্থাৎ বিনিয়োগ)।

সুদি ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের মূলপ্রকৃতি হচ্ছে পূর্ব-নির্ধারিত হারের সুদে জনগণের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। অতঃপর পূর্ব-নির্ধারিত অপর এক হারে অন্যদেরকে ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে, অবশ্যই যা আগের হারের তুলনায় বেশি।

কিন্তু সুদ মুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা এ উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন রূপে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এই পর্বে প্রথমেই বাকের সদরের পরিকল্পনা মোতাবিক সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার প্রধানতম কার্যক্রমের একটি ছক উপস্থাপন করা হল। অতঃপর এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হবে।

---

[১০০]. দ্র. cÖv¸³, পৃ. ১১।
[১০১]. দ্র. cÖv¸³

10.2. m‘g³ e¨vsKe¨e¯’vi Kvhµg

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যক্রম : বাকের সদরের মডেল

- ১. অর্থের উৎস সংস্থান করা
  - ১-১ চলতি হিসাব
  - ১-২ সঞ্চয়ী হিসাব
  - ১-৩ মেয়াদি হিসাব
- ২. অর্থের উৎসসমূহের বরাদ্দকরণ
  - ২-১ মুদারাবা
  - ২-২ মুনাফা বিহীন লোন
  - ২-৩ বাণিজ্যিক সনদসমূহের নগদায়ন
- ৩. ব্যাংকিং সেবা প্রদান
  - ৩-১ চেক ভাঙ্গানো
  - ৩-২ আর্থিক নথিপত্র প্রেরণ
  - ৩-৩ হাওয়ালা প্রেরণ
  - ৩-৪ প্রমিজরি নোট ও নিগোশিয়েবেল ইন্স্ট্রুমেন্ট ভাঙ্গানো
  - ৩-৫ সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয়
  - ৩-৬ মূল্যবান জিনিসপত্র ও সিকিউরিটিজ লকার
  - ৩-৭ ব্যাংকিং গ্যারান্টি প্রদান
  - ৩-৮ বৈদেশিক মূদ্রা ক্রয়-বিক্রয়
- ৪. পুঁজি বিনিয়োগ
- ৫. বিশেষ সুদি ব্যাংকসমূহের সাথে বিনিময় লেনদেন

A‡_i Drm e¨e¯’vcbv

বাকের সদর সম্পদের উৎস ব্যবস্থাপনায়, প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থাকেই সংরক্ষণ করেছেন এবং স্বীয় পরিকল্পনাকে প্রচলিত ব্যাংক আমনতসমূহের (অর্থাৎ চলতি, সঞ্চয়ী এবং ফিক্সড্ ডিপোজিট) উপরেই দাঁড় করিয়েছেন। তবে তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনার সাথে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার মূল পার্থক্যের জায়গাটি হচ্ছে ব্যাংক ও আমনতকারীদের আইনি (তথা অধিকারগত) সম্পর্কের বিষয়টি।

PjwZ wnmve

চলতি হিসাবে জমাকৃত আমানত হচ্ছে এমন টাকা, যার মালিক, ঐ টাকাকে ব্যাংকে জমা রেখে একটি চেক বই পায়। অতঃপর প্রয়োজন অনুসারে চেক লেখার মাধ্যমে সে নিজে কিংবা অন্যের মাধ্যমে ঐ টাকা উত্তোলন করে থাকে। সচরাচর এরূপ আমনতের উপর কোন মুনাফা প্রদান করা হয় না। তবে চাওয়া মাত্রই এ টাকা উত্তোলন করা যায়।[১০২]

বাকের সদরের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা মোতাবিক চলতি আমানতের ফিকাহ্গত পরিচিতি হচ্ছে এটা এক মুনাফা বিহীন ঋণ। আর জমাকৃত টাকা ব্যাংকের মালিকানাভুক্ত হয়ে গেছে এবং তা ব্যাংকের সম্পদভুক্ত বলে গণ্য হয়। ব্যাংক ঐ টাকায় সব ধরনের হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে।[১০৩] তিনি চলতি হিসাবে জমাকৃত টাকার ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনটি প্রস্তাব রেখেছেন-[১০৪]

এক. চলতি হিসাবে জমাকৃত টাকার কিছু অংশ নগদ হিসাবে ব্যাংকে রাখা থাকবে, যাতে আমানতকারীদের মধ্যে যারা টাকা উত্তোলন করতে আসবে তাদের চাহিদা সেখান থেকে মিটিয়ে দিতে পারে।

দুই. ঐ জমাকৃত টাকার আরেকটি অংশ সুদবিহীন ঋণ হিসাবে ঐ সকল গ্রাহকদের প্রদান করবে, যাদের সাথে ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে না।

তিন. চলতি হিসাবে জামাকৃত টাকার অপর একটি অংশ মুদারাবা চুক্তির পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগকারীদেরকে প্রদান করা হবে। এ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ পুঁজির মালিক হিসাবে ব্যাংক আর মুদারাবার কর্মী হিসাবে বিনিয়োগকারীর মধ্যে বণ্টন করা হবে।

বাকের সদর বিশ্বাস করেন, চলতি হিসাব খোলার প্রক্রিয়া এবং চলতি হিসাবে টাকা জমা করা অর্থাৎ জমাকারীর পক্ষ থেকে ব্যাংক কে ঋণ প্রদান করার নামান্তর। পক্ষান্তরে চলতি হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের প্রক্রিয়াটি হচ্ছে ঋণ পরিশোধ করার নামান্তর। এক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য আইনজ্ঞদের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেন নি। তারা চলতি হিসাবে জমা প্রদান করা এবং হিসাব থেকে উত্তোলন করাকে আমানতকারীর থেকে ব্যাংকের এবং বিপরীতক্রমে ব্যাংক থেকে আমানতকারীর ঋণ গ্রহণ হিসাবে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।[১০৫]

বাকের সদর Avj-e¨vsK Avj-jv ivewe¨vn গ্রন্থের ১ নং পরিশিষ্টির মধ্যে চলতি আমানতের টাকার অন্য আরেক ধরনের ব্যাখ্যা সম্ভব বলে মনে করেছেন। উক্ত ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে এক্ষেত্রে ব্যাংক হবে আমানতকারীর উকিল তথা প্রতিনিধি। অর্থাৎ আমানতকারী চলতি হিসাব খোলা এবং সেখানে টাকা জমা রাখার মাধ্যমে ব্যাংক কে উক্ত টাকা সুবিধামতো ঋণ প্রদানের জন্য স্বীয় উকিল তথা প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত করবে। এই ব্যাখ্যায় ব্যাংক আমানতের মালিক থাকবে না। বরং ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে মাধ্যম হিসাবে থাকবে। সে তার এই কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারেব। অবশ্য এই পারিশ্রমিকের থেকে কোন অংশই আমানতকারীর পাওনা হবে না।[১০৬]

---

[১০২].দ্র. cÖv¸³, পৃ. ২৩।
[১০৩]. দ্র. cÖv¸³, পৃ. ৪৮।
[১০৪]. দ্র. cÖv¸³, পৃ. ৬৬।
[১০৫]. দ্র. cÖv¸³, ৮৫-৯৫।
[১০৬]. দ্র. cÖv¸³, পৃ. ১৭৯।

mÂqx wnmve

সঞ্চয়ী আমানত হচ্ছে সেই টাকা, যা মালিক ব্যাংকে আমানত রাখে এবং এর বিপরীতে সঞ্চয়ী হিসাবের পাশ বই পায়। প্রত্যেকবার টাকা জমা প্রদান বা উত্তোলনের সময় টাকার অংকটি ঐ বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। সঞ্চয়ী হিসাবের মালিক যখনই যত পরিমাণ টাকা তার স্থিতি থেকে উত্তোলন করতে চায়, তা উত্তোলন করার অধিকার তার রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো আমানতকারীদেরকে উৎসাহিত করে যেন তারা তাদের হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন না করে। এ উদ্দেশ্যে তারা এ হিসাবে আমানতকৃত অবশিষ্ট টাকার উপর মুনাফা প্রদান করে থাকে। সুতরাং সঞ্চয়ী হিসাব ও চলতি হিসাবের মাঝে একটি জায়গায় মিল থাকে। সেটা হল হিসাবের মালিক যখনই চায় তখনই তার হিসাবের স্থিতি থেকে চাহিদা মত টাকা উত্তোলন করতে পারে। আবার মেয়াদি (ফিক্সড ডিপোজিট) হিসাবের সাথেও এর একটি মিল রয়েছে। সেটা হচ্ছে ব্যাংক আমানতকারীর হিসাবে অবশিষ্ট থাকা স্থিতির উপর মুনাফা প্রদান করে থাকে।[১০৭]

বাকের সদর মনে করেন যে, সুদি ব্যাংকব্যবস্থায় সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে আমানতকারীর সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক হচ্ছে ঋণের সম্পর্ক। আর যেহেতু এরূপ আমানতের মুনাফা প্রদান করা হয়ে থাকে, কাজেই এটা মুনাফার বিনিময়ে ঋণ হিসাবে গণ্য হবে যা সুদ বৈকি। কাজেই এটা সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থায় পরিচালনাযোগ্য নয়। এ কারণে তিনি প্রস্তাব করেন যে, এক্ষেত্রে আমানতকারীর সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক হবে 'প্রতিনিধি'র সম্পর্ক। অর্থাৎ ব্যাংক উকিল তথা প্রতিনিধিস্বরূপ আমানতকারীর জমাকৃত টাকা গ্রহণ করে বিনিয়োগকারীর সাথে মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে লেনদেনে যাবে।

প্রতিনিধিত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে আমানতকৃত সম্পদ ব্যাংকের মালিকানায় আসে না। বরং পূর্ববৎ আমানতকারীর মালিকানায় থেকে যায়। এক্ষেত্রে ব্যাংক, ঐ পুঁজির মালিকের প্রতিনিধি হিসাবে তা মুদারাবার পক্ষ অর্থাৎ বিনিয়োগকারীকে দিবে। মুদারাবার চুক্তি অনুযায়ী সে সঞ্চয়ী আমানত থেকে অর্জিত মুনাফাকে দুই ভাগে বিভক্ত করবে : একটি ভাগ যা প্রায় ১০ শতাংশ হয়, নগদ টাকা রূপে ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হবে, যাতে সঞ্চয়ী হিসাবে আমানতকারীরা টাকা উত্তোলন করতে আসলে তাদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। আর অপর ভাগটি যা প্রায় ৯০ শতাংশ পরিমাণ হয়, মুদারাবার চুক্তির ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদের দেয়া হবে। বলা বাহুল্য যে, এক্ষেত্রে যে শতাংশ আমানত ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হবে, তাতে কোন মুনাফা আসবে না। এভাবে সঞ্চয়কারীরা যেমন চাহিবামাত্র ব্যাংক থেকে তার প্রয়োজনীয় পরিমাণে টাকা উত্তোলন করতে পারবে, তদ্রূপ ব্যাংকও আমানতকারীকে তার আমানত জমা রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে কিছু মুনাফা তাকে প্রদান করতে পারবে।[১০৮]

†gqvw` AvgvbZ (wd· W wW‡cvwRU)

মেয়াদি আমানত হচ্ছে সেই টাকা, যা আমানতকারী আয় করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে জমা রাখে। আর ব্যাংক আমানতকারীর সাথে এ মর্মে শর্তবদ্ধ হয় যে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত (উদাহরণস্বরূপ ৬ মাস) তার আমানত উত্তোলন করতে পারবে না। এরূপ আমানতের বিপরীতে তাকে মুনাফা প্রদান করা হবে। সুদি ব্যাংকব্যবস্থায় এরূপ আমানতকারীর সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক হচ্ছে লাভের বিনিময়ে ঋণ প্রদানের সম্পর্ক এবং এটা সুদ। ফলে এটা সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থায় পরিচালনা করার যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় বাকের সদরের প্রস্তাব

[১০৭] দ্র. cv¸³, পৃ. ২৩।
[১০৮] দ্র. cv¸³, পৃ. ৬৪, ৬৫, ৯৭।

হল, ঋণের সম্পর্কটি প্রতিনিধিত্বের সম্পর্কে পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থাৎ ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাবের মতই আমানতকারীদের আমানতকে প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর মুদারাবার চুক্তির কাঠামোর মধ্যে তা বিনিয়োগকারীদের কাছে দিবে এবং মুদারাবা চুক্তির ধারা অনুযায়ী তাদের লভ্যাংশে অংশীদার হবে।[১০৯]

বাকের সদরের প্রস্তাব অনুযায়ী, ব্যাংকের মুদারাবা তিনটি আর্থিক ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পন্ন হয়।[১১০] যথা :

এক. আমানতকারী - যে এখানে পুঁজি ও মুদারাবার মালিকের ভূমিকায়।

দুই. বিনিয়োগকারী - যে এখানে কর্মী এবং মুদারাবা চুক্তির একটি পক্ষ এবং

তিন. ব্যাংক - যে এখানে আমানতকারীর উকিল তথা প্রতিনিধি এবং মুদারাবা চুক্তির মাধ্যম।

বাকের সদর মেয়াদি আমানতের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছেন।[১১১] যথা :

এক. আমানতকারী এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে যে, তার আমানতি টাকা ন্যুনতম ৬ মাস যাবত ব্যাংকে রেখে দিবে। আর যদি আমানতকারী এরূপ অঙ্গীকার প্রদান না করে, তাহলে ব্যাংক তার জমাকৃত টাকা মুদারাবার কাজে ব্যবহার করবে না এবং এ মর্মে তার প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করবে না।

দুই. আমানতকারী ব্যাংক কর্তৃক মুদারাবা চুক্তির জন্য যেসব শর্তাবলি নির্ধারণ করেছে, সেগুলো সে মানবে।

তিন. ব্যাংকে আমানতকারীর মেয়াদি আমানত ছাড়াও চলতি হিসাবও থাকতে হবে।

বাকের সদরের পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্থায়ী আমানতের জন্য কোন বিশেষ শর্ত নেই। যেহেতু ব্যাংক যে কোন আমানতকেই আলাদা মুদারাবার মধ্যে ব্যবহার করে না। বরং স্থায়ী হিসাবসমূহে জমাকৃত টাকার সমষ্টিকে একগুচ্ছ মুদারাবার মধ্যে কাজে লাগায়। ফলে আমানতকৃত টাকার পরিমাণ যতই কম হোক না কেন, ব্যাংকের জন্য তা কাজে লাগাবার উপযোগী থাকবে।[১১২]

প্রতিনিধিত্ব চুক্তির সূত্রে ব্যাংকের উচিত হবে মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগের সফল খাতসমূহ চিহ্নিত করা এবং স্থায়ী হিসাবে জমাকৃত অর্থ ঐসব খাতে বিনিয়োগ করা। হিসাবে জমাকৃত টাকা বিনিয়োগে বিলম্ব করার অধিকার ব্যাংকের নেই।[১১৩]

AvgvbZKvix‡`i AwaKvi

সুদি ব্যাংকসমূহে টাকার মালিকদের আমানত জমা রাখতে উৎসাহিত করে তিনটি উদ্দীপক। সেগুলো হল-

১. মূল আমানত সুরক্ষার নিশ্চয়তা : সুদি ব্যাংকসমূহ মূল আমানতের টাকাকে জামাকারীদের জন্য ঋণস্বরূপ সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে।

২. মুনাফা প্রদান : সুদি ব্যাংকসমূহ জমাকৃত আমানতি টাকা ছাড়াও হিসাবে থাকা টাকার উপর মুনাফা প্রদান করে থাকে।

---

[১০৯]. দ্র. Cv¸3, পৃ. ২৪।
[১১০].দ্র. Cv¸3, পৃ. ২৬।
[১১১]. দ্র. Cv¸3, পৃ. ২৭।
[১১২]. দ্র. Cv¸3, পৃ. ২৭।
[১১৩]. দ্র. Cv¸3, পৃ. ৩০ ।

৩. উত্তোলনের সুযোগ : সুদি ব্যাংকসমূহ এই সুযোগের ব্যবস্থা রেখেছে যাতে আমানতকারী মেয়াদ পূর্ণ হলে তার জমাকৃত অর্থের সম্পূর্ণটা কিম্বা আংশিক উত্তোলন করতে পারবে।

বাকের সদর দেখান যে এ বিষয়গুলো সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় কার্যকর করা যায়-

AvgvbZi wbðqZv

বাকের সদর বলেন, সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থায়ও আমানতকারীর মূল আমানত সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধানকারী উদ্দীপককে কার্যকর করা যায়। তবে আমানতকে ঋণ বলে গণ্য করার মাধ্যমে নয়, যেটা সুদি ব্যাংকে চালানো হয়। কারণ সেক্ষেত্রে আমানতকারীকে মুনাফা প্রদান করা যাবে না। আবার বিনিয়োগকারী (অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পনায় যিনি মুদারাবার কর্মীস্বরূপ) তাকে এ অর্থের সুরক্ষা নিশ্চয়তার জন্য বাধ্য করার মাধ্যমেও নয়। কেননা শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে মূল পুঁজির জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ করা যায় না। বরং যেটা করতে হবে সেটা হল, ব্যাংক তৃতীয় এক ব্যক্তির স্থলে এবং মুদারাবা চুক্তির মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পুঁজির মালিক (অর্থাৎ আমানতকারী) কে এমর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে, যদি বিনিয়োগকারী পুঁজিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে লোকসানে পতিত হয়, তাহলে ব্যাংক তার সে ক্ষতি পুষিয়ে দিবে। বাকের সদর ২নং পরিশিষ্টির মধ্যে দেখিয়েছেন যে, মুদারাবা চুক্তির ক্ষেত্রে তৃতীয় কোন ব্যক্তির মাধ্যমে পুঁজির সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে কোন বাধা নেই।[১১৪]

gbvdv

আমানত জমা রাখার পেছনে দ্বিতীয় যে উদ্দীপকটি কার্যকর প্রভাব রাখে সেটা হচ্ছে সুদি ব্যাংকসমূহের পক্ষ থেকে দীর্ঘমেয়াদি আমানতের উপর নির্দিষ্ট হারে মুনাফা প্রদান করা হয়। সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থায় এই মুনাফাকে মুদারাবা চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত লভ্যাংশ থেকে পূরণ করা যায়। যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাংক প্রতিনিধি হিসাবে দীর্ঘমেয়াদী হিসাবসমূহে জমাকৃত আমানতকে মুদারাবার আওতায় বিনিয়োগকারীদেরকে দিবে এবং অর্থ বছরের শেষে গিয়ে বিনিয়োগকৃত পুঁজি থেকে অর্জিত লভ্যাংশ তাদের থেকে গ্রহণ করে তা আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টন করবে। এভাবে দ্বিতীয় উদ্দীপকটি অর্থাৎ মুনাফা আয়ের বিষয়টিও নিশ্চিত হবে। শুধু পার্থক্য হল সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থায় স্থির ধার্যকৃত এবং পূর্ব নির্ধারিত কোন আয় নেই। বরং এটা নির্ভর করে বিনিয়োগকারী ও অর্থ-লগ্নিকারী সংস্থার সাফল্যের হারের উপর।[১১৫] অন্য আরেকটি পার্থক্য হল, সুদি ব্যাংকব্যবস্থায় আমানত জমা করার দিন থেকেই মেয়াদি আমানতের উপর মুনাফা বর্তায়। অথচ সুদ বিহীন ব্যাংকব্যবস্থায় আমানতি অর্থ বিনিয়োগে পরিণত হতে হবে এবং এর পর থেকে মুনাফা প্রযোজ্য হবে।[১১৬]

D‡Ëvj‡bi m‡hvM

সুদি ব্যাংকব্যবস্থায় আমানতকারী মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিক অর্থ উত্তোলন করতে পারে। সুদ বিহীন ব্যাংকে এই বিষয়টি কিছুটা কঠিন। কেননা, এখানে মেয়াদি আমানতি অর্থ মুদারাবা চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য ও শিল্প কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই অর্থনৈতিক প্রকল্পসমূহ থেকে ঐ অর্থ বের করে

---

[১১৪]. দ্র. cv¸³, পৃ. ৩৩, ১৮৪-২০৪।
[১১৫]. দ্রঃ cv¸³, পৃ. ৩৩-৩৭।
[১১৬]. দ্র. cv¸³, পৃ. ৩৬।

ফেললে প্রকল্পসমূহ থেমে যাবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাকের সদর আমানতসমূহের কাজে লাগানোর ব্যাপারে ব্যাংকের সূক্ষ্ম কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাব রেখেছেন। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক ছয় মাস শেষে যেন যেসব প্রকল্পে মুদারাবার মাধ্যমে অর্থের সংস্থান করা হয়েছে, সেগুলোর অন্তত দশ শতাংশ এবং মেয়াদি আমানতের অন্তত দশ শতাংশ মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়, যাতে আমানতকারীদের জন্য তা উত্তোলন করা সম্ভবপর হয়।[১১৭]

e¨vs‡Ki AvaKvi

সুদি ব্যাংকব্যবস্থায় প্রদত্ত লোন থেকে প্রাপ্ত মুনাফা এবং আমানতকারীদেরকে প্রদেয় মুনাফার মধ্যে পার্থক্যের হার সাধারণত নির্ধারিত থাকে এবং ব্যাংকের আয়ও মূলত এটাই। কিন্তু বাকের সদরের মতে[১১৮] সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার আয়ের জায়গা হচ্ছে দুইটি :

GK. wewb‡qvMKvixi w'K †_‡K wbawiZ Avq

যেমনটা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, সুদ মুক্ত ব্যাংক হচ্ছে মুদারাবা চুক্তির ক্ষেত্রে পুঁজির মালিক (অর্থাৎ আমানতকারী) এবং কর্মীর (অর্থাৎ বিনিয়োগকারী) মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। এই মধ্যস্থতার মাধ্যমে সে কিছু সেবা আমানতকারীকে এবং কিছু সেবা বিনিয়োগকারীকে প্রদান করে থাকে। তাই সুদ মুক্ত ব্যাংক পুঁজি বিনিয়োগকারীকে প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত পরিমাণে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে। এই পারিশ্রমিক হতে পারে সুদি ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীর থেকে যে পরিমাণ মুনাফা গ্রহণ করা হয় ও আমানতকারীকে যে পরিমাণ মুনাফা প্রদান করা হয় তার পার্থক্যের সমপরিমাণে।

'B. AvgvbZKvixi w'K †_‡K cwieZbkxj Avq

ব্যাংক, আমানতকারীর উকিল তথা প্রতিনিধি হিসাবে আমানতকারীকে যেসব সেবা প্রদান করে থাকে যেমন আমানতের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা, এর জন্য কর্মী (অর্থাৎ বিনেয়োগকারী) খুঁজে পাওয়া ইত্যাদি, এর বিনিময়ে মুদারাবা থেকে অর্জিত মুনাফা, যা পুঁজির মালিক তথা আমানতকারীর প্রাপ্য, তা থেকে সে প্রতিনিধির পারিশ্রমিক স্বরূপ আমানতকারীর নিকট থেকে গ্রহণ করতে পারে।

বাকের সদর ৩ নং পরিশিষ্টির মধ্যে আমানতকারীর মুনাফা থেকে কিছু অংশ উকিল তথা প্রতিনিধির পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করার ফিক্হী বৈধতার ভিত্তি ব্যাখ্যা করেছেন।[১১৯]

A_-m¤ú' eivÏKiY

সুদি ব্যাংক ব্যবস্থা চলতি, সঞ্চয়ী ও মেয়াদী হিসাবসমূহের মাধ্যমে জমাকৃত আমানতকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ কর্তনের পর লোন হিসাবে বিনিয়োগকারীদের ও ভোক্তাদেরকে সরবরাহ করে। যেহেতু লোনের ফিকাহ্গত প্রকৃতি হচ্ছে

---

[১১৭]. দ্রঃ cv¸³, পৃ. ৩৭-৪০।
[১১৮]. দ্র. cv¸³, পৃ. ৪১-৪৭।
[১১৯]. দ্র. cv¸³, পৃ. ২০৫।

লাভের বিনিময়ে ঋণ এবং তা সুদ হয়, একারণে এ প্রক্রিয়াটি সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থায় চালানো যায় না। একারণে বাকের সদর অন্য কোন চুক্তির অনুসন্ধান করেছেন। নিচে তার বিস্তারিত তুলে ধরা হল :

10.3. g‘vivev

বাকের সদরের প্রস্তাবনায় অর্থ-সম্পদ বরাদ্দকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পন্থাটি হচ্ছে মুদারাবা চুক্তি। সুদমুক্ত ব্যাংক দুই ভাবে বিনিয়োগকারীদের জন্য মুদারাবার আওতায় অর্থ যোগানের পদক্ষেপ নেয় -

GK. পুঁজির মালিক হিসাবে মুদারাবা প্রদান

সুদমুক্ত ব্যাংক খোদ ব্যাংকের সম্পদকে এবং চলতি হিসাবসমূহের আমানতের (বিধিবদ্ধ ও সতর্কতামূলক রিজার্ভ কর্তনের পর) অবশিষ্ট অর্থকে পুঁজির মালিক হিসাবে উৎপাদন ও বাণিজ্যিক খাতে বিনিয়োগকারীদের হাতে দেয়। অতঃপর অর্থনৈতিক কর্ম-তৎপরতা থেকে অর্জিত মুনাফায় তাদের সাথে অংশীদার হয়।[১২০]

‘B. পুঁজির মালিকের উকিল তথা প্রতিনিধি হিসাবে মুদারাবা প্রদান

সুদমুক্ত ব্যাংক সঞ্চয়ী ও মেয়াদী হিসাবসমূহ হতে জমাকৃত আমানতকে আমানতকারীর উকিল হিসাবে উৎপাদন ও বাণিজ্যিক খাতে বিনিয়োগকারীদের হাতে দেয়। অতঃপর আমানতকারীদের প্রতিনিধি হিসাবে বিনিয়োগকারীদের সাথে অর্থনৈতিক কর্ম-তৎপরতার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফায় অংশীদার হয়।[১২১]
এক্ষেত্রে ‘আমানতকারী’- পুঁজির মালিক হিসাবে এবং ‘বিনিয়োগকারী’- মুদারাবার কর্মী হিসাবে আর ‘ব্যাংক’- উকিল তথা প্রতিনিধি হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকে।[১২২]

(K) Kgxi (Z_v g‘vivev Znwej MnYKvixi) kZvewj

বাকের সদর লেনদেন সঠিক ও সুষ্ঠু হওয়া এবং আমানতকারীদের স্বার্থ বজায় রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মুদারাবা তহবিল গ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ শর্তাবলি নির্ধারণ করেছেন।[১২৩] যথা :

১. বিনিয়োগকারীকে বিশ্বস্ত হতে হবে। দু’জন ব্যক্তি, যাদেরকে ব্যাংক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে থাকে, তারা তার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

২. ব্যাংকের কাছে প্রমাণিত হতে হবে যে, বিনিয়োগের জন্য কর্মীর প্রস্তাবিত খাতটি লাভজনক।

৩. ব্যাংক এ মর্মে নিশ্চিত হবে যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও সামর্থের অধিকারী।

৪. কর্মীর প্রস্তাবিত খাতটি বিনিয়োগের জন্য একটি স্বীকৃত ও নির্ধারিত খাত হতে হবে।

৫. বিনিয়োগকারীকে মুদারাবা চুক্তি সম্পাদনে ব্যাংক নির্ধারিত শর্তাবলি মানতে হবে। এরূপ গুরুত্বপর্ণ কয়েকটি শর্ত হল-

---

[১২০]. দ্র. cv¸³, পৃ. ৪৭।
[১২১]. দ্র. cv¸³, পৃ. ২৫।
[১২২]. দ্র. cv¸³, পৃ. ২৬।
[১২৩]. দ্র. cv¸³, পৃ. ২৮-৩০।

ক) মুনাফা বণ্টন সংক্রান্ত নিয়মাবলি।

খ) ব্যাংকে তার চলতি হিসাব থাকা।

গ) ব্যাংকের চাহিদা মাফিক তার সঠিক কাগজপত্রাদি থাকা।

ঘ) ব্যাংকের চাহিদা মাফিক সঠিক তথ্যাদি যথাসময়ে পেশ করা।

বাকের সদরের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক-লেনদেনে সুনাম রয়েছে, তাদেরকেই অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(L) wewb‡qvMKvixi ‘vq-‘wqZ I gbvdv

মুদারাবার দাবি অনুসারে বিনিয়োগকারী (অর্থাৎ মুদারাবার কর্মী) মূল পুঁজি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মুনাফার নিশ্চয়তা দেয় না। কাজেই এমন হতে পারে যে বিনিয়োগকারী তার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লাভ নাও আসতে পারে। এমনকি নানান কারণে ব্যবসায় লোকসানও হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কর্মী মুনাফা না করা কিংবা লোকসান করার কারণে কোন দায়-দায়িত্ব বহন করবে না। শুধু কেবল তার কাজকে সে হারাবে এবং কৃত পরিশ্রমের বিপরীতে সে কোন পারিশ্রমিক লাভ করবে না।

ফিক্সড্ ডিপোজিট তথা মেয়াদি আমানতের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, ব্যাংক উকিল ও তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে আমানতকৃত অর্থের ব্যাপারে আমানতকারীদের জন্য নিশ্চয়তা বিধান করবে। এর ফলে, যদি ধরা হয় যে ব্যবসায় লোকসান ঘটে যায়, তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাংকই ঐ ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বহন করবে। সুতরাং পুঁজির ঝুঁকি থাকবে ব্যাংকের দায়িত্বে। আর মুনাফার ঝুঁকি থাকবে কর্মী ও আমানতকারীর দায়িত্বে।

যদি বিনিয়োগ কার্যক্রম মুনাফা বয়ে আনে, তাহলে অর্জিত মুনাফা ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে পূর্ব-সমঝোতা মোতাবিক দু'পক্ষের মধ্যে বণ্টন করা হবে। অতঃপর ব্যাংক পুঁজির মুনাফার একটি অংশ উকিলের পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করবে। আর বাকী অংশকে আমানতকারীদের মুনাফা হিসাবে বণ্টন করবে।[১২৪]

(M) wewb‡qvMKvixi ˆbwZK SwK

মুদারাবা চুক্তির দাবি অনুসারে মুল মুনাফা এবং ব্যাংকের ও আমানতকারীর মুনাফার পরিমাণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মুনাফার সাথে সম্পর্কিত। এমতাবস্থায় এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, বিনিয়োগকারী অসত্য তথ্য দিয়ে ব্যবসায়ের প্রকৃত মুনাফাকে কমিয়ে ঘোষণা করল। অথবা মুনাফা করেও লোকসানের কথা বলে চালিয়ে দিল। এক্ষেত্রে বাকের সদর বিশ্বাস করেন, যদি ব্যাংক নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করে, তাহলে মিথ্যা ঘোষণা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে :

1. বিনিয়োগকারীর বিশ্বস্ত হওয়ার ব্যাপারে অনুসন্ধান : ব্যাংক একটি অনুসন্ধানী টিম গঠন করতে পারে। যারা মুদারাবার তহবিল গ্রহণের আবেদনকারীদের সামর্থ, অভিজ্ঞতা, সততা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করবে এবং শ্রেণিবিন্যাস করবে। অতঃপর ব্যাংক ঐ তথ্যাদির ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

[১২৪] দ্র. Cv¸ 3, পৃ. ৪৭।

2. অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান : লেনদেন যে বিনিয়োগ খাতের উপর সংঘটিত হবে সে ব্যাপারে ব্যাংকের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে এবং ঐ বিষয়ে লাভ ও ক্ষতির সম্ভাবনা ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে। তাহলে অসত্য প্রতিবেদনগুলোকে নির্ণয় করতে পারবে।

3. ব্যাংক একদিক থেকে বিনিয়োগকারীকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারে যাতে সে ক্রয়মূল্য, সংশ্লিষ্ট খরচাদি, বিক্রয়মূল্য এবং ঐ সময়ে বাজার মূল্য ইত্যাদি তথ্য ব্যাংকে দাখিল করবে। অপরদিকে অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ শাখা সৃষ্টি, অর্থনীতির প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা, মূল্যসমূহের (ক্রয়মূল্য-বিক্রয়মূল্য) অবস্থা এবং অর্থনীতির বিবিধ বিষয়ের খরচের গড় পরিমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ ও শ্রেণিবিন্যাস করে রাখতে হবে। এভাবে ব্যাংক বিনিয়োগকারীদের সরবরাহকৃত তথ্যাদি এবং ব্যাংকের নিজস্ব অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ শাখার সংগৃহীত তথ্যাদিকে একত্রে মিলিয়ে দেখলে প্রতিবেদনসমূহের যথার্থতা কিম্বা ঘাপলা ধরে ফেলতে পারে।

4. ব্যাংক অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরুর প্রথম থেকেই নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদেরকে লাভ ও লোকসানের উপায়সমূহ জ্ঞাত করতে পারে এবং তাকে এ মর্মে দায়িত্বারোপ করতে পারে যে ব্যাংকের পরামর্শ মাফিক তাকে কাজ করতে হবে এবং লেনদেন ও কর্মকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণী নথিভুক্ত করতে হবে। ব্যাংক বিনিয়োগকারীকে এমর্মে অঙ্গীকারাবাদ্ধ করতে পারে যে, যদি সে ব্যাংকের পরামর্শের বাইরে চলে এবং ব্যাংকের চাহিদা মাফিক লাভ-লোকসানের নথি লিপিবদ্ধ ও দাখিল না করে, তাহলে ব্যাংক তার লোকসানের দাবিকে গ্রহণ করবে না। সেক্ষেত্রে তার মূল পুঁজি ছাড়াও ঐ ব্যবসায়ে সচরাচর যে মুনাফা হয়, সে মুনাফার অর্থ তার কাছে দাবি করবে।[১২৫]

(N) wewb‡qvMKvixi cÿ †_‡K gj cwR mi ÿvi wbðqZv

মুদারাবা চুক্তির প্রাথমিক দাবি হচ্ছে কর্মী (অর্থাৎ বিনিয়োগকারী) ব্যবসায় লোকসানের ক্ষেত্রে কোনরূপ দায় বহন করবে না। কিন্তু যদি পুঁজি সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করার বিষয়টি একটি শর্ত রূপে পুঁজির মালিকের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয় এবং কর্মী (বিনিয়োগকারী) সেটা মেনে নেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে হুকুম কি হবে- এ নিয়ে ফকীহ্‌বৃন্দের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বাকের সদর এ প্রসঙ্গে বিশদ ফিক্‌হি আলোচনা উপস্থাপনপূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কর্মীর জন্য পুঁজির সুরক্ষার নিশ্চয়তা মর্মে শর্তারোপ করা যদিও নিয়মের দাবি অনুযায়ী কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তিনি বলেন, মুদারাবার অধ্যায়ে আমাদের বিশেষ নির্দেশনা[১২৬] রয়েছে।

10.4. gbvdv wenxb FY

বাকের সদরের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দকরণের দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে, বিশেষ আবেদনকারীদের জন্য বিনা মুনাফায় ঋণ প্রদান করা। এই প্রকল্প মোতাবিক ব্যাংক সকল আবেদনকে মুদারাবার (যা একটি লাভজনক চুক্তি) পথ দিয়ে তহবিল যোগান দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মুদারাবা সম্ভব থাকে না[১২৭], সেসব ক্ষেত্রে ব্যাংক তার সম্পদের একটা অংশকে মুনাফা বিহীন ঋণ হিসাবে এরূপ বিনিয়োগকারীদের প্রদান করে। আর ঋণ গ্রহীতা এমর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সে প্রাপ্ত ঋণের টাকা ব্যাংকে ফেরত প্রদান করবে।[১২৮]

---

[১২৫]. দ্র. C¸ 3, পৃ. ২০৯।

[১২৬]. মুহাম্মদ বিন কায়েস বর্ণিত রেওয়ায়াত। উক্ত রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, শর্তারোপ করলেও লোকসানের ক্ষেত্রে সে দায়ী হবে না।

[১২৭]. যেমন লোনের আবেদনকারী যখন লোনের টাকা দিয়ে তার কিস্তির টাকা শোধ করতে চায় কিম্বা কর্মচারীদের বেতনভাতা পরিশোধ করতে চায়।

[১২৮]. দ্র. C¸ 3, পৃ. ৬৬-৬৭।

11. gšÍe¨

একত্ববাদী সমাজব্যবস্থায় সর্বপ্রকার সুদি লেনদেন পরিহার করে চলা আল-কুরআনের কড়া নির্দেশ। কিন্তু বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক লেনদেন বিশেষ করে ব্যাংকব্যবস্থায় সুদের প্রচলন মহামারী রূপ ধারণ করেছে। মুসলিম জাতিকে এ মহামারী থেকে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এই প্রেক্ষিতে বাকের সদর তাঁর ÔAvj-e¨vsK Avj-jv-iveweq¨vn wd Avj-BmjvgÕ গ্রন্থে বিদ্যমান ব্যাংকসমূহের সুদি লেনদেন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার মৌলিক উপায় নির্দেশ করতে সক্ষম হন। মুনাফার জন্য ব্যাংকে টাকা জমা রাখা আর মুনাফার শর্তে ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদান করা- ব্যাংকের এ উভয় প্রকার লেনদেনই ইসলামি বিধানের পরিপন্থী। কারণ তা সুদের হুকুমে পড়ে এবং নিষিদ্ধ। বাকের সদর যে সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার রূপরেখা প্রস্তাব করেছেন তার ভিত্তি সুদি ব্যাংকের ভিত্তির থেকে আলাদা। এ ব্যাংকব্যবস্থা সমাজের সার্বিক অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করবে এবং সর্বস্তরের মানুষের জীবনে অর্থনীতির চাকাকে আরো সচল করবে। কারণ সুদি ব্যাংকগুলো সুদপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার আশায় অর্থনৈতিক সক্ষমতা বেশি আছে এমন গ্রাহকদের ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়। ফলে অর্থনৈতিক লেনদেনের পরিসর সীমিত হয়ে যায়। কিন্তু সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থায় সমাজের এ কাযক্রমের আওতা আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। ফলে সার্বিক অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। অবশ্য সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যথাসম্ভব এ ধারণার সমর্থনকারী ধর্মভীরু ব্যক্তিদের নিযুক্ত করতে হবে। যারা এই পরিকল্পনার প্রতি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবে এবং ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার সাফল্যের জন্য প্রয়াস চালাবে।

বাকের সদর প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার বহুমুখী কার্যক্রমকে বলবৎ রেখেই তাঁর রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন। যদিও তিনি যে বিষয়টির উপর বেশি দৃষ্টিপাত করেছেন তা হচ্ছে সুদ থেকে মুক্ত থেকে কীভাবে আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও সচল রাখা যায়। এ লক্ষ্যে তিনি যথাসম্ভব ঋণ কার্যক্রমকে 'মুদারাবা'য় রূপান্তর করার উপর সবচেয়ে জোর দিয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের ভূমিকা হবে আমানতকারী আর ঋণগ্রহীতা (তথা বিনিয়োগকারী)র মাঝে মধ্যস্থতাকারী স্বরূপ। দেখা যাচ্ছে যে সুদমুক্ত ব্যাংকব্যাস্থায় বাকের সদরের মূল চিন্তা হচ্ছে আমানতকারী ও ঋণগ্রহীতার মাঝে মুদারাবা চুক্তিতে মধ্যস্থতা করা। এই মডেলে ব্যাংক আমানতকৃত টাকা মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করে। মুদারাবা ছাড়াও আরও কয়েক প্রকার আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান প্রকল্প চলতে পারে। এগুলোর মধ্যে করজুল হাসানা প্রকল্প অন্যতম।

বিশ্লেষণে বলা যায় যে, বাকের সদরের প্রস্তাবিত মডেল যদিও সমসাময়িক মডেলগুলোর মধ্যে তাত্ত্বিক যুক্তিগ্রাহ্যতা এবং বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতার বিচারে এগিয়ে ছিল, কিন্তু অন্যান্য মডেলের ন্যায় বেশি বেশি সুদমুক্ত লেনদেনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ ব্যাংকিং শিল্পের খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর উপর সেই অনুপাতে আলোকপাত করা হয়নি। তদ্রূপ তাঁর প্রস্তাবনায় সঞ্চয়কারী কিম্বা ঋণগ্রহীতা- কোন পক্ষের গ্রাহকদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হয়নি। ফলে সকল ব্যাংকের সকল গ্রাহকদের জন্য একই মডেল প্রস্তাব করা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে গ্রাহকরা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়। কেউ চায় কম মুনাফা হলেও তার আমানত নিরাপদ থাকুক। আবার কেউ বা বেশি ঝুঁকি নিয়ে হলেও অধিক মুনাফা লাভ করতে চায়। কাজেই সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার মূল প্রস্তাব প্রশংসনীয় হলেও তা কার্যকরী করে তুলতে হলে আরও বেশি মনোযোগের সাথে পরিকল্পনা করার দাবি রাখে।

mßg Aa¨vq

ivó, h‡Mvc‡hvMx A_bxwZ Ges Dbqb

mßg Aa¨vq

ivó, h‡Mvc‡hvMx A_bxwZ Ges Dbqb

রাজনৈতিক পরিভাষায় রাষ্ট্র ও এর তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান রয়েছে। কেউ কেউ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্যে বিশ্বাস করে না এবং তারা 'শাসন জারী'কে 'রাষ্ট্র'র তাৎপর্যের সমার্থক হিসাবে প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ তাত্ত্বিকগণ 'রাষ্ট্র'কে স্বয়ং জাতিরই একটি রূপ হিসাবে গণ্য করে থাকে, এমন এক শক্তি, যা নির্দিষ্ট কোন ভূ-খণ্ডের সুসংগঠিত জনগণের সমষ্টি থেকে উদ্‌গত হয়। রাষ্ট্র হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ সর্বজনীন শক্তি, যা সরকারকে মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।[১]

এ সংজ্ঞানুযায়ী যতদিন পর্যন্ত খোদ্ জনগণ এবং তাদের সামাজিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে, ততদিন রাষ্ট্র বিলীন হবে না। সরকার অপসারণের কারণে রাষ্ট্র মুছে যায় না। সুতরাং সরকারের মধ্যে যে কোন সংকটের অর্থ রাষ্ট্রের মধ্যে সংকটের প্রকাশ নয়। রাষ্ট্রের থাকা বা না থাকা নির্ভর করে সমাজের থাকা বা না থাকা এবং উক্ত সমাজের সামাজিক ব্যবস্থার বৈধতার উপরে। যতদিন পর্যন্ত সামাজিক ব্যবস্থা অব্যাহত ও বৈধ থাকবে, রাষ্ট্রও থাকবে। কারণ, প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থারই যে কোন রূপেই হোক না কেন, তার শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা একান্ত দরকার। কোন সমাজই সামাজিক জীবনের এই তিনটি স্তম্ভ থেকে শূন্য থাকতে পারে না।[২]

বাকের সদর রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় জনগণের সামষ্টিক অস্তিত্ব থেকে উৎসারিত 'রাজনৈতিক ঐক্য' উপাদানটির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে জনগণের মধ্যে বিরাজমান রাজনৈতিক ঐক্যের পরম প্রকাশ।[৩] অন্যত্র তিনি রাষ্ট্রকে মানব জীবনে নিখাঁদ সামাজিক শক্তির প্রতীক বলে গণ্য করেছেন, যার উৎপত্তি ঘটে ঐশীপুরুষদের প্রেরণ এবং তাঁদের মাধ্যমে জনগণের বিভেদ দূর করার মধ্য থেকে।[৪]

তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রসমূহের 'রাজনৈতিক ঐক্য' কিম্বা 'একক রাজনৈতিক শক্তি'- হয় ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত, নয়ত চিন্তা ও অনুধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবেগী রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে সেই সকল রাষ্ট্র, যাদের ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে ভূ-খণ্ড কিম্বা জাতিগত বৈশিষ্ট্যাবলি, যেমন সুনির্দিষ্ট কোন বংশগতি, ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে চিন্তা ও অনুধ্যানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমূহ স্বয়ং কয়েক প্রকারে বিভক্ত। যথা–

প্রথমত : যারা আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শগত দিক দিয়ে অবিশ্বাসী (তথা কুফ্‌র)। যেমন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহ।

দ্বিতীয়ত : যারা বাহ্যত নিজেদেরকে চিন্তা ও অনুধ্যানের উপর ভিত্তিশীল বলে মনে করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে এরূপ নয়। যেমন, পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো।

তৃতীয়ত : ইসলামি চৈন্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক রাষ্ট্রসমূহ, যারা 'ইসলাম ধর্ম' এবং অস্তিত্বজগত, জীবন ও সমাজ সম্পর্কিত এর ভিত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৫]

---

১. দ্র. A. Vincent, *Theories of the State*, Tr. (Persian), Hussein Basiriyeh, Tehran: Nei Publication, 1992, পৃ. ৩২১।

২. দ্র. হাসান আরসানজানি, nv‡Kwgqv‡Z †'ŠjvZ nv, (প্রথম মুদ্রণ), তেহরান : সাজমানে কেতাবহায়ে জেইবি, ১৩৪২ সৌ. সন, পৃ. ৬৭-৬৮।

৩. উৎ, নাসের জাহানিয়ান, "জায়গাহে দৌলাত দার ইকতিসাদ-এ ইসলামি," Ô^Î-gwmK BKwZmv'-B Bmjwg0, ১ম সংখ্যা. বাহার, (১৩৫২ ফা. সন)।

৪. দ্র. cÖv¸³|

৫. দ্র. cÖv¸³|

বর্তমান যুগে সামাজিক বিকাশ এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে রাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই ভাগ্য নির্ধারণী ও গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে ইতিহাসকাল জুড়ে অর্থনৈতিক চিন্তার প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও পরিণতি সত্ত্বেও প্রতীয়মান হয় যে কার্যকর উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রই প্রধান সহায়ক। নিঃসন্দেহে টেকসই উন্নয়ন অভিমুখে অভিযাত্রা এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করতে হলে রাষ্ট্র ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নয়। অপরদিকে ন্যায়বিচারের বিস্তার ও বৈষম্যের হ্রাস ঘটানো, অর্থনৈতিক বিবাদসমূহের নিরসন, বাজারের ত্রুটি ও ঘাটতিসমূহ পূরণ, সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বিধান, নৈতিক বিকৃতি ও বিচ্যুতি রোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অপরিহার্যতাকে ব্যাখ্যা করে থাকে। এ কারণে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা চাবিকাঠির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্রে সরকার খোদায়ী বৈধতার মাধ্যমে জনগণের উপর শাসন করে থাকে, এ কারণে রাষ্ট্রনায়কদের কাছে আমজনতার চাওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যেন একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সকলের জন্য ন্যায্য ও সমান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে যেন মানবের সৃজনশীলতার প্রস্ফুটন এবং অযাচিত বৈষম্যসমূহ অপসারণে ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এটাই হচ্ছে একটি একত্ববাদী সমাজে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মর্মকথা।

1. A_bxwZ‡Z iv‡ói ‘wqZ-KZe¨ I KZZmxgv

বাকের সদর অর্থনৈতিক পরিধির মধ্যে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য দুইটি প্রধান কর্তব্য রয়েছে বলে মনে করেন। যথা-

GK. ইসলামি অর্থনীতির অপরিবর্তনশীল উপাদানগুলোকে মেলানো এবং (সামগ্রিক সূচকসমূহের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ) পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহকে নির্ধারণ।

‘B. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শর্তাবলি ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী প্রথম কর্তব্যটি সম্পাদন।

এই দুইটি প্রধান ও ব্যাপক কর্তব্য, সরকারের জন্য সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত দায়িত্ব বয়ে আনে। এর মধ্যে কয়েকটি দায়িত্ব নিম্নরূপ :

ক) সামাজিক নিরাপত্তা, যা সমাজের ব্যক্তিদের জন্য ন্যুনতম আপেক্ষিক সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

খ) জীবনমানের স্তরসমূহ নিকটবর্তীতর করণের মাধ্যমে জীবনে সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

গ) মজুতদারী এবং একচেটিয়াভাবে সম্পদ কুক্ষিগতকরণ নিষিদ্ধের মাধ্যমে আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা করা।

ঘ) গণভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বিদ্যমান সকল সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধাকে জনকল্যাণে কাজে লাগানো।

ঙ) প্রকৃত বিনিময় মূল্য সংরক্ষণের নিমিত্তে পণ্য, পুঁজি ও অন্যান্য পরিষেবার বাজারের উপর দায়িত্বশীল হস্তক্ষেপ করা এবং এজন্য অর্থনৈতিক জীবনের সকল ময়দানে একচেটিয়াপনার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম পরিচালনা করা।[৬]

বাকের সদরের মতে, একটি সমাজে জনগণ তিন দলে বিভক্ত হয়। একটি দল হচ্ছে যারা কাজ করতে পারে এবং নিজেদের চৈন্তিক ও কর্ম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাদের জীবনকে উচ্চতর স্তরে পরিচালনা করতে সক্ষম থাকে।

৬. দ্র. বাকের সদর, miVZ Avb BKwZmv‘ Avj-Bmjvwg, বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল-মাতবুআত, ১৩৯৯ হি. পৃ. ১০-১১।

দ্বিতীয় দলটি হচ্ছে যারা কাজের মাধ্যমে কেবল নিজের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনগুলোকেই মেটাতে সক্ষম হয়। আর তৃতীয় দলটি হচ্ছে যারা শারীরিক দুর্বলতা কিম্বা মানসিক বিকলাঙ্গতার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে (যা মানুষের কর্মক্ষমতা কেড়ে নেয়) কাজ করতে পারে না।[৭]

ইসলামে বিতরণ ব্যব্যস্থার মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রথম দলটি তাদের নিজেদের কাজের উপর নির্ভর করে। কারণ কর্ম তথা শ্রমই হচ্ছে মালিকানার ভিত্তি এবং বিতরণের প্রধান মাধ্যম। এর বিপরীতে তৃতীয় দলটি তাদের জীবনকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণের মাধ্যমে নির্বাহ করবে। কারণ তারা কাজ করতে সক্ষম নয়।

সুতরাং এ দলের লোকেরা বিতরণ ব্যবস্থা থেকে ততটা পরিমাণ জীবিকা গ্রহণ করবে যাতে তাদের জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তা নিশ্চিত পূরণ হয়। এই নিশ্চয়তা হচ্ছে ইসলামি সমাজের পরস্পর সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতা এবং সামজিক নিরাপত্তার মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দ্বিতীয় দলটি, যারা কাজ করে, কিন্তু তাদের কাজের মাধ্যমে উপার্জিত আয় দ্বারা তারা কোনমতে নিম্নমানের এক জীবন নির্বাহ করতে পারে মাত্র, তাদের আয় নির্ভর করবে 'শ্রম' এবং 'চাহিদা'– এ দুটি মানদণ্ডের উপর। অর্থাৎ শ্রম তাদের জীবনের আবশ্যকীয় প্রয়োজনসমূহ পূরণ করবে। আর চাহিদা– পরস্পর সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতা'র মূলনীতি অনুযায়ী তাদের আয়কে বৃদ্ধি ঘটাবে এবং তাদেরকে সর্বজনীন সুখ-সমৃদ্ধির স্তরে উন্নীত করবে।

যেহেতু ইসলামি অর্থনীতির চুড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে লোকদেরকে অভাবমুক্ত করা এবং সর্বজনীন আপেক্ষিক সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা, সেহেতু ইসলামি সরকার তথা রাষ্ট্রের অভিভাবকের কর্তব্য হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

2. mvgwRK wbivcËv weav‡b iv‡óªi KZe¨

বাকের সদর ইসলামি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের জন্য ব্যাপক ভূমিকায় বিশ্বাস করেন। রাষ্ট্রের একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে গণ-মানুষের চাহিদাসমূহ পূরণ করা। পরিভাষায় এটাকে বলা হয় সামাজিক নিরাপত্তা। তদ্রূপ ব্যাপক পরিসরে এবং উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্ত অপরিহার্য। ইসলামের গতিশীল ও উন্নত মতাদর্শ অপরাপর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ন্যায় সামাজিক নিরাপত্তার মূলনীতির উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং এটাকে ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের স্কন্ধে ন্যাস্ত করেছে। তবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যকে বিবেচনায় রেখেছে, যেগুলো তাত্ত্বিক এবং আইনি ও সামাজিক উভয় দিকে প্রযোজ্য। বাকের সদর বলেন:[৮]

> "রাষ্ট্রের উপর ন্যাস্তকৃত সামাজিক নিরাপত্তার মূলনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তিকে অনুসন্ধান করতে হবে সম্পদের উৎসসমূহের উপর সমাজের অভিন্ন অধিকারের মধ্যে। কেননা, সম্পদসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে সামগ্রিকভাবে সকলের ব্যবহারের কাজে, বিশেষ কোন দল বা শ্রেণির কাজে নয়। KziAv‡b এসেছে, 'তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন'।"[৯]

সর্বজনীন ও অভিন্ন অধিকারের কারণে প্রত্যেকেরই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার এবং ভাল জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। একারণে রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে সকল জনগণের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা।

---

[৭]. cv¸³|

[৮]. বাকের সদর, BKwZmv'bv, ফা. অনু. কাযেম মুসাভি, কোম : ইন্তেশারাতে ইসলামি, ১৩৪৮ সৌ. সন, খ. ২, পৃ. ৩২৫।

[৯]. Avj-KziAvb, বাকারা : ২৯।

আর যে কেউ প্রয়োজনীয় সুযোগ পাবে না, কিম্বা কর্ম করতে অক্ষম থাকে, তার জন্য একটি সুখময় জীবনযাপনের নিমিত্তে প্রাকৃতিক সম্পদে অংশীদার ও উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা করা।

এ কারণে নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার প্রশ্নে সমাজের সাধারণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আর এ অধিকার সেই সকল ব্যক্তির স্বার্থে যারা কর্মে অক্ষম। এ প্রসঙ্গে বাকের সদর খলীফা হযরত আলী (রা.) মিশরে নিযুক্ত স্বীয় গভর্ণরের প্রতি যে উপদেশ বার্তা প্রেরণ করেছিলেন, তার উদ্ধৃতি প্রদান করেন। ঐ উপদেশ বার্তায় হযরত আলী মিশরের গভর্ণর মালিক আশতারকে উদ্দেশ্য করে লিখেন :

> ‘তুমি আল্লাহ্‌কে দৃষ্টিতে আনো। সমাজের নিম্ন শ্রেণি অর্থাৎ অসহায়-দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যাদের কোন উপায়-অবলম্বন নেই, যারা দুর্ভাগা এবং ধরাশায়ী, তাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্‌কে দৃষ্টিতে আনো। কেননা, স্বল্পে তুষ্ট মানুষরা এই শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত এবং এরা হল সেই জনগোষ্ঠী যাদের কল্যাণ অন্যদের কাছে পৌঁছায়।
>
> আল্লাহ্‌র খাতিরে তোমার উচিত, মহাপ্রতিপালক তাদের উপকারার্থে যে অধিকার প্রবর্তন করেছেন এবং তোমাকে তা পরিপালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত করেছেন, সেটা পালন করা। তাই তোমার উচিত বাইতুল মালের কিছু অংশ এবং ইসলামি শাসনাধীন ভূ-খণ্ডের খাদ্যশস্যের কিছু অংশ তাদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা... ।’[১০]

বাকের সদর হযরত আলীর (রা.) এই উপদেশনামা থেকে কয়েকটি মূল্যবান বিষয় বের করেন, যা ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিপন্থা নির্ধারণে বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

১. গভর্ণর কর্তৃক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন নির্ভর করে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি তার পূর্ণ মনোযোগ রাখার মধ্যে।

২. গভর্ণরকে জানতে হবে যে সমাজের স্বল্পতুষ্ট ও স্বল্প আয়ের মানুষরা অন্যদের তুলনায় অধিকতর আস্থা ও বিশ্বাসের পাত্র।

৩. অসহায় মানুষদের চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করা, এটা গভর্ণরের উপর তাদের সর্বসম্মত অধিকার। আর তা পরিপূরণ করা একটি শরীয়তগত কর্তব্য।

৪. রাষ্ট্র বাইতুল মাল এবং যাকাতের ন্যায় অবশ্য পালনীয় আর্থিক কর্তব্যের আদলে যে তহবিল সংগ্রহ করে এবং এর মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক সামর্থ ও ভিত্তি গড়ে তোলে, তার প্রধানতম লক্ষ্য হচ্ছে সবকিছুর আগে জনগণের জীবনযাপনের অবস্থা সুষ্ঠু ও সুন্দর করা।

৫. দরিদ্রদের অবস্থা ভাল করার ক্ষেত্রে আপন ও পরের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না।

৬. সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির প্রতি অবহেলা গভর্ণরের খোদাদ্রোহিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার শামিল।

৭. রাষ্ট্রনায়কদের জন্য দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের অধিকার পরিপূরণের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ নেই। সুতরাং রাষ্ট্রের সমুদয় চেষ্টা ও প্রয়াস এ কাজেই নিয়োজিত হওয়া উচিত।

৮. বিপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনসমূহ পূরণে সরকারের উচিত তার একটি মূল, গুরুত্বপূর্ণ এবং খোদায়ী দায়িত্ব পালনার্থে তাদেরকে সন্ধান করে বের করা। এমন নয় যে তাদেরকে ভিক্ষার হাত পাতার লাঞ্ছনা ও হীনমন্যতার যন্ত্রণা সইতে হবে।

---

[১০]. বাকের সদর, BKwZmv‘bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪-৩২৫।

৯. অসহায় জনগোষ্ঠীর সেবাকার্যে খোদাভীরু ও বিনয়ী লোকদেরকে নিযুক্ত করতে হবে।

১০. শাসকদের পক্ষ থেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির অভাবসমূহ দূর করার উপর। অন্যথায় রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র সম্মুখে কোনই অজুহাত প্রদর্শন করতে পারবে না।

এখানে লক্ষণীয় যে, ইসলাম যে সামাজিক নিরাপত্তার মূলনীতিকে রাষ্ট্রের স্কন্ধে ন্যাস্ত করেছে, সেটা কেবল মুসলমান ও স্বজাতির জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সরকারের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠী তথা সকল নাগরিকের জন্য কাজ করা।

যদিও ইসলাম সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির অবস্থার উন্নয়নে কাজ করাকে নিজস্ব আকীদাগত ও অধিকার আইনের ভিত্তিতে আবশ্যক করেছে, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও তার অনুসারীদের প্রতিপালন ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের দিক থেকে উদাসীন থাকেনি। বরং এই খোদায়ী কর্তব্যটি পালনকে মানব-প্রেমের অনুভূতিকে উজ্জীবিত করা আর মানবতার প্রতি মহানুভবতা সৃষ্টির কারণ হিসাবে দেখেছে। এ প্রসঙ্গে বাকের সদর বলেন :

> ‘ইসলাম সর্বজনীন দায়িত্বপরায়নতাকে ইসলামের ভ্রাতৃত্বের মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত হিসাবে জানে, যাতে দেখাতে পারে যে পারস্পরিক সামাজিক দায়িত্ববোধের মূলনীতিটি শ্রেফ অতিরিক্ত আয়-উপার্জন থেকে কর আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রবর্তন করা হয়নি। বরং জ্ঞানগত দিক থেকে ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি থেকে উদ্‌গত। এ কথা থেকে পরিস্কার হয় যে, পারস্পরিক দায়বোধ সম্পর্কিত বিধি-নিয়মগুলো একই মানব সমাজে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক থেকে উৎসারিত, যা সম্পাদনের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যাস্ত। যে সমস্ত চাহিদা উপরোক্ত এই অধিকারের বলে পরিপূরণ হওয়া চাই, সেগুলো অর্থনৈতিক দিক থেকে অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক হিসাবে নির্ণীত হতে হবে।’[১১]

বাকের সদর অন্যত্র রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন:

> ‘ইসলাম রাষ্ট্রকে সর্বসাধারণ জনগণের জীবনোপকরণ পূর্ণরূপে সংস্থান করার দায়িত্ব আরোপ করেছে। রাষ্ট্র সচরাচর দুইটি ধাপে এই কর্তব্য পালন করে থাকে -
>
> c_g avc : অর্থনৈতিক ইউনিটসমূহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উপকারী ও কার্যকর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে, যাতে তারা কর্ম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়।
>
> wØZxq avc : এটা ঐ সময়ে, যখন ব্যতিক্রম পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকার কারণে সরাসরি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদিকে চালু করতে পারে না। তবে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন করার মাধ্যমে পুঁজির যোগান দিয়ে এবং পুঁজি-বিনিয়োগকারীদের অর্থের যোগান দিয়ে কর্মের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে।’[১২]

বাকের সদর মনে করেন রাষ্ট্রের আইনি দায়িত্বই হচ্ছে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন করা। তিনি বলেন :

> ‘ইসলামি সমাজ-সংস্থায় রাষ্ট্র হুকুম-বিধানের বাস্তবায়নকারী, ভাল কাজের প্রতি আদেশকারী, মন্দ কাজ থেকে নিষেধকারী এবং একইভাবে বিধি-বিধানের সঠিকরূপে বাস্তবায়নের দায়িত্ব বহনকারী। যারা ধর্মীয় আবশ্যকীয় কর্মসমূহ সম্পাদন এবং খোদায়ী কর্তব্যসমূহ পালনে অবাধ্য হবে, রাষ্ট্র তাদেরকে আইনের অনুসরণ করতে বাধ্য করবে।
>
> সুতরাং মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তদ্রূপ তাদেরকে জীবনের সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্তব্যসমূহ পালনে সক্ষম করে তোলাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের জীবনকে

---

[১১]. cv¸ ³, পৃ. ৩২৮।
[১২]. cv¸ ³, পৃ. ৩২০।

এমনভাবে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে যাতে এ বিষয়ে খোদায়ী চাওয়া অনুযায়ী দায়িত্ব সুসম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হয়।'[১৩]

বাকের সদরের সামাজিক নিরাপত্তা প্রশ্নে ইসলামে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের এ আলোচনা থেকে হয়ত এমনটা মনে হতে পারে যে, রাষ্ট্রের নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা এবং নাগরিকদের চাহিদাসমূহ পরিপূরণ করা শুধুমাত্র ইসলামি শাসনব্যবস্থার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নয়। বরং ধর্মীয়, অধর্মীয় নির্বিশেষে সকল শাসনব্যবস্থাই স্ব স্ব জাতির সামনে এভাবে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করে থাকে এবং তাদের অভাব-চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করাকে তাদের কার্যক্রমের অগ্রভাগে স্থান দিয়ে থাকে। কাজেই রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব পালন এবং জনসেবায় আত্ম-নিয়োগ করা ইসলামি শাসনব্যবস্থার জন্য কোন আলাদা বিশেষত্ব হিসাবে গণ্য হয় না।

– বাকের সদর এ ধরনের সংশয় দূর করে দিয়ে বলেন, প্রকৃতপক্ষে যদি ইসলামি শিক্ষার গভীরে মনোযোগ নিবদ্ধ করা যায় তাহলে আমরা এমন এক শিক্ষার সাথে পরিচিত হতে পারবো যা সম্ভবত অন্য কোন অর্থনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে বা অন্য কোন শাসনতান্ত্রিক ইশতেহারে পাওয়া যাবে না। কারণ এ ধরনের পরম বিধি-বিধান ও শিক্ষা, মানবিক মর্যাদা ও মূল্যবোধের পরম মূল্যায়নের মধ্যেই প্রকাশ পায়। অন্য কথায় বলা যায়, রাষ্ট্রের কর্তা-ব্যক্তিদের হাতে রাজস্বের একটি অংশ বরাদ্দ দিয়ে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রাণে বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত করাই শুধু ইসলামের লক্ষ্য নয়। বরং ইসলাম 'সামাজিক ভারসাম্যতা'র মূলনীতিকে উপস্থাপনের মাধ্যমে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দেয়। যদি এ ব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে শুধু যে আর কোন অভাবী-ই থাকবে না, তা নয়; বরং জাতির ভেতরে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যকার গভীর ফাটলও দূর হয়ে যাবে। তখন সকলে ভারসাম্যশীল ও সুখি-সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারবে এবং এরূপ এক সুন্দর সমাজে জীবনযাপন করতে পেরে পরিতৃপ্তি লাভ করবে।

সুতরাং প্রথমে জানতে হবে যে, জীবনের চাহিদা ও জীবনমান বলতে কী বোঝায়? অতঃপর ইসলামে যে সমস্ত উপায়-পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, সেগুলোর পর্যালোচনা করতে হবে। দারিদ্র্য বলতে কি এটা বোঝানো হয় যে, ব্যক্তি এমনকি নিজের ও পরিবারের পেটের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারবে না? এর উত্তরে বাকের সদর লিখেন :

> 'সামাজিক ভারসাম্যতা বলতে উদ্দেশ্য জীবনমানের দিক থেকে সমাজের ব্যক্তিদের সাম্যতা; আয়-উপার্জনের দিক থেকে নয়। আর জীবনমান বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে পুঁজি এমন পরিমাণে জনগণের নাগালে থাকা যাতে তারা কাল-পাত্রের দাবি মোতাবিক জীবনধারণের সুবিধাদি ভোগ করতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, সমাজের সকল সদস্যের জন্য একই জীবনমান নিশ্চিত হওয়া।'[১৪]

অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, এখানে একসমান জীবনমান বলতে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, পরিমাণগত দিক দিয়ে সমাজের ব্যক্তিদের আয়-উপার্জনের কোন পার্থক্য থাকবে না। কেননা এমনটা কখনই সম্ভবপর নয়। অর্থনীতির প্রাথমিক মূলনীতি, সম্পদ উৎপাদন ও আয়-উপার্জনের বিবেচনায় যেমন তা সম্ভব নয়, তদ্রূপ সর্বস্তরের জনগণের অর্থনৈতিক কর্ম-তৎপরতার ব্যাপারে প্রণোদনামূলক নিয়ামকসমূহের বিবেচনায়ও সম্ভব নয়। এজন্য বাকের সদর স্পষ্টতই বলেন :

> '...অবশ্য ঐ জীবনমানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তর চোখে পড়বে। কিন্তু এই পার্থক্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে প্রচণ্ড শ্রেণি-বৈষম্য বিদ্যমান, তা থেকে ভিন্ন। কারণ এটা হচ্ছে স্তরের পার্থক্য, মৌলিক পার্থক্য নয়। তদ্রূপ বলতে হয়

---

[১৩]. CV¸ 3 |

[১৪]. CV¸ 3, পৃ. ৩৩১।

যে, সামষ্টিক সাম্যতা সীমিত কোন সময়কাল ও সুনির্দিষ্ট কোন ক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র নয়। বরং এটা হচ্ছে একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, যে লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন বৈধ পন্থায় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সম্ভবত এটাই অপচয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। কেননা, এ কাজের মাধ্যমে একদিক থেকে ধনীক শ্রেণির অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসিতা রোধ করা হয়, অপরদিকে নিম্নবিত্ত শ্রেণির জীবনমান বৃদ্ধি ঘটানো হয়। এভাবে বিভিন্ন স্তরের জীবনকে একে অপরের নিকটবর্তী করা সম্ভব হয় এবং শ্রেণি বৈষম্যের ফারাক কমে আসে। ফলে অবশেষে সর্বসাধারণ জনগণকে একই জীবনমানে উপনীত করে, তবে পুঁজিবাদের অবস্থা ও প্রচণ্ড বৈপরীত্য থেকে দূরে রাখে।'[১৫]

তিনি সামাজিক সাম্যতার মূলনীতির ব্যাখ্যা করার পর মুসলমানদের জীবনাচার থেকে কিছু বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপন করেন। এরূপই একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি হচ্ছে, ইমাম মূসা ইবনে জাফর যাকাতের অর্থের উপর গভর্ণরের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেন :

'উলুল আমর (তথা রাষ্ট্রের অভিভাবক) অর্থ-সম্পদকে গ্রহণ করে এবং অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ মাফিক উক্ত সম্পদকে আট ভাগে বিভক্ত করে। এর কিছু অংশ দরিদ্রদের জন্য, কিছু অংশ নিঃস্বদের জন্য ... এবং একে এমনভাবে বণ্টন করতে হবে যেন হকদাররা অনায়াসে সাধারণ দৃষ্টিতে অভাবমুক্ত হয়ে যায়। এরপর যদি কিছু অতিরিক্ত থেকে যায়, তাহলে সেটা রাষ্ট্রের অভিভাবকের হাতে অবশিষ্ট রয়ে যাবে।

যদি ঐ সহায়-সম্পদ সকল দলের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট না হয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অভিভাবকের উচিত তার হাতে থাকা অন্য সম্পদ থেকে একাজে ভর্তুকি প্রদান করা, যাতে লোকদের অভাব দূর হয়ে যায়। এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে অভাবমুক্ত করাই পরম লক্ষ্য। আর রাষ্ট্রের অভিভাবক কিম্বা রাষ্ট্রের উপরেই এই লক্ষ্য পূরণের দায়িত্ব ন্যাস্ত।'[১৬]

বাকের সদর মনে করেন, ইসলামি রাষ্ট্র এবং এর কার্যক্রমের প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিকাশ ও ন্যায়বিচারের বিস্তার ঘটানো। অন্যান্য অর্থনৈতিক মতাদর্শে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে বস্তুগত সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। বস্তুগত সমৃদ্ধি বাস্তবায়ন লাভ করে নিরাপত্তা ও প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য দরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা, সাংগঠনিক তৎপরতা, যথাযথ নীতিপন্থা এবং তা বাস্তবায়নের তাগিদ। তাই ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেতে এ সমস্ত খাতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এখানে 'অর্থনীতি' উদ্দেশ্য নয়, বরং আরও উন্নততর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের একটি 'মাধ্যম' বিশেষ। ইসলামি অর্থনীতি একটি 'আধ্যাত্মিক অর্থনীতি' হিসাবে পরিগণিত হয়। স্বভাবতঃই এর উপায়-উপকরণও নৈতিকতা বিবর্জিত নয় এবং কোনক্রমেই তা আধ্যাত্মিক বিকাশের অন্তরায় হতে পারে না। অথচ অন্যান্য অর্থনৈতিক মতবাদে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন মুখ্য নয়। বরং সেখানে বস্তুগত সমৃদ্ধি ও উন্নয়নই প্রধান গুরুত্বের বিষয়।[১৭]

একারণে ইসলামি অর্থনীতিতে যখনই কোন কল্যাণমূলক পদক্ষেপের প্রসঙ্গ আসে তখন মনে রাখতে হবে যে, এ কল্যাণ হতে হবে আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সাপেক্ষে। বস্তুজাগতিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নও অর্থবহ হয়ে ওঠে যদি সেটা আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যম হয়। ইসলাম যদি বস্তুজাগতিক সমৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে

---

[১৫]. C\/¸ ³ |

[১৬]. C\/¸ ³, খ. ২ পৃ. ৩৩২।

[১৭]. দ্র. 0*The only objective of the State in the neo-classical framework, is the maximisation of social welfare. The State will intervene only to correct market inefficiencies which impinge on social welfare. The State thus has no other objectives which might conflict with the objective of maximising the welfare of its constituents viz. the consumers."*-Ajit Karnik, "Theories of State Intervention", University of Mumbai, Working Paper 96/11, May 189S, p.9.

থাকে সেটা একারণে যে বস্তুজাগতিক সমৃদ্ধি হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এ প্রসঙ্গে বাকের সদর একটি রেওয়ায়াতের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, 'যার জীবিকা নেই তার পরকালও নেই।'[১৮] মানবের পূর্ণতা অর্জনের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অতীব প্রয়োজন। আর আধ্যাত্মিক নৈকট্য ও পরকালীন সৌভাগ্যই হচ্ছে মানবের পূর্ণতা। তবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা খোদায়ী নৈকট্য লাভের জন্য ভূমিকা ও মাধ্যম স্বরূপ। খোদ্ সামাজিক ন্যায়বিচারও মূল্যবান বিষয় এবং মানুষের পূর্ণতার একটি পর্যায় হিসাবে পরিগণিত হয়।[১৯]

3. ivó I m¤ú‡`i gvwjKvbv cm½

বাকের সদরের মতে, প্রাকৃতিক অ-প্রাকৃতিক সকল সম্পদ ইসলামি রাষ্ট্রের হাতে থাকে। ইসলামি ফিকাহ্র নির্দেশনা মোতাবিক মৃত ভূমিসমূহ, বনভূমি, পানি, খনিজ, নদ-নদী ও হ্রদ, পাহাড়-পর্বত, সাগর, তৃণভূমি, ঝোপ-ঝাড়, চারণভূমি, ওয়ারিশবিহীন সম্পদ, যেসব সম্পদের সুনির্দিষ্ট মালিক থাকে না ইত্যাদি- সব প্রকার সম্পদেরই এখ্তিয়ার ইসলামি রাষ্ট্র এবং তার অভিভাবকের হাতে ন্যাস্ত থাকে। এছাড়াও বিস্তীর্ণ মৃত ভূমি যা জিহাদের মাধ্যমে হস্তগত হয় এবং যা মুসলমানদের সাধারণ মালিকানায় থাকে বটে, কিন্তু সেটা রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থাকে।[২০] কিন্তু অন্যান্য মতাদর্শে সম্পদের মালিকানা প্রধানত ব্যক্তি খাতের অধীন থাকে। তাদের মূলনীতি হচ্ছে এসমস্ত সম্পদ কারও মালিকানাভুক্ত নয়। যে কেউ তা হস্তগত করবে তারই মালিকানায় চলে আসবে। শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের উৎসাবলি, বরং সমস্ত সম্পদই পাবলিক সেক্টরের অধীনে থাকে।

কিন্তু ইসলামি ফিকাহ্ মতে সম্পদরাজি একত্ববাদ, নবুওয়াত, ইমামত এবং খোদায়ী খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে এবং সম্পদ প্রথম থেকেই বিশেষ মালিকানাধীন থাকে। আর অন্যদের জন্য যেটা সম্ভবপর হয় সেটা হচ্ছে অনুমতি সাপেক্ষে এবং সবার স্বার্থ বিবেচনায় রেখে তা ব্যবহার তথা ভোগদখল। ইসলামি ফিকাহ্ মতে, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ব্যতিক্রম রূপে নয়, বরং প্রাথমিক মূলনীতি হিসাবে গ্রহণীয়। কিন্তু পুঁজিবাদী মতাদর্শে রাষ্ট্রীয় মালিকানা রূপ নেয় বিশেষ ও ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ব্যক্তি মালিকানার জন্য কোন অবকাশই রাখে না। বাকির সদর এক্ষেত্রে দাবি করেন যে, ইসলামি রাষ্ট্র বিভিন্ন সম্পদের উৎস হস্তগত রেখে ব্যক্তিখাতের মালিকানার সংরক্ষণকারী হয় এবং একই সাথে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান করে থাকে।[২১] ইসলামি রাষ্ট্র ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি পরিপূরক হিসাবে বিশেষ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজের উপর তুলে নেয়। রাষ্ট্র যেহেতু সিংহভাগ সম্পদ নিজের হাতে রাখে, একারণে সে অর্থনীতির প্রধানতম কর্তব্য অর্থাৎ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজটি বাস্তবায়নের প্রয়াস চালায়। অর্থনৈতিক অভাব দারিদ্র্য বিমোচন, ধর্মীয় সংস্কৃতির বিস্তার, নববি সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করণ, দ্বীনের স্লোগানসমূহ বাস্তবায়ন, খোদায়ী দণ্ডবিধি জারি করণ এবং জনগণের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ব্যক্তিখাতের উপর নজরদারি করে থাকে এবং বিধি-বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণের অধিকারকে নির্ধারণ করে দেয়।

---

[১৮].দ্র. রেযা হাকিমি, wKZve Av j -nvqvZ, তেহরান : মাকতাবু নাশর আল-সাকাফাতু আল-ইসলামিয়্যা, ১৪১০ হি. খ. ৩, পৃ. ২২৫।

[১৯]. মূর্তাজা মোতাহ্হারি, †gvKv Ïvg-B Rvnvbwewb-G Bmjvwg, কোম : দাফতারে ইন্তেশারাতে ইসলামি, ১৩৬২ সৌ. সন. পৃ. ১৬২।

[২০]. দ্র. বাকের সদর, BKwZmv ̒bv, কোম : মাকতাবু আল-আ'লাম আল-ইসলামি, ১৪১৭ হি. পৃ. ৪১৯।

[২১]. দ্র. cv¸ 3, পৃ. ২৮১।

ফিকাহ্ শাস্ত্র এবং ধর্মীয় অন্যান্য সূত্রের মধ্যে জনগণের অধিকার সুনির্দ্দিষ্ট করে নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। কাজেই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধানতম ভূমিকা হচ্ছে সেগুলো নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়নের উপর নজরদারি করা। সুতরাং এখানে রাষ্ট্রের উপস্থিতি বাজার ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য নয়। কারণ ইসলামি অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের তৎপরতাই আসল নয়। বরং মূলনীতি অনুযায়ী উভয়খাতের কার্যক্রম চালানোই আসল। আর প্রত্যেকেরই প্রথম থেকে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তথ্যের বিস্তার ছাড়াও বিনিময় তথা লেনদেনের খরচ হ্রাসেরও কারণ হয়ে থাকে।

ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয় যাতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমাজের কর্ণধারদের জন্য সংযমশীলতা ও পরহেযগারিতা অবশ্য প্রয়োজন। জনগণের সাথে তাদের সহানুভূতিশীল হওয়া, বিপদ আপদকে সহ্য করা, তাদের সাথে উঠাবসা করা এবং জনগণের জীবনধারণের স্তরেই নিজে জীবনধারণ করা শরীয়তের নির্দেশ। ইসলামি শাসকের একজন সেবক হওয়াই সর্বাগ্রে মূলনীতি।

4. e¨w³Lv‡Zi Dci bRi‘wi

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যক্তিখাতের জন্য নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে এবং কেবল কর আদায়ের মাধ্যমে নিজের খরচাদি মিটিয়ে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিখাতের কর্মকাণ্ডের উপর কোন প্রকার নজরদারি থাকে না। নয়া ধ্রুপদী রাষ্ট্রও যে সব খাতে পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজার গড়ে ওঠে তার উপর কোন নজরদারি রাখে না এবং শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই যে খাতে, সেই পরিসরের মধ্যেই দায়িত্ব নিয়ে থাকে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থনীতির জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিখাত হয় মোটেও থাকে না, আর থাকলেও রাষ্ট্রের পরিকল্পনা মেনে নিয়ে চলতে হয়। আর জাতীয় সরকার ব্যক্তিখাতের সমর্থনকারী ও সহায়তাকারী হয়, তবে সেটা উন্নয়নের মহা পরিকল্পনার আওতায়।

পক্ষান্তরে ইসলামি অর্থনীতিতে রাষ্ট্র স্বীয় বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন সামাজিক নিরাপত্তা, বিভিন্ন কর ও শুল্ক আদায়, নীতিপন্থা প্রণয়ন ইত্যাদি বাস্তবায়ন ছাড়াও বাজার অবস্থার উপরও নজরদারি করে থাকে। আবার যখন মূল্যব্যবস্থায় অনিয়ম দেখা দেয় এবং চাঁদাবাজি ইত্যাদি কারণে অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে তখন রাষ্ট্র নজরদারি এবং মূল্য নির্ধারণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় মূল্যের অবস্থাকে সংশোধন করে দেয়, যাতে সমাজ ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্র ব্যক্তিখাতের উপর নজরদারি ও নীতিপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে সহযোগিতা করে এবং ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের পথকে মসৃণ করে তোলে। অতএব প্রথমত ব্যক্তিখাত যেসব ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে না সেগুলো সম্পাদন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিখাতে কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। তৃতীয়ত ব্যক্তিখাতের বিচ্যুতিগুলোকে নজরদারির মাধ্যমে সংশোধন ও সংস্কার করে দেয়। চতুর্থত ক্ষেত্রবিশেষে মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থায়ও হস্তক্ষেপ করে থাকে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা। তাছাড়া ইসলামি সরকার ও জনগণের মধ্যে হিতাকাঙ্ক্ষী ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কারণে রাষ্ট্র যখন তার কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন জনগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সরকারের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে এবং ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে থাকে।

5. bxwZcš’v cYqb

সব প্রকার রাষ্ট্রই অর্থনীতির জন্য নীতিপন্থা প্রণয়ন করে থাকে। অবশ্য লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সব রাষ্ট্রেরই অন্যতম লক্ষ্য থাকে।

ইসলামি রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ জোরারোপ করে থাকে। আর এসব লক্ষ্য পূরণকল্পে রাষ্ট্র সম্ভাব্য সকল উপায় ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে থাকে।

বাকের সদরের মতে, প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যেমন পানি, বাতাস, মাটি ইত্যাদি ইসলামি রাষ্ট্রের দখলে থাকার সুবাদে রাষ্ট্র কোন ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত হস্তক্ষেপে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। যেহেতু রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত জনস্বার্থ বাস্তবায়নের ভিত্তিতে গৃহীত হয়, আর পরিবেশ রক্ষা করা হচ্ছে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি অন্যতম প্রধান বিষয়, একারণে যেসব পণ্য উৎপাদনে পরিবেশ দূষণ ঘটে, সেগুলো উৎপাদনে রাষ্ট্র বিভিন্ন উপায়ে বাধা প্রদান করতে পারে। পরিবেশ রক্ষা কেবল বর্তমান প্রয়োজনের জন্যই অত্যাবশ্যক নয়। বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের জন্যও পরিবেশ রক্ষা করা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা তাদের অধিকার বটে। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ রাষ্ট্রের অধীনে থাকার ফলে এ পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি আরও সহজতর হয়। এই নীতির আলোকে জনগণের জন্য পরিবেশ দূষণ নিষিদ্ধ করার ব্যাখ্যাটি অপেক্ষাকৃত কম সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনুরূপভাবে আরও কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোর ব্যবহার ইসলামি ফিকাহ্‌র আলোকে সর্বজনীনভাবে বৈধ করা হয়েছে ঠিকই, তদুপরি সেগুলোর ব্যবহার পদ্ধতির উপর নজরদারি করার ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যাস্ত থাকে। কাজেই যদি এগুলোর ব্যক্তিগত ব্যবহারজনিত কারণে অন্যদের জন্য ব্যবহারে বাধা সৃষ্টি করে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র এরূপ বাড়াবাড়ি মাত্রার ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে পারে।[২২]

6. Av‡qi cbteÈb

প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার আয় সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কর আরোপ করে থাকে এবং সরকারের খরচাদির পরিমাণ অনুপাতে করের ভিত্তি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। করসমূহ সরকারের খরচাদি পূরণ করার পাশাপাশি আয় পুনঃবন্টনের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের একটি উপযুক্ত মাধ্যমও বটে। ইসলামি রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীল করের সুযোগ হাতে রেখে যথাযথ আয় নিশ্চিত করা ছাড়াও যথাযথ নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। অবশ্য এখানে আয় পুনঃবন্টনের একমাত্র পথ 'কর' আদায় করা এবং প্রয়োজনীয় খাতে তা ব্যয় করা নয়। ইসলামি রাষ্ট্র মালিকানার সুবিধা কাজে লাগিয়ে কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ স্বীয় এখ্‌তিয়ারে রেখে আয় পুনঃবন্টনের সমস্যাবলি সমাধানে এসব সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। অথবা তা বিক্রয় কিংবা ইজারা প্রদান করতে পারে। অর্থাৎ আয় পুনঃবন্টনের একাধিক উপায় ইসলামি রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে, যা অন্য পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রসমূহের হাতে থাকে না।

বাকের সদর মনে করেন, আয়ের পুনঃবন্টনের প্রক্রিয়া ছাড়াও বিভিন্ন আয়ভিত্তিক শ্রেণির মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পেলে তা টেকসই সামাজিক ব্যবস্থার জন্য সহায়ক হয়। অর্থনৈতিক মতবাদগুলোতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের লক্ষ্য হিসাবে মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের পর এই শ্রেণিব্যবধান হ্রাসের বিষয়টি আলোচনায় নেই। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র সরকারি সম্পদ ব্যবহারে এমনভাবে পরিকল্পনা করে যাতে সামাজিক ভারসাম্যের কোন ক্ষতি না হয়।[২৩]

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাকের সদরের দৃষ্টিতে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটা অনস্বীকার্য। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রাধান্য প্রদান এবং আধ্যাত্মিক চেতনা থেকে জাগতিক চেতনাকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে একটি সংখ্যালঘুর ডিক্টেটরশীপে পরিণত হয়। কিন্তু দ্বীনি রাষ্ট্র ব্যবস্থায়

---

[২২]. দ্র. বাকের সদর, Av‡j Bmjvg BqvK' Av‡j nvqvZ, কোম : মারকায আল আবহাছ ওয়া আল দিরাসাত আল সাদর, ১৪২১ হি. পৃ. ৭৭।
[২৩]. দ্রঃ ________ , BKwZmv'bv, কোম : মাকতাবু আল-আ'লাম আল-ইসলামি, ১৪১৭ হি. পৃ. ৬৭৩।

রাজনীতিকদের আসল চেতনা বস্তুগত স্বার্থ নয়। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবস্থা ও তাদের নির্বাচন পদ্ধতি, ন্যায়বিচারের সার্বভৌম বাস্তবায়ন এবং গোটা সরকারকে নজরদারি করা হয় ধর্মীয় ও জন প্রতিনিধি তথা আধ্যাত্মিক নেতা কর্তৃক। রাষ্ট্রের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের মধ্যে ন্যায়পরয়ানত ও ধর্মভীরুতা, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার অকৃত্রিম স্পৃহা, পরহেযগারিতা এবং জনসেবার বাসনা ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকৃতই জনগণের সেবকে পরিণত হয়। তখন জনগণের ভোট তাদের কাছে আমানত হিসাবে মর্যাদা পায় এবং জনগণের সেবা করা সবচেয়ে বড় ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়। বিশ্বাসী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পরিচালকগণ পরকাল এবং আধ্যাত্মিকতা অর্জনের লক্ষ্যে জনগণের সেবায় কোন ত্রুটি রাখে না। কেননা একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে আমানতকে রক্ষা করা, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সঠিকভাবে পালন করা এবং সর্ব-সাধারণের সমস্যাবলির সমাধান করা। ভোটাররা ভোট প্রদানের সময় খোদায়ী আমানতকে রাজনীতিকদের হাতে তুলে দেয়। আর নির্বাচিতরা এই আমানতকে রক্ষা করে। একারণে ইসলামি রাষ্ট্র জনগণের অগ্রাধিকারের খাতগুলোকে উত্তমভাবে নির্ণয় করে থাকে। আর রাষ্ট্রীয় কর্তাব্যক্তিরা জনগণের স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উপর অগ্রগণ্য করে থাকে।

এভাবে বাকের সদরের অর্থনৈতিক মতাদর্শের বিচারে অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের তুলনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যায় :

১. মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানতম লক্ষ্য এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

২. ব্যক্তি মুনাফার চেতনা যদিও ইসলামে গ্রহণীয়, তথাপি আধ্যাত্মিকতা অর্জনকল্পে এর মূল্য রয়েছে। অথচ অন্যান্য মতাদর্শে ব্যক্তি মুনাফা হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধানতম লক্ষ্য।

৩. রাষ্ট্রীয় কর্তাব্যক্তিদের ব্যাপারে অন্যান্য অর্থনৈতিক মতবাদের সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের মতবাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

৪. ইসলামি রাষ্ট্রের এখ্‌তিয়ারে ব্যাপক সম্পদ থাকার সুবাদে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বহুলাংশে সহজতর হয়।

৫. অর্থনীতির অঙ্গনে ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি রাষ্ট্রের উপস্থিত থাকার মূলনীতি হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রের আরেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

৬. ইসলামি রাষ্ট্র ব্যক্তিখাতের কর্মকাণ্ডের পরিপূরক হিসাবে ব্যক্তিখাতকে সহযোগিতা করে এবং স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে এ খাতের উপর নজরদারিও করে থাকে।

৭. ইসলামি রাষ্ট্র কর্তৃক নেতিবাচক প্রভাব বিশিষ্ট (যেমন পরিবেশ দুষণকারী) ব্যক্তি খাতের পণ্য উৎপাদনকে বিরত করার সম্ভাবনা অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি।

৮. ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে কিছু কিছু মিলও রয়েছে। কিন্তু তাই বলে ইসলামি রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক কিংবা অন্য কোন প্রকারভুক্ত করা যাবে না। বরং ইসলামি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় স্বতন্ত্র এবং একে স্বতন্ত্রভাবেই উত্থাপন করতে হবে।

৯. ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অধিকতর কার্যকারিতার দাবি কোন অসত্য দাবি নয়।

7. ÔAvj-gvš ÍvKvZj dvivMÕ ZË Ges A_bxwZi h‡Mvc‡hvwMZv

ইসলামি অর্থনীতিতে বিতরণতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের মালিকানার একক অধিকার রাষ্ট্রের। ফলে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার সকল দিকের ওপরই ইসলামি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বাকের সদরের মতে প্রাকৃতিক সম্পদ বা প্রাথমিক দ্রব্য-সামগ্রীর মালিকই দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রীর একক মালিক। মূলত ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার সমাজে সম্পদের প্রবাহ নির্ধারণ ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করতে পারে। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে গোটা সমাজকে উপকৃত করার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের পূর্ণমাত্রায় উন্নয়নের নীতিমালা প্রণয়ন করা।

এ অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামি রাষ্ট্র সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পদসমূহ বিতরণের অধিকার রাখে। আর সর্বাধিক উৎপাদনের ফলে জনগণের সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।

সমাজের ন্যূনতম অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা এবং জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বা মার্কস্‌বাদী রাষ্ট্রের সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের সাদৃশ্য নেই। কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের বিষয়টি বাজারের ওঠা-নামার ওপর ছেড়ে দেয়। অপরদিকে মার্কস্‌বাদ রাষ্ট্র কর্তৃক সকল প্রকার অথনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয় এবং একই সাথে সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার প্রদান করে। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর দৃষ্টি রাখা ও প্রয়োজন মাফিক নিয়ন্ত্রণ করা।

অতএব, দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইসলাম, রাষ্ট্রকে অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের স্থিতিস্থাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে। ফলে উদ্ভূত যে কোন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ইসলামি রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করতে পারে। বাকের সদর শরীয়তের কড়াকড়িবিহীন ও অপেক্ষাকৃত ছাড়ের ক্ষেত্রগুলোকে ÔAvj-gvš ÍvKvZj dvivMÕ (المنطقة الفراغ) তত্ত্বের আওতায় ব্যাখ্যা করেছেন। এটা হচ্ছে এমন সব ক্ষেত্র, যেখানে একজন বিজ্ঞ ফকিহ্ BRwZnw' মূলনীতির ভিত্তিতে সমাধান প্রদান করতে পারেন। বাকের সদর এ তত্ত্বের তিনটি প্রেক্ষিত বর্ণনা করেছেন :

c_gZ : ÔAvj-gvš ÍvKvZj dvivMÕ প্রসঙ্গে আলোচনা ব্যতীত ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শের মূল্য পরিপূর্ণ হয় না এবং ইসলামের অর্থনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়। শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে প্রথমেই যে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে 'আল-মান্তাকাতুল ফারাগ' তথা মুক্তাঞ্চলের পরিসরের মূল্যায়ন ও তুলনা করে দেখতে হবে।

wØZxqZ : রাসুলুল্লাহ (সা.) একজন শাসক ও 'ফলুল আমর' (রাষ্ট্রের কর্ণধার) হিসাবে আল-মান্তাকাতুল ফারাগ'-এর আওতায় যে সমস্ত বিধি-বিধান জারি করেছেন, সেগুলো স্বভাবতই চিরস্থায়ী কোন হুকুম বিধান নয়। কারণ, সেগুলো তিনি ঐশী বার্তাবাহক তথা নবি হিসাবে সামগ্রিক বিধি-বিধান রূপে বর্ণনা করেননি। বরং তিনি মুসলমানদের উলুল আম্‌র ছিলেন এবং সেই হিসাবে জারি করেছেন। অতএব সেগুলো ইসলামি অর্থনৈতিক মতাদর্শের চিরায়ত অংশ হিসাবে পরিগণিত নয়।

ZZxqZ : এই ভিত্তিতে ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীল। যতক্ষণ না ইসলামি সমাজের শাসনকর্তা, রাসুলুল্লাহ সা. (নবি হিসাবে নয় বরং মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে) যে সমস্ত এখ্‌তিয়ারের অধিকারী ছিলেন, সে সমস্ত এখ্‌তিয়ারের অধিকারী না থাকবে, ততক্ষণ

অর্থনৈতিক মতাদর্শের Avj-gvšÍvKvZj dvivM (তথা বিধি-বিধানে প্রদত্ত ছাড়গুলো)-কে ইসলামি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ যেভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে, ঠিক সেভাবে শর্তাদি অনুসারে পূরণ করা যাবে না। ফলে ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শের সমুদয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ফলদায়ক পরিকল্পনা সত্ত্বেও এর পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।[২৪]

ÔAvj-gvšÍvKvZj dvivMÕ ZË Avm‡j wK?

এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটে একটি বিতর্কের জায়গা থেকে। বিতর্কটি হল, পৃথিবীতে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। পরিবেশ, জীবন, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সবই সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তন হয়ে যায়। তাহলে ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবনব্যবস্থার বিধান নিয়ে এসেছে, তা কীভাবে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুগোপযোগী সমাধান প্রদান করবে? এ বিতর্ক থেকে কারো কারো অভিমত হচ্ছে ধর্ম সেকেল হয়ে গেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মের কোন কার্যকারিতা নেই। কারণ বর্তমান যুগের ব্যাপকতর পরিসরে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ জীবনের নতুন নতুন সমস্যাবলির সমাধান দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্ম নিতান্তই অপারগ। এ বিতর্কটি কখনো কখনো ‘ইসলাম ও যুগ-জিজ্ঞাসা’ শিরোনামে আবার কখনো কখনো ‘ইসলামের স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল মূলনীতিসমূহ’ শিরোনামে আলোচনা করা হয়ে থাকে। তবে কেউ কেউ আবার ‘ইসলামের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সক্ষমতা’ শিরোনামটি ব্যবহার করে থাকে, যা এক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ শিরোনাম বটে। কারণ এ ধরনের শিরোনাম দ্বারা ইসলামকে খাটো করা হয়।

বাকের সদর এ আলোচনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন তাঁর Avj-gvšÍvKvZj wdvivM তত্ত্বের অবতারণার মাধ্যমে। ÔAvj-gvšÍvKvZj dvivMÕ হচ্ছে শরয়ি ভাষ্যসমূহ সম্পর্কে একটি পরিভাষা, নবুওয়াতের যুগের সমাজের বহির্জাগতিক বাস্তবতা তথা ঘটনাবলি সম্পর্কিত কোন পরিভাষা নয়। প্রতীয়মান হয় যে, Avj-gvšÍvKvZj dvivM তত্ত্ব এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিরসনে এ তত্ত্ব থেকে যেসব ব্যবহারিক সমাধান পাওয়া যায়, সেগুলো বিবেচনায় না নিয়ে ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ পর্যালোচনা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ যদি ঐ আইনসম্মত ছাড়ের সুবিধাটি যথাযথ ব্যবহার করা যায়, তাহলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উত্তমরূপে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। তখন একটি কালোত্তীর্ণ ধর্ম হিসাবে ইসলামি বিধানাবলির নমনীয়তার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ দিকটির প্রতি কম দৃষ্টি দেওয়ার অর্থই হবে আইন প্রণয়ণের সুবিধাটির অসম্পূর্ণ ব্যবহার। অর্থাৎ আইনি ব্যবস্থার পরিসংখ্যানগত উপাদানসমূহের দিকে মনোযোগ দেওয়া আর প্রগতিশীল উপাদানসমূহ হতে উদাসীন হওয়া একই কথার নামান্তর হবে। এমর্মে বাকের সদরের তত্ত্বের সার-সংক্ষেপ হল :

GK. ইসলাম তার বিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় একটি অঞ্চলকে (ফরজ ও হারাম) এই দুই আবশ্যিক হুকুমের আওতার বাইরে রেখে দিয়েছে।[২৫] (অর্থাৎ ছাড় দেওয়া খাতসসমূহ)

‘B. এই অঞ্চলকে আবশ্যিক হুকুমের বাইরে রাখাটা কোন কাক্তালীয় কিংবা বিস্মৃতি বা বে-খেয়ালিপনা বশত নয়। অথবা ইসলামি বিধান প্রণয়ন ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি কিংবা ঘাটতি বশত নয়।[২৬] বরং এটা জ্ঞাতসারে এবং

২৪.cÖv¸³, পৃ. ৩৮১।

২৫. দ্র. বাকের সদর, BKwZmv‘bv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২১।

২৬. দ্র. cÖv¸³, পৃ. ৭২৫।

প্রজ্ঞার ভিত্তিতে করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম এ সুযোগের মাধ্যমে নিজের বিধান প্রণয়নে নমনীয় ব্যবস্থাকে চিরন্তনতা প্রদান করেছে এবং এটাকে সর্বকালের এবং সর্বস্থানের উপযোগী ব্যবস্থার রূপ প্রদান করতে চেয়েছে।[২৭]

iiZb. ইসলাম এই মুক্ত অঞ্চলটিকে উলুল আমর তথা রাষ্ট্রের কর্ণধারের হাতে ন্যাস্ত করেছে, যাতে তিনি একে কল্যাণ বিবেচনায় এবং যুগ ও কালের চাহিদা মাফিক শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূরণ করেন।[২৮]

ইসলামি শরীয়ত কিছু চিরায়ত ও অপরিবর্তনীয় আইন নির্ধারণ করেছে যা সর্বাবস্থায় উপকারী ও অনুপেক্ষণীয়। যেমন 'ব্যবসা বৈধ আর সুদ নিষিদ্ধ' হওয়া। পাশাপাশি আইনি প্রয়োজন পূরণের একটি বিরাট ক্ষেত্রকে ন্যাস্ত করেছে রাষ্ট্রের উপর। যাতে রাষ্ট্র চিরায়ত শরয়ি বিধানসমূহকে দৃষ্টিতে রেখে এবং সামাজিক কল্যাণ বিচার করে এ প্রয়োজন পূরণে ব্রতী হয়।

রাষ্ট্রের এই এখ্তিয়ারের মধ্যে শুধু যে স্থায়ী আইন ও বিধানসমূহের প্রয়োগ ও কার্যক্রমই অন্তর্ভুক্ত হয়, তা নয়, বরং মুক্তাঞ্চলকে পূরণ করাও এর মধ্যে পড়ে। রাষ্ট্র একদিকে শরীয়তের প্রবর্তিত স্থায়ী আইনের বাস্তবায়নকারী। অপরদিকে ঐ সমস্ত বিধি-বিধানের প্রণয়নকারী যা সামাজিক অপরিহার্যতা এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। রাষ্ট্র আইনের প্রয়োগের ব্যাপারে সুদি লেনদেন থেকে শুরু করে জমি-জমার অবৈধ হস্তগতকরণ সবকিছুরই প্রতিহত করে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইনসমূহকে সরাসরি বাস্তবায়ন করে থাকে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একইভাবে কাল-পাত্রের পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন বিধি-বিধান প্রণয়ন করার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ÔAvj-gvšÍvKvZj dvivMÕ সুবিধার আওতায় সক্রিয় থাকবে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করবে।

একটা প্রশ্ন প্রায়শঃই উত্থাপিত হয় তা হচ্ছে, ইসলামের আইন প্রণয়ন ব্যবস্থায় কি নমনীয়তার সুযোগ আছে? যদি থাকে তাহলে সেটা কীভাবে?

বাকের সদর এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, নিঃসন্দেহে একটি মতাদর্শ তথা জীবনব্যবস্থা তখনই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নের যোগ্য থাকে, যখন তার মধ্যে নমনীয়তা থাকে। অর্থাৎ তা স্বীয় পরিচয়সত্তা, অস্তিত্ব, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মূলনীতিসমূহ বজায় রেখেই নতুন নতুন সংকট, সমস্যা ও চাহিদার সমাধান প্রদানে সক্ষম থাকে।

কিন্তু কীভাবে এই সমাধান পেশ করবে, সে বিষয়ে মত প্রকাশ করা হচ্ছে ইসলামের স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল বিতর্কের সবচেয়ে জ্ঞানগর্ভমূলক, ভাগ্যনির্ধারণী এবং সংবেদনশীল অধ্যায়। এ প্রসঙ্গে মতবাদসমূহ পরস্পর বিপরীত। যদিও এক্ষেত্রে সকলেই Djj Avgi তথা রাষ্ট্রের কর্ণধারের ভূমিকাকে একটি সর্বসম্মত বিষয় হিসাবে মতামত প্রকাশ করেছেন।[২৯] এসব মতামতগুলোর বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় যে এক্ষেত্রে কলাকৌশল নির্ধারণে কয়েকটি বিষয় বিবেচ্য:

প্রথমত, শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে ছাড় দেওয়া (অর্থাৎ হস্তক্ষেপ না করা) একারণে যে এটা মানুষদের পার্থিব বিষয়াবলির আওতাধীন। কাজেই এটাকে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপরেই সোপর্দ করা হয়েছে।

---

[২৭]. দ্র. C\/¸ ³, পৃ. ৭২২।
[২৮]. দ্র. C\/¸ ³, পৃ. ৭২৬।
[২৯]. এ ব্যাপারে সমসাময়িক মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদর ছাড়াও আল্লামা তাবাতাবাঈ, ইমাম খোমেইনি প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এ ধরনের মত হচ্ছে সেই সমাধানের উপায় দ্বারা প্রভাবিত, যা পাশ্চাত্যে ধর্মকে রাজনীতি ও অর্থনীতি থেকে আলাদা করার চেতনা থেকে উদ্ভূত। আর মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে এ মতকে তারাই উত্থাপন করে থাকে, যারা পাশ্চাত্য ভিত্তি ও মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে চিন্তা করে এবং সেই চিন্তারই মুখপাত্র হয়।

তবে বাকের সদরের নিকট যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় সেটা হল, ইসলাম কীভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিধি-বিধান প্রণয়নে তার মূলনীতিসমূহকে সর্বযুগের জন্য উপযোগী করেছে? অথচ মানব জাতি প্রত্যেক যুগেই যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলো সমাধানকল্পে কীভাবে নতুন নতুন উপায় অন্বেষণ করে থাকে?[৩০]

যেমনটা প্রকাশমান, এক্ষেত্রে বাকের সদর তিনটি বিষয়কে সামনে রেখেছেন :

c_gZ, মানুষ সব যুগেই নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়।

wØZxqZ, নতুন নতুন সমস্যা সমাধানে নতুন নতুন উপায় ও পন্থা প্রয়োজন হয়।

ZZxqZ, ইসলাম কীভাবে স্বীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শ তথা ব্যবস্থাকে প্রবর্তন করেছে যে যুগে যুগে উদ্ভূত সমস্যাবলির সমাধান প্রদান করতে পারবে?

অতঃপর তিনি এর চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করতে গিয়ে দুইটি প্রধানতম উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে, ইসলাম প্রয়োজনীয় সকল দিকের পরিমাত্রা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করেছে। অপরটি হচ্ছে ইসলাম Djj Avgi তথা রাষ্ট্রের কর্ণধারকে হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রদান করেছে, যাতে তিনি এসমস্ত দিক, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত হয়ে প্রত্যেক যুগের জন্য প্রয়োজনীয় সমাধান বের করেন। অবশ্য এখানে Djj Avgi বলতে প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্র প্রধান উদ্দেশ্য নয়। ইসলামি রাষ্ট্রে Djj Avgi অন্য সবকিছুর আগে একজন আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু, যিনি নবি ও ইমামের স্থলাভিষিক্ত। বাকের সদর Djj Avgi এর যোগ্যতা হিসাবে দুইটি গুণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। একটি হচ্ছে তাঁর ইলমি যোগ্যতা এবং কুরআন, হাদীস ও ইসলামি শরীয়ত গভীরভাবে উপলব্ধি করে তারই আলোকে যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান বের করতে পারার বিশেষ পারদর্শিতা। এজন্য ইলমে উসুল এবং ফিকাহ শাস্ত্রের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ইজতিহাদের পথ ধরে অগ্রসর হতে হয় এবং বাকের সদর তাঁর Avj-nvjvKvZ wd Dmj Avj Øxb (الحلقات فى اصول الدين) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। অপরটি হচ্ছে Djj Avgi এর ব্যক্তিগত আত্মিক পরিশুদ্ধি (তাক্ওয়া) এবং ন্যায়পরায়নতা। সমকালীন ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তনকারী ইমাম খোমেইনি এখানে আরও একটি যোগ্যতার কথা যোগ করেছেন। সেটা হচ্ছে Djj Avgiকে তার যুগ জামানার স্থান-কাল-পাত্রের সঠিক জ্ঞান রাখতে হবে।[৩১]

বাকের সদর আইন প্রণয়নের এ ক্ষেত্রটিকে আইনদাতা (আল্লাহ্)-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি বাস্তবভিত্তিক 'ফারাগ' তথা ছাড় বলে গণ্য করেছেন। এ ছাড়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক তৎপরতা ও উৎপাদন উপকরণাদির বিকাশ নিশ্চিতকরণ। এ ছাড়ের ফলেই ইসলামি রাষ্ট্রের কর্ণধার জনগণের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ এবং অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির উপযোগী যে কোন নতুন বিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করতে পারেন।

---

[৩০] দ্র, cv¸ ³, পৃ. ৭২২, ৭২৩।

[৩১]. দ্র. রুহুল্লাহ মুসাভী খোমেইনী, Zvnixi Avj Dwmjv, 1g LÐ, "তাকলীদ ও বেলায়াতে ফকীহ" অধ্যায়।

অন্যকথায় ইসলামি রাষ্ট্র স্বীয় সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। ইসলামি রাষ্ট্র চাইলে যেমন অর্থনীতির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তেমনি চাইলে উন্মুক্ত উদ্যোগের সুযোগ দিতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গতিধারা নির্ধারণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সর্বোত্তম বিকল্প নীতিমালা প্রণয়নের জন্য অবশ্যই অর্থনীতিবিদগণ ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত গ্রহণ করতে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, ইসলামের মৌলিক বিতরণ ব্যবস্থাক উপেক্ষা করা যাবে না।

8. A_‰bwZK Dbqb cm‡½ AgZ¨ †mb I ev‡Ki m‘‡ii ‘wóf½i mvhR¨

বাকের সদরের মতে অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামি সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের পূর্ণতম ব্যবহার।[৩২] আল্লাহ্ মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রকৃতিতে অফুরন্ত সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণার্থে এসব নেয়ামত ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এমর্মে বাকের সদর বলেন :

> 'আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ইসলাম অর্থনৈতিক সম্পদের উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় সদ্ব্যবহারকে সমাজের জন্য একটি লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছে।'[৩৩]

এ অর্থনৈতিক লক্ষ্যটি ইসলাম ও পুঁজিবাদ উভয় মতাদর্শের দ্বারাই স্বীকৃত। তবে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য উভয়ের পন্থা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নীতিকে বাধাগ্রস্ত করে এমন যে কোন উৎপাদন বৃদ্ধিকারী বা সম্পদ বৃদ্ধিকারী পন্থাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। তবে ইসলাম সেই সব পন্থাকে প্রত্যাখ্যান করে যা তার (অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের) বিতরণ তত্ত্ব ও ন্যায়বিচার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

ইতোপূর্বে যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলাম ব্যক্তিদেরকে সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত লক্ষ্যের পেছনে ধাবিত হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং এভাবে এই অন্তর্বর্তীকালীন (পার্থিব) অস্তিত্বের সাময়িক সুবিধার গুরুত্বকে কমিয়ে দিয়েছে। বাকের সদর অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে একটি পুণ্যবান সমাজের লক্ষ্যরূপে গণ্য করেন যদিও ব্যক্তির জন্য লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করেন না। কারণ আল্লাহ্ তো ধরণীর বুকে যা কিছু আছে তার সব কিছুকে এবং বেহেশতকেও মানুষের সেবার নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন।

'উন্নয়ন' কথাটি শ্রবণ করার সাথে সাথে আমাদের মস্তিস্ক চালিত হয় অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক উন্নয়নের দিকে। এককথায় বস্তুগত উন্নয়ন। কিন্তু বাকের সদর এবং অমর্ত্য সেন উন্নয়নকে বস্তু থেকে মানবে অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। বাকের সদর মনে করেন, মানবের আত্মিক উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন। অপরদিকে অমর্ত্য সেনও অনুরূপ চিন্তা পোষণ করতঃ স্বাধীনতাকে মানব উন্নয়নের প্রধান সূচক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

বাকের সদরের মতে, ইসলাম শুধু পার্থিব সুবিধা অর্জনকে মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে গণ্য করার মানসিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ তা মানুষকে অন্যদের ওপর জুলুম ও শোষণ চালাতে প্রবৃত্ত করে। এর পরিবর্তে ইসলাম মানুষকে কৃচ্ছতা অবলম্বনে উৎসাহিত করে। কেননা, কৃচ্ছতা হচ্ছে এমন একটি মূল্যবোধ যা মানুষকে বস্তুগত সম্পদকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে গণ্য না করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বস্তুত কৃচ্ছতা

---

[৩২]. দ্র. বাকের সদর, BKwZmv‘bv, বৈরুত : দার আল-তাআরুফ, ১৯৮২, পৃ. ৬৪৯।
[৩৩]. cÖv¸³, পৃ. ৬৫০।

হচ্ছে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া যার সহায়তায় সে তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তার লক্ষ্যসমূহকে আল্লাহ্‌র দিকে পরিচালিত করে। অবশ্য কৃচ্ছতা ঈমানদার জনগণের সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য নয়, বরং তা ব্যক্তির জন্যে কাঙ্ক্ষিত গুণ হিসাবে পরিগণিত।

এ প্রসঙ্গে নোবলে বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সাথে বাকের সদরের অভিমতের সাজুয্য খুঁজে পাওয়া যায়। অমর্ত্য সেন-এর বিপ্লবী লেখনীসমূহ 'উন্নয়ন' সম্পর্কিত সর্ব-সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে এক গভীর তাত্ত্বিক ও ব্যাবহরিক বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন যে, আমাদের জীবনধারণ পদ্ধতি শুধুই আয়-রোজগার ও সম্পদের ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয়। বরং তা পরিমাপ করতে হবে আমাদের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার মাত্রা অনুপাতে। জাতিসংঘ তার উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহে এ নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদের চিন্তা ও প্রজ্ঞা থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। এ ভারতীয় অর্থনীতিবিদ তাঁর অর্থনীতি ও মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ করে দারিদ্র্য, অসাম্যতা এবং দুর্ভিক্ষের উপর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুবাদে ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

উন্নয়ন বিষয়ে অমর্ত্য সেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উন্নয়নে মানব সক্ষমতার গুরুত্বের উপর জোরারোপ। এই কারণে তিনি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টার পরিবর্তে ব্যক্তিদের সত্তাগত যোগ্যতা এবং তা বিকশিত করার উপর বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Development as Freedom* এর মধ্যে উন্নয়নকে মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতার বিস্তারের নামান্তর বলে মনে করেন, যে স্বাধীনতা জনগণ ভোগ করে থাকে। তাঁর মতে, উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বাধীনতার বিরুদ্ধ মূল-উপাদানসমূহের অপনোদন। এরূপ কয়েকটি উপাদান হচ্ছে যেমন দারিদ্র্য, স্বৈরচারিতা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা, সুসংবদ্ধ সামাজিক বঞ্চনা, সর্বজনীন সুবিধাদি সৃষ্টিতে ঔদাসীন্য এবং দমনপীড়ন মূলক আপোষহীনতা কিম্বা অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।[34]

প্রথমদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে জাতীয় বড় দাগের অর্থনৈতিক সূচকে অর্থাৎ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি, জাতীয় আয় ইত্যাদিকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা হত। ১৯৬০ সাল থেকে আয় বন্টন ও সামাজিক ন্যায়বিচারও উন্নয়নের সূচকে যোগ হয়। ১৯৯০ সালে অমর্ত্য সেন 'মানবিক উন্নয়ন'র প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। বর্তমানে জাতিসংঘ থেকে প্রত্যেক দেশের উন্নয়ন মূল্যায়নে যে *Human Development Index* প্রকাশিত হয়, সেখানে মানুষের গড় আয়ু, শিক্ষার হার, নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যদিও অমর্ত্য সেনের Development as Freedom তত্ত্বটি একটি পদ্ধতিগত পন্থায় উত্থাপন করা হয়েছে এবং উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনায় নতুন মাত্রা যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু বাকের সদর ইসলামি অর্থনীতিতে অনেক আগেই এই ধারণার গোড়াপত্তন করে যান। এখানে উন্নয়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও হাতিয়ার হিসাবে মানুষের 'কর্তা' ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দেশে দেশে চাহিদা পূরণের নিমিত্তে উন্নয়নের একটি সর্বব্যাপী কর্মকৌশল প্রণয়নকল্পে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি খুবই উপযুক্ত। কেননা, এই দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন খাতে একটি সর্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি হওয়ার পাশাপাশি উপরোক্ত খাতসমূহে মানুষদের জন্য স্বাধীনতার সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টির ছায়াতলেই উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যাওয়ার পথ নিহিত বলে মনে করে থাকে। একারণে অমর্ত্য সেন বিশ্বাস করেন বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতাকে অর্জন ব্যতীত অন্য কিছুই উন্নয়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় (যার মধ্যে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক সুযোগসমূহ, রাজনৈতিক স্বাধীনতাসমূহ

[34]. *"Human development, as an approach, is concerned with what I take to be the basic development idea: namely, advancing the richness of human life, rather than the richness of the economy in which human beings live, which is only a part of it".* Amartya Sen : *Development as Freedom*

ইত্যাদি অর্জন করাও অন্তর্ভুক্ত)। অন্যকথায় বলা যায়, 'উন্নয়ন' হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতার নির্যাসস্বরূপ। উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে Unfreedom তথা অ-স্বাধীনতাসমূহকে বিলোপ এবং মানুষদের নির্বাচনের আওতাকে বৃদ্ধি।[৩৫]

অমর্ত্য সেনের দৃষ্টিতে Unfreedom কথাটি একটি চাবিকাঠিতুল্য অভিধা। এ কথাটির অর্থ হচ্ছে উন্নয়ন তখনই বাস্তবতা লাভ করে যখন স্বাধীনতা-হীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। হোক সেটা চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতা আর হোক পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। প্রকৃতপক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষরা একাধারে উন্নয়নের হাতিয়ার আবার উন্নয়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বটে।

উন্নয়ন সম্পর্কে অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের মধ্যে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ্য পার্থক্যটি হচ্ছে এই যে, আগের মতবাদগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপরেই বেশি বেশি গুরুত্বারোপ করতো। আর সেখানে যদি আয়ের পুনঃবণ্টন, মানব উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করাও হত, সেটা একারণে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এদের উপকরণসর্বস্ব ভূমিকা ছিল। অথচ স্বাধীনতাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি অর্থনীতি ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে স্বাধীনতার আর পাঁচটি অক্ষের মধ্যে একটি অক্ষ বলে মনে করে থাকে।

অমর্ত্য সেনের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা হয়েছে এবং যে কোন ধরনের বঞ্চনা ও সীমাবদ্ধতা, যা মানব মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে, তা দূর করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একারণে এই কাঠামোর মধ্যে দারিদ্র্য, অসাম্য এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধার অভাবের মূল্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। বরং উন্নয়নের প্রতি এই ধারার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে একটি বন্ধুসুলভ, মানবিক এবং নৈতিকতা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এখানে এ কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচুর্য এবং জীবনযাত্রার উন্নত মান, মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে সাহায্য করে। অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-ক্লেশ মানবজাতির এ অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ক ও প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। বাকের সদর মনে করেন, মানব জাতি যতই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে ততই প্রকৃতি মানুষের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে থাকবে। সামাজিক সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিদর্শন। অন্যদিকে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতার বাহ্যিক প্রকাশ বা উপসর্গ হচ্ছে সামাজিক অবিচার। আর এর পরিণতিতে অর্থনৈতিক সম্পদসমূহ ও উৎপাদনশীলতা ধ্বংস হয়ে যায়, সেই সাথে মানুষের সামাজিক অস্তিত্বেও বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়।[৩৬]

ইসলাম স্বীয় ধর্মীয় বিধি-বিধানের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির সামাজিক তৎপরতার গতি বৃদ্ধি করে। প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের উন্নয়নে অব্যাহত মানবিক প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে এর ওপর কারো মালিকানাকে ইসলাম বৈধতা দেয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই মানবিক শ্রম প্রদান ব্যতীত যে কোন ধরনের উপার্জনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ কারণেই উপার্জনের কাজে অর্থনৈতিক পুঁজির ব্যবহারকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। বৈধভাবে পুঁজি ব্যবহারের একমাত্র পথ হচ্ছে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণপূর্বক উৎপাদনে বিনিয়োগ করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নকার্যে পুঁজির ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলাম অর্থ সঞ্চিত করে রাখাকে নিষিদ্ধ করেছে এবং উৎপাদন

---

৩৫. *"Development consists of the removal of various types of unfreedoms that leave people with little choice and little opportunity of exercising their reasoned agency. The removal of substantial unfreedoms, it is argued here, is constitutive of development."*— Amartya Sen, *Development as Freedom*.

৩৬. বাকের সদর, gKwÏgv wd Avj-Zvdmxi, কুয়েত : আল-দিইর আল-ইসলামিয়্যা, ১৯৮২, পৃ. ১০৪-১০৭।

প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়নি এমন যে কোন সম্পদের ওপর একটি বার্ষিক কর (যাকাত) আরোপ করে এ সম্পদকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার ব্যবস্থা করেছে। অধিকন্তু ইসলাম যে কোন ধরনের মূল্যহীন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যেমন জুয়া, যাদু, ভেল্কিবাজি ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করেছে।

এছাড়া ইসলাম মুসলমানদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল অঙ্গনের বিকাশ সাধন এবং বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ থেকে সর্বাধিক কল্যাণ লাভের জন্য তা ব্যবহারের লক্ষ্যে যে কোন কার্যকর উৎপাদন-উপকরণ উদ্ভাবন ও তা কাজে লাগানোকে আবশ্যক বলে গণ্য করেছে। এভাবে ইসলাম তার সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের অগ্রগতি এবং আল্লাহ্ অভিমুখে তার পূর্ণতা অর্জনের পথে অবস্থিত সকল বাধা-বিপত্তিগুলোকে অপসারণ করে ফেলে। এজন্য বাকের সদরের অর্থনৈতিক রূপরেখায় খিলাফত (তথা প্রতিনিধিত্ব) এবং শাহাদাত (তথা সাক্ষ্য)কে যুগপৎভাবে রাষ্ট্রের মধ্যে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়। অর্থাৎ তিনি সরকার, জাতি আর নেতৃত্বকে একে অপর থেকে পৃথক করেন না। একারণে বাকের সদরের 'রাষ্ট্র' মতবাদ তিন ভাগে উপস্থাপিত হয়। যথা : অর্থনৈতিক বিষয়াবলিতে মানুষের প্রতিনিধিত্ব, অপরিবর্তনীয় উপাদান আর পরিবর্তনশীল উপাদানের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের বিশালায়তন দায়িত্ব ও কর্তব্য।

Aóg Aa¨vq

ev‡Ki m‘‡ii KwZcq ‘wóf½i mgv‡jvPbv

Aóg Aa¨vq

ev‡Ki m`‡ii KwZcq `wóf½i mgv‡jvPbv

নিঃসন্দেহে বাকের সদরের আর্থ-সামাজিক দর্শন, একত্ববাদী সমাজ ও ইসলামি অর্থনীতির পরিচয়সত্তার ব্যাখ্যায় অনবদ্য অবদান রেখেছে। যদিও ইসলামি চিন্তা-দর্শনের পুরোটাই একত্ববাদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় এবং এটা একটা সর্বজনবিদিত বিষয়। কিন্তু এই একত্ববাদী জীবন দর্শনের বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সকল মুসলিম মনীষী অভিন্ন পথে চলেন নি। বিশেষ করে সমাজ ও অর্থনৈতিক চিন্তার জগতে মুসলিম মনীষীদের উপস্থিতি যেমন মুষ্টিমেয় সংখ্যক, তদ্রূপ তাঁদের চিন্তার পরিসরও বহুলাংশে সীমাবদ্ধ। সমাজ কিম্বা অর্থনীতির মত ক্ষেত্র প্রায়শঃ থেকে গেছে যার বাইরে। সেই বিবেচনায় বাকের সদর হচ্ছেন সমসাময়িক মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তিনি শুধু ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তা-দর্শনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন নি। তাঁর dvjmvdvZbv, gRZvgvDbv এবং BKwZmv`bv শিরোনামের মৌলিক গ্রন্থগুলোই এ দাবির সপক্ষে বড় প্রমাণ। তাঁর আর্থ-সামাজিক দর্শন যেভাবে ব্যাপক পরিসরে ও মৌলিক পন্থায় উপস্থাপিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটা এ ক্ষেত্রে চিন্তা ও গবেষণার একটি শুভ সূচনা ছিল। সাম্প্রতিক কালের প্রায় সকল মুসলিম অর্থনীতিবিদই কোন না কোন ভাবে বাকের সদরের চিন্তা ও দর্শন থেকে প্রভাব গ্রহণ করেছেন। একারণে কোন অতিরঞ্জন না করেই বলা যায় যে, এই মুসলিম মনীষীর অর্থনৈতিক দর্শন, ইসলামি অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। তবে এ কথার অর্থ এটা নয় যে এই প্রাজ্ঞ মনীষীর চিন্তাধারার মধ্যে কোন প্রশ্নের সুযোগ নেই। বিগত প্রায় চার দশক কাল ধরে মুসলিম চিন্তাবিদগণ তাঁর চিন্তাধারার উপর পর্যালোচনা অব্যাহত রেখেছেন এবং স্ব স্ব মতামত দ্বারা এ ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছেন। এ অধ্যায়ে বাকের সদরের আর্থ-সামাজিক দর্শনকে কেন্দ্র করে কতিপয় উল্লেখযোগ্য সমস্যা ও সমালোচনা উপস্থাপন করা হল ঃ

১. বাকের সদর বিশ্বাস করেন যে, ডকট্রিনগত আলোচনাসমূহ সামাজিক ন্যায়বিচারের এক সুনির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য সম্পর্কিত হতে হবে, এমনভাবে যে যদি কোন আলোচনা সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কিত না থাকে তাহলে তা ডকট্রিনের নীতিমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

mgv‡jvPbv :

এ বক্তব্যের মধ্যে তিনটি আপত্তি উত্থাপন করা যায় -

প্রথমত, এ বৈশিষ্ট্যটি শুধুমাত্র ইসলামি অর্থনৈতিক ডকট্রিনের জন্য স্বতন্ত্র, সকল অর্থনৈতিক ডকট্রিনের বেলায় নয়। উদাহরণস্বরূপ পুঁজিবাদী ডকট্রিন, যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সেখানে বলতে গেলে নিরর্থক একটি বিষয়, বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই সেখানে মূল লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। অতএব এভাবে বলা যায় না যে অর্থনৈতিক ডকট্রিনের মধ্যে শুধুমাত্র সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনগুলোই অন্তর্ভুক্ত হয়। আর প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন যদি ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কিত না হয়, তাহলে তা ডকট্রিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্যকথায় বলা যায় যে, যদি একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচারের চেয়েও বড় লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয় এমনভাবে যে সামাজিক ন্যায়বিচার হবে উদ্দেশ্য, তবে মাধ্যমস্বরূপ, আর প্রবৃদ্ধিই হবে আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কিংবা ন্যায়বিচার ও প্রবৃদ্ধি দুইটি স্বতন্ত্র ও একে অপরের সমান্তরালে উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য হয়, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার ডকট্রিনাল চিন্তাধারাসমূহের একে অপর থেকে পৃথকীকরণের মানদণ্ড হতে পারে না। অবশ্য ইসলামি অর্থব্যবস্থায়, যেখানে বাকের সদরের দর্শনের ভিত্তিতে

উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি আসল ও পরম উদ্দেশ্য নয়, বরং মাধ্যমস্বরূপ[১] এবং যথাযথ বিতরণের শর্তসাপেক্ষ উৎপাদন হতে হবে[২], সেক্ষেত্রে ডকট্রিনাল আলোচনায় এই মানদণ্ড সঠিক আছে।

দ্বিতীয়ত, ন্যায়বিচারের পাশাপাশি অর্থনীতির ভেতর বাহির উভয় দিকের নিরাপত্তার বিষয়টিও এখানে আলোচ্য বিষয়। হতে পারে যে অর্থনৈতিক ডকট্রিনের কিছু কিছু নিয়মের দর্শন হচ্ছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা; অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নয়। একারণে সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খলের নিয়মসমূহের মধ্যে কোন একটি নিয়ম হয়ত নিরাপত্তার নির্দিষ্ট একটি তাৎপর্যের সাথে সম্পর্কিত, ন্যায়বিচারের তাৎপর্যের সাথে নয়। সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে ডকট্রিনের নিয়মসমূহের মধ্যে একটি নিয়ম হিসাবে গণ্য করব না- তার কোন কারণ নেই।

তৃতীয়ত, এ কথা সঠিক যে ইসলামি অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমান্তরালে কোন স্বতন্ত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তা মাধ্যমস্বরূপ এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের পরম্পরায় একটি উদ্দেশ্য হিসাবে ইসলামে গ্রহণীয়। একারণে বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়পরতার সাথে সম্পর্কিত নিয়মসমূহ প্রবৃদ্ধির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। যদিও বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার পর্যায়ে যদি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাহলে ন্যায়বিচারই অগ্রগণ্য হবে।

ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, ডকট্রিনাল আলোচনায় শুধুমাত্র সামাজিক ন্যায়বিচার কিংবা প্রচলিত পরিভাষায় যাকে বলা হয় অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারকে মানদণ্ড হিসাবে নির্ধারণ না করে 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য'কে মানদণ্ড হিসাবে নির্ধারণ করাই উত্তম। সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে বলতে পারি যে অর্থনৈতিক জীবন সুশৃঙ্খলের নিয়মসমূহের মধ্যে যে কোন নিয়ম, যা অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত থাকবে, তা অর্থনৈতিক ডকট্রিনের নীতিমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হবে।

২. বাকের সদর স্পষ্টত বলেছেন যে, অর্থনৈতিক সমস্যাবলি জুলুম ও নেয়ামতের কুফ্রি থেকে উদ্ভুত। তিনি জুলুম বলতে বুঝিয়েছেন 'মন্দ বিতরণ' এবং নেয়ামতের কুফরি বলতে বুঝিয়েছেন 'প্রকৃতি থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে গাফিলতি'।

mgv‡jvPbv :

নেয়ামতের কুফরি'র এ ধরনের ব্যাখ্যা এটাই নির্দেশ করে যে, তিনি কুফরি জন্ম নেওয়ার প্রশ্নে ভোগের সীমাকে বিবেচনায় নেন নি। অথচ নেয়ামতের কুফরি'র সবচাইতে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে নেয়ামতকে সঠিকভাবে ভোগ না করা। আর অর্থনৈতিক সমস্যাবলির কারণসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে বিলাসিতা, অপচয় এবং বিনষ্ট করা। একারণে ইসলামে সঠিকভাবে নেয়ামত ভোগ করা এবং ভোগের গরজ ও সীমা সম্পর্কে বিবিধ হুকুম বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

হয়ত এখানে বাকের সদরের পক্ষ থেকে এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করা হবে যে, ভোগ সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না। একারণে অর্থনৈতিক ডকট্রিনে এ নিয়ে আলোচনা হয় না।

কিন্তু এর উত্তরে বলতে পারি যে, আমরা ধরেই নিলাম যে কথা সঠিক। অর্থাৎ ভোগ সম্পর্কিত আলোচনা সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্ক রাখে না। সেক্ষেত্রে সমস্যা হল এটা যে ইসলামের অর্থনৈতিক ডকট্রিনের সংজ্ঞায়

---

১. দ্র.বাকের সদর, BK\Zmv' bv, বৈরুত : আল-মাজমা আল ইলমি লি আল শহীদ আল-সদর, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০৮ হি. পৃ. ৬৭২-৬৯৯।
২. দ্র. cv¸3, পৃ. ৬৭৭-৬৭৯।

‘সামাজিক ন্যায়বিচারের চিন্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার’ শর্তটি আনা সঠিক নয়। কারণ, সঠিকভাবে ভোগ না করা অর্থনৈতিক সমস্যার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ বটে এবং প্রত্যেক অর্থনৈতিক মতবাদেরই ভোগকে সুশৃঙ্খলাপূর্ণ করার জন্য কিছু মূলনীতি পেশ করতে হবে। তাছাড়া উৎপাদনের ন্যায় ভোগও ন্যায়বিচারের চিন্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কেননা, উৎপাদনের ন্যায় ভোগও মানবিক দিক সম্পন্ন এবং মানুষের চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য এবং এ কাজ সম্পর্কে তার মূল্যায়ন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। আর এ বিষয়গুলোও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে তার ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

৩. বাকের সদর স্পষ্টত বলেন যে ইসলামি অর্থনৈতিক ডকট্রিনের দুইটা ভাগ রয়েছে। একটি হল চিরায়ত ও অপরিবর্তনীয় ভাগ এবং অপরটি হল পরিবর্তনশীল ভাগ। চিরায়ত ভাগটি শরীয়তের সরাসরি বিধি-বিধান দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। আর এর অপরিবর্তনশীল ভাগটি ÔAvj-gvšÍvKvZj dviviMÕ তথা মুক্ত অঞ্চলের সুবিধার আওতায় পূরণ করা হয়, যা Djj Avgi তথা রাষ্ট্রের কর্ণধার কর্তৃক স্থায়ী মূলনীতিসমূহের আলোকে প্রণীত হয়ে থাকে।[৩]

mgv‡jvPbv :

এ কথার তাৎপর্য দাঁড়ায় ইসলামের অর্থনৈতিক ডকট্রিন স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল- এই দুই ধরনের নিয়মাবলির অধিকারী। অথচ নিয়ম পরিবর্তনশীল হতে পারে না। যে জিনিসটি সময়ের অবস্থার সাথে পরিবর্তন হয়ে যায় সেটা নিয়ম নয়, বরং এসব নিয়মের প্রয়োগ। অন্যকথায়, অর্থনৈতিক বিধি-বিধান ও সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন কল্পনীয়। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনকে সুশৃঙ্খল করার নিয়মপন্থায় পরিবর্তন কল্পনীয় নয়। আর এই কারণেই বাকের সদর Avj-gvšÍvKvZj dviviM তত্ত্বকে হুকুম-বিধানের পরিসরেই উত্থাপন করেন, সামগ্রিক নিয়ম-কানুনের পরিসরে নয়। যে সমস্ত নিয়ম ডকট্রিনগত নিয়ম রূপে সিদ্ধান্ত করা হয়, সেগুলোর কোনটাই পরিবর্তনশীল নিয়ম নয়। অনেক ইসলামি অর্থনীতিবিদও বাকের সদরের পরে ডকট্রিনকে চিরায়ত ও স্থায়ী মূলনীতি তথা ভিত্তি রূপে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

এ সমস্ত আপত্তির ভিত্তিতে ইসলামের অর্থনৈতিক ডকট্রিনকে এভাবে সংজ্ঞা দেয়াই উত্তম : “ইসলামের অর্থনৈতিক ডকট্রিন হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিরসনকল্পে উৎপাদন, বিতরণ এবং ভোগ- এ তিন দিকেই অর্থনৈতিক সম্পর্ককে সুশৃঙ্খল করার স্থায়ী নিয়মসমূহের সমাহার।”

৪. বাকের সদর মনে করেন, উৎপাদন কার্যক্রমে ব্যক্তিরা প্রকৃতি থেকে উপকার লাভ করে এবং সামাজিক ব্যবস্থায় (যা তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে নির্ধারণ করে) এই মুনাফাকে বণ্টন করে থাকে।[৪]

mgv‡jvPbv:

কিন্তু বাকের সদরের এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাকের সদর মনে করেন একটি সমাজব্যবস্থায় মানুষদের মাঝে সম্পর্ক শুধুমাত্র মুনাফা বিতরণ তথা বণ্টনের জন্যই হয়, উৎপাদনের জন্য নয়। এ বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, উৎপাদন সবসময় ব্যক্তিক রূপে সম্পাদিত হয় না। মানুষ বিতরণের মত মুনাফা উৎপাদনের জন্যও একে অপরের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে থাকে। অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে মানুষের একে অপরের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয় কিছু চুক্তির আদলে যেমন জমির বর্গা, সেচ সুবিধা, ভাগীসাথী, মুদারাবা, ইজারা ইত্যাদি। এসব চুক্তিতে একদিকে

---

৩. দ্র. cv¸³, পৃ. ৪০০-৪০২।

৪. দ্র.cv¸³, পৃ. ৩৩৫।

যেমন উৎপাদনে চুক্তির পক্ষসমূহের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে যায়, তদ্রূপ উপার্জিত মুনাফার ভাগ-বণ্টনের বিষয়টিও পরিস্কার থাকে। কাজেই এভাবে বিতরণ থেকে উৎপাদনকে পৃথক করা সঠিক নয়। লোকেরা উৎপাদন ও বিতরণের দৃশ্যপটে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। আর এসব সম্পর্ক ও যোগাযোগ হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থারই একটি অংশ।

৫. বাকের সদরের দৃষ্টিতে ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে বুঝায় মানুষদের মাঝে একগুচ্ছ অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যা অর্থনৈতিক চাহিদাসমূহ পূরণ (কিম্বা অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ দূর করার) লক্ষ্যে সুসংবদ্ধ হয়ে থাকে এবং যা মানুষের চাহিদা মাফিক অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল এ দুই ভাগে বিভক্ত।

mgv‡jvPbv :

এ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারেও দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। এ সংজ্ঞাটি (যা বাকের সদরের বক্তব্য থেকে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং একইভাবে সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত ইতোপূর্বে বর্ণিত তাঁর বক্তব্যের অপরিহার্য অনুষঙ্গ বটে) হচ্ছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থার একটি অংশ হিসাবে শুধুমাত্র মানুষদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক তথা যোগাযোগই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু সহায় সম্পদের সাথে মানুষদের সম্পর্ক এর অন্তর্ভুক্ত হয় না, হোক সেটা উৎপাদনের পরিসরে আর হোক ভোগের পরিসরে।

অন্যকথায়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক দুই প্রকারের। এক প্রকার সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক। আরেক প্রকার সম্পর্ক হচ্ছে সহায় সম্পদের সাথে মানুষদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক। আবার সহায় সম্পদের সাথে মানুষদের যে সম্পর্ক হয়, সেটা হয় উৎপাদনের উদ্দেশ্যে, নয়ত ভোগের উদ্দেশ্যে। বাকের সদরের বক্তব্যের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে এটা যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেবলমাত্র প্রথম প্রকারের অর্থাৎ মানুষের সাথে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পকর্টি বিন্যস্ত হবে। আর দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ সহায় সম্পদের সাথে বিশেষ করে ভোগের ক্ষেত্রে মানুষদের সম্পর্কের বিন্যাস অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতার বাইরে অবস্থিত। অথচ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা থেকে এরূপ সম্পর্ক বাইরে চলে যাওয়ার কোন কারণ নেই। প্রতীয়মান হচ্ছে যে ডকট্রিন ও সিস্টেমের সংজ্ঞায়নে ভোগের পরিসর থেকে বাকের সদরের এ বে-খেয়ালীপনার মূল কারণ হল তিনি অর্থনৈতিক সমস্যার মূল নিহিত দেখতে পান উৎপাদন ও বিতরণ খাতের মধ্যে।

৬. বাকের সদর মনে করেন, ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুইটি ভাগ রয়েছে- চিরায়ত তথা অপরিবর্তনীয় ভাগ এবং পরিবর্তনশীল ভাগ।

mgv‡jvPbv :

এ বক্তব্যটি তাঁর নিজ তত্ত্বের ভিত্তিতে ÔAvj-gvš Í vKvZj dvivMÕ এর সম্পর্কে সঠিক আছে। কিন্তু এ তত্ত্বটি এর স্ব-স্থানে বিতর্কের কবলে পড়েছে।[৫] তাই ইতোপূর্বে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা এরূপে দেওয়াই উত্তম যে, 'ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে বুঝায় উৎপাদন, বিতরণ এবং ভোগ- এ তিন দিকের একগুচ্ছ অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যা ইসলামের অর্থনৈতিক ডকট্রিনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিরসনকল্পে সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করেছে।'

[৫]. সাইয়্যেদ হাসান মীর মুয়েজ্জী, "ছুবাতে শারিয়াত ওয়া মুদিরিয়্যাতে দেগারগুনি হায়ে ইকতিসাদি-ইজতিমায়ী", ÔBKwZmv'-G Bmjwg M‡elYvgjK ^ÎgwmK', তেহরান, ২য় বর্ষ, ১৩৮১ ফার্সী সন, সংখ্যা ৮, পৃ. ৯৫।

ইসলামে এ সম্পর্কসমূহ শরয়ি হুকুম-বিধান এবং দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এসমস্ত হুকুম বিধান এবং শিক্ষা থেকে যেটা নিঃসৃত হয় তা হচ্ছে স্থির ও স্থায়ী সম্পর্কসমূহ। আর এসব সম্পর্ক বাস্তবায়নে পরিবর্তন যেটা ঘটে, তা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানাদি, গঠনতন্ত্র ও অনুরূপ জিনিসের মধ্যে ঘটে থাকে। অর্থাৎ বলা যায় যে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুইটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে তাত্ত্বিক দিক, যা ইসলামি হুকুম-বিধান ও শিক্ষা থেকে প্রতিপন্ন হয় এবং যা অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। আরেকটি হচ্ছে ঐ তাত্ত্বিক দিকেরই বাস্তবায়ন হওয়া রূপ, যা কাল-পাত্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

৭. বাকের সদরের দৃষ্টিতে ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান তখনই সত্যিকারভাবে উৎপত্তি লাভ করবে যখন দুইটি পূর্বশর্ত বাস্তবে বিদ্যমান থাকবে- একটি হচ্ছে সমাজে ইসলামি অর্থনৈতিক ডকট্রিন ও সিস্টেম বাস্তবায়ন হবে। অপরটি হচ্ছে এরূপ একটি সমাজে অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ ও অভিজ্ঞতাসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে অধ্যয়ন করা হবে। সুতরাং বাকের সদরের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ও অনৈসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র সেই সমাজে রয়েছে যেখানে অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ঐ সমাজের অর্থনৈতিক ঘটনাবলি ও প্রপঞ্চসমূহকে অধ্যয়ন করে থাকে। অন্যকথায় বলা যায় যে এ পার্থক্য কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে বিদ্যমান। কিন্তু ইসলামি ও অনৈসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং এখানে আমরা ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে বাকের সদরের মতবাদকে ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পন্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখতে পারি যাতে আমরা এর যথার্থতা কিম্বা অযথার্থতাকে অনুধাবন করতে পারি ঃ

প্রথমত, ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের ‘বিষয়বস্তু’।

ড. শওকী দুনিয়া[৬] সর্বপ্রথম এই প্রশ্নটি[৭] উত্থাপন করেন যে, স্রেফ অর্থনৈতিক প্রপঞ্চই কি ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, নাকি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ এর বিষয়বস্তু? তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে অর্থনীতিবিদগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং বলেন :

> “আজ অবধি ইসলামি অর্থনীতির গবেষকদের মধ্যে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ঐ দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে সমসাময়িক অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ছায়াতলে উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করার কারণে এবং মুসলমানদের অর্থনৈতিক আচরণের সাথে এর ভিন্নতার কারণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিকাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক আচরণের ব্যাখ্যা প্রদান করার সক্ষমতা রাখে না। বিশেষ করে উৎপত্তিস্থল এবং সর্বসম্মত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলির আওতায় তো একেবারেই না। এসব পর্যবেক্ষণসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতা সত্ত্বেও আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যার ভিত্তিতে যেমনভাবে কুরআন সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে ‘ইহা মুসলমানদের জন্য পথ-প্রদর্শনকারী গ্রন্থ’, একইভাবে এটাও স্পষ্টত ঘোষণা করেছে যে ‘ইহা একটি বৈশ্বিক গ্রন্থ’ এবং এভাবে এ গ্রন্থ তার পথ-প্রদর্শনের আবেদনকে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করে।
>
> অতঃপর কুরআন এবং মহানবি’র সুন্নাত অমুসলমানদের অর্থনৈতিক আচরণের সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নে ব্রতী হয়। এমতাবস্থায় যদি ক্ষমতাসীন সেক্যুলার অর্থনীতি দাবি করে যে তার সর্বজনীনতা এবং বাস্তবায়নের যোগ্যতা

---

[৬]. ড. শওকী আহমেদ দুনিয়া : আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ইসলামি অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য আইডিবি পুরস্কার প্রাপ্ত।

[৭]. দ্র. Shawki Ahmed Dunya, “Topics in Islamic Economics; Economic Theory from an Islamic Perspective”- `*Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*’, Vol. 3, No. 1, 1985.

> সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য, তাহলে আমাদের জন্য কি এটা বলা সমুচিত নয় যে, ইসলামি অর্থনীতিও তদ্রুপ সকল মনুষের জন্য প্রযোজ্য?"[৮]

অধ্যাপক আনাস যারকাও সুস্পষ্টভাবে এই মতবাদকে সমর্থন করেছেন এবং শওকী দুনিয়া যে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন সেটারই উত্তরে বলেন, 'আমার মতে, একমাত্র সঠিক উত্তর হচ্ছে এটা যে ইসলামি অর্থনীতি, ইসলামি-অনৈসলামি নির্বিশেষে গোটা মানব সমাজের অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহকে অধ্যয়ন করে থাকে। এই দাবি কুরআন ও সুন্নাহ্র পক্ষ থেকেও সমর্থিত হয়।'[৯]

ড. মুনজির কাহ্ফও তাঁর 'Islamic Economics : Notes on Definition and Methodlogy' শীর্ষক গবেষণাপত্রে এই মতবাদকেই সমর্থন করেছেন। তিনি এ মতবাদের সঠিকতার পক্ষে পূর্ববর্তী মনীষীদের বিশেষ করে ইবনে খালদুনের ÔBjgj BgivbÕ (علم العمران) তত্ত্বের রেফারেন্স প্রদান করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, আমরা আচরণ-বিজ্ঞানের এমন এক পূর্ব-ইতিহাসের অধিকারী যা বিশ্বময় একটি প্রপঞ্চ নিয়ে কাজ করে। এমন এক বিজ্ঞান, মুসলমানরা যেটাকে একটি মুসলিম সমাজ কিম্বা একটি ইসলামি সিস্টেমেরে মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য ছিল না। তাহলে আমরা মুসলিম অর্থনীতিবিদরা কেন অর্থনৈতিক বিজ্ঞান থেকে একটি বৈশ্বিক তাৎপর্যে চিন্তা করতে পারবো না?[১০]

অন্যত্র তিনি বলেন, অবশেষে 'অর্থনৈতিক বিজ্ঞান' এর পরিধি যদি পুনরায় ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়ন করা হয় তাহলে বলতে হয় অর্থনীতি বলতে মানুষের আচরণের সকল দিক্সহ এবং সকল প্রকার নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অধীনে এবং সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত কাঠামোর মধ্যে তার আচরণকে বুঝায়। অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ যেন বস্তুগত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের দিক-নির্ধারণে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের আচরণকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়।

ড. কাহ্ফ এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেন এবং এরূপ বিজ্ঞান বিদ্যমান থাকার সপক্ষে কুরআন থেকে প্রমাণও উপস্থাপন করেন। তদুপরি তিনি মনে করেন যে, এরূপ বিজ্ঞানের সাথে 'ইসলামি' অভিধাটি যোগ করা চলে না। তিনি ইসলামি অর্থনীতিকে পূর্বোক্ত অর্থে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের একটি শাখা বলে গণ্য করেন।[১১]

যাই হোক, আমরা যদি কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতসমূহের শরণাপন্ন হই তাহলে দেখব যে এ মতটি অনেকটাই সমর্থনযোগ্য। কেননা, কুরআনে জনগণকে তিন দলে বিভক্ত করা হয়েছে-

প্রথম দল : 'আসহাবু আল-শিমাল' (أَصْحَابُ الشِّمَال) অর্থাৎ বামপন্থীরা। এরা হচ্ছে তারাই যারা সর্বদা কামনা-বাসনাকে বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় দল : 'আসহাবু আল-ইয়ামিন' (أَصْحَابِ الْيَمِين) অর্থাৎ ডানপন্থীরা। এরা হচ্ছে তারাই যারা অধিকাংশই সরল পথে চলে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিছলে যায় এবং কামনা-বাসনাকে বুদ্ধিমত্তার উপর প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকে।

তৃতীয় দল : 'আল-সাবিকুন' (السابقون) অর্থাৎ অগ্রবর্তীরা। এরা হচ্ছে তারাই যারা সর্বদা খোদায়ী সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং বুদ্ধিমত্তাকে তাদের কামনা-বাসনার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।[১২]

---

[৮]. দ্র.শওকী আহমেদ দুনিয়া, "নাযারিয়ে পারদাযি দার ইকিতসাদে ইসলামি" ÔBKwZmv'-G Bmjwg M‡elYvgjK ˆÎgwmKÕ, তেহরান, ৩য় বর্ষ, ১৩৮২ সৌ.সন, সং. ১২, পৃ. ১৩২-১৩৩।

[৯]. দ্র. মোহাম্মদ আনাস যারকা, "রাভেশ শেনাসি ইলমে ইক্তিসাদ-এ ইসলামি", প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১০, পৃ. ১২৩।

[১০].দ্র. Dr. Munzer Kahf, "Islamic Economics : Notes on Definition and Methodlogy", `*Review on Islamic Economics'* (Journal), 2003, Vo. 13.

[১১]. দ্র. প্রাগুক্ত।

বহু আয়াতে এবং রেওয়ায়াতে এই তিন দলের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই আচরণগত নিয়মসমূহ অনৈসলামি সমাজেও অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহকে ব্যাখ্যায় প্রযোজ্য হতে পারে। তাছাড়া ইসলামের বিশেষ জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে এবং মানুষ ও জগতের প্রতি বিশেষ বীক্ষার অধিকারী। কাজেই অর্থনৈতিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে অবশ্যই ইসলামের বিশেষ পদ্ধতি থাকাই সঙ্গত। কেননা আজ এটা প্রমাণিত যে, বিশ্ববীক্ষা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তিসমূহ পন্থা ও পদ্ধতি নির্বাচনে প্রভাব ফেলে থাকে। এই ভিত্তিতে বলা যায় যে, ইসলামের দুই ধরনের অর্থনৈতিক বিজ্ঞান রয়েছে। একটি হল নিরঙ্কুশ ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, যা মানব সমাজের অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে থাকে এবং বিশ্বব্যাপী বটে। আরেকটি হল শর্তসাপেক্ষ ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, যা মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে থাকে। এ উভয় প্রকার বিজ্ঞানকেই ইসলামি বিশ্লেষণে ভূষিত করা যেতে পারে। প্রথমটি এই বিবেচনায় যে, এর পন্থা ও নিয়ম-কানুনগুলো ইসলামি বিশ্ববীক্ষা ও ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর দ্বিতীয়টি এই বিবেচনায় যে, পন্থা এবং নিয়মকানুন ছাড়াও এর বিষয়বস্তুও হচ্ছে এমন একটি সমাজ, যেখানে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন এবং ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপাদানগুলোও বাস্তবায়ন লাভ করেছে।

এই ভিত্তিতে বাকের সদরের বক্তব্যের সাথে দুইটি বিষয় যোগ করা যায় :

এক. যে সমাজে ইসলামের অর্থনৈতিক ডকট্রিন ও সিস্টেম বাস্তবায়ন লাভ করেছে, সেখানে ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ। আর ইসলামের নিরঙ্কুশ ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানও রয়েছে, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে গোটা মানব সমাজ। এই বিজ্ঞানের উপকারিতা হল অনৈসলামি সমাজে অর্থনৈতিক আচরণসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা।

দুই. শর্তসাপেক্ষ ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানে যেখানে কাঙ্ক্ষিত অবস্থা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়, ইসলামি সর্বসম্মত ও ধারণানির্ভর শিক্ষাসমূহ থেকে লব্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহকে ন্যায়িক পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়। আর সেগুলোর ন্যায্যতা বা অন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষণের রেফারেন্স দেওয়া লজিকের দিক থেকে সঠিক কাজ নয়। কারণ ধরে নেওয়া হয়েছে যে এসব তত্ত্ব বিদ্যমান অবস্থা ব্যাখ্যার জন্য নয়, বরং কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত অবস্থার ব্যাখ্যার জন্য। কাজেই বাকের সদর যে দাবি করেন 'এই উপায়ে যেসব তত্ত্ব পাওয়া যায়, সেগুলো অর্থনৈতিক জীবনের কিছু কিছু সত্যের ব্যাখ্যার জন্য ফলপ্রসু। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরের সত্যতা থেকে সংগৃহীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরীক্ষিত না হবে ততক্ষণ তা সাধারণ ও সূক্ষ্মভাবে ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের জন্ম দিতে পারে না। কেননা, অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবন আর ধারণার ভিত্তিতে কৃত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে পার্থক্য থাকে'- তা সঠিক নয়। কারণ এ পন্থায় যেসব তত্ত্ব পাওয়া যায় সেগুলো বিদ্যমান বাস্তবতাকে ব্যাখ্যার জন্য নয়, বরং ইসলামি মতে কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত অবস্থার ব্যাখ্যার জন্য।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের 'লক্ষ্য'।

প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহের ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা? নাকি এর আদর্শিক ও কমাণ্ডের দিকও রয়েছে। নাকি এ উভয় দিকই তার কাজের মধ্যে পড়ে?

ইসলাম হচ্ছে মানুষকে সুপথ প্রদর্শনের ধর্ম। এর লক্ষ্য হচ্ছে মানুষদেরকে পূর্ণতার (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাসত্বের) চূঁড়ায় পৌঁছে দেওয়া। ইসলামে শুধু যে বিদ্যমান অবস্থার বর্ণনা ও ব্যাখ্যার পদ্ধতিসমূহের ভিত্তি বিবৃত হয়েছে, তা

[১২]. Av¨j-‡Kv¨iAvb: সূরা ওয়াকিয়া

নয়, বরং কাঙ্ক্ষিত অবস্থারও এবং বিদ্যমান অবস্থা থেকে উক্ত কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় উত্তরণের মূলনীতি ও নিয়ম-কানুনও বর্ণিত হয়েছে। এরকম একটি ধর্মের লক্ষ্য শুধুই বিদ্যমান অবস্থার ব্যাখ্যা হতে পারে না। বরং বিদ্যমান অবস্থার ব্যাখ্যা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত অবস্থা অভিমুখে যাত্রার ভূমিকাস্বরূপ। ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, যা ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে অন্যতম একটি বিজ্ঞান বটে, এর লক্ষ্য কেবলই বিদ্যমান অবস্থার বিবরণ হতে পারে না। বরং এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও দায়িত্ব কল্পণা করা যায়। যথা -

এক. বিদ্যমান অবস্থার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা।

দুই. কাঙ্ক্ষিত অবস্থার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এবং

তিন. বিদ্যমান অবস্থা থেকে কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় উত্তরণের মূলনীতি ও নিয়ম-কানুনের বর্ণনা।

কাজেই বাকের সদরের তত্ত্বের সাথে এ কথাটিও যোগ করা যায় যে, ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ন্যায় লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রচলিত অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের সাথে পার্থক্য রয়েছে।

তৃতীয়ত, ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের 'পদ্ধতি'।

বিশ্ববীক্ষা ও প্রত্যাদেশকে নাকচ করা প্রচলিত এবং বস্তুবাদী উভয় অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং এটা তাদের জ্ঞানতত্ত্বের উৎসমূল হিসাবে অধিষ্ঠিত। এই বিজ্ঞানে মনে করা হয় যে, জগত বস্তুগত কারণের মধ্যেই আবদ্ধ। অজড় কোন কারণেরই অস্তিত্ব নেই। মানুষ একটি জড়বস্তুগত অস্তিত্ব। এর কোন অবস্তুগত ও আধ্যাত্মিক দিক নেই। তদ্রূপ জ্ঞানতত্ত্বের উৎসও সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি আর অভিজ্ঞতার মধ্যে।

অথচ ইসলামি বিশ্ববীক্ষা ও জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি অনুযায়ী জগতের জন্য অজড় কারণসমূহ রয়েছে যা বস্তুজগতের উপর প্রভাবশীল। আর মানুষ হচ্ছে বস্তুগত ও অবস্তুগত -এই উভয় দিকসম্পন্ন এক অস্তিত্ব। আর বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রত্যাদেশও জ্ঞানের একটি উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। অতএব ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান যে প্রচলিত অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের থেকে কিছুটা পার্থক্য হবে এটাই স্বাভাবিক।

ফলাফলে বলা যায়, ইসলাম অর্থনৈতিক ডকট্রিন, অর্থনৈতিক সিস্টেম এবং অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের অধিকারী। ইসলামের অর্থনৈতিক ডকট্রিন বলতে বুঝায় "অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সমাধানের নিমিত্তে উৎপাদন, বিতরণ ও ভোগ - এই তিন বিভাগে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে সুশৃঙ্খল করার স্থায়ী নিয়ম কানুন।"

আর ইসলামের অর্থনৈতিক সিস্টেম বলতে বুঝায় "উৎপাদন, বিতরণ এবং ভোগ- এই তিন বিভাগে একগুচ্ছ অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যা অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সমাধানকল্পে ইসলামের অর্থনৈতিক ডকট্রিনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।" এ সম্পর্কগুলো ইসলামি হুকুম-বিধান ও শিক্ষা থেকে জন্ম নেয় এবং অপরিবর্তনীয় ও বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য।

অপরদিকে ইসলামের অর্থনৈতিক বিজ্ঞান বিষয়বস্তুর দিক থেকে দুই প্রকার- এক. ইসলামের নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক বিজ্ঞান এবং দুই. ইসলামের শর্তসাপেক্ষ অর্থনৈতিক বিজ্ঞান। নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক বিজ্ঞান বলতে বুঝায় "এমন বিজ্ঞান যা মানব সমাজে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও পরিবর্তনশীল অবস্থার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে থাকে। এর পদ্ধতি ইসলামি বিশ্ববীক্ষা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আয়াত ও রেওয়ায়াতে বিধৃত সাধারণ বিধানাবলি দ্বারা সমৃদ্ধ।"

পক্ষান্তরে ইসলামের শর্তসাপেক্ষ অর্থনৈতিক বিজ্ঞান বলতে বুঝায় “এমন বিজ্ঞান যা একটি কাঙ্ক্ষিত ইসলামি সমাজে যেখানে মনে করা হয় যে ইসলামি অর্থনৈতিক ডকট্রিনের মূলনীতিসমূহ এবং এ অর্থনৈতিক সিস্টেমের উপাদানসমূহ বাস্তব রূপ লাভ করেছে, সেখানকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও পরিবর্তনশীল অবস্থার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে থাকে।”

লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়। যথা এক. পজিটিভ অর্থনৈতিক বিজ্ঞান এবং দুই. কমাণ্ড অর্থনৈতিক বিজ্ঞান। পজিটিভ ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান বিদ্যমান অবস্থার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে থাকে। আর কমাণ্ড ইসলামি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান কাঙ্ক্ষিত অবস্থার ব্যাখ্যা করে থাকে এবং বিদ্যমান অবস্থা থেকে কাঙ্ক্ষিত অবস্থার দিকে যাত্রার নিয়ম-কানুন বাৎলে দেয়।

Dcmsnvi

আমাদের ধর্মীয় কূটাভ্যাস বা জটিলতাবোধের অনেকখানি আমাদের সীমিত দৃষ্টির ফল। এক্ষেত্রে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারলে জীবন ও জগতের অনেক প্রশ্নের সমাধান আমাদের চিন্তার উপলব্ধিতে উন্মোচিত করা সম্ভব। কেননা জীবন ও জগত পরিচালনায় বিভিন্ন পথ ও পন্থা এই জগতে প্রচলিত আছে। এর সবগুলোই স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে পরিচালিত। কিন্তু আমাদের উপলব্ধিতে অনুভূত হয় যে, জ্ঞানের সব দিগন্তই মানব কর্তৃক উন্মোচিত ও বিকশিত। কিন্তু আমাদের এই উপলব্ধি প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধিক জ্ঞানের উৎসই স্রষ্টার তরফ থেকে প্রাপ্ত। কিন্তু আমাদের উপলব্ধিতে তা ধরা দেয় না। - কেন? ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এর একাধিক উত্তর থাকলেও মূল কথা হল আমাদের অন্তর্দৃষ্টির সীমাবদ্ধতাই এর মূল কারণ। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোকে বলা যায় : 'যে মাত্র একটি বিষয় জানে, প্রকৃতপক্ষে সে কিছুই জানে না।'[১]অপরদিকে 'যে একটি ভাষা জানে, সে কোন ভাষাই জানে না।'[২] তাহলে মানুষ কীভাবে প্রকৃতির সকল জ্ঞান একই স্রোতধারায় সূত্রবদ্ধ করতে পারে? এটি শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সম্ভব নয়। যিনি সর্বধর্মী সমন্বয়ী সাধক তাঁর অধ্যাত্ম জীবনে এরকম বহুবিষয় এবং বহুভাষিক উপলব্ধিবোধের অনুধাবন ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। এই অর্জন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সামান্যই অর্জিত হয়। বিশেষত মৌলিক জ্ঞান তো নয়ই। কেননা ধর্মতাত্ত্বিক সূত্র অনুযায়ী এ জগতে মানুষ চারভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ১. ইলমে তাসাউফ (অধ্যাত্ম সাধনায় অর্জিত জ্ঞান) ২. ইলমে সফর (ভ্রমণের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান), ৩. ইলমে সোহ্‌বাত (সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান) এবং ৪. ইলমে কিতাব (বই পড়ার মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান)। এই চতুর্থ ধাপের শিক্ষায় আবার দুটি ধারা আছে- (ক) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং (খ) আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। অর্থাৎ সকল সনদধারী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এই চতুর্থ শ্রেণির বা চার -এর (খ) ধাপের শিক্ষিত।

শেখ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি'র (১১৬৫-১২৪০) মতে জ্ঞান তিন প্রকার : ক. প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞান, খ. বৌদ্ধিক জ্ঞান ও গ. স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান। ইবনুল আরাবি রচিত Iqvnv'vZj IR' I Iqvnv'vZk kû' শীর্ষক তাসাউফ সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থে আল্লাহ্‌র সত্তার প্রধানত তিনটি ধারণা দিয়েছেন– (ক) ইজাদিয়া (আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যেই এই বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে), (খ) শহুদিয়া (বিশ্বজগত সবকিছুই আল্লাহর মহিমার প্রকাশ) এবং(গ) ওয়াজুদিয়া (সমগ্র বিশ্বজগত ব্যাপীয়া একটিমাত্র সত্তাই বিরাজমান)। চিন্তা জগতের ইতিহাসে বিশ্বে বহু সম্প্রদায়ে বহু মনীষীর জন্ম হয়েছে। তাঁদের চিন্তার দ্বারা মানব জগত নানা প্রতিকূলতার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সফলতার দিকে এগিয়ে গেছে। আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু এই চিন্তা জগতের অন্যতম একজন মহিমান্বিত মানুষ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের সদর। ইসলামি চিন্তা জগতের যিনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ, যিনি মাত্র ৪৭ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন সমাজ ও অর্থনীতির নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী অনন্য পথ-নির্দেশনা। জগতের অপরাপর সম্প্রদায়ের মনীষীদের চিন্তার তুলনামূলক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের আলোকে আমরা বাকের সদরের মৌলিক চিন্তা-দর্শন ও তাঁর স্বাতন্ত্রের নানা দিক অনুপুঙ্ক্ষ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, জীবসত্তা হিসাবে মানুষের পক্ষে কোন কিছুই স্রষ্টার আনুগত্যের বাইরে গিয়ে মানব কল্যাণ করা সম্ভব

---

[১] . *One who knows one thing, he knows nothing.*- Maxmuller

[২]. *One who knows only one language knows no language.* - Goethe

নয়। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলো সফল বলে মনে হয় তা সাময়িকভাবে কার্যকর হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তার ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেগুলো মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দিয়ে মোকাবিলা করতে হয়। কিন্তু মানুষ যদি তার আত্ম-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার একত্ববাদের মৌলিক সত্তার সাথে একীভূত হয়ে তার বিশ্বাস ও বিশ্ববীক্ষা উন্মোচিত হয়, তবে তাতে স্রষ্টার ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটে। আর স্রষ্টার এই ইচ্ছার প্রতিফলনের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির সার্থকতা ও তার মানবীয় মর্যাদার প্রতিনিধিত্বের অধিকার স-মহীমায় প্রতিষ্ঠিত করে।

আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল যে, বাকের সদরের চিন্তাদর্শনে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। বিশ্ববীক্ষার আলোকে অপরাপর মনীষীদের চিন্তা দর্শনের সাথে বাকের সদরের চিন্তার মৌলিক পার্থক্য হল মানুষের বিশ্বাস ও বিশ্ববীক্ষাই হচ্ছে ভিত্তি (Base), আর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ অন্য সকল বিষয়গুলো উপরিকাঠামোর (Superstructure) অংশ। যেখানে অন্যান্য বিশ্ববীক্ষায় (কার্ল মার্কস্ প্রমুখ) অর্থনীতি এবং উৎপাদন সরঞ্জামকেই ভিত্তি গণ্য করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ধর্ম, সমাজ, শিল্পকলা, নৈতিকতা ইত্যাদিকে উপরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাকের সদরের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল ইসলামি আর্থ-সামাজিক দর্শনকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র আর সমাজতান্ত্রিক সমভোগবাদের পাশাপাশি জীবনধারণের তৃতীয় আরেকটি পথ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। অভিসন্দর্ভে তাঁর এই সর্বমানবিক দর্শনকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। একারণে স্বভাবতই বাকের সদরের সামাজিক দর্শনের আলোচনাকে অভিসন্দর্ভের অগ্রভাগে চারটি অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর অর্থনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে। আর অষ্টম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে বাকের সদরের কতিপয় তত্ত্ব ও মতামতের উপর সমালোচনা।

প্রথম অধ্যায়ে mgvR wPšÍvi BwZeË I gmwjg gvbm শিরোনামে মানবের সমাজ চিন্তার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং এক্ষেত্রে মুসলিম মনীষীদের অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামি দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে একগুচ্ছ প্রত্যাদেশভিত্তিক শিক্ষার সমাহার, যেগুলো আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু প্রজ্ঞাবাণী (হিক্‌মাত) উপস্থাপন করেছে। আর মানুষের কর্তব্য হচ্ছে স্ব স্ব বুঝ ও প্রয়োজন মাফিক তা থেকে উপকৃত হওয়া। কাজেই ধর্মের দৃষ্টিতে আমাদের কাজ এটা নয় যে নিজেরা ভিত্তি রচনা করব। বরং নির্দেশিত ভিত্তকে উদ্ভাবন করাই আমাদের কাজ। আল্লাহ্ মানুষকে একটি সামাজিক জীবসত্তা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। এ মানুষের নিজের প্রকৃতির কারণেই অপরাপর মানুষের সাথে তার যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা করে চলতে হয় এবং তাকে জীবন যাপনও করতে হবে প্রকৃতিতে। যে মানুষ মানবিক দিক ও প্রাকৃতিক (তথা বস্তুগত) দিক- এ উভয় দিকের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখবে এবং যে মানুষ সৃষ্টিই হয়েছে এরূপ সৃষ্টিকৌশলে, তার জন্য এ দ্বিবিধ যোগাযোগ কিছু উপকার আবার কিছু সমস্যা ও ক্ষতি বয়ে আনবে। এসব সমস্যা ও ক্ষতি বিদূরিত হতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন মানুষের এই সৃষ্টিগত সকল বাস্তবতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ একটি সামাজিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা, যাতে এসব সমস্যা দূর হয়ে যায় (সেটা প্রাকৃতিক সমস্যাই হোক আর জীবনে চলার পথে উদ্ভুত কোন সমস্যাই হোক)। বাকের সদর মনে করেন, এ কাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা যে মানুষ নিজেই মানুষের সম্পর্কে ও মানুষের সমস্যাবলি সম্পর্কে গভীরভাবে পরিজ্ঞাত নয়, অথবা মানুষের চলার পথে মানুষের সাথে মানুষের কিম্বা প্রকৃতির সাথে মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে উপলব্ধি করে না, সে যে ধরনের ব্যবস্থাই পরিকল্পনা করুক না কেন, তা শেষ পরিণামে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

অগস্ট কোঁত, ম্যাক্স ভেবার, এমিল ডুর্খেইম প্রমুখ সমাজচিন্তকরা ধর্মের বিকল্প হিসাবে নৈতিকতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে ধর্মচেতনা থেকে উদ্ভুত মানুষের মৌলিক ন্যায়পরায়নতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমর্পণের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা পাওয়া যায় না। বাকের সদর এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে মার্কস্‌বাদ, উদার-

নৈতিকতাবাদসহ সকল মনুষ্য মতাদর্শকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করে বলেন যে, এসব মতাদর্শে মানুষের এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং এ কারণে সেগুলো ব্যর্থতার মুখে পড়েছে। ইসলাম তার প্রত্যাদেশভিত্তিক জ্ঞান নির্ভরতার সূত্রে এক্ষেত্রে সঠিকভাবে মানুষের মানবিক পরিচয়সত্তা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সৃষ্টিগত নিয়ম-বিধানগুলোকেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আত্মস্থ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে GKZev‘x mgvR KvVv‡gv শিরোনামে বাকের সদরের দৃষ্টিকোণ থেকে একত্ববাদী সমাজ (المجتمع التوحيدى) দর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে। একত্ববাদী সমাজ দর্শন আল-কুরআনে বর্ণিত ‘খিলাফাত’ তথা প্রতিনিধিত্ব তত্ত্বের উপর গড়ে উঠেছে। বাকের সদর এ তত্ত্বকে একটি ত্রিকৌণিক পিরামিডের সাথে তুলনা করে তারই আলোকে সমাজের গঠনশৈলির বিশ্লেষণ করেছেন। এ পিরামিডের শীর্ষ প্রান্তে রয়েছে মহামহিম আল্লাহ্‌র সার্বভৌম অবস্থান। আর ভূমিতলে অবস্থিত এক কোণে মানুষ আর অপর কোণে প্রকৃতি তথা জগতকে কল্পনা করেছেন। আর এই ত্রিকৌণিক পিরামিডের মধ্যবিন্দুতে মানুষকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অর্থাৎ বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সবকিছুর উর্দ্ধে এবং প্রতিনিধিমানুষের সকল দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা আল্লাহ্‌র নিকটে। আর নিচে তার একদিকে রয়েছে অপর মানুষের (অর্থাৎ সমাজের) সাথে সম্পর্ক, আর অপরদিকে রয়েছে প্রকৃতি (তথা জগতের) সাথে সম্পর্ক। এভাবে ত্রিকৌণিক পিরামিডের কেন্দ্রে অবস্থি ‘প্রতিনিধি’ হিসাবে মানুষ তার তিন দিকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। উপরের দিকে আল্লাহর সাথে- এটা হচ্ছে তার জবাবদিহিতার সম্পর্ক। আর নিচের দিকে এক প্রান্তে সমাজের সাথে এবং অপর প্রান্তে প্রকৃতির সাথে - এ দুটি সম্পর্ক হচ্ছে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের সম্পর্ক। এ পিরামিড আকৃতির সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ সমাজকে বলা হয় ‘একত্ববাদী সমাজ’।বাকের সদর এভাবে ‘একত্ববাদী সমাজ’ এর রূপরেখা চিত্রায়িত করেছেন যে সমাজের শীর্ষে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ সার্বভৌম শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। এ সমাজের উন্নয়ন ও অধঃপতন দুটিই নির্ভর করে মানুষের কর্ম ও আচরণের প্রেক্ষিতে।

বাকের সদর একইভাবে একত্ববাদ তথা আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের ঝোঁককে তার সামাজিক জীবনযাত্রার উৎসস্থল হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে বলেন, একথা ঠিক যে আল্লাহ্ বলেছেন ‘আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করছি’- এখানে ‘প্রতিনিধি’ প্রসঙ্গটি নিছক একটি ধারণা কিম্বা প্রতীকী কথা নয়। বরং এটা সেই বাস্তবতা থেকেই উৎসারিত, যা মানুষের অন্তঃপুরে বিরাজমান। সুতরাং মানুষের জীবনে যত সমস্যারই উদ্ভব ঘটে, সেটা একারণে যে আমরা আল্লাহ্‌কে মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন থেকে বাদ দিয়ে থাকি। ফলে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক একটি অসম্পূর্ণ ও সমস্যাসংকুল সম্পর্কে পরিণত হয়। কিন্তু যেহেতু মানুষের একটি খোদায়ী পরিচিতি রয়েছে, কাজেই সে যদি স্বীয় পরিচিতিকে আবিষ্কার করে এবং বুঝতে পারে, তাহলে ‘আল্লাহ্ হলেন প্রতিনিধি নিযুক্তকারী’- এই পরিচিতিটা যথাযথভাবে চলবে। আল্লাহ্‌ই মূল এবং তিনিই পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। যখন মানুষ অনুভব করবে যে, সে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, সেক্ষেত্রে মানুষ আর নিজের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি এবং জীবনের প্রতি স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে না। সে নিজেকে পাবে আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানাধীন হিসাবে, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে মানুষের মধ্যে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে মানুষকে মর্যাদা প্রদান করলেন এবং তাকে বস্তু ও প্রাকৃতিক জগতের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করলেন, এর ফলে মানুষ অনুভব করে যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার উপর কোন না কোন কাজ সোপর্দ করা হয়েছে এবং সে দায়িত্বশীলতা অনুভব করে। পাশাপাশি সে নিজের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদা দেখতে পায়। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে তার মধ্যে প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বশীলতার বোধ, যা স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে জন্ম নেয়। যখন মানুষ দায়িত্বশীল ও

প্রতিশ্রুতিশীল হয়, তখন তার জন্য আল্লাহ্‌র চাওয়ার ভিত্তিতে কাজ না করে উপায় থাকে না। এখন আর এসব চাওয়াগুলো শুধুই অপ্রকৃত ও মূল্যহীন বিষয় নয়। বরং এগুলো সৃষ্টি শৃঙ্খলার সাথে সূত্রবদ্ধ। অর্থাৎ মানুষের থেকে আল্লাহ্‌র এ সমস্ত চাওয়াগুলো, মানুষের প্রাকৃতিক, বস্তু জগতের এবং তার পার্থিব জীবনের চাহিদাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বাকের সদর মনে করেন যে, কুরআনের সামাজিক মতাদর্শের সারকথা হচ্ছে, মানুষ হল পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র একমাত্র প্রতিনিধি। কিন্তু এই প্রতিনিধিত্বের কিছু ঝুঁকির দিকও রয়েছে। কারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পাশাপাশি তার মধ্যে কামনা-বাসনাও রয়েছে। কাজেই তার বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। এই মানুষ বেপরোয়া ও বাতুলতার পথে চলে যেতে পারে। কেননা, যদি তার মধ্যে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি জন্ম না নেয় এবং নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে প্রতিনিধিত্ব বাস্তবায়নের কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। ফলে সমস্যাসংকুল হয়ে উঠবে সামাজিক জীবন এবং মানুষ নতুন নতুন সংকটের মধ্যে নিপতিত হবে। আল্লাহ্‌ এ পথচলাকে নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রত্যক্ষকারী জগত, একটি প্রত্যক্ষের পদ এবং যে এই প্রতিনিধিত্বের উপর প্রত্যক্ষকারী হবে, তাকে নির্ধারণ করেছেন। তিনি স্বয়ং হচ্ছেন প্রথম প্রত্যক্ষকারী। পাশাপাশি একজন পার্থিব প্রত্যক্ষকারীও নির্ধারণ করেছেন যাতে নিয়ন্ত্রণকারী ও সুপথ প্রদর্শনকারী হয় এবং এই পথচলা যে কোন প্রকার বিচ্যুতি থেকে বেঁচে থাকে। এ কারণেই বলা হয়েছে, ‘মানুষের প্রতিনিধিত্ব’। অর্থাৎ এ প্রতিনিধিত্ব সকল মানুষদের জন্যই। শুধুমাত্র ব্যক্তি আদমের জন্য নয়। বরং প্রত্যেক মানুষই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম mgvRZË Ges ÔBmjvwg gvblÕ ZË। এই অধ্যায়ে প্রচলিত সমাজতত্ত্বের পাশাপাশি বাকের সদরের দৃষ্টিতে একত্ববাদী সমাজের ধারায় ইসলামি মানুষতত্ত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি ইসলামি মানুষের কিছু সুনিদ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন যে মানুষ নৈতিকতার কাছে আত্মসমর্পিত, আত্ম-সংযমী এবং দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার সামনে প্রতিশ্রুতিশীল। ‘ইসলামি মানুষ’-এর ঠিক বিপরীতে অবস্থান করে ‘অর্থনৈতিক মানুষ’, যে নৈতিকতা বোঝে না, অমিতচারী ও লোভী প্রকৃতির। দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার পরিবর্তে সে আত্ম-স্বার্থ ও শোষণে বিশ্বাসী।

বাকের সদরের ইসলামি মানুষ তত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুসারে সমাজের পরিবর্তন শুরু হয় মানুষের চিত্তের অভ্যন্তরে সংশোধন প্রক্রিয়া অর্থাৎ ‘চাওয়া’ থেকে। হাদীসের পরিভাষা মোতাবিক চিত্তের এই সংশোধন প্রয়াসকে আল-জিহাদ আল-আকবার তথা ‘বৃহত্তর সংগ্রাম’ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যায় তখন বাইরের পরিবর্তন সময়ের ব্যাপার মাত্র। সমাজকে বদলে ফেলা কিম্বা বিপ্লব সাধন করা- এ জাতীয় কথাগুলো প্রচলিত ধ্যান ধারণায় অত্যন্ত কঠিন কিছু বলে প্রতিভাত হলেও বাকের সদরের দর্শনে এগুলো হচ্ছে উপরিকাঠামো (Superstructure)-এর অংশমাত্র। পক্ষান্তরে ভিত্তি (Base) হচ্ছে মানবের চিত্ত তথা অন্তরসত্তা। এই অ্যাভন্তরীণ অন্তরসত্তা পরিবর্তিত হয়ে গেলে উপরিকাঠামোয় পরিবর্তন আসা খুব সহজ ব্যাপার। তাই বাকের সদর হাদীসের অনুসরণে সমাজ সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে আল-জিহাদ আল-আসগর তথা ‘ক্ষুদ্রতর সংগ্রাম’ নামকরণ করেছেন।

পাশ্চাত্যের সমাজচিন্তকরা সমাজমানুষের বিকাশে ধর্ম উদ্ভুততিনটি কার্যকরী ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। এক.সমাজে ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে বাড়তি জ্ঞান অর্জন করা; দুই. মানব জাতির ইতিহাসে এর গুরুত্ব ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা; তিন. ধর্মের উপর সামাজিক শক্তির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা। এই বিশ্লেষণের আরও সম্প্রসারিত ও পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে বাকের সদরের ইসলামি মানুষ তত্ত্বে। তিনি দেখিয়েছেন একজন মানুষ, যে নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে দেখে এবং আরেকজন মানুষ যে নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে দেখে না,

এদের দুজনের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈয়ায়িক দায়বদ্ধতা ভিন্নতর হবে। যে মানুষ নিজেকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি বলে অনুভব করবে, সে একজন প্রতিশ্রুতিশীল মানুষ হবে। পক্ষান্তরে যে মানুষ নিজেকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি বলে অনুভব করবে না, সে নিজেকে একজন তথাকথিত মুক্ত মানুষ হিসাবে দেখবে। এমন মুক্ত, যার উপর কোন নজরদারি নেই। ফলশ্রুতিতে সে স্বৈরাচারে পরিণত হবে। কেননা, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সুসংবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তার উপর কারো নজরদারি ও কর্তৃত্ব নেই। সে এ ব্যাপারে কাউকে মানে না। আর যেহেতু মানুষদের সাথে এই যে তার সম্পর্কের ধরন ও প্রকৃতি, এতে সে নিজেই লাভবান হয়, একারণে সে এইরূপ সম্পর্ক থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণ করবে। অথচ নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নেই। কিন্তু ইসলামি মানুষ তত্ত্বে নৈতিকতার কাছে আত্ম-সমর্পিত ব্যক্তি সর্বদাই স্রষ্টার ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম mvgwRK mgm¨vewj Ges a‡g cZ¨veZ‡bi WvK। মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস অসম্ভব। তাই সমাজ জীবনে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মানুভূতির মধ্যেও তাকে সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে একটি মানবিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। এখানে প্রয়োজন হয় নিয়ন্ত্রিত জীবনের নানা দিক-নির্দেশনা। ধর্মের অনুসারিদের উদ্দেশ্য একটি নিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত জীবনযাপনের মধ্যে জীবনের উদ্দেশ্যকে অর্থবহ করা। আর জীবনকে অর্থবহ করতে এবং প্রশান্তিপূর্ণ করতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। পৃথিবীতে ধর্ম চূড়ান্ত অর্থ সম্পর্কিত অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। যেমন, জীবনের উদ্দেশ্য কী? মানুষের ভোগান্তির কারণ কী? পরকালের স্বরূপ কেমন হতে পারে! এসব প্রশ্নের উত্তর মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। ধর্মহীন জীবন হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন, এতে সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু প্রত্যাদেশ পরিচালিত ধর্মচেতনায় এর একটি লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্যে যে দর্শন প্রতিফলিত হয়, তার মধ্যে মানুষ তার সকল সমস্যা সমাধানের একটি দিক-নির্দেশনা পায়। অর্থাৎ জীবনের চূড়ান্ত অর্থ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে ধর্মবিশ্বাসীরা জীবনের এমনকি ভোগান্তিরও একটি উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। তাই বলা যায়, সামাজিক সমস্যাবলির মধ্যেই ধর্মে প্রত্যাবর্তের মধ্যে কীভাবে মানুষ মানবিক প্রশান্তি খুঁজে পায় তারই কার্যকরী উপায় উপস্থাপন করেছেন বাকের সদর। তাই এ অধ্যায়ে বাকের সদরের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের আলোকে সামাজিক দর্শনের তুলনামূলক চিত্রের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যাবলি কীভাবে সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো সমাধানের সবচেয়ে কার্যকরী উপায় তথা পন্থা কী?- সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাকের সদর দেখিয়েছেন যে, মানুষ সহজাতভাবে আত্মপ্রেমী ও ব্যক্তিস্বার্থ পরায়ন। একারণে সামাজিক তথা সামষ্টিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্বের থেকেই অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার জন্ম। কিন্তু এই দুই বাস্তব প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা যায় কীভাবে? বাকের সদর এখানে মানব জীবনে ধর্মের অবদানকে অনেক বড় করে দেখেছেন। কারণ ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষকে আত্মপ্রেম থেকে মানবপ্রেমের শিক্ষায় উদ্ভাসিত করে। ব্যক্তি নয় সমষ্টির মধ্যেই মানুষ তার জীবনের সৌন্দর্য খুঁজে পায়। ইহ্লৌকিক জীবনের সাথে পারলৌকিক জীবনের নিবিড় বন্ধন স্থাপিত হয়। এরূপ ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস বোধের মানুষকে বাকের সদর ‘ইসলামি মানুষ’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। একজন ইসলামি মানুষ পারলৌকিক জীবনকে স্বার্থক ও সমৃদ্ধ করতে ইহ্লৌকিক জীবনে ত্যাগ তিতীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়। পরার্থপরতার পরম মূল্যবোধ এতটাই তাকে অনুপ্রাণিত করে তোলে যে পরের কারণে সে নিজের মূল্যবান জীবনকেও উৎসর্গ করতে কুণ্ঠা করে না। আর যে সমাজে এরূপ মানসিকতার মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব হবে, সেখানে সামাজিক সমস্যা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে এমন দাবি অমূলক নয়।

এই একই অধ্যায়ে বাকের সদরের দৃষ্টিতে সভ্যতার লালন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাকের সদর দাবি করেন যে, পৃথিবীতে মানুষের যে খোদায়ী প্রতিনিধিত্ব রয়েছে সেটার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন থেকে সভ্যতা জন্ম নেয়।

সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সবই তখন একই সরল রেখায় প্রবাহিত হয় এবং অর্থবহ হয়ে ওঠে। তিনি মনে করেন, মানুষ হচ্ছে একটি পূর্ণতাকামী ও সভ্যতা নির্মাণকারী অস্তিত্বসত্তা। কাজেই সামাজিক অঙ্গনে ও সাধারণ জনজীবনে পরিবর্তন সাধনের সম্ভাব্যতা ও সক্ষমতা দুটোই তার রয়েছে। তিনি একত্ববাদী সমাজ কীভাবে সভ্যতায় উত্তরণ ঘটাতে পারে তার চারটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। যথা এক. জগত ও মানুষের উপর আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের মূলনীতি; দুই. বিশ্বজগতের ওপর শাসনকারী ঐশ্বরিক নিয়মরীতিসমূহ তথা সৃষ্টির নিয়মপন্থার মূলনীতি; তিন. মানুষের মুক্ত ও স্বাধীনতার মূলনীতি এবং চার. বুদ্ধি ও ধর্মীয় বিধানের ছায়াতলে মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনির্মাণের মূলনীতি। বাকের সদরের দৃষ্টিতে 'সভ্যতা' হচ্ছে বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতিতে আবশ্যকীয় পরিবর্তন। তিনি মানুষের নিজের চারপাশের পরিবেশে পরিবর্তন ও বিবর্তন সৃষ্টির দিকে মানুষের সক্রিয়তার সাথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে 'সভ্যতার ত্রিভূজ' তত্ত্বের ধারণা প্রদান করেছেন। এ ত্রিভূজের তিনটি বাহু। প্রথমত বুদ্ধি ও অবগতি, যা আদর্শ, নিয়মসমূহ ও সুবিধাগুলোকে ব্যাখ্যা করে। দ্বিতীয়ত উচ্ছ্বসিত আবেগ ও গভীর আত্মিক নেশা। কেননা, প্রত্যেক আচরণের জন্য মানুষের প্রাণের গভীরে একটি শিকড় থাকতে হবে এবং তৃতীয়ত কর্ম ও গতিশীলতা। যা মানবিক শক্তিসমূহের চৈন্তিক ও জ্ঞানগত সুসংহতি রূপে প্রতিফলিত হবে। এ তিনটি বিভাগের সমষ্টিকে 'সভ্যতার ত্রিভূজ' নামে আখ্যায়িত করা যায়। সমাজের স্তম্ভচতুষ্টয় যদি বর্তমান থাকে, তাহলে 'সভ্যতা বিনির্মাণের সম্ভাবনা' একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে পরিণত হবে। আর তা বাস্তবায়িত করার জন্য মানুষকে আপন অস্তিত্বের এই তিনটি বিভাগের প্রতি নির্ভর করতে হবে।

বাকের সদর তাঁর BKwZmv'bv গ্রন্থে ইসলামে অর্থনৈতিক ডকট্রিন আবিস্কারকে সমাজ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করেছেন, যা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি জাতি সভ্যতার পথে অগ্রসর হবে। তবে সমকালীন বিশ্ব-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্যের কতিপয় বিশ্লেষক, বিশেষত হান্টিংটন প্রমুখ ইসলামকে সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে নেতিবাচক পর্যালোচনা করেছেন তাতেও মানুষের জ্ঞানের মৌলিক উৎসের দিক-নির্দেশনায় ভ্রান্তি চিহ্নিত হয়েছে।ফলে ইসলামের জ্ঞানের উৎস 'সর্বজ্ঞ স্রষ্টা', এই মৌলিক দর্শন এতে প্রতিফলিত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে বাকের সদর মনে করেন, সামাজিক দর্শনে সভ্যতা কোন ইতিহাস বা পরিস্থিতির ফসল নয়। বরং তা মানুষেরই ইচ্ছা থেকে প্রসূত এবং তাদেরই বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রয়োগিক প্রচেষ্টার ফসল। সভ্যতার এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাকের সদর ইসলামের বৈশ্বিক রূপকে চিত্রায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। আর ইসলামি সভ্যতার এই বৈশ্বিক আহ্বান রেখে বাকের সদরের সামাজিক দর্শনের আলোচনার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

mgvR I A_©bxwZK 'kb শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়েসমাজ ও অর্থনীতির মধ্যকার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক বিষয়ে বাকের সদরের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও ইসলামি অর্থনীতির গোড়াপত্তন ঘটে স্বয়ং ইসলামের উষালগ্ন থেকেই তবে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে এসে মুসলিম চিন্তাবিদগণ অর্থনীতি বিষয়ের উপর বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। কেননা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশ্বজুড়ে শাসন দৌরত্ম্যের বিপরীতে মুসলিম দেশগুলোর জন্য তৎকালে অর্থনীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট করে বিবৃত করার আবশ্যকতা দেখা দেয়, যা ইসলামে অর্থ-ব্যবস্থার সাধারণ বিষয়াবলির চেয়েও ব্যাপকতর ছিল। কাজেই অর্থনীতি হচ্ছে বিশ্বে জীবনের রক্ত সংবহনের ধমনী, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃদেশীয় রাজনীতির প্রধানতম হাতিয়ার এবং ভূ-পৃষ্ঠে মানব গোষ্ঠীর গুরুত্বারোপের জায়গা। অর্থনীতি দেশে দেশে প্রবৃদ্ধির ধারাকে সঠিক পথে অগ্রসর করে, সমাজকে কর্মমুখর রাখে, সুখ ও সমৃদ্ধির পথে উদ্বুদ্ধ করে, আর নানা ধরনের সমস্যা সংকট ও দুঃখ দুর্দশা হতে উত্তরণে সাহায্য করে।

বাকের সদর তাঁর BKwZmv‘bv গ্রন্থে দেখিয়েছেন ইসলামি আইন যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইসলামি আইনতত্ত্ব সেই যুক্তির সন্ধান দেয়। শক্তি প্রয়োগের ভয়ে আইন মানা আর যুক্তির প্রবর্তনায় আইন মানা ভিন্ন বস্তু। দ্বিতীয়টি অনেক উচ্চ স্তরের। ইসলামি আইনের উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস। যে কারণে সকল বিধি নিষেধ রাষ্ট্র কৃর্তক স্বীকৃত এবং যা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্য পালনীয় তার অধিকাংশেরই উৎস এখনও ধর্ম। বাকের সদর দেখিয়েছেন, ধর্ম মানুষের জীবনাচরণের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও অর্থনীতিও নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহ্ ব্যবসাকে বৈধ এবং সুদকে হারাম করার যে দর্শন কুরআনে রয়েছে, তার মধ্যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যায়ন ও শ্রমের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেটি অন্য কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়নি। বাকের সদর দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক সমস্যাবলি মানবের বিশ্ববীক্ষা ও আইডোলজিসমূহের ভিত্তিগত তাৎপর্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজ ও মানুষরা যে বিশ্ববীক্ষা, আকীদা-বিশ্বাস ও তাৎপর্যে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে তা অর্থনৈতিক বিষয়াবলির উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অর্থনীতিতে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা আকীদা-বিশ্বাসগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তিশীল। কিংবা একশ্রেণীর বিশ্বাসগত পূর্ব-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই বাকের সদরের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি অর্থনীতির দর্শন হিসাবে তিনটি সূচকের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ১. ইসলামি অর্থনীতি একত্ববাদী বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ২. ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনীতি হচ্ছে মানুষের সমাজে ও ইতিহাসে স্বাধীনতা ও চলাচলের অংশবিশেষ। অর্থাৎ অর্থনীতি মানুষের সেবায় নিয়োজিত। মানুষ, অর্থনীতির সেবায় নিয়োজিত নয় এবং ৩. ইসলামি অর্থনীতি একদিকে যেমন বাস্তবমুখী অপরদিকে তেমনি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও নৈতিক নিয়মাবলি সমৃদ্ধ।

বাকের সদরের অর্থনৈতিক দর্শনে একজন মানুষ ‘অর্থনৈতিক মানুষ’ হওয়ার আগে সে একজন ‘ইসলামি মানুষ’। আর ইসলামি মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় পরজগতের প্রতি বিশ্বাস দ্বারা। এ বিশ্বাসের কারণে মানুষের নিকট লাভ-লোকসান, ব্যবসা, উৎকর্ষতা, মুনাফা ইত্যাদি বিষয়গুলোর অর্থই বদলে যায় এবং এগুলোর দৃষ্টান্তের আওতা বৃদ্ধি পায়। তখন এরূপ মানুষের কাছে কেবল পার্থিব লাভ-লোকসানই বড় হয়ে দেখা দেয় না। পরজগতে সে এর বিনিময়ে যা পাবে, সেটাই তার লাভ-লোকসানের মাপকাঠি। সেটাই তার প্রকৃত মুনাফা। আর পরকালের মুনাফা নিশ্চিত হয় যে ব্যবসায়, সেটাই উৎকৃষ্টতর ব্যবসা। কুরআনের ভাষায় : ‘হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হতে রক্ষা করবে! তা এ যে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করবে। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; প্রবেশ করাবেন স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটিই মহা সাফল্য।’[৩]

- কাজেই এরূপ অর্থনৈতিক দর্শনে মাল-সম্পদ জীবনের উদ্দেশ্য নয়, বরং উপকরণ।

এ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে বাকের সদরের দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামি অর্থনীতির তুলনামূলক পর্যালোচনাও উপস্থাপন করা হয়েছে। বাকের সদর দেখেছেন যে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় দুইটি ধারণা থেকে। প্রথমত, তাদের মতে পৃথিবীতে সম্পদ সীমাবদ্ধ। আর দ্বিতীয়ত, মানুষের চাহিদা সীমাহীন। কাজেই চাহিদার তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতা হেতু সীমিত সম্পদ দ্বারা সীমাহীন চাহিদা মেটাতে গিয়েই যতসব দ্বন্দ্ব ও সমস্যার জন্ম। কিন্তু বাকের সদর পাশ্চাত্যের এ ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক সমস্যার জন্ম সম্পদের স্বল্পতা হেতু নয়। বরং অন্য দুটি কারণ এজন্য

---

[৩]. Avj-KziAvb, সাফ : ১০-১২।

দায়ী। একটি হল বিতরণ ব্যবস্থার ত্রুটি এবং অপরটি হল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে মানুষের ঔদাসীন্য ও অবহেলা। মানুষ যদি ন্যায্যতাপূর্ণ বিতরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আন্তরিক ও পরিশ্রমী হয় তাহলে প্রকৃতি উদার হস্তে সম্পদের দরজা খুলে দিবে, এটা আল-কুরআনে বিধৃত খোদায়ী প্রতিশ্রুতি। কাজেই ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের সীমাবদ্ধতা তত্ত্বের কোন স্থান নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাকের সদরের দৃষ্টিকোণ থেকে Bmjvwg A_©bxwZi iƒc‡iLv উপস্থাপিত হয়েছে দুইটি পর্বে। প্রথম পর্বটি হচ্ছে সামগ্রিক রূপরেখা। তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপরে ইসলামি অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামো দণ্ডায়মান। যথা- এক. মিশ্র মালিকানা, দুই. বিশেষ কাঠামোর আওতায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং ৩. সামাজিক ন্যায়বিচার।

বাকের সদর সমাজতন্ত্রের পূর্ণরূপ সমালোচনার পর ইসলামের একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করেন। প্রথমে তিনি মালিকানা তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেন। মালিকানার ভিত্তি হচ্ছে কর্ম তথা শ্রম। অনুরূপভাবে তিনি ইসলামের অর্থনীতিতে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনতাকে গ্রহণ করেন। আর সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলনীতিতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ কারণে দেখা যায় যে, বাকের সদর রাষ্ট্রের হাতে উচ্চ এক্তিয়ার প্রদানের পক্ষপাতি। তাঁর মতে, জনগণের বিপরীতে রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব রয়েছে। যদি জনগণ নিজেরা দারিদ্র্যকে বিমোচন করতে সক্ষম না হয়, সেক্ষেত্রে এ কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এ দায়িত্ব পালন করতে পারে যাতে কেউই দারিদ্র্যের কারণে মারা না যায়। এ প্রসঙ্গে বাকের সদরের বিশদ মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়েছে ইসলামি অর্থনীতির বিস্তারিত রূপরেখা পর্বে।

বিগত তিন দশকে বিশ্বজুড়ে ‘ইসলামি অর্থনীতি’ নামে যে ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, পুঁজিবাদের সাথে তার কোন পার্থক্য তো নেই-ই, উপরুন্তু ইসলামের উদ্দেশ্যের সাথেও এটি সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলা চলে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমসাময়িক পশ্চিমা অর্থব্যবস্থা নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত। ফলে মুনাফা অর্জনের সীমাহীন পুঁজিবাদী প্রচেষ্টা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদ সাধারণত এক ধরনের ইতিবাচক ব্যবসায়িক উদ্যোগের মুখোশ পরে থাকে। অথচ ইসলাম ও পুঁজিবাদের মতো দুটি ভিন্ন ধারার সাথে একই ধরনের ব্যবসায়িক উদ্যোগ কি আসলেই কার্যকর থাকতে পারে?- এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে ivó, h‡Mvc‡hvMx A_©bxwZ Ges Dbqb শিরোনামে। এ অধ্যায়ে একটি চিরকালীন জীবনদর্শন হিসাবে ইসলাম কিভাবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় যুগোপযোগী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করে থাকে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় সে বিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাকের সদরের Avj-gvšÍvKvZj dvivM তথা ‘মুক্ত অঞ্চল তত্ত্ব’ প্রকৃত অর্থেই অর্থনীতির বহুবিধ জটিলতা নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি তাঁর ‘মুক্ত অঞ্চল’ তত্ত্বে তিনটি পথ-নির্দেশনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে প্রথমত, ইসলাম তার বিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় একটি অঞ্চলকে ফরজ ও হারামের হুকুমের আওতার বাইরে রেখে দিয়েছে। (অর্থাৎ ছাড় দেওয়া খাতসমূহ)। দ্বিতীয়ত, এই ছাড় দেওয়া খাতসমূহ বা অঞ্চলকে আবশ্যিক হুকুমের বাইরে রাখাটা কাকতালীয় নয়। অথবা ইসলামি বিধান প্রণয়ন ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি কিংবা ঘাটতিজনিত নয়। বরং এটা জ্ঞাতসারে এবং প্রজ্ঞার ভিত্তিতে করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম এ নমনীয়তার মাধ্যমে নিজের বিধান প্রণয়নের ব্যবস্থাকে চিরন্তনতা প্রদান করেছে এবং এটাকে সর্বকালের এবং সর্বস্থানের উপযোগী ব্যবস্থার রূপ প্রদান করতে চেয়েছে। তৃতীয়ত, ইসলাম এই মুক্ত অঞ্চলটিকে Djj-Avgi (اولو الامر) তথা রাষ্ট্রের কর্ণধারের হাতে ন্যাস্ত করেছে, যাতে তিনি একে কল্যাণ বিবেচনায় এবং যুগ-জিজ্ঞাসার চাহিদা মাফিক শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূরণ করেন। এই তত্ত্বের মাধ্যমেই তিনি ইসলামি রাষ্ট্রে যুগোপযোগী অর্থনীতি এবং উন্নয়নের গতিশীলতা নির্ধারণ করেছেন।

এছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্রের কর্তব্য, রাষ্ট্রের কার্যক্রমের পরম উদ্দেশ্য, রাষ্ট্র ও সম্পদের মালিকানা প্রসঙ্গ, ব্যক্তি খাতের উপর নজরদারি, নীতিপন্থা প্রণয়ন, আয়ের পুনঃবণ্টন ইত্যাদি বিষয়গুলোও সবিস্তারে উপস্থাপিত হয়েছে এ অধ্যায়ে। দেখা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপমহাদেশের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন-এর অর্থনৈতিক চিন্তাদর্শনের সাথে বাকের সদরের এই অর্থনৈতিক দর্শনের সাযুজ্য রয়েছে। অমর্ত্য সেন যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা ও মানবিক আত্মবিকাশে নাগরিক চেতনার পরিপূরক স্বাধীনতার সপক্ষে জোর দিয়েছেন, বাকের সদর সেখানে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ আত্ম-শুদ্ধির মাধ্যমে বিকশিত স্বাধীন মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এই স্বকীয়তা হল সমর্পিত মানুষের স্বাধীনতার স্বকীয়তা। এখানেই মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির পথ-নির্দেশনায় অমর্ত্য সেন ও বাকের সদরের দর্শনের সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাংকিং ব্যবস্থার পতন থেকে বুঝা যায়, পাশ্চাত্যধারার পুঁজিবাদ অনেক সমস্যা তৈরি করেছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়'অর্থ' হচ্ছে নিছক বিনিময়ের মাধ্যম, ব্যবসায়ের পণ্য নয়। অর্থনৈতিক লেনদেনসহ যে কোন ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে সততার উপর আল-কুরআন জোর দিয়েছে। মুসলমানরা ব্যবসায়ে প্রতারণা করতে পারে না। তারা এমন কোন ব্যবসায়ে জড়িত থাকতে পারে না, যেখানে এক পক্ষের বিনিয়োগ থেকে আরেক পক্ষ মুনাফা অর্জন করে। কুরআন ঘোষণা করেছে 'তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।' সততার আত্ম-প্রত্যয়ের মূল উৎস শক্তি ঐশীবাণী থেকেই প্রাপ্ত। এখানেই মানবচিন্তাপ্রসূত জাগতিক ব্যবস্থাপনা ও ঐশীপ্রসূত জ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জাগতিক ব্যবস্থাপনায় মানুষ যে সুফল ভোগ করে তা সাময়িক সুখপ্রদ হলেও চিরকল্যাণকর কোন ব্যবস্থা নয়। শ্রমের মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সুষম বণ্টনে জগতে প্রতিষ্ঠিত যত তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে, এর অধিকাংশই নানা সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ। কেননা মানুষের ভোগরহিত ও বাসনা বহির্ভূত ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনিয়ন্ত্রিত সকল ব্যবস্থাপনা যতই মানবিক প্রচারণায় উচ্চকিত হোক না কেন, তা যদি ঐশী অনুভূতি অনুসৃত না হয় পরিণামে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সামাজিক অর্থনীতিতে দেখা যায়, যে উপায়ের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, বণ্টন ইত্যাদি কার্যগুলো সম্পাদন করা হয়, সেই পুরো ব্যাপারটি হল অর্থনীতি। অর্থনীতি একইসাথে পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞান (experimental science) ও মানব বিজ্ঞান (human science)। মোটাদাগে অর্থনীতির দুই ধরনের ব্যবস্থা আছে। এক. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এখানে রাষ্ট্র বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। দুই. পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে স্বনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার আসলে খুব একটা কার্যকর নয়। সমকালীন কতিপয় অর্থনীতিবিদ এই তথাকথিত স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার পেছনে 'ঈশ্বরের হাত' কাজ করে বলে মনে করেন! এদিক থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিটাই একটি সমস্যা। কিন্তু ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুক্তবাজার স্বয়ং কোন সমস্যা নয়, যদি তা মানুষের অধিকার ও তাদের প্রতি দায়িত্বপালনের ব্যাপারে যথাযথ নিয়মনীতি মেনে চলে।পুঁজিবাদ, নব্য-উদারবাদ ইত্যাদির মধ্যে আবার পুঁজিবাদের একটা নির্বিচারবাদী উপনিবেশিক অতীত রয়েছে। যেখানে একদল লোককে ধনী করার নিমিত্তে দাসব্যবস্থার পত্তন করা হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, কিছু পরিভাষা ও সংজ্ঞার সামান্য পরিবর্তনের আড়ালে প্রকৃত ঘটনা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি। তাছাড়া ব্যাপারটা শুধু অতীতেই নয়, এখনও বিদ্যমান। সেটা হচ্ছে বিশ্বায়ন। মূলত অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন। এটা বর্তমানকালের বৈশ্বিক ব্যবস্থা। এর উপর ভিত্তি করেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চলছে।

এই নব্য-উদারবাদের প্রসঙ্গে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে - এর প্রকৃত মর্মবাণী কী? মানবতার সেবাধর্মী কোনঅর্থনীতির কথা কি এখানে বলা হচ্ছে? নাকি, এমন এক ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে, যার একমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

চালিকা শক্তি হচ্ছে মুনাফা?এগুলোই হচ্ছে আমাদের জন্য সমস্যা। কারণ, যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে শুরুর প্রশ্নটা হবে ব্যবস্থাটির চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে। অর্থাৎ, এটি কী অর্জন করতে চায়? এটি কি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা ও মানুষের কল্যাণ অর্জন করতে চায়? এর সদুত্তর অবশ্যই মানবিকতার সপক্ষে যুক্তিনিষ্ঠ হতে হবে। কেননা, 'মানুষ'কে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে বিবেচনা করার অর্থ হল, অন্য সবকিছু হচ্ছে উপায় (means) মাত্র। কিন্তু যদি 'মুনাফা'কে কেন্দ্রে রাখা হয়, তাহলে ব্যক্তি তো বটেই, সমগ্র মানবজাতিও মুনাফা অর্জনের উপায়ে পরিণত হয়। এটাই হল নব্য-উদারবাদী ব্যবস্থা। এখানে মুনাফার স্বার্থেই সবকিছু করা হয়, এর পরিণতি যাই হোক না কেন। বৈশ্বিক অর্থনীতি তার স্বার্থে মানুষ ও জাতিসমূহকে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে দাসপ্রথা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র। অথচ দাসপ্রথা নিয়ে এখন আর তেমন কথা বলা হয় না।কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়, সর্বত্রই দাসপ্রথা রয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে শুরু করে গ্লোবাল সাউথ (অর্থাৎ আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং এশিয়ার অধিকাংশ দেশ) পর্যন্ত দাসপ্রথা এখনও বিদ্যমান। যেখানে নিছক অর্থ উপার্জনের জন্য বড় বড় বহুজাতিক করপোরেশন মানুষকে ব্যবহার করছে। দাসের ন্যায় সারাদিন খেটে একজন শ্রমিক পাবে মাত্র এক ডলার। এটা দাসত্বের নতুন ধরন। অথচ এ নিয়ে কেউ কথা বলে না, যেন এটা অতীতের কোন ব্যাপার। দাসপ্রথা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তাই আগের মত চোখে পড়ে না হয়ত; কিন্তু ব্যাপারটা এখনও আছে।

এদিকে পুঁজিবাদ ও এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে দেখা হবে? ব্যবসায় উদ্যোক্তাগণ এটা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। এমন কোন স্বতন্ত্র ইসলামি ব্যবসা বা ইসলামি ব্যবস্থা কী আছে, যাকে সঠিক বলা যায়? কেননা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এটা কোন সমস্যা বলে মনে হয় না। কুরআনে এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে, 'তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে- ব্যবসা তো সুদ নেয়ার মতোই! অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।' এ ভাষ্যের সহজ অর্থ হল, ব্যবসায় সম্পৃক্ত হওয়া। অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার মানে হল মানুষ পণ্য উৎপাদন করবে এবং সেগুলো বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করবে। এতে কোন প্রকার সমস্যা নেই। এটা ব্যবসা। এটা এমন 'একটা কিছু' যা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে হচ্ছে। তবে এটা অবশ্যই স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে। ইসলামি ব্যবস্থায় 'সুদ হারাম হওয়া'র মানে হল, কোন কিছু বিক্রি করার সময় অতিরিক্ত যা পেতে চায়, সেটা হারাম।প্রকৃতপক্ষে, ব্যাপারটা তখনই ঘটে যখন অর্থ নিজেই অর্থ উৎপাদন করে। অর্থাৎ যে অর্থ পণ্য উৎপাদন ছাড়াই অর্জিত হয়। কোনঅর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থ নিছক একটা উপায় (means) হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে নিজেই উদ্দেশ্যে (goal) পরিণত হলে তা অগ্রহণযোগ্য। যেমন, কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তি থাকতেই পারে। নৈতিক শর্তাবলি পূরণ করলে ইসলামের দৃষ্টিতে এতে কোন সমস্যা থাকে না। অর্থাৎ, মানুষকে শোষণ করা যাবে না, দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ উপায়ে ব্যবসা করতে হবে এবং অর্থ থেকে অর্থ বানানো যাবে না। তবে কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন আপত্তির নয়। অতএব, নিজস্ব অংশগ্রহণ ও ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে যা কিছুই করা হবে, ইসলামে তা অনুমোদিত। নিছক টাকা খাটিয়ে আরো টাকা উপার্জন এবং অন্যায্য লেনদেন নির্ভর কোন ব্যবস্থা চালু করার মতো ব্যাপারগুলো ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রহণযোগ্য।

এ অগ্রহণযোগ্যতা অপনোদনের লক্ষ্যেই বাকের সদর উপস্থাপিত ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব। ইসলামের বিশ্ববীক্ষা বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এমতাবস্থায় কেউ যদি ইসলামি উপায় অবলম্বন করে কিন্তু ইসলামি উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে না যায়, তাহলে এই ব্যবস্থা তার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলবে। একারণে আসলে উপায় ঠিক আছে কিনা, তা যাচাই করার আগে উদ্দেশ্য ঠিক আছে কিনা, তা যাচাই করতে হবে। অর্থাৎ আমরা কী

অর্জন করতে চাই? তথাকথিত 'ইসলামিক বিজনেস' বা 'ইসলামিক কেয়ার এন্টারপ্রাইজ' বা 'ইসলামিক ব্যাংক' জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যদের চেয়ে যথাসম্ভব বেশি টাকা উপার্জন করতে চায়। তারা বলতে চায় যে তারা বেশি দক্ষ। কিন্তু এটা কোন যুক্তি নয়। মূলকথা হচ্ছে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু কি মানবতার সেবা, নাকি মুনাফা অর্জন?

ইসলামি অর্থনীতি ‖ie⁄ ও ফটকাবাজির নিষিদ্ধতা এবং যাকাত, ওয়াক্‌ফ ও সমবায় নিয়ে কাজ করার কথা বলে। এ কারণেই ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যবসা করাকে উৎসাহিত করতে হবে। তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা নৈতিক ভিত্তি থাকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, পুরো প্রক্রিয়াটির সাথে যিনি জড়িত, তার উদ্দেশ্য ও ব্যবহৃত উপায়কে যাচাই করতে হবে। দুর্নীতি ও ফটকাবাজি না করে পণ্যটি বিক্রির ঝুঁকি নিতে হবে। এটা হল শুরুর কথা। নয়া-উদারবাদ ব্যবস্থায় মুনাফার প্রতি যে বিকার লক্ষ্য করা যায়, তা থাকা যাবে না। দ্বিতীয়ত, সকল উপায় হতে হবে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে, যা পুঁজি ও অর্থকে পরিচালিত করবে। মানব কল্যাণভিত্তিক অর্থনৈতিক বীক্ষা থাকতে হবে। এটা হতে হবে এমন একটা কিছু, গরীবের অধিকার হবে যার কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয় এ কারণেই। অর্থাৎ ধনীদের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ নিয়ে তা গরীবদের মাঝে বণ্টন করা, যাতে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এটা নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হচ্ছে ধনী ও ক্ষমতাবানদের অধিকারকেন্দ্রিক।

বর্তমানে যে কোন ব্যবসা বা ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে ওঠার অন্যতম একটা উদ্দেশ্য হলো মুনাফা করা। মুনাফা করার অধিকার অবশ্যই থাকবে। কিন্তু এই মুনাফা কীভাবে করা হবে, সেটাই বিবেচ্য বিষয়। উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে শুধু উপায়কে গুরুত্ব দেয়ার প্রবণতাও পর্যালোচনার দাবি রাখে। ইসলামে মুনাফা অর্জনে কোন বারণ নেই। কিন্তু তাই বলে উপায়কে উদ্দেশ্যে রূপান্তর করা যাবে না। কেউ ধনী হওয়া মানে তিনি মন্দ লোক, আবার কেউ গরীব হলে তিনি ভাল- ব্যাপারটা এমন নয়। ইসলামে এ রকম কোন ধারণা নেই। নৈতিকভাবে ভাল মানুষ হতে হলে তাকে অবশ্যই গরীব হতে হবে- এ ধরনের ধারণা মূলত খ্রিষ্টান প্রথায় রয়েছে। ইসলাম এমনটা বলেনি। কেউ ধনী হয়েও ভাল হতে পারে, আবার গরীব হয়েও মন্দ হতে পারে। এটা কোন প্রসঙ্গ নয়। আসলে ব্যাপারটা নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়ত, উপায় ও উদ্দেশ্যের উপর। বিষয়টিকে নৈতিক জায়গা থেকে বিবেচনা করতে হবে। তাই শুধু উপায়কে ইসলামিকরণ করা হবে, আর উদ্দেশ্যকে পুঁজিতান্ত্রিকই রেখে দেওয়া হবে- তা যেন না হয়। আবার, উদ্দেশ্যকে নিছক আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামিকরণ করা হবে, আর অনৈসলামি উপায় ব্যবহার করা হবে- সেটাও যেন না হয়। বর্তমান সমগ্র বিশ্বব্যবস্থাটিই চলছে এমন করে, যার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্য কথা হল, অর্থব্যবস্থার ইসলামি প্রেক্ষিত নিয়ে আন্তরিক হলে দেখা যাবে, প্রচলিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন বিকল্প আমাদের হাতে নেই। আমাদের আছে কিছু মূলনীতি ও উদ্দেশ্য। কিন্তু এগুলোকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে, তা প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঐশী অনুসৃত কোন সমাধান আমাদের জানা ছিল না। যেখানে হারাম ও হালালের মধ্যে কৌশলগত মিশ্রণের মধ্য দিয়ে একটি অস্বচ্ছ দৃশ্যমান সমাধান প্রচলিত ছিল, সেটাকে খণ্ডন করে বাকের সদর ইসলামি আদর্শের এক নতুন মানবিক ঐশীপ্রসূত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র উদ্ভাবন করেছেন। যেখানে মানুষের জীবনযাত্রায় কোন হারাম হালালের সংমিশ্রণ পদ্ধতি যুক্ত করার প্রয়োজন পড়ে না।

প্রচলিত নয়া-উদারবাদী ব্যবস্থা দুনিয়ার মাত্র দশ শতাংশেরও কম মানুষকে সুরক্ষা দিচ্ছে! এটাই বাস্তবতা। দুনিয়ার বাদবাকি মানুষ বর্তমানে এই ব্যবস্থার নীরব শিকার। তার মানে ব্যবস্থাটি মানবিক কার্যকারিতার সুফল পাচ্ছে না। এটি অন্যায় ও অনৈতিক। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। আল্লাহ্ বলেন, 'হে

বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।' কেউ যদি অর্থ উপার্জনেরস্বার্থে মানুষকে মেরে ফেলতে থাকে, অর্থাৎ এই ব্যবস্থাকে জারি রাখে তাহলে যুদ্ধের হুশিয়ারি দেয়া হচ্ছে। কারণ, এটা শুধু মানুষ মারার একটা হাতিয়ারই নয়, বরং যে কোন প্রকার অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে মুনাফা অর্জনের জন্য, যা নিতান্তই অমানবিক। এই অমানবিকতার বিরুদ্ধেই বাকের সদরের দর্শন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতার দাবি রাখে।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শেষ দিকে সর্বশেষ যে বিপর্যয়টা গেল, তারপর আমরা স্টিগলিজ, জর্জ সরোসসহ কোন কোন অর্থনীতিবিদের কাছ থেকে শুনেছি, 'আমাদের আসলে কী দরকার? আমাদের দরকার একটা নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ।' অন্যদিকে কোন কোন মুসলিম পণ্ডিতের নিকট থেকে এমনটাও শোনা যায় যে, 'এটা তো ঠিক তা-ই, মুসলিম হিসাবে আমরা যা বলে আসছি। অর্থাৎ ইসলাম এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদকে উৎসাহিত করে।' প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের এ ধারণা ঠিক নয়। সম্ভাব্য সকল পন্থায় অর্থ উপার্জন তথা মুনাফা করা যে ব্যবস্থার কেন্দ্র, তাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। অপরপক্ষে একটা মডেল থাকা সত্ত্বেও ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু না হওয়ার কারণ হল, বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় এটি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তারা এ থেকে ফিরে আসতে চায় না, যদিও তারা যথেষ্ট ধনী। উপসাগরীয় দেশগুলোর দিকে তাকাই, আর আফ্রিকার দিকে তাকাই- দেখা যাবে এরা যথেষ্ট ধনী। আফ্রিকাও যেখানে সমস্ত ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল। কিন্তু উপনিবেশবাদের কারণে তাদের সবই চুরি হয়ে গেছে। উপনিবেশবাদ আজও বিদ্যমান। রাজনৈতিক উপনিবেশবাদ না থাকলেও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ এখনও আছে। এটা একটা বাস্তবতা। কিন্তু উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো তেল, গ্যাস ও অর্থবিত্ত নিয়ে যা করছে, সেগুলো দেখার পর আমরা শুধু অন্যদেরকেই দোষারোপ করতে পারি না। এসব দেশের সম্পদ বিশ্বের বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র ও বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন। তারা এগুলো তাদের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করছে। এমতাবস্থায় আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা দরকার- আমরা কি সত্যিই একটা বিকল্প চাই? যদি চাই, তাহলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিভাষার জায়গা থেকে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের কথা বলতে হবে। বিকল্প তৈরি করার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে কথা বলা শুরু না করে গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে অর্থনীতির মাধ্যমে। গরীবের অধিকার, যাকাত, মুনাফার নিয়ন্ত্রণ- এইসব আমরা কীভাবে পরিচালনা করছি, তার উপর সামাজিক ন্যায়বিচার নির্ভর করছে। যে কেউ মুনাফা করতে পারে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পৃক্তহতে পারে; কিন্তু মানুষকে শোষণ করা কারও লক্ষ্য হতে পারবে না, অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষকে মেরে ফেলা যাবে না। বর্তমানে তো অনেকটা তাই ঘটছে। তাই এসব সমকালীন সমস্যা মোকাবিলা করতে আমরা বাকের সদর উপস্থাপিত ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে পারি।

যে কারণে বাকের সদর প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি পুনর্বিন্যাস করেছেন, তা অর্থনৈতিক পূর্ব ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কারণেই নির্দেশিত হয়েছে। তিনি দেখেছেন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা দিন দিন এক ধরনের অস্ত্রে পরিণত হচ্ছে। এই আগ্রাসন থেকে নিজেকে রক্ষা করা কিম্বা প্রতিরোধের জন্য ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় সুদমুক্ত অর্থনৈতিক রক্ষাকবচের সূত্র আবিস্কার করেছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনাচরণ একটি ঐশী বিধান সমন্বিত দিক-নির্দেশনাসহ প্রয়োগের মাধ্যমে সকল জাগতিক সমস্যা একযোগে মোকাবিলা করা সম্ভব। অবশ্য পরিতাপের বিষয় হচ্ছে বাকের সদরের সুদমুক্ত ব্যাংকিং পরিকল্পনাটি তাঁর পরবর্তীকালে মুসলিম অর্থনীতিবিদদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ করা হয়নি। ফলে বাকের সদরের প্রস্তাবনা অনেকাংশে তাঁর Avj-e¨vsK Avj jv-iveweq¨vn0i ব্যাখ্যার মধ্যেই

থেমে রয়েছে। যদিও ইসলামি সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা নামে যতটুকু বাস্তবায়ন করা গেছে তা নিঃসন্দেহে এ মনীষীর চিন্তা ও উদ্ভাবনের কাছে ঋণী।

প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী কাঠামোর বিকল্প হিসেবে একটি র্নিভরযোগ্য ও টেকসই ইসলামি বিকল্প কীভাবে তৈরি করা যায়, কিংবা এমন কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা কি সম্ভব, যা মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে সাহায্য করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে সৃষ্টিকূলের সেবাকার্যের সহায়ক হবে?

ঠিক এই জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে অগ্রসর হলে বাকের সদরের আর্থ-সামাজিক দর্শনকে সমহীমায় জানা সম্ভব হবে। কারণ, বাকের সদর কেবল ইসলামি অর্থনীতির কিছু তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি ইসলামি অর্থনীতির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন, যা মুসলিম জাহানে নিতান্তই বিরল। এ কৃতিত্বের জন্য ইতোমধ্যে বাকের সদরকে মুসলিম জাহানে 'আধুনিক ইসলামি অর্থনীতির জনক' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছে। এ প্রস্তাবটি সুবিবেচনার দাবি রাখে। কারণ ইসলামি অর্থনীতি এমন এক চিন্তাগত ভিত্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে যা বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে সৃষ্টির কেন্দ্রীয় অক্ষ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। এ অর্থনীতি পূর্ণরূপে ইসলামি মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। এখানে শোষণ কোন মাত্রায় কিংবা কোন রূপেই গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্‌র সামনে তার জবাবদিহিতা রয়েছে। এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা ইসলামি অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও মানবিকতার সঞ্চার করে। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের সদর ইসলামের সেই মানবিকতাপূর্ণ দর্শনের আলোকে ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতিগুলোকে আবিস্কার করার প্রয়াস চালিয়েছেন এবং এটাকে আধুনিক বিশ্বের প্রতাপশালী দুই অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সমান্তরালে তৃতীয় একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র অর্থ-ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরেছেন। আর এক্ষেত্রে তিনি কোন হীনমন্যতার আশ্রয় না নিয়ে বরং অকপটে এর নামকরণ করেছেন 'ইক্‌তিসাদুনা' অর্থাৎ আমাদের (মুসলমানদের) অর্থনীতি। এখানে মুসলমানদের অর্থনীতি মানে কোন সম্প্রদায়ের অনুকূলে বা সপক্ষের গৌরবগাঁথা নয়, এটি সমগ্র আত্ম-সমর্পিত মানব জাতির সমাজ ও জীবন ব্যবস্থারই এক সর্বমানবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

উল্লেখ্য যে, মাত্র ৪৭ বছর আয়ুষ্কালে এই ক্ষণজন্মা চিন্তাবিদ আর্থ-সামাজিক দর্শনে যে অবদান রেখেছেন, তা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে খুবই বিরল। অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি জগতে একাধিক মনীষীদের চিন্তার নির্যাস আমরা নানা আলোচনায় অবগত হই। কিন্তু বাকের সদরের আর্থ-সামাজিক চিন্তা দর্শনের মত এতো পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ইতোপূর্বে উপস্থাপিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এতদ্ভিন্ন আরও উল্লেখ্য যে আর্থ-সামাজিক দর্শন নিয়ে বাকের সদর একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করলেও তাঁর BKwZmv`bv গ্রন্থটি সর্বাধিক আলোচনায় এসেছে। অনেকে আবার অপরাপর গ্রন্থে আলোচিত তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা ও দর্শনকে শুধুই BKwZmv`bv গ্রন্থে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন। এতে বাকের সদরের আর্থ-সামাজিক চিন্তা দর্শনের অখণ্ড অবয়ব উপেক্ষিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাকের সদরের উপস্থাপিত ইসলামি অর্থনীতির মডেল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আলো আর আঁধারে মিশে আছে। বলা যাবে না যে পুরোপুরি সফল, আবার এটাও বলা যাবে না যে তা ব্যর্থ। কেননা এ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রকেই বাকের সদরের মডেলকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করে তার অর্থনীতি পরিচালনা করতে দেখা যায়নি। ব্যাংকিং, খাজনা বা কর ... কোনটাই না। বড়জোর এটুকু বলা যায় যে, কিছু কিছু রাষ্ট্র বাকের সদরের চিন্তাধারা আংশিক গ্রহণ করেছে মাত্র। নিশ্চয় এতটুকু দিয়ে তাঁর উপস্থাপিত মডেলের ভাগ্য নির্ধারিত হতে পারে না এবং এর সফলতা বা ব্যর্থতার রায় দেওয়া যায় না। ঠিক যেমন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যখন কোন ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন, তখন যদি তা পুরোপুরি অনুসরণ না করা হয় তাহলে এজন্য চিকিৎসককে ব্যর্থ বলে দায়ী করা যায় না।

বাকের সদরের ব্যবস্থাপত্রের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কিংবা উদারনৈতিক অর্থনীতি যেভাবে দীর্ঘ সময় ধরে দেশে দেশে চর্চা হয়েছে এবং সে অভিজ্ঞতার আলোকে আজ তাদের সফলতা বা ব্যর্থতার ব্যাপারে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়, বাকের সদরের ইসলামি অর্থনীতির মডেলের ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই। এটা তাঁর প্রতি অবহেলার বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। তাঁর অভিনব চিন্তা ও তত্ত্বগুলো যতবেশি তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার, বিপরীতে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ঠিক সেই অনুপাতে কম। তবে আশার কথা হল তৎকালীন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাইখ ড. আহমদ শওকী কর্তৃক এবং পরবর্তীকালে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে বাকের সদরের BKwZmv' bv পাঠ্য ও গবেষণার বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এভাবে গোটা মুসলিম জাহানে বাকের সদরের আর্থ-সামাজিক দর্শন চর্চা আরও সম্প্রসারিত হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, ইসলামি অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের বাকের সদর প্রস্তাবিত অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সব জটিলতা রয়েছে, সে সম্পর্কে যথাযথ অধ্যয়ন ও গবেষণা করে বর্তমান বিশ্বে বাস্তবায়নযোগ্য ইসলামি বিধান সমন্বিত অর্থনৈতিক দর্শন উপস্থাপন করা একান্তভাবেই উচিত।

mnvqK MšcÄx

MšcÄx:

১. আল-কুরআন, বঙ্গানু. মাওলানা মোবারক করীম জওহর, (কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, ২০০৫)।

২. আরসানজানি, হাসান, nv‡Kwgqv‡Z †`ŠjvZnv, (১ম মুদ্রণ), (তেহরান : সাজমানে কেতাবহায়ে জেইবি, ১৩৪২ সৌ. সন)।

৩. Avj-gvRgAvZ Avj-Kwgjvn wj Avj-mvB‡q¨` ewKi Avj-mv`i, (বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল-মাতবুআত, ১৯৮০, খ. ১৩)।

৪. আলম, ড. রশীদুল, mgvR`k©‡bi fwgKv, (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৮)।

৫. আল-হাকিম, সাইয়্যেদ মুনযির, মুজতামাউনা ফি তুরাছি আল-শাহীদ বাকির আল-সাদর, (বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল মাতবুয়াত, ২০১২)।

৬. আল-হাকিম, সাইয়্যেদ বাকের, Rv‡g wkbwQ Avh w``Mv‡n KiAvb, ফা. অনু. মুসা দানিশ, (মাশহাদ : ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ১৩৭৮ সৌ. সন)।

৭. আল-হাসান, নাযিয়াহ, Avj-mvB‡q¨` gnv¤§v` ewKi Avj-mv`i : w`ivmvZb wd Avj-gvbnvR, (বৈরুত : দার আল-মাআরিফ লিল মাতবুয়াত, ১৯৯২)।

৮. ইবনে খালদুন, Avj-gKwÏgv, বঙ্গানু. গোলাম সামদানী কোরায়শী, (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০১৫)।

৯. ইস্পাহানী, রাগেব, Avj-gdiv`vZ wd Mwie Avj-KiAvb, (তেহরান : নাশর আল-কিতাব, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৫)।

১০. এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক, cwievi, e¨w³MZ gwjKvbv I iv‡ói DrcwË (Øv`k g`Y), (কলিকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ২০১৫)

১১. এল লিয়েনটিয়েভ, gvKmxq A_bwZ, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি. ২০১৪)।

১২. কারাম, ড. ইউসুফ, AvZ-Zweeq¨v Iqv gvevÒ`v AvZ-Zwweq¨v, (বৈরুত : মাকতাবাতু আছ-ছাকাফাতু আল-দ্বীনীয়্যা, তা. নে.)।

১৩. করিম, ড. কে. এম. রেজাউল, AvawbK mgvRweÁv‡bi ZË¡ (দ্বিতীয় সংস্করণ), (ঢাকা : এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০০৭)।

১৪. করিম, ড. নাজমুল, mgvRweÁvb mgxÿY, (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০১৬)।

১৫. করিম, সরদার ফজলুল, `kb‡Kvl, (ঢাকা : প্যাপিরাস, জুলাই ২০০৬)।

১৬. ______________ , iæ‡kvi †mvk¨vj KbUv±, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০)।

১৭. কুলায়নী, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব, Dm‡j Kwd, (কোম : ইন্তিশারাতে ইসলামিয়্যা, ১৩৮৪ সৌ. সন.)।

১৮. খলিল, ড. ইব্রাহীম, Bmjv‡g A_©e¨e¯'v, (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৩)।

১৯. ________ , mvgwRK mgm¨v mgvavi‡b Bmjv‡gi wbavb : ‡cÖ¶vcU evsjv‡`k, (ঢাকা : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭)।

২০. খান, আকবর আলী, civ_ciZvi A_bxwZ, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৫)।

২১. খোল্দ, সোফিয়া, mgvRwe`¨vi msw¶ß kã‡Kvl, (মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন, ১৯৯০)।

২২. গেস্ট, ডেভিড, ØvwšØK e¯‘ev` : gvKmxq `k©bi fwgKv, বঙ্গানু. আনন্দময়ী মজুমদার, (ঢাকা : সাহিত্যিকা, ২০০৩)।

২৩. চাকমা, নীরুকুমার, Aw¯ÍZev` I e¨w³¯^vaxbZv, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩)।

২৪. জামশিদী, মুহাম্মদ হোসাইন, C`vjvZ Avh w``Mv‡n dviwe, m`i Iqv Bgvg †Lv‡gBwb, (তেহরান : মুআসসেসে-এ নাশ্‌র, ২০০১)।

২৫. তাবাতাবাঈ, মোহাম্মদ হোসাইন, Bmjvg Iqv BRwZgv, (কোম : জাহানঅরা, তা. নে.)।

২৬. তাসখিরী, আলী, `vimnwq Avh BKwZmv`-B Bmjwg, (তেহরান : সজমানে তাবলিগাতে ইমলামি, ১৩৮২ সৌ. সন)।

২৭. নূরুজ্জামান, wPivqZ mgvRwPšÍv, (ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩)।

২৮. পরসানিয়া, হামিদ, Rvnvbnv‡q BRwZgwq, (কোম : কিতাবে ফারদা, ১৩৯১ সৌ. সন.)।

২৯. ফারশাদ, শারিয়াত, Rb jK Iqv Awb›`‡k‡q Ahwi`, (তেহরান : অসাহ্ পাবলিশার্স, ১৩৮০সৌ. সন.)।

৩০. বটোমোর, টম, mgmvRwe`¨v : ZË I mgm¨vi i/c‡iLv, বঙ্গানু. হিমাচল চক্রবর্তী, (কলকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৮)।

৩১. gImAvZ Avj-kvnx` Avj-mv`i (বৈরুতঃ দার আল মাআরিফ লিল মাতবুয়াত, ২০১২)।

৩২. মার্কস, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রিডরিখ, Rgvb fvev`k, বঙ্গানু. গৌতম দাস, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৯)।

৩৩. _____________ , কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, (ঢাকা : সংঘ প্রকাশন, ২০১৪)।

৩৪. মার্কস, কার্ল, `¨ MæwÛwi‡m, ফা. অনু. বাকের পুরহাম, (৩য় মুদ্রণ), (তেহরান : অগাহ্ পাবলিকেশন্স, ১৩৭৮ সৌ. সন)।

৩৫. _______ , `¨ †cvfwU Ae wd‡jvmwd, (ফা. অনু. আর্টিন আরাকেল), তেহরান : আহওয়ারা পাবলিকেশন্স, ১৩৮০ সৌ. সন)।

৩৬. _______ , cwR, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, (প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৮)।

৩৭. _______ , A_kv¯¿-wePvi cm‡½, বঙ্গানু. প্রফুল্ল রায়, (ঢাকা : সংঘ প্রকাশন, ২০১৬)।

৩৮. মোতাহ্হারি, মূর্তাজা, Bmjvg Iqv wbqvhnv‡q hvgvb, (কোম : সাদরা প্রকাশনী, ১৩৯৬ সৌ. সন)।

৩৯. ____________ , Rv‡g‡q Iqv ZwiL, (কোম : ইন্তেশারাতে সাদরা, ১৩৮৫ সৌ. সন)

৪০. মাহমুদ, ড. আবু, gvKmxq wekex¶v -1 (পরিমার্জিত দ্বিতীয় প্রকাশ), (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৯)।

৪১. ম্যুর, টমাস, BD‡UvwcqV, বঙ্গানু. মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান, (ঢাকা : প্যাপিরাস, ২০০৩)।

৪২. মিসবাহি, গোলাম রেযা, evii wm‡q wm‡¯Ígnv‡q BKwZmvw`, (কোম : কানুনে ইন্তেশারাতে নাসের, তা. নে.)।

৪৩. রহমান, শাহ্ মুহাম্মদ হাবিবুর, A_bxwZ cwRev` I Bmjvg, (ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১৬)।

৪৪. রায়, সুপ্রকাশ, gvK‡mi K¨wcUvj, (কলকাতা : র‌্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, চতুর্থ প্রকাশনী, ২০১৫)।

৪৫. লেনিন. ভি, আই, bv‡iv`ev‡`i A_©bwZK gge¯, বঙ্গানু. দাউদ হোসেন, (ঢাকা : সংঘ প্রকাশন, ২০02)।

৪৬. __________ , A_©bwZK †ivgvw›UKZvev`, বঙ্গানু. দাউদ হোসেন, (ঢাকা : সংঘ প্রকাশন, ২০০২)।

৪৭. __________ ,mvg¨vR¨ev` cwRev‡`i m‡ev”P chvq (প্রভাত পট্টনায়কের ভূমিকা সম্বলিত- দ্বাদশ মুদ্রণ), (কলিকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২)

৪৮. সদর, সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকের, dvjmvdvZbv, (বৈরুতঃ দার আত-তাআরুফ, ১৯৮৯)।

৪৯. ________ , gKvÏvgv wd Avj-Zvdmxi, (কুয়েতঃ আল-দার আল-ইসলামিয়্যা, ১৯৮২)।

৫০. ________ , BKwZmv`bv, (†Kvg : gvKZve Avj-Avÿjvg Avj Bmjvwg, ১৩৭৫ সৌ. সন)।

৫১. ________, wimvjvZbv, (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-ইসলামি, ২০০৪)।

৫২. __________ , Avj-gimvj, Avj-ivmj, Avj-wimvjvn, (বৈরুত : দার আত-তাআ'রুফ, ১৯৮৯)।

৫৩. ________, Avj-Bmjvg BqvK` Avj nvqvZ, (তেহরানঃ ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক সার্ভিসেস্, তা. নে.)|

৫৪. ________ , BLZvibv jvKv, (বৈরুতঃ দার আল-যাহরা, ১৯৮২)।

৫৫. ________ , wLjvdvZ Avj-Bbmvb Iqv kvnv`vZ Avj-Awm¤qv, (বৈরুত : দার আল-মাআরিফ আল-হিকামিয়াহ্, ২০১৪)।

৫৬.__________ ,Avj-e¨vsK Avj-jv-ivewe`q¨v wd Avj-Bmjvg, (তেহরান : মারকায আল-আবহাছ ওয়া আল-দিরাসাতু আত-তাখসিসিয়্যা, ১৪১০হি.)।

৫৭. _________ , mivZ Avb BKwZmv` Avj-gRZvgv Avj-Bmjvwg, (তেহরান : বেযারাতে এরশাদ-এ ইসলামি, তা. নে.)।

৫৮. _________, Avj-gv`ivmZ Avj-Bmjvwgq¨v, (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-লুবনানি, ২০১১)।

৫৯. _________ , Avj-gv`ivmZ Avj-KziAvwbq¨v, (বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল মাতবুয়াত, ১৯৮৯)।

৬০. _______ , BQev‡Z †Lv`v ev iv‡f‡k Bjwg Iqv dvjmwd, (ফা. অনু. মাহমুদ আবেদি), (তেহরান : রুজবেহ, ১৩৬২ সৌ. সন.)।

৬১. _________ , jgnvZ wdKwnq¨v Avb gvkiæwq `v¯i Avj-Rgûwiq¨vZ Avj-Bmjvwgq¨vZ wd Bivb, (নাজাফ : প্র. নে. ১৩৯৯ হি.)।

৬২. __________ , Avj-ûiwiqv wd Avj-KziAvb, (বৈরুত : দার আত-তাআরুফ লিল মাতবুয়াত, ১৯৮৯)।

৬৩. সরকার, জাহাঙ্গীর আলম, gnv¤§` BDbm‚Ûi mvgwRK e¨emv, (ঢাকা : অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০১৪)।

৬৪. সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, mgvR`kb, (কলিকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৬১)।

৬৫. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, gvbe mgvR, (ঢাকা : হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১২)।

৬৬. হাকিমী, রেযা, wKZve Avj-nvqvZ, (তেহরান : মাকতাবু নাশর আল-সাকাফাতু আল-ইসলামিয়্যা, ১৪১০ হি.)।

৬৭. হায়েরি, সাইয়্যেদ কাযেম হোসাইনি, gvewnmj Dmj, (কোম : দাফতারে তাবলিগাতে ইসলামি, ১৪০৭ হি.)।

৬৮. হাশেমী, সাইয়্যেদ মাহমুদ, eûQ wd Bjg Avj-Dmj, (কোম : দায়েরাতুল মাআরিফ আল-ফিক্হ আল-ইসলামি, ২০১০)।

৬৯. হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল গং, Bmjv‡gi A_e¨e¯v, (ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭)।

৭০. হোসাইনী, সাইয়্যেদ আকিল, bvhwi‡q-G Avi‡hk Iqv †KBgvZ, (তেহরান : পার্লামেন্টারী রিসার্চ সেন্টার পাবলিকেশন্স, ১৩৯৩ সৌ.সন)।

৭১. A. Anikin, *Science in Its Youth: Pre-Marxian Political Economy,* (Tr. Persian, Naser Gilani), (Tehran : Terang Publishers, 1987) ।

৭২. Abu Yala, Muhammad b. Husayn. *Al-Ahkam al-Sultaniyah,* (Cairo : Matba‘ah Mustafa, 1966).

৭৩. Ahmad, Ziauddin. et al. Ed. *Fiscal Policy and Resource Allocation,* (Islamabad : Institute of Policy Studies, 1983).

৭৪. Al-Sadr, Muhammad Baqir, *Iqtisaduna (Our Economics),* Tr. & Pub. by WOFIS : World Organization For Islamic Services, Tehran, 1983.

৭৫. ________, *Contemporary Man And The Social Problem,* (Tr.& Pub. by WOFIS : World Organization For Islamic Services, Tehran, 1986).

৭৬. Aron, Raymond, *Main Currents In Sociological Thought,* (New York : Basic Books Inc. 1993).

৭৭. Ayub, M.N. *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice. (*Karachi: SBP Press, 2002).

৭৮. Azam, K.M., *Economics and Politics of Development: An Islamic Perspective,* (Karachi, Royal Book Company, 1968).

৭৯. Bronowski, J. & Bruce, Mazlish, *The Western Intellectual Tradition, From Leonardo to Hegel*, Tr. (Persian), Laila Sajesar, 3rd Ed., (Tehran : Agah Publishers, 1379 SH.)।

৮০. Bullivant, Alison, *The Little Book of Humorous Quotations,* (Bristol: Paragon, 1994).

৮১. Burtt, E. A. *The Metaphysical Foundations of Modern Science*, Tr. (Persian), Abdul Karim Surush, 3rd Ed. (Tehran : Ilmi-Farangi Publications Co. 1378 SH)

৮২. Choudhury, MasudulAlam. *Islamic Economic Co-operation*. (New York, 1989).

৮৩. Dewett, K.K, *Modern Economic Theories,* (New Delhi : S. Chand and Company, 2003).

৮৪. Diakonoff, Igor M., *The Paths of History*, (Cambridge University Press, 1999).

৮৫. Durant, Will, *The life of Greece*, (New York: Simon and Schuster, 1966).

৮৬. Frederick, Charles Copleston, *A History of Philosophy, The British Philosophers from Hobbes to Hume*, Tr. (Persian), Amir Jalaluddin, 3rd Ed. (Tehran : Surush Publishers, 1375 SH)

৮৭. Ghazanfar, S.M., ed., *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*. (London: Routledge/Curzon, 2003).

৮৮. Gide, Charles and Rist, Charles, *A History of Economic Doctrines, from the time of the physiocrats to the present day*, Tr. (Persian), Dr. Karim Sanjabi, (Tehran : University Press,1380 SH)

৮৯. Haneef, Mohamed Aslam, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis, (*Kuala Lumpur : Ikraq,1995).

৯০. Haque, Ziaul. *Islam and Feudalism: The Economics of Riba Interest and Profit*, (Srinagar :Gulshan Publishers, 1991).

৯১. Hausman, Danil M., and Michael S. McPherson *Economic Analysis and Moral Philosophy*, 2004.

৯২. Holz, Hans Heinz, *Sociology, Philosophy and Change*, Tr. (Bengali), Hasanuzzaman Chowdhury, (Dhaka, Bangla Academy, 2004).

৯৩. IbnTaimiyah, *Al-Hisbah fi al Islam*, Tr. English *(Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*) Muhtar Holland, (London:The Islamic Foundation, 1982).

৯৪. Iqbal, Allama Muhammad, *Ilmul Iqtisad*, (Lahore : Iqbal Academy Pakistan, 1996).

৯৫. __________________ , *The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam*, (Lahore : Institute of Islamic Culture, 2006).

৯৬. Ismail, Syed Muhammad, *Critical Analysis of Capitalism, Socialism and Islamic Economic Order, (*New Delhi : Adam Publishers and Distributers, 2008).

৯৭. Jones, Pip, Bradbury & Boulillier, Shaun Le, *Introducing Social Theory*, (Cambridge : Polity Press, 2011).

৯৮. Jordac, George, *The Voice of Human Justice*, Tr. (English), M. Fazal Haq, (Karachi :Islamic Seminary of Pakistan, 1990)

৯৯. Khan, Muhammad Shabbir, *Social Structure and Economic Change in Islam*, KitabGhar (Aligarh : Educational Publishers, 1987).

১০০. Levy, R. *The Structure of Islam*, (Cambridge, 1975).

১০১. Little, Daniel, *Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science*, Tr. (Persian), Abdul Karim Surush, (Tehran : Muassese Farhangi Serat, 1373 SH).

১০২. Losee, John, *A Historical Introduction to the Philosophy of Science*, Tr. (Persian), Alipaya, 2rd Ed. (Tehran : Samt Publications Co. 1377 SH).

১০৩. Mackenzie, *Outlines of Social Philosophy, (*London: George Allen and Unwin Ltd. 1918).

১০৪. Mannan, Muhammad Abdul. *The Frontiers of Islamic Economics*, (Delhi: Idarah-i Adabiyat, 1984).

১০৫. ___________________, *The Making of an Islamic Economic Society Islamic Dimensions in Economic Analysis*. (Cairo : International Institute for Islamic Banking and Economics, 1984).

১০৬. Manzoor, Nayyar. *Islamic Economic: A Welfare Approach*. (N.P., Saad Publications, 1986)

১০৭. Marx, Karl, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Tr. by N.I. Stone, (Chicago : Charles H. Kerr & Company, 1904).

১০৮. Marshall, G.S. Hodgson, *History of Religions*, 1954, vol. 3.

১০৯. Naqvi, Syed Haider , *Development Economics : A New Paradigm*. (New Delhi: Sage Publications, 1993).

১১০. Nikolsky, Nikolai, *The Philosophy of New Thinking and The Soviet Initiatives,* (Calcutta : Allied Publishers Private Limited, 1988).

১১১. Piero V. Mini, *Philosophy and Economics: The Origins and Development of Economic Theory*, Tr. (Persian), Murtaza Nusrat & Hussain Ragfar, (Tehran : Ilmi-Farangi Publications Co. 1375 SH).

১১২. Pifer, Josef, “Scholasticism,” in *Encyclopedia Britannica*, 1978.

১১৩. Rodinson, Maxime, *Islam etCapitalisme*, (Paris: 1966).

১১৪. Scruton, Roger, *Modern Philosophy*,(Hammondsworth : Penguin Books, 1994).

১১৫. Sen, Amartya, *The Idea of Justice*, (New Delhi : Penguin Books India Pvt. Ltd., 2009).

১১৬. Shariati, Ali, *Vizegihaye Qurune Jadid* (Features of the New Ages), (Tehran : Chapaksh Publications, 1988).

১১৭. Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Banking without Interest*. (Delhi: Markazi Maktaba Islamic, 1972).

১১৮. Smith, Adam, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*- a selected Edition, Sutherland, Kathryn, ed., (Oxford University Press, 1993) Book-I.

১১৯. Turner, Bryan, S, *Weber and Islam*, Tr. (Persian), Hussain Bustam, (Qom : Joytun Printing Foundation. 1385 SH).

১২০. Vincent, Andrew, *Theories of the State*, Tr. (Persian), Hussein Basiriyeh, (Tehran: Nei Publication, 1992).

১২১. Weber, Max: *Economy and Society*, Vol.3, 1905.

১২২. ______, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Tr. by Talcott Parson, (Routledge, London and New York. 1930).

cÎ-cwÎKv I mvgwqKx :

১. mgvR A_bxwZ I ivó সাময়িকী, (ঢাকা : সমাজ গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত, সংখ্যা ৮, জানুয়ারী ২০১৪)।

২. ˆ‘wbK hMvšÍi, (ঢাকা : ৪ঠা এপ্রিল ২০১৬ সংখ্যা)।

৩. *Quarterly Kayhan-e Andishey*, (Tehran, 1376 SH, N. 71).

৪. *Iqtesad-e Islami Research Journal,* (Tehran, 1381 SH, Y 2, N. 8).

৫. *Quarterly Motaleyat-e Ma'refat*, (Tehran, Daneshgahe Islami, 1393 SH, N. 59, Summer).

৬. *The Journal of Economic Literature*,(American Economic Association,) vol. XXXI, No.2.

৭. *The British Journal of Sociology*, 1953, Vol. 4, No.2.

৮. *Journal of Economic Theories*,. 7(2). https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-theory

৯. *Journal of Islamic Studies*, Oxford University Press , Vol. 9, No. 1 (January 1998).